# তপোভূমি নর্মদা

## পঞ্চম খণ্ড

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

# তপোভূমি নর্মদা

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

## লেখক-পরিচিতি

দি বৈদিক রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট-এর ডিরেক্টর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় বহু অধীতী সুপণ্ডিত, বেদাধ্যায়ী শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল ১৯২৮ সালের ৫ই মার্চ দোল-পূর্ণিমার দিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ শশিভূষণ ঘোষাল ও মাতা প্রভাবতী দেবীর ইনি মধ্যম পুত্র।

পিতার ইচ্ছানুসারে বেদাধ্যয়ন ও 'ভারতকে জান' এই আদেশ শিরোধার্য করে কৈলাস, মানস-সরোবর, শতপন্থ, কেদারবদ্রীসহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ চারবার পরিভ্রমণ করেন।

১৯৫৭ সালে প্রথম গ্রন্থ 'আলোক-তীর্থ' প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি বেদ-বিরোধী মূর্তিপূজা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণাদি খণ্ডন করেন এবং নতুন আলোর পথ দেখান।

রক্ষণশীল এবং গোঁড়া পণ্ডিতসমাজ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে এই গ্রন্থের প্রতিবাদে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করলেও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক শ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, মনীষী চিন্তানায়ক শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ, এই সৎ প্রচেষ্টায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তথাকথিত পণ্ডিতসমাজের সমালোচনার এবং অপযুক্তির অক্ষরশঃ খণ্ডন করেন 'আলোক-বন্দনা' (১৯৫৯) নামক দ্বিতীয় গ্রন্থে।

পিতামাতাই শিব-শিবানী — প্রত্যেকের জীবনে পিতামাতাকেই আরাধ্য দেবতা হিসাবে পূজা করা উচিত — এই তত্ত্বই প্রকাশ করেন তাঁর 'পিতরৌ' (১৯৮০) গ্রন্থে।

ঋষি-পিতার শেষ আদেশানুসারে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ (যেখানে নর্মদা সমুদ্রে গিয়ে মিলেছেন) পর্যন্ত উভয়তট নগ্নপদে পরিক্রমাকালে যেখানে যা দেখেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন তাঁর 'তপোভূমি নর্মদা' গ্রন্থে। কয়েক খণ্ড প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে রয়েছে উচ্চকোটি সাধু-মহাত্মাদের সাধন-পথ, শ্বাপদ-শঙ্কুল গভীর অরণ্যের পথঘাট ও আরও সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

**১৯৮৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের রাত্রি ১২টায় পিতৃপক্ষের পুণ্যক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে লেখক শিবতনু প্রাপ্ত হন।**

ন্দের আটটি তপস্থলী দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে সিদ্ধস্থলীতে পূজা করার 'দুসরা তরিকা' লাভ — দ্বিপ্রহরে আশ্রমে মহাত্মার সঙ্গে সিদ্ধযোগীদের কায়কল্প প্রসঙ্গে আলোচনা সুধারাম বাউলের গল্প — রাত্রে পুনরায় পূষণ গিরিজীর সঙ্গে উত্তরেশ্বর তীর্থে আগমন পূর্বদিনের অর্জিত যোগ-ক্রিয়ার পরীক্ষা গ্রহণ এবং ইষ্টমন্ত্র অনুলোম বিলোম ক্রমে জপের শিক্ষা — পূষণ গিরিজীর কাছে বিদায় গ্রহণ — সিনোর ত্যাগ — কোটেশ্বর তীর্থ আঙ্গিরস তীর্থ — মঙ্গলেশ্বর তীর্থ — অযোনিজ তীর্থ — পাণ্ডু তীর্থ — মালসরে বাঙালী বৈষ্ণব সাধু মাধবদাসজী — বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা — মাধবদাসজীর আশ্রমে সুমিষ্ট বাংলা গান শ্রবণ — আশ্রম ত্যাগ — পরিক্রমার পথে কপিলেশ্বর — ত্রিলোচন শিব দর্শন — সাংখ্যদর্শনের সূত্র ব্যাখ্যা — কম্বুকেশ্বর তীর্থ — চন্দ্র প্রভাস তীর্থ কোহনেশ্বর তীর্থ — প্রাচীন কপর্দীশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্রে পূজা — ভিক্ষা গ্রহণ — কপর্দী শব্দের ব্যাখ্যা — মূল কপর্দীশ্বর তীর্থে রাত্রিবাস ও শিবের মহিমা বর্ণনা ও তার মনন — শুক্লতীর্থের পথে যাত্রা — সাগেরেশ্বর তীর্থ — মোতিশঙ্খের উৎপত্তিস্থল কোরাল গ্রাম অতিক্রম — কুবের তীর্থ — বরুণেশ্বর তীর্থ — বায়বেশ্বর তীর্থ — যাম্যেশ্বর তীর্থ — অহল্যা তীর্থ — শুক্রতীর্থ — কর্কটেশ্বর তীর্থ — সোমতীর্থ —নন্দাদেবী, ভৈরব, কেদার ও রুদ্রমহালয় মন্দির — রুক্মিণী তীর্থ — রামকেশব তীর্থ — শিবতীর্থ — চক্রতীর্থ — জয়বারাহ তীর্থ — সুপ্রসিদ্ধ পিতৃতীর্থ আস্মাহক তীর্থে স্নান ও তর্পণ — পথে অঙ্গারেশ্বর তীর্থ — লিংকেশ্বর মহাদেব — শ্বেতবারাহ তীর্থ — ভর্গলেশ্বর তীর্থ — রবিতীর্থ — হুংকারেশ্বর মহাদেব দর্শন — শুক্লতীর্থে প্রবেশ — সংস্কৃত টোলে রাত্রিবাস — শুক্লতীর্থের অলৌকিক মহিমা দর্শন ও শ্রবণ — শুক্লতীর্থের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বাল-ব্রহ্মচারীদের দর্শন ও তাঁদের কণ্ঠে সুমধুর বেদগান শ্রবণ — হরিধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা — বাণাসুর নির্মিত কোটেশ্বর তীর্থ — রেবা-সমুদ্র সঙ্গমে পূজার জন্য অসময়ে শ্রীফল লাভ — ত্রিশিরার উপাখ্যান — মোহান্তজীর স্তোত্রপাঠ — পরমবাঞ্ছিত রেবা-সমুদ্র সঙ্গমে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম — সমুদ্র-স্নান ও পূজা অর্পণ — নাগা সন্ন্যাসীসহ লক্ষ্মণভারতীজীর ভারোচের উদ্দেশ্যে যাত্রা — মোহান্তজীর সঙ্গে ভৃগুক্ষেত্রের ২৩টি অন্যান্য তীর্থ দর্শন ও মহিমা বর্ণনা — ভারোচে প্রবেশ — সমুদ্রে স্নান ও তর্পণ — ভৃগীশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দর্শন ও তাঁর মহিমা শ্রবণ — ভৃগুকচ্ছে জগন্নাথ সাজোত্রীর কুঠিতে অবস্থান — বৃষখাতে ৪৬টি তীর্থ দর্শন ও অলৌকিক সাধু দর্শন — বৃষখাতে জপ সমর্পণ — কমলভারতীজীর মূল আশ্রমে প্রবেশ সৌভাগ্যসুন্দরীর পূজা — ত্রাটক সিদ্ধ মহাযোগী দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ ভূতেশ্বরের শাম্ভবী পাঠ বিস্ময়কর ভাবে ভূর্জপত্রে মহাত্মা সোমানন্দজীর কুশল সংবাদ উৎকীর্ণ হওয়া — শাম্ভবী বিদ্যার ব্যাখ্যা — নগেন্দ্রভারতীজী ও মতীন্দ্রজীর কাছ হতে বিদায় প্রার্থনা — প্রহ্লাদদাসজীর দর্শন — হরিধাম অতিক্রম ও দিব্যৌঘ গুরুবর্গের বন্দনা — সমুদ্র মধ্যে ভৃগুর তৃতীয় নেত্র দর্শন ও তৃতীয় নেত্র লাভ— দক্ষিণতটে পদার্পণ —উত্তরতট পরিক্রমা সমাপ্ত।

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

# তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

॥ হর নর্মদে হর ॥

মা নর্মদাকে চোখে রেখে আমাদের যাত্রা সুরু হল। কুয়াশা তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। সূর্য 'উঠি উঠি' করছেন। বহুকাল পরে পায়ে মাটির স্পর্শ লাগছে। সমতল অঞ্চল হলেও পার্বত্য-সমতল অঞ্চল। যে পথে পশ্চিমমুখে হাঁটতে আরম্ভ করলাম, সে পথের প্রায় মাইলখানিক রাস্তার দুইদিকেই অশ্বত্থ ও বটগাছের সারি। অশ্বত্থ ও বটের মাঝখানে কতকগুলি বিচিত্র ধরনের গাছ। লক্ষ্মণভারতীজী এক একটি গাছ দেখিয়ে পরিচয় দিচ্ছেন, ইসকা নাম দোকা হৈ, ইহ্ পেড়্‌কা নাম হ্যায় শালগা, শালগাকো পাশমেঁ জো পেড়্ দেখাই দেতা হৈ, উস্‌কা নাম পাষড়া।' পাহাড় অঞ্চলের বিচিত্র সব গাছ দেখতে দেখতে দ্রুতবেগে আমরা হেঁটে চলেছি। দোকা গাছ দেখতে কতকটা আমাদের দেশের আমড়া গাছের মত। আমাদের চলার পথের দুই দিকেই অশ্বত্থ বটের গাছ থাকার ফলে মনে হচ্ছে আমরা কোন প্রাচীন তপোবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। মাইল দুই-এইরকম সুদীর্ঘ অশ্বত্ত বটের সারির পর আমরা পেলাম রাস্তার দুইপাশেই আসান ও পলাশের গাছের সারি। সূর্য মাথার উপর উঠে গেছেন। দূরে দূরে অনেক চাষযোগ্য আবাদী জমি এবং লোকজনের বাড়ীঘরও দেখা যাচ্ছে। নর্মদার দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখলাম, নর্মদা আবার বাঁক নিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছেন। আমাদের পথও ক্রমশঃ নিচুস্তর হতে উচ্চতর হয়ে উঠল। এখন দেখছি রাস্তার দুধারে বনতুলসী, আম ও আমলকী গাছের ভীড়। ঝলমল রৌদ্রে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে নর্মদাকে, নর্মদাতটের এই মনোরম পথকে। আমরা ঘন্টা দেড়েক হেঁটে প্রায় সাতমাইল পথ অতিক্রম করে প্রায় সাড়ে আটটায় পৌঁছে গেলাম, একটি জনবসতিপূর্ণ মহল্লাতে, লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন —'ইহ্ মহল্লেকা নাম হৈ, ভেদিয়া। ঔর মিল্ ভর যানেসে, হমলোগ্ গরুড়েশ্বরমেঁ পৌঁছেঙ্গে।' আমরা বেলা ৯টার মধ্যে গরুড়েশ্বর মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। বিশাল মন্দির। মন্দিরের নিচেই নর্মদা বড়ই স্থির ও শান্তভাবে বয়ে চলেছেন। একটু দূরেই বিন্ধ্যপর্বতের চূড়া দেখা যাচ্ছে। নর্মদার বিস্তারও এখানে বেশী। বড়ই শান্ত গম্ভীর স্থান। তপস্যার অনুকুল। মন্দির থেকে নর্মদার জলের ধার পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্থানটি বড় বড় পাথর দিয়ে মজবুত করে বাঁধানো। ঘাটের পাথরে লেখা আছে যে, ইন্দোরের মহারাণী দ্বারা এই ঘাট নির্মিত। গরুড়েশ্বর মন্দিরের দরজা খোলাই আছে। আমরা সবাই প্রণাম করলাম। ঘন পিঙ্গলবর্ণের প্রায় একফুট উঁচু শিবলিঙ্গ পত্রপুষ্পে ঢাকা। গর্ভগৃহে ঘি এর প্রদীপ জ্বলছে। মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন একজন মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী, তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষমালা, ব্যাঘ্রচর্মের উপর পদ্মাসনে বসে একমনে

একটি রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করে চলেছেন। তিনি আমাদের দিকে একবারের জন্যও তাকালেন না। তাঁর জপে কোন বিঘ্ন না ঘটে, এজন্য মোহান্তজী মুখে অঙ্গুলী স্থাপন করে সকলকে নীরব থাকতে বললেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে চললেন পাশেই আর একটি মন্দিরে। এই মন্দির শ্বেতমর্মর প্রস্তরে নির্মিত। এখানে ভগবান দত্তাত্রেয়ের মর্মর মূর্তি স্থাপিত আছে। মোহান্তজী বললেন — 'অব দেখিয়ে এহি দত্তাত্রেয় মন্দিরমেঁ ভগবান দত্তাত্রেয় কে সম্পূর্ণ জীবনকে বড়ে হি সুন্দর ভাবময় ভিত্তি চিত্র অঙ্কিত হৈ। যহাঁ মার্গশীর্ষ পূর্ণিমাকো দত্তাত্রেয় জয়ন্তী তথা আষাঢ় শুক্লা প্রতিপদা কো ইস্ মন্দির কো প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী বাসুদেবানন্দ সরস্বতীজী কী পুণ্য তিথি বড়ী ধূমধাম সে মনাই যাতী হৈ'। এইকথা বলেই মোহান্তজী মন্দিরের দেওয়ালে ঝুলানো একটি তৈলচিত্র দেখিয়ে বললেন — এইটি শ্রীমৎ বাসুদেবানন্দজীর তৈলচিত্র; মুণ্ডিত মস্তক ক্ষীণকায় এই যোগী সিদ্ধাসনে সমকায়শিরোগ্রীব হয়ে বসে আছেন, তাঁর ডান হাতে দণ্ড এবং বামহাতটি ব্রহ্মকমণ্ডলুর উপর স্থাপিত আছে। এই অঞ্চলে এই স্থান 'দত্তমন্দির' নামে প্রসিদ্ধ। আমরা ভগবান দত্তাত্রেয়ের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে যে সব তথ্যচিত্র মার্বল পাথরে অঙ্কিত আছে সেগুলি খুটিয়ে দেখতে লাগলাম। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণভারতীজী নর্মদার স্নান করে ফিরে এলেন। মোহান্তজী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদার ঘাটে নামলেন। এঁরা আদিত্যেশ্বর হতে যাত্রা করার পূর্বে সেখানে নর্মদায় স্নান করে আসেন নি কুয়াশার জন্য। লক্ষ্মণভারতীজী এসেই আমাদেরকে শোনাতে থাকলেন বাসুদেবানন্দজীর জীবন কথা — ''পহিলে য়হ গরুড়েশ্বর গ্রাম বহুৎ ছোটা থা, ইসকী মহিমাভি ইত্‌নী নহীঁ থী। থী লেকিন জানতে নেহি। যব সে স্বামী বাসুদেবানন্দজী ইধর পধারেঁ, তব সে ইনকী খ্যাতি বিশেষ হুই। অব তো গরুড়েশ্বর আধুনিক সাধনোঁ সে সম্পন্ন হো গয়ি। দো চার সালকে অন্দর ছোটামোটা বাজার ভি বন্ সকতা হৈ। ইধর স্বামীজীকা স্মৃতিমেঁ ধরমশালা, সদাবর্ত, সংস্কৃত পাঠশালা হো গয়ি। য়হাঁ তক্ বরোদা সে ডবোই হোকর পক্কী সড়ককা ইন্তেজাম হোতা হৈ। হিঁয়াসে বরোদা করীব ৩৫ মিল্ হোগা ঔর ক্যা'। এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে তিনি বাসুদেবানন্দজীর জীবনী শোনাতে লাগলেন। বললেন — 'আজ থেকে ৩০ বৎসর আগে আমি গুরুজীর সঙ্গে প্রথম যখন পরিক্রমায় আসি, তখন স্বামীজীর দর্শন পেয়েছিলাম। সাবন্তবাড়ী রাজ্যের অন্তর্গত মানগাঁও নামক গ্রামে ১৯১১ সংবতে স্বামীজী জন্মগ্রহণ করেন। এখন সংবৎ চলছে ২০১১, কাজেই প্রায় ১০০ বৎসর আগে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পিতার নাম ছিল গণেশ ভট্টি রেঁবে আর মাতার নাম ছিল রমাবাঈ। তাঁরা ভগবান দত্তাত্রেয়ের পরম ভক্ত ছিলেন। বাল্যকাল থেকে স্বামীজী মাতাপিতার প্রভাবে দত্ত-ভক্ত হয়েছিলেন। স্বামীজীর বয়স যখন একুশ, তখন অন্নপূর্ণাবাঈ নামক এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর বিবাহিত জীবন মাত্র চার বৎসর কাল স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর একটি পুত্রসন্তানও জন্মে ছিল। সন্তান প্রসব করার পরেই তাঁর পত্নীর দেহান্ত ঘটে, এক বৎসর পরে তাঁর শিশুপুত্রেরও মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার পরেই স্বামীজী গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে নানা তীর্থে উদাসীর মত পর্যটন করতে থাকেন। উজ্জয়িনীতে তাঁর গুরুলাভ হয়। উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ মহাত্মা নারায়ণ স্বামীর কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা নিয়ে তিনি দণ্ড গ্রহণ করেন। একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় একটি ঘাসের কুটীরে থেকে তিনি কঠিন তপস্যায় ব্রতী হন। মা নর্মদা তপস্যায় সদৈব সিদ্ধিদায়িনী। নর্মদাতটে কেউ তপস্যা করেছেন, অথচ সিদ্ধিলাভ হয় নি, এ রকম ঘটনা

বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত কখনও ঘটেনি। স্বামীজী এখানেই মা নর্মদার দর্শনলাভ করেন। তাঁর সিদ্ধিলাভের পরেই ইন্দোরের মহারাণী এবং বরোদার দুজন ভক্ত শেঠকে একই সময়ে মা নর্মদা স্বপ্নে দর্শন দিয়ে স্বামীজীর 'দেখভাল' করার নির্দেশ দেন। তারপর থেকে এস্থানে ভক্তদের ভীড় জমতে থাকে। এখনও প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে স্বামীজির সিদ্ধি দিবসে ভারোচ ও বরোদা হতে এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। স্বামীজী সংস্কৃত জ্যোতিষ এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিশ্ বাইশখানি গ্রন্থও প্রকাশ করে গেছেন। সংবৎ ১৯৭০ সালে তাঁর সংকল্পানুসারে ভক্তদের দানে এই দত্তাত্রেয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ বৎসরই জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সজ্ঞানে 'হর নর্মদে' বলতে বলতে তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।'

লক্ষ্মণভারতীজীর এই পুণ্যস্মৃতিচারণ শেষ হতে না হতেই শুনতে পেলাম আমাদের পিছন দিক থেকে মন্দিরের সেই মহাত্মা বলে উঠলেন 'নারায়ণ! নারায়ণ! আপ্ মেরে গুরুজীকা জীবনচরিত আচ্ছিতরেসে বর্ণন কিয়া। য়হী নর্মদা কিনারমেঁ গুরুজীকী ভব্য সমাধি বনী হৈ। উহা উনকী গুফা ভি হৈ। চলিয়ে হমারা সাথ, হম দেখায়েঙ্গে।'

আমরা যখন বাসুদেবানন্দজীর জীবনকথা শোনায় নিবিষ্ট ছিলাম, তখন কখন যে এই মহাত্মা মন্দির হতে এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা জানতে পারিনি। তাঁর সঙ্গে গিয়ে প্রায় ৫০ গজ দূরেই বাসুদেবানন্দজীর সমাধি এবং সাধন গুহা দেখে গরুড়েশ্বর মন্দিরে ফিরে এলাম। স্নানাদির পর মোহান্তজী যখন মন্দিরে বসেছিলেন তখন কথায় কথায় আগেই জেনে নিয়েছি, এই মহাত্মার নাম হরানন্দ সরস্বতী। বাসুদেবানন্দজীরই শিষ্য। মন্দিরে আসার পরেই তাঁর এক ব্রহ্মচারী শিষ্য একটি কাঁসার সরাতে কিছু আতপ চাল, একটি রোপ্যমুদ্রা এবং নারিকেল নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর হাত থেকে সরাটি নিয়ে হরানন্দজী 'নমো নারায়ণায়' বলে মোহান্তজীর হস্তে সমর্পণ করে অত্যন্ত বিনম্র কণ্ঠে বললেন — ' আজ থেকে ২৫ বৎসর পূর্বে এই আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে এই শরীর গুরুজীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেছিল। এই শরীরের দীক্ষা দিবসে আপনাদের আগমন ঘটেছে। তাই এই পুণ্যদিনে আপনাদেরকে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আবাহন জানাচ্ছি।' আমন্ত্রণ জানানোর এই রীতিটি আমার খবই ভাল লাগল। মোহান্তজী মৃদু আপত্তি তুলতে চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে তাঁর ইচ্ছা ছিল চাঁদোদে গিয়ে রাত্রিবাস করবেন। ভিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন — 'হুড়োহুড়ি করে পরিক্রমা করলে পরিক্রমার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এইজন্য রেবাখণ্ডে মার্কণ্ডেয় মুনির সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, এক এক যোজন গিয়ে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করতে হবে। সম্ভব হলে নর্মদার প্রতি ঘাটে প্রতি তীর্থে একরাত্রি করে বাস করা উচিত। তাহলে তৎ তৎ তীর্থের শুদ্ধ বাতাবরণ সাধককে সাধনপথে সাহায্য করে। পূর্বে পূর্বে যে সব দেবতা বা ঋষি সেই সেই ঘাটে তপস্যা করে গেছেন তাঁদের চিৎশক্তির কম্পন এবং পবিত্র ভাব-তরঙ্গ পরিক্রমাবাসীকে ধ্যানের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। কম্পন (Vibration) হতেই এই জগতের সৃষ্টি, কম্পনের স্পন্দন-পথেই সাধকের জীবদেহ নেমে এসেছে এই মর্ত্যভূমিতে, সেই স্পন্দনের ধারা ধরেই তাকে উঠে যেতে হবে সেই দিব্যভূমিতে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, এই স্থান সহস্র সহস্র মুনি ঋষির ত বটেই, স্বয়ং গরুড় এবং ভগবান কুমার কার্তিকেয়, যিনি সনৎকুমার রূপে ব্রহ্মবিদ্যার

জনক, তাঁরাও এখানে তপস্যা করে গেছেন। এই মন্দির হতে কিছু দূরেই কুমারেশ্বর মহাদেব বিরাজিত, স্বয়ং কুমার কার্তিকেয় এই মহাদেব লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। কুমারেশ্বর মহাদেবের কাছেই করোটীশ্বর মহাদেবও প্রকট আছেন। চলিয়ে হম আপ্‌কা সাথমেঁ চল কর কুমারেশ্বর ঔর করোটীশ্বর মহাদেওকো দর্শন করায়েঙ্গে।'

মোহান্তজীর আপত্তি তাঁর আন্তরিকতার তাপে ভেসে গেল। হরানন্দজী তাঁর কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কুমারেশ্বর মন্দিরের দিকে এগোতে লাগলেন। গরুড়েশ্বর মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখতে পেলাম প্রায় ৫০ গজ দূরেই একটি ধর্মশালা এবং ধর্মশালা হতে মাত্র ৫০ গজ দূরে সদাবর্ত। দুতিনটি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর যথা, চাল ডাল আটা ঘি কর্পূর নারকেল এবং আগরবাতি প্রভৃতির দোকান আছে।

ধর্মশালা এবং সদাবর্তের মাঝখান দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তিনি বাঁদিকে বাঁক নিলেন। অশ্বত্থ, আমলকী, আম ও শিমূল গাছের তপোবন সদৃশ সুন্দর একটি বাগান অতিক্রম করে তিনি আমাদেরকে নিয়ে এলেন নর্মদারই তটে। প্রায় আধমাইল রাস্তা আমরা হেঁটে এলাম। পৌঁছে গেলাম কুমারেশ্বর মন্দিরে। ছোট মন্দির। মন্দিরে প্রায় তিনফুট লম্বা বিরাট স্ফটিক লিঙ্গ। হরানন্দজী জানালেন — প্রাচীনকালমেঁ কুমারস্বামী নে য়হাঁ তপস্যা করকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত কী হৈ। য়হাঁ কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী কা বিশেষ্‌ মাহাত্ম্য হৈ। স্বয়ম্ভু স্ফটিক লিঙ্গ স্বয়ং কার্তিকেয় স্বামী কা তপঃ প্রভাবসেই প্রকট হুয়া থা।

আমরা সবাই কমণ্ডলুর জল ঢেলে স্বয়ম্ভু কুমারেশ্বরজীর অর্চনা করলাম। প্রণাম করলাম। সেখান থেকে নর্মদার কিনারে কিনারে হেঁটে প্রায় আরও আধ মাইল দূরে করোটীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হলাম। বহু প্রাচীন পাথরের মন্দির। মন্দিরে কোন দরজা নাই। মন্দিরের গায়েই পরপর তিনটি বিল্ববৃক্ষ। প্রণাম করে শিবলিঙ্গের দিকে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এইরকম বিচিত্র শিবলিঙ্গ নর্মদাতটে কোথাও দেখিনি। প্রায় চারফুট উঁচু শিবলিঙ্গের শীর্ষদেশ তাজা রক্তের মত টকটকে লাল। প্রায় দুই ইঞ্চি নিচ থেকে লিঙ্গের তলদেশ পর্যন্ত হস্তীচর্মের মত ঈষৎ কালচে বর্ণ। একই শিবলিঙ্গের ৫/৬ অংশ কালচে এবং ১/৬ অংশ রক্তাভ। গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করতেই গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। এতলোকের মাঝখানে থেকেও এইরকম ভয়ের অনুভূতি শুধু আমারই হয় নি, পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম সকলেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে, অথচ এ স্থান শূলপাণির ঝাড়ির মত কোন দুর্ভেদ্য ভয়ঙ্কর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত নয়।

হরানন্দজী বললেন — ইস্‌কী ভী কথা শুন্‌ লিজিয়ে। প্রাচীনকালমেঁ য়হাঁ এক অসুর গজকে রূপমেঁ রহ্‌তা থা। উসকা নাম গজাসুর থা। গরুড়জী য়হাঁ জল পীনে কে লিয়ে আয়ে হোংগে। উন্‌হে ভুখ লাগী। ইয়ে গজাসুরকো লেকর উড় গয়ে ঔর সমীপ কে পর্বত শিখর পর বৈঠকর উস্‌কা ভক্ষণ করনে লাগে। ভক্ষণ করতে সময় ইস্‌কী করোটী নর্মদাজীমেঁ গিড় পড়ী। নর্মদাজীকে জল কা স্পর্শ হোতে হী উস্‌ গজাসুর দৈত্যকা দিব্যরূপ হো গয়া। উসী দিব্যরূপমেঁ উস্‌নে তপস্যা কী। শিবজী উসপর প্রসন্ন হুয়ে, বর মাঁগনে কো কহা। তব উসনে য়হী বর মাংগা কি আপ মেরে চর্মকো ধারণ করেঁ ঔর য়হাঁ মেরী করোটী গিরী হৈ উহাঁ রহকর্‌ আপ ভক্তোঁকা মনোকামনা পূর্ণ করতে রহেঁ। তভী সে শংকরজী য়হাঁ করোটীশ্বর রূপমেঁ রহকর ভক্তকো মনোকামনা পূর্ণ করতে হৈ। য়হাঁ গজছায়া পর্ব, ব্যতীপাত সংক্রান্তি,

কৃষ্ণ অষ্টমী, চতুর্দশী, গ্রহণাদিমেঁ স্নান কা বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ। য়হাঁ দানধর্ম কিয়ে হুয়ে কা লক্ষগুণা মাহাত্ম্য হৈ। ভগবান শংকরাচার্যনে, ওঁকারেশ্বরমেঁ তপস্যা কিয়ে থে, ম্যয় শোচতা হুঁ, উনোনে করোটীশ্বর য়হ্ মহাদেবজীকা জরুর দর্শন কিয়া হোংগে। ইসী ওয়াস্তে উনকা রচিত 'শিবাপরাধক্ষমাপন স্তোত্র' মেঁ জিকর আয়া —

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শংকরে
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণযুগলে নেত্রোত্থ বৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্‌কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোকসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং কর্মভিঃ॥

অর্থাৎ যাঁর মস্তক চন্দ্রের দ্বারা উদ্ভাসিত, যিনি মদনকে ভস্ম করেছিলেন, যিনি মস্তকে গঙ্গা ধারণ করেন, যিনি মঙ্গলবিধায়ী, যাঁর কণ্ঠ ও কর্ণযুগল সর্পের দ্বারা ভূষিত, যাঁর নয়ন হতে অগ্নি উত্থিত হয়, যিনি গজচর্মের সুন্দর আবরণ ধারণ করেছেন, মুক্তিলাভের জন্য ত্রৈলোক্যের সার সেই শিবসুন্দরে চিত্ত বৃত্তি স্থির কর। অন্য কর্মের কি প্রয়োজন?

হরানন্দজী করোটীশ্বর মহাদেবের বৃত্তান্ত শেষ করলে আমরা সবাই করোটীশ্বরকে প্রণাম করে ফিরলাম। ফিরবার পথে মোহান্তজী তাঁকে অনুরোধ করলেন ভগবান কার্তিকেয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করার জন্য। আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি বলতে লাগলেন — ভগবান কার্তিকেয় তপস্যা করতে এসেছিলেন এই নর্মদাতটে পরিপূর্ণভাবে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করতে। মা নর্মদার মাহাত্ম্য গুণে তিনি স্বয়ং মূর্তিমান ব্রহ্মবিদ্যা হয়ে উঠলেন। একথা আপনারা সকলেই জানেন যে, ভগবান কার্তিকেয় স্বয়ং মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। বেদব্যাস মহাভারতে বর্ণনা করেছেন যে, দেবতাদের সঙ্গে দানবরা সর্বদা জয়ী হয় দেখে ইন্দ্র একজন উপযুক্ত সেনাপতির অনুসন্ধান করতে থাকেন। একদিন মানসপর্বতে বামাকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে ইন্দ্র দেখেন যে, কেশীদানব প্রজাপতির কন্যা দেবসেনাকে হরণ করতে চেষ্টা করছে। ইন্দ্র কেশীর কবল হতে মুক্ত করে দেবসেনাকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা তাঁকে দেখে বলেন, একজন মহাপরাক্রান্ত তেজোবীর্যশালী দিব্যপুরুষ এই কন্যার পতি হবেন আর তিনিই হবেন দেবসেনাপতি। দক্ষ কন্যা স্বাহা অগ্নিকে মনে মনে কামনা করতেন। একদিন অগ্নি সপ্তর্ষিদের পত্নীগণকে দেখে কামাতুর হয়ে পড়েন। স্বাহা মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী শিবার রূপ ধারণ পূর্বক কামাতুর অগ্নির সঙ্গে সহবাস করেন এবং অগ্নির শুক্র নিয়ে গরুড়পক্ষিনী হয়ে এক কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। এতেও তৃপ্ত না হয়ে তিনি সপ্তর্ষিদের প্রত্যেকের স্ত্রীর রূপ ধারণ করে পূর্বের মত অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। কেবলমাত্র বশিষ্টপত্নী অরুন্ধতীর তপস্যা প্রভাবে স্বাহা তাঁর রূপ ধারণ করতে অক্ষম হন। এইভাবে স্বাহা ষষ্ঠবার কাঞ্চনকুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করেন। সেই সম্মিলিত শুক্র থেকে স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। তাঁর ছয়টি মস্তক, একটি গ্রীবা এবং একটি উদর হয়। কার্তিকেয়ের জন্মের পর সপ্তর্ষিরা তাঁদের স্ত্রীদেরকে ত্যাগ করেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, তাঁদেরই স্ত্রীরাই স্কন্দের জননী; কিন্তু স্বাহা বারংবার করে বলতে লাগলেন যে স্কন্দ তাঁরই পুত্র। প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত ছিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। কিন্তু সপ্তর্ষিরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন স্কন্দকে বধ করতে। কারণ তাঁর অমিত বীর্য তাঁদের অসহ্য। কিন্তু

ইন্দ্র এই কার্যে সাহসী হলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার জন্য লোকমাতাদেরকে (শিবের অনুচরী মাতৃকাশক্তি) প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে নিজেদের পুত্রজ্ঞানে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে ইন্দ্র দেবতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্কন্দকে হত্যা করতে ছুটলেন, কিন্তু অগ্নির তেজে উৎপন্ন বালকের মুখ-নির্গত অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে দেবসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিলেন। তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলে, কার্তিকেয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করে বিশাখ নামে এক কাঞ্চনবর্ণ যুবার আবির্ভাব ঘটল। বিশাখকুমার কার্তিকেয়েরই অপর নাম। তখন দেবরাজ ভীত হয়ে সসম্মানে কুমারকে দেবসেনাপতি পদে বরণ করে নিলেন।'

গল্প শুনতে শুনতে আমরা কুমারেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। দ্বিতীয় বারের জন্য দর্শন করলাম কুমারেশ্বরের মহাস্ফটিক লিঙ্গ। দেখে দেখে আশ মিটে না। এতবড় শুদ্ধ স্ফটিক এবং স্ফটিক হতে বিচ্ছুরিত শ্বেতাভ জ্যোতিঃ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না। একবার প্রণাম করলাম। আমাদের প্রণাম শেষ হতেই হরানন্দজীও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ভগবান কুমারেশ্বরকে। করোটীশ্বর মন্দিরে ভয়ে আমাদের গাত্র ছম্‌ছম্ করছিল কিন্তু এখানে দেখছি যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। গর্ভগৃহ থেকে সামনে প্রবাহিত মা নর্মদার দিকে তাকাতেই মন স্বতঃই অন্তর্মুখ হয়ে যেতে চায়।

এখান থেকে গরুড়েশ্বর মন্দিরের দিকে হরানন্দজী তাঁর আশ্রমের পথে নিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে আরম্ভ করলেন — রুদ্রকে অগ্নি বলা হয়, এইজন্য কুমার কার্তিকেয় মহাদেবেরই পুত্র। ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে দেবসেনার বিবাহ দেন। দেবসেনাপতিপদে নিযুক্ত হবার পর দেবাসুরের যুদ্ধে কুমার শরাঘাতে সমস্ত দানবকে নিহত করে দেবতাদেরকে রক্ষা করেছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কুমারের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কুমার মহাদেবের তেজে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বতীর সঙ্গে বিহারকালে মহাদেবের তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী এই তেজ ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভয়ে এই তেজ শরবনে ত্যাগ করেন। শরবনে পতিত এই বীর্য থেকে একটি সুন্দর বালকের জন্ম হয়। কৃত্তিকারা এই বালককে স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করেন। পার্বতীদেবী এই ঘটনা জানতে পেরে কার্তিকেয়কে নিজের কাছে এনে রাখেন।

স্বামীজীর গল্পও শেষ হল, আমরাও গরুড়েশ্বর মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। খুবই যত্নের সঙ্গে স্বামীজী আমাদেরকে ভিক্ষা দান করলেন। ভিক্ষা গ্রহণের পর তাঁর যজ্ঞশালার বিশাল মণ্ডপে বিশ্রাম করতে লাগলাম। মতীন্দ্রজীর ঘড়িতে তখন বেলা ২টা বেজেছে।

ঘন্টাখানিক পরেই দেখলাম, হরানন্দজী মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। তাই দেখে আমাদেরও আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগল না। আমরা সবাই উঠে গিয়ে মন্দিরে গিয়ে বসলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি ভগবান গরুড়েশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতে লাগলেন — এই স্থান গরুড়ের তপস্যাক্ষেত্র। নর্মদাতটে গরুড়ের তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব এখানে প্রকট হন। এখানে কত সহস্র যে ঋষি মুনি মা নর্মদার দয়ায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তার ইয়ত্তা নাই।

মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে বললেন — নর্মদা তীর্থের প্রত্যেক স্থানের বিবরণ বর্ণনা করা আপনার কর্তব্য। কেননা, আপনিই এইসব পরিক্রমাবাসীর দলনেতা। বলতে আরম্ভ করুন, আপনার মত মহাত্মার মুখেও আমিও শুনে ধন্য হতে চাই। গরুড় সম্বন্ধে বলুন, পরে আমিও যা জানি বলব।

মোহান্তজী গরুড়েশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন — মহাভারতের আদিপর্বে আছে, বালখিল্য ঋষিদের আকার এবং দৈহিক ক্ষমতার হীনতা দেখে একবার ইন্দ্র উপহাস করলে তাঁরা নূতন ইন্দ্র সৃষ্টির জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কশ্যপ মধ্যস্থ হয়ে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করেন ও তাঁর পত্নী বিনতার গর্ভে পক্ষীকূলের ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করবেন বলে স্থির করেন। কশ্যপ দক্ষের দুই কন্যা কদ্রু ও বিনতাকে বিবাহ করেছিলেন। কশ্যপের বরে কদ্রুর সহস্র নাগপুত্র জন্মে। বিনতারও দুই পুত্র হয় কিন্তু তাঁর সাময়িক ক্ষোভ ও অবিমৃষ্যতার ফলে প্রথম পুত্র অরুণ বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, পরে পিতা কশ্যপের বরে তিনি সূর্যের সারথি হয়েছিলেন। বিনতার দ্বিতীয় পুত্র অমিত শক্তি ও তেজের আধার মহাবীর গরুড়। কদ্রু ও বিনতা একদিন দূর থেকে ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবাক দেখে তার পুচ্ছের বর্ণ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে থাকেন। বিনতার মতে পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, কদ্রুর মতে তা কৃষ্ণবর্ণ। স্থির হল, যাঁর কথা মিথ্যা হবে, তাকে অপরের দাসীবৃত্তি করতে হবে। উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ প্রকৃতপক্ষে শ্বেতই ছিল কিন্তু কদ্রুর আদেশে তাঁর কৃষ্ণবর্ণ নাগপুত্রগণ উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছকে আচ্ছন্ন করে থাকার ফলে পুচ্ছের বর্ণ কালোই দেখাল। পরাজিত হয়ে বিনতা সপত্নীর দাসীবৃত্তি করতে থাকলেন। প্রকাণ্ড দেহ, অনন্ত পরাক্রম এবং প্রচণ্ড তেজের অধিকারী হয়েও মায়ের সঙ্গে গরুড়কে দাসত্ব স্বীকার করে নিতে হল। মায়ের নিগ্রহ দেখে গরুড় তাঁর দাসীত্ব মোচনের শর্ত জানতে চাইলে নাগমাতা কদ্রু বললেন যে অমৃত এনে দিতে পারলে মাতাপুত্র উভয়েই মুক্তিলাভ করবেন।

মাকে প্রণাম করে গরুড় অমিত বিক্রমে ছুটে চললেন স্বর্গ পথে। দেবতারা তাঁকে আক্রমণ করতে আসেন কিন্তু গরুড়ের কালান্তক মূর্তি এবং অবিরাম 'মা মা' ডাকে দেবতারা এতই ভীত হয়ে পড়েন যে তাঁরা একে অপরের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করতে থাকেন। অমৃতের দ্বার রক্ষক বিশ্বকর্মা বাধা দিতে এসে গরুড়ের হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হন। অমৃত রক্ষার জন্য দেবতারা অমৃতকুম্ভের চতুর্দিকে অগ্নিব্যূহ , ঘূর্ণমান শানিত ক্ষুরচক্র এবং ক্ষুরচক্রের নিচে দুটি ভীষণ সর্প স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গরুড় মা বিনতার চরণপদ্ম ধ্যান করে সূক্ষ্মদেহে সেই চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে দুটি ভীষণ সর্পকে নখের চাপে পিষ্ট করেন এবং অমৃতকুম্ভ ছিনিয়ে নিয়ে আকাশ পথে উড্ডীন হন, এই সময় ভগবান বিষ্ণু এসে তাঁর পথরোধ করেন কিন্তু মাতৃআশীর্বাদে অজেয় গরুড় সেই প্রতিরোধও চূর্ণ করেন। অমৃত লাভ করেও অমৃতপানে বিরত থাকতে দেখে বিষ্ণু প্রীত হয়ে তাঁকে অমরত্ব দান করেন। গরুড়ও বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করতে বললে বিষ্ণু তাঁকে তাঁর বাহন হতে এবং তাঁর রথে অধিষ্ঠান করতে বলেন। গরুড় তাঁকে তথাস্তু বলে প্রস্থানে উদ্যত হলে ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করেন। অক্ষতদেহে গরুড় দেবেন্দ্রকে উপহাস করে বলেন — 'মাতৃআশীর্বাদে আমি অজেয়। মায়ের অভয় হস্তস্পর্শে সন্তানের দেহ বিষ্ণুচক্র ও বজ্রেরও যে দুর্ভেদ্য হয়, তা দেবরাজ হয়েও তোমার জানা নাই। আমি দধীচি এবং আপনার সম্মানে একটি পালক ত্যাগ করে দিচ্ছি।'

এখন দেখছি, আপনারা মোটেই তপস্বী নন। কেতাবী বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের চেয়ে তপস্যার মূল্য অনেক বেশী। ইন্দ্রিয় সংযম, লোভ জয় এবং চিত্তশুদ্ধ তপস্যা ছাড়া হয় না। এই বলে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং দশকন্যা মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তদ্দণ্ডেই সেখানে দৈববাণী হল — পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের দল! আমরা দশকন্যা 'কে' তার পরিচয় শ্রবণ কর —

ভীমাদেবী হিমাদ্রৌতু শুদ্ধি হি কপালমোচনে।
শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনির্ণাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা॥
মন্মথা হেমকূটা তু কুশদ্বীপে কুশোদকা।
গায়ত্রী বেদবদনে পার্বতী শিবসন্নিধৌ॥
শূলেশ্বরী ভৃগুক্ষেত্রে ভৃগৌ সৌভাগ্যসুন্দরী।
সর্বগা সর্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্বতো ভুবি॥

অর্থাৎ হিমালয়ে যিনি ভীমাদেবী, কপালমোচনে যিনি শুদ্ধি, শঙ্খোদ্বারে যিনি ধ্বনি, পিণ্ডারকে যিনি ধৃতি, হেমকূট পর্বতে যিনি মন্মথা, কুশদ্বীপে যিনি কুশোদকা, বেদমুখে যিনি গায়ত্রী, শিব সন্নিধানে যিনি পার্বতী, ভৃগুক্ষেত্রে যিনি শূলেশ্বরী এবং ভৃগুতে যিনি সৌভাগ্যসুন্দীর নামে প্রসিদ্ধা, আমরা দশকন্যা সেই আদ্যাশক্তিরই বিভূতি। আমরা সর্বভূতাধিষ্ঠাত্রী এবং ভূতলে সর্বত্রই দৃশ্যমানা।

দৈববাণী স্তব্ধ হতেই সকল আশ্চর্য হয়ে দেখল, বিবাহ মণ্ডপে একটি শিবলিঙ্গ উদ্ভূত হয়েছেন। সেই বিবাহ মণ্ডপেই পরে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে, মন্দিরের মধ্যে সেই শিবলিঙ্গই বিরাজমান। এখানে তপস্যা করলে সিদ্ধিলাভ হয়।

২৬। আমরা দশকন্যাকা তীর্থে প্রণাম এবং হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করে তটে উঠে হাঁটতে লাগলাম। এখানে দেখছি, নর্মদা বিপুলাকারা। একুল ওকুল দুকুল জুড়ে শুধু জল আর জল। মোহান্তজী বললেন — আর মাইলখানিক হেঁটে গেলেই আমরা ভৃগুকচ্ছ বা ভৃগুক্ষেত্রে পৌঁছে যাব। বর্তমান নাম ভারোচ। ভারোচ এখন বড় শহরের রূপ ধারণ করেছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ, শহরের বড় বড় অট্টালিকা দেখা যাচ্ছে। নর্মদা এবার মূল আরব সাগরে গিয়ে মিলিতা হবেন। তাই প্রশস্ততমা হয়েছেন।

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দেখলাম একজন সাইকেল আরোহী সাইকেল থামিয়ে তটের উপরেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন মোহান্তজীকে। প্রণাম করে উঠেই তিনি মোহান্তজীকে হড়বড় করে বলে গেলেন — গুরুজী আপনার জন্য প্রতীক্ষা করে করে লক্ষ্মণভারতীজী অস্থির হয়ে উঠেছেন। দক্ষিণতট হতে পরিক্রমাকারী নাগা সন্ন্যাসীর দলও এখন আশ্রমে এসে পৌঁছাননি। এদিকে আপনিও এখন আশ্রমে পদার্পণ করেননি। গত ৯ই কার্তিক তিনি জনা চল্লিশেক নাগাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আশ্রমে এসে পৌঁছেছেন। আপনার নাকি গত পরশু এখানে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল, কাল ১২ তারিখেও আপনি না এসে পৌঁছানোতে চিন্তায় লক্ষ্মণভারতীজী কাতর হয়ে পড়েছেন। শহরের ভক্তবৃন্দ এসে প্রতিদিনই আপনার খোঁজ নিচ্ছেন। তাঁদেরকে জবাব দিতে দিতে লক্ষ্মণভারতীজী কাতর হয়ে পড়েছেন। এক নিঃশ্বাসে তিনি এতগুলি কথা অত্যন্ত দ্রুততালে বলার পর মোহান্তজী বললেন — জগন্নাথজী, তাঁকে আরও একটু যন্ত্রণা ভোগ করতে দাও। আমি আজও আশ্রমে যাচ্ছি না।

আমি এখন বৃষখাতের দিকে যাচ্ছি , সেখানে এই সাতজন পরিক্রমাবাসীকে তীর্থকৃত্য এবং ভৃগু নর্মদার দর্শন করিয়ে ফিরে এসে তোমার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করব। তুমি ত জান, এই ভৃগুকচ্ছের মধ্যে আরও ৪৬টি প্রসিদ্ধ তীর্থ কাছে। সেগুলি আমার সাথীরা না দর্শন করলে এদের জীবনের প্রথম পরিক্রমা সম্পূর্ণ হবে না। আশ্রমের চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকে গেলে আমি আর বেরতেই পারব না। দরকার হলে আরও দুদিন তোমাদের বাড়ীতে এঁদেরকে নিয়ে আমাকে থাকতে হবে।

(আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন) — এই বাঙালী বাবা সুদূর বাংলাদেশ থেকে পরিক্রমা করতে এসেছেন। মা নর্মদার ইচ্ছাক্রমে আমাদের দলের সঙ্গে পথিমধ্যে এঁর দেখা হয়েছে। লছমন ভেইয়া স্বয়ং প্রধান সাধক হয়েও এই নূতন পরিক্রমাবাসীদেরকে হরিধামে ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণতটাগত নাগা সন্ন্যাসীদের টানে আগেভাগে ভারোচে এসে পৌঁছে গেছেন। দেখবে, আমি আশ্রমে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁদের কারও দেখা মিলবে না। আমি যে এঁদেরকে নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে থাকব, তা কাউকে বলার দরকার নাই।

মোহান্তজীর কথা শেষ হলেই জগন্নাথজী আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পুনরায় সাইকেলে চেপে ছুটে গেলেন ভারোচের দিকে। তিনি চলে যেতেই মোহান্তজী বললেন — এই জগন্নাথ আমার মন্ত্রশিষ্য। এঁরা সাজোত্রা গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুব বুদ্ধিমতী। প্রায় কোটিপতি ধনী। ভারোচের আশ্রম এঁদেরই প্রদত্ত জমিতে স্থাপিত হয়েছে। পরম গুরুদেব মহাত্মা কমলভারতীজীর আমল থেকে এঁদের পাঁচ পুরুষ ধরে বংশপরম্পরা আমাদের মূল গদীর শিষ্য। অনন্য ভক্ত।

কথা বলতে বলতেই আমরা ভারোচের সীমায় প্রবেশ করলাম। ভারভূতেশ্বর হতে এই ভড়ৌচ বা ভারোচ ভৃগুক্ষেত্রের দূরত্ব ৮ মাইল। ঝোলা গাঁঠরী রেখে নিজেও ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন, আমাদেরকেও প্রণাম করতে বললেন। আমাদের প্রণামপর্ব শেষ হতেই তিনি বলতে লাগলেন — আমরা যে বৃষখাতের দিকে যাচ্ছি, ভারোচে প্রবেশ করছি, এই ভৃগুক্ষেত্র বা ভারোচ হল নর্মদাখণ্ডের সর্বপ্রধান তীর্থ। এখানে ভৃগুমুনি ১০০ দিব্য বর্ষ গায়ত্রী সাধনা করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। এখানের মাটিকে মাটি ভেবো না। পবিত্রতম তীর্থরেণু বলে ভাববে। এখানের সমুদ্রের সঙ্গে নর্মদার সঙ্গম হয়েছে বলে নর্মদা যেমন চওড়া হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। সমুদ্রের সন্নিকটবর্তী বলে এখানকার জল ঈষৎ লবণাক্ত হলেও পান করা চলে। এখান হতে ক্রমশঃ নিচের দিকের জল আর মুখে দেওয়া যায় না। এখানে সকল রকম বেদোক্তকর্ম, স্নান দান, জপ তপ কোটিগুণ ফল প্রদান করে। ভারোচ তীর্থময়, মন্দিরময় শহর হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। নর্মদার সঙ্গে সমুদ্রের সংগম হয়েছে, জাহাজাদি চলাচল করে। ভারোচ রেলের একটি প্রধান জংশন। বোম্বাই হতে বরোদা আমেদাবাদ মেন লাইন নর্মদার উপরে লৌহ সেতুর উপর দিয়ে চলে গেছে বলে সেদিক দিয়েও ব্যবসা বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়েছে। জাহাজ ও রেলপথে গুজরাটের প্রধান ফসল কার্পাস দেশ দেশান্তরে রপ্তানী হয়ে থাকে। আমি মহর্ষি ভৃগুর পুণ্যজীবন সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই কিছু বলেছি। বাকী কথা ভৃগু নর্মদার মন্দিরে গিয়ে শোনাব।

ভারোচ শহরের মধ্যে না ঢুকে মোহান্তজী একেবারে সমুদ্রের ধারে নিয়ে এলেন। বেলা তখন ১০ টা। সমুদ্রের বিশাল বিস্তার বিশেষতঃ নর্মদা সংগমের ক্ষেত্রটি দেখে আমাদের

এইজন্য মহাভারতে তাঁর একটি নাম দেওয়া হয়েছে 'সুপর্ণ'।

ইন্দ্র প্রীত হয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। ইন্দ্রের বরে নাগগণ গরুড়ের ভক্ত হল এবং গরুড়ও প্রতিজ্ঞা করলেন অমৃত নাগদেরকে পান করতে দিবেন না। গরুড় অমৃত নিয়ে গিয়ে কুশের উপর স্থাপন করলেন। মাকে মুক্ত করলেন। এই অবসরে নাগগণ অমৃত পান করার পূর্বেই ইন্দ্র তা অপহরণ করে নিলেন। নাগগণ শূন্যকুশ লেহন করতে গিয়ে খণ্ডজিহ্ব হয়ে গেলেন।

জগন্মঙ্গল ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড়ও জগন্মঙ্গল। তিনিও জগতের হিতকারী। মহামুনি গালব যাতে বিভিন্ন রাজার নিকট হতে অভিলষিত দান গ্রহণ করে গুরুদক্ষিণা দিতে পারেন এজন্য গরুড়ের নিকট প্রার্থনা জানালে গরুড় তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন। এই পরোপকার বৃত্তি গরুড়ের বংশগত ধর্ম। এই আদর্শ অনুসরণ করেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জটায়ু রাবণের কবল হতে সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। রামায়ণে আছে যে গরুড়কে স্মরণ করতেই গরুড় আবির্ভূত হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশের বন্ধন হতে মুক্ত করেছিলেন এবং গরুড়ের স্পর্শে রাম-লক্ষ্মণের দেহে সর্পশর জনিত ক্ষতসকল নিরাময় হয়েছিল (রামায়ণ, ৫০ সর্গ)। নানা গ্রন্থে গারুড়ী মন্ত্রের প্রভাবের উল্লেখ আছে। সর্পভয় নিবারণের জন্য এখনও আমরা গরুড়ের নাম করি। গুরুদেব শ্রীশ্রীচৈতন্যভারতীজীর মুখে শুনেছি, বৈমাত্রের ভাইদেরকে ভক্ষণ করার ফলে ব্রহ্মহত্যার অপরাধ হয়েছিল গরুড়ের কারণ সর্প হলেও তাঁরা ত মহর্ষি কশ্যপেরই পুত্র। সেই অপরাধ স্খালনের জন্যই তিনি সর্বপাপবিনাশিনী নর্মদাতটের এইস্থানে এসে তপস্যা করেছিলেন।'

— নারায়ণ! নারায়ণ! আপনে বহুৎ আচ্ছিতরেসে ভগবান গরুড়জীকো চরিত্র বর্ণন কিয়া।

হরানন্দজীর উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ শেষ হলেই আমি যুক্তকরে নিবেদন করলাম — নর্মদাতটে পরিক্রমা করতে করতে অধিকাংশ মহাত্মার মুখে পুরাণের নানা উপাখ্যানই শুনে আসছি। মোহান্তজী মহাভারত হতে যে কাহিনী বর্ণনা করলেন তা উপাদেয় সন্দেহ নাই। আমার জানতে আগ্রহ হয়, গরুড় সম্বন্ধে কোন বৈদিক সাহিত্যে কোন কিছু সূত্র আছে কিনা। মূল বেদে কি সূত্রাকারে বা সংকেতে গরুড় সম্বন্ধে কোন উক্তি আছে?

— হম্ শোচতে হৈ আপ্ বাঙালী হ্যায়। বাঙালীকো উপর হম্ বহুৎ শ্রদ্ধা রাখতে হৈ, কেঁও কি বাঙালী লোক বিচারশীল ঔর যুক্তিনিষ্ঠ হোতেঁ হৈ।

এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন — 'শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার আখ্যায়িকা হতেই এই গরুড় প্রসঙ্গ মহাভারতে বিস্তারিত হয়েছে সন্দেহ নাই। কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর নাম ও অশ্বের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। সেখানে দেখা যায়, দেবগণের ইচ্ছা হল যে সোম বা অমৃত আকাশ হতে তাঁদের কাছে আসেন। সেইজন্য তাঁরা সুপর্ণী ও কদ্রু নামে দুইটি মায়া শক্তি সৃষ্টি করলেন। এই দুজনের মধ্যে কলহ হয়। অবশেষে স্থির হল, তাঁদের মধ্যে যিনি অধিক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবেন তিনিই অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারবেন। সুপর্ণী বললেন, 'সলিল রাশির পারে যুপকাষ্ঠে বদ্ধ একটি শ্বেত অশ্ব রয়েছে।' কদ্রুর দৃষ্টিশক্তি আরও তীক্ষ্ণ, তিনি শ্বেত অশ্ব ত দেখলেনই, তার উপর তার পুচ্ছ বায়ুভরে আন্দোলিত হচ্ছে তাও দেখতে পেলেন। সুপর্ণী গিয়ে দেখে আসলেন যে কদ্রুর কথাই সত্য।

কদ্রু বললেন — তুমি আমার দাসী হলে। দিব্যলোকে সোম আছে, তুমি তা এনে মুক্তি লাভ কর। সুপর্ণী তখন ছন্দসকলকে প্রসব করলেন এবং গায়ত্রী স্বর্গ হতে সোম আহরণ করে আনলেন; সুপর্ণী মুক্তিলাভ করলেন (শতপথ ৩।৬।২)। যখন গায়ত্রী সোম আনয়ন করছিলেন, তখন একজন তীর নিক্ষেপক তাঁর একটি পালক বা সোমের একটি পত্র ছেদন করেছিলেন (শতপথ ৩।৩।৪।১০)। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও এই বিবরণ আছে (৬।১।৬), তবে সেখানে উল্লেখ আছে যে, কার রূপ অধিক এই নিয়েই কদ্রু এবং সুপর্ণীর মধ্যে দন্দ্ব হয়েছিল।

সোম আনয়নের জন্য যেসব বৈদিক উপাখ্যান আছে তা আলোচনা করলেই তার সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে আছে —

ঋজিপ্য ঈমিন্দ্রাবতো ন ভূজ্জ্যং শ্যেনো জভরে বৃহতো অধি ষ্ণোঃ।
অন্তঃ পতৎপতচ্যস্য পর্ণমধ যামনি প্রসিতস্য তদ্বেঃ।।

মন্ত্রের অর্থ হল — অশ্বিদ্বয় যে রকম ইন্দ্রবান দেশ হতে ভুজ্যুকে বহন করেছিল সেইরকম ঋজুগামী অর্থাৎ দ্রুতগতিবিশিষ্ট শ্যেনপক্ষী বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হতে সোম হরণ করে এনেছিল। তখন যুদ্ধে প্রহৃত এই পক্ষীর মধ্যস্থিত পতনশীল পালক পড়ে গিয়েছিল।

ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের অন্তর্গত ৭৭ সূক্তের ২ মন্ত্রেও আছে — স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিতস্তিরো রজঃ অর্থাৎ শ্যেন পক্ষী আপন জননী কর্তৃক প্রেরিত হয়ে, যাকে আকাশ হতে বায়ুপথের মধ্য দিয়ে অবতীর্ণ করেছিল, সে প্রাচীন দেবতা সোম ক্ষরিত হচ্ছেন।

এই শ্যেন পক্ষীই অবশেষে পুরাণে গরুড় হয়েছেন এবং শ্যেন জননী হয়েছেন বিনতা।

ঠিক গরুড় নামটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। তবে 'সুপর্ণ' 'গরুত্মান' নামে দুটি শব্দের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (১। ১৬৪। ১৬) ঋগ্বেদের (১। ৮৯। ৬) তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি বলে দুটি শব্দ আছে। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির নিকট সূক্ত প্রণেতা ঋষি মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছেন। ভারতের বেদভাষ্যকারগণ অরিষ্টনেমিকে বিশেষণ করে তার্ক্ষ্য অর্থে গরুড় বুঝেছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৭৮ সূক্তে দেখা যায় যে ঋষি তার্ক্ষ্য দেবতার স্তব করছেন। তাতে আছে তে তার্ক্ষ্য সোম আনয়নের জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৮।৬) আছে, গায়ত্রী যখন সোম আনতে যান তখন তার্ক্ষ্য তাঁর পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। এইভাবে গায়ত্রী কর্তৃক সোম আনয়নের যে কাহিনী বৈদিক গ্রন্থে আছে, তার্ক্ষ্যের কাহিনী তার সঙ্গে মিশে গরুড়ের উৎপত্তি কাহিনী রচনায় যে সহায়তা করেছে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়।'

মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, গরুড়জী কেন এখানে তপস্যা করতে এসেছিলেন, তার কারণ সম্বন্ধে আপনার গুরুজীর কাছে যা শুনেছেন তা শ্রদ্ধা ভরে শিরোধার্য করেও আমি যা শুনেছি তা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

একবার গরুড়জী কোন কারণে মহাতপস্বিনী শাণ্ডিলীকে অপমান করেন; সেইজন্য তাঁর সুন্দর পক্ষসকল শাণ্ডিলীর অভিশাপে স্খলিত হয়ে মাংসপিণ্ডবৎ হয়ে গেছল। এ হল মহাভারতের বৃত্তান্ত। গরুড় অনুনয় দ্বারা তপস্বিনীকে সন্তুষ্ট করলে তিনি গরুড়কে বলেন, নর্মদাতীরে গিয়ে তপস্যা করলে আবার পক্ষসকল পূর্ববৎ উদিত হবে, তিনি পুনরায় পূর্ববৎ তেজোবীর্যময় সুন্দর দেহলাভ করতে পারবেন। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে আছে , এইখানে

নর্মদাতীরে তপস্যা করলে মহাদেবের কৃপায় গরুড়ের পুনরায় পক্ষোদগম হয়।

তাঁর কথা শেষ হল। ভগবান গরুড়েশ্বরের সন্ধ্যারতির সময়ও হয়ে গেছে। পাঁচজন ব্রহ্মচারী পঞ্চপ্রদীপ কর্পূরদানী চামর প্রভৃতি নিয়ে মন্দিরে এলেন। হরানন্দজী নর্মদা স্পর্শ করতে গেলেন, আমরাও নর্মদারও ঘাটে নেমে মাথায় নর্মদার জল ছিটিয়ে মন্দিরে এলাম। নাগা সন্ন্যাসীরা শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে লাগলেন, আরতি সুরু হয়ে গেল। ধূপধুনার গন্ধে চারদিক আমোদিত হল। প্রথমে গুরু, তারপর মহামুনি মার্কণ্ডেয় এবং গরুড়ের বন্দনা গীতি গেয়ে ব্রহ্মচারীরা মা নর্মদা এবং মহাদেবের আরতি করলেন ধূপ-দীপ চামর ইত্যাদি দিয়ে। অনেক স্তোত্র অনেক বন্দনা এবং অনেক বার ধরে হর নর্মদে জয়ধ্বনি দেওয়া হল। আরতির পর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে ব্রহ্মচারীরা চলে গেলেন। আমাদেরকে আলো দেখিয়ে তাঁরা নিয়ে গেলেন যজ্ঞশালায়। একজন ব্রহ্মচারী প্রস্তাব করেছিলেন, ধর্মশালায় শোবার জন্য। কিন্তু মোহান্তজী কিছুতেই রাজী হলেন না। এখানে কোন বনজঙ্গলও নাই, বাঘ ভাল্লুকের উপদ্রবও নাই, কাজেই মোহান্তজীর সাহস অনেক বেড়ে গেছে। তিনি যজ্ঞশালাতেই সকলকে শয্যা গ্রহণ করতে বললেন। আমরা যে যার আসনে বসে সান্ধ্যক্রিয়াতে মন দিলাম। এই ঘোর নির্জন শান্ত বাতাবরণ তপস্যার অনুকূল সন্দেহ নাই। মন স্বতঃই এখানে শান্ত ও স্থির হয়ে যায়। জপ ক্রিয়াদি সেরে রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা শুয়ে পড়লাম। অল্প অল্প শীত অনুভব হচ্ছে বটে কিন্তু তাতে কোন কষ্ট অনুভব হচ্ছে না। ঘুমিয়ে পড়লাম।

গভীর ঘুমের মধ্যে যখন আচ্ছন্ন, তখন স্বপ্ন দেখলাম বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন — 'এই রকম মহাসিদ্ধিক্ষেত্রে এসেও ঘুমিয়েই সময় কাটাবি? উঠে পড়, মন্দিরে গিয়ে মা নর্মদার ষড়ক্ষরী বীজ যতক্ষণ পারিস্ জপ কর।' বাবার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর! ঘুম ভেঙে গেল। কান্নায় আমার বুক ভেসে যেতে লাগল। আমি কম্বলটা বগলে নিয়ে মন্দিরের দিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি, হরানন্দজী দরজার সামনে বসে জপ করছেন, মন্দিরের বাঁদিকে মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতীজীও নিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মন্দিরের দেওয়াল ঘড়িতে টং করে একটা শব্দ হল। তার মানে এখন রাত্রি একটা। ধীরে ধীরে নর্মদার ঘাঠে নেমে জলস্পর্শ করে এসে মন্দিরের এককোণে বসে বাবার সদ্যপ্রাপ্ত নির্দেশ মত মা নর্মদার ষড়ক্ষরী বীজ জপে মন দিলাম। কিন্তু জপ করব কি, বাবার কথাই বেশী করে মনে পড়তে লাগল; জিহ্বায় ষড়ক্ষরী বীজ আওড়ে যাচ্ছি, মন চিন্তা করছে বাবার কথা। জপের অক্ষরের দিকে মন দিতেই দেখছি, আমি ষড়ক্ষরী বীজ জপছি না, জিহবাতে স্পন্দিত হচ্ছে রেবা রেবা, বাবা বাবা, কখনও বা রে-বা বাবা! মনকে স্থির ও অন্তর্মুখ করার জন্য মা নর্মদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম —

নমঃ পুণ্যজলে আদ্যে নমঃ সাগরগামিনী,<br>
নমস্তে পাপশমণি নমো দেবি বরাননে।<br>
নমোহস্তুতে ঋষিগণ সংঘসেবিতে<br>
নমোহস্তুতে শংকরদেহনিঃসৃতে<br>
নমোহস্তুতে ধর্মভৃতাং বরপ্রদে,<br>
নমোহস্তুতে সর্বপবিত্র পাবনে।।

মা নর্মদার স্তব করতে করতে মন শান্ত ও স্থির হয়ে এল। একমনে ষড়ক্ষরী বীজ জপ করতে লাগলাম। নিজের ইষ্ট বীজ যা করপাত্রীজীর দয়ায় অবিরাম প্রবাহে অহর্নিশ জপ হয়ে যাচ্ছিল, তার গতিবেগ ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে ষড়ক্ষরী-বীজের কলতানে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। ঠিক, ঠিক এই সময়ে কেউ চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেও দূর থেকে তার মুখের উপর কোন তীব্র আলো এসে পড়লে চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেও যেমন চোখে আলোর আভাস জাগে, ঠিক সেইরকম ভাবেই আমার মনে হল যেন সার্চলাইটের আলো কেউ আমার চোখে ফোকাস্ করেছে। চমকে উঠে সামনের দিকে নর্মদার উপর দৃষ্টি ফেলতেই দেখলাম.... কি দেখলাম..... দেখলাম কারও অঙ্গদ্যুতিতে নর্মদার জল আলোকিত হয়ে উঠেছে, জলের উপর ভাসমান এক বিরাট পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা, মাথায় ললিত শিবজটা তাতে অর্ধচন্দ্র, জ্যোতির্ময় ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা ত্রিশূলধারিণী জ্যোতির্ময়ী এক ভৈরবীর সাজে সজ্জিতা কেউ যেন বিদ্যুৎগতিতে চলে গেলেন পশ্চিমাভিমুখী সমুদ্রের দিকে। এক লহমার মধ্যে সব ঘটে গেল। চোখ বন্ধ করে নিতে বাধ্য হলাম। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে দিব্যগন্ধ..........।

কতক্ষণ এই আনন্দ স্বর্গে ডুবে ছিলাম জানি না। যখন চেতনা এল তখন শুনলাম হরানন্দজী ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন —

তব প্রসাদাৎ বরদে বরিষ্টে কালং যথেমং পরিপালয়িত্বা।
যামোহথ রুদ্রং তব সুপ্রসাদাৎ অয়ং তথা ত্বং কুরু বৈ প্রসাদং।

ধীরে ধীরে যখন চোখ দুটো মেলবার সামর্থ্য এল, তখন দেখলাম, হরানন্দজী ও মোহান্তজীসহ আমাদের সকল সাথীরাই নর্মদার ঘাটে স্নান করতে নেমেছেন। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমিও নর্মদাতে স্নান ও পিতৃতর্পণ সেরে সদ্য উদীয়মান ভগবান বিবস্বানের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম। অঞ্জলিভরা মহাপবিত্র রেবাবারির সঙ্গে, মায়ের অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করতে করতে অশ্রুধারাও গড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রণামান্তে পাথরের বাঁধানো ধাপে ধাপে গরুড়েশ্বরের চরণে দণ্ড দিতে দিতে উঠে এলাম মন্দিরে। হে গরুড়েশ্বর মহাদেব! তুমি সত্য, তোমার নাম সত্য, মহিমা সত্য! তোমার করুণাও প্রত্যক্ষ সত্য। ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম —

ওঁ যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাত মদ্রিবঃ
রাধ স্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর॥ ৪

(সামবেদ, ৩ অধ্যায়, দ্বাদশী দশতি)

হে ত্রিশূলধারিন্ আনন্দদেবতা! ত্রিজগতের সমস্ত বস্তুই তোমার। তোমাকে দেয় বা দাতব্য কিছুই নাই (নাস্তি ত্বাদাত)। জীবের সাধ্য নাই যে তোমাকে কিছু দেয় তবুও তুমি সকলকেই উভয় হস্তদ্বারা (উভয়া হস্ত্যা) আভর অর্থাৎ যথেষ্ট রূপে বিতরণ করে থাক। হে চিত্র (সুন্দর পুরুষ)! তোমায় প্রণাম।

ওঁ সোমানাং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ॥ ৫ (সামবেদ, অধ্যায় ২য়, দশতি ৩)

হে বেদপতি পরমেশ্বর! জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হলে পাপাত্মা যেমন দেবসন্নিকর্ষ (দেবতাদের সান্নিধ্যলাভ) লাভ করে তেমনি আমার মত কর্মজালে বদ্ধ প্রার্থনাকারীকেও দেবানুগ্রহ লাভের উপযুক্ত করে তুলুন।

প্রণাম করে উঠে একধারে চুপ করে বসে থাকলাম। হরানন্দজী ছাড়া মন্দিরে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। প্রায় আধঘন্টা কেটে গেল। ওঁরা সব গেলেন কোথায়? অনুমান করলাম, তাঁরা বোধহয়, এখান থেকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। পূর্ণভাবে সূর্য প্রকট হয়েছেন। আর কুয়াশা নাই। একটু পরেই ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে সকলেই মন্দিরে উপস্থিত হলেন। মতীন্দ্রজী যজ্ঞশালা হতে আমার ঝোলা গাঁঠরী কমণ্ডলু লাঠি সব বয়ে এনেছেন। এসেই বললেন — এই যে তোমার কম্বলটা সিঁড়ির নিচে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। উঠে পড়, তৈরী হও আমরা এখনই রওনা হব। মোহান্তজী হরানন্দজীকে তাঁর আতিথ্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন। আমি সব গুছিয়ে আলখাল্লা গায়ে দিচ্ছি, তখন আমার দিকে তাকিয়ে মোহান্তজী হঠাৎ মন্তব্য করে বসলেন — 'দেখিয়ে, লছমন ভেইয়া! তুমহারা মাফিক্ বাঙ্গালীবাবাকো ভি বক্ষপট রক্তাভ ঔর গাত্রবর্ণ ভি হরিদ্রাভ হো গয়া। তুমলোগোকা সকল বদল গয়ে ক্যায়সে?' হঠাৎ গর্জে উঠলেন হরানন্দজী। তিনি বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন — আপ্ ক্যা বাচ্চোঁ কি মাফিক্ বাতচিৎ কর রহে হো। ইন্‌কা ইহ গাত্রবর্ণ জিন্দেগী ভর রহেগা। যেত্‌না বুঢ্‌ঢা হোগা ইয়ে বর্ণ থোড়াসা হ্রাস হোগা ত জরুর, লেকিন ইনকা অন্তকালমেঁ ইনকা বক্ষদেশ এ্যায়সাহি রক্তাভ ঔর গাত্রবর্ণ জ্যাদা হরিদ্রাভ হো যাবে গা।

তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন — 'নর্মদা পরিক্রমা করতে এসেছ , একা একা পরিক্রমা করতে এসেছ, একা একা পরিক্রমা করতে পারলেই ভাল হয়। এতবড় দলের সঙ্গে নয়, বড় জোর দু' একজনের সঙ্গে থাকলে দোষ নাই। চরকীর মত পথে পথে চক্কর না খেয়ে যে কোন স্থানে দু চারদিন থেকে ধ্যান ধারণা করতে পারলে তবে ত ভক্তবৎসলা নর্মদামায়ীর কৃপা বুঝতে পারবে।' হরানন্দজীর কথায় মোহান্তজীর মুখ বিষণ্ণ হল। তাঁর মুখ দেখে ব্যথা পেলাম। স্নেহময় এই সরল মানুষটি যখন যা মনে আসে অকপটে সরলভাবে বলে ফেলেন কিন্তু মন বড় উদার এবং মহৎ। আমরা পুনরায় গরুড়েশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে মন্দির পরিক্রমা করতে লাগলাম। যতক্ষণ পরিক্রমা করলাম, ততক্ষণই হরানন্দজী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে স্বস্তিবাচন করতে লাগলেন। তিনবার মন্দির পরিক্রমা করে আমরা মন্দিরের পিছন দিয়ে ধর্মশালা এবং সদাবর্তের মাঝখান দিয়ে আধঘন্টা হেঁটে পৌঁছে গেলাম গতকালের দৃষ্ট সেই মনোলোভা স্ফটিক লিঙ্গ কুমারেশ্বর মন্দিরে। প্রণাম করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আধঘন্টা পরেই পৌঁছালাম সেই ভীতিপ্রদ ভয়ংকর করোটীশ্বর মহাদেবের স্থানে। মন্দির পরিক্রমা করে আমরা এগোতে লাগলাম নর্মদার কিনারা ধরে। তটের গায়ে গায়ে মাঝে মাঝেই শাল অশ্বত্থ কোথাও বা আম ও আমলকী গাছ দেখতে পাচ্ছি। এই পথে অনেক পেঁপে এবং পেয়ারা গাছও আছে। একটা আমলকী গাছে দেখলাম একটা সুন্দর ধনেশ পাখি বসে আছে। শূলপাণির ঝাড়িতে ভয়ংকর ভয়ংকর সেই সব ডুংরী এবং জঙ্গলের তুলনায় এইসব পথকে বড়ই মনোরম লাগছে। নর্মদার কিনারে কিনারে হাঁটার ফলে পায়ের তলায় বালি এবং মাটির স্পর্শও পাচ্ছি। এইসব স্থানে যুগ যুগ ধরে কত যে ঋষি তপস্যা করে গেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। কিছু দূরে দূরেই শিবমন্দির দেখে বুঝছি নর্মদাতটের এইস্থানগুলি সত্য তপোবন সদৃশ, সত্য সত্যই তপস্যার

জনকূল স্থান। পথে অনেক মানুষজনেরও মুখ দেখা যাচ্ছে। মিনিট কুড়ি হাঁটার পরেই আমরা জনবসতিপূর্ণ অক্‌তেশ্বর মহল্লায় এসে পৌঁছালাম। নাগাদের শিঙ্গা ডম্বরু বাদ্য এবং 'হর নর্মদে' ধ্বনি শুনে অনেক স্ত্রী পুরুষ তাঁদের গৃহ থেকে ছুটে এসে শঙ্খধ্বনি এবং 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে লাগলেন। পরিক্রমাবাসীদেরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এটি একটি মহৎ রীতি। এখানেই আছে অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরে পৌঁছেই মোহান্তজী বললেন — রেবাখণ্ডের ৮৩তম অধ্যায়ে আছে, বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষি অগস্ত্যদেব। বিন্ধ্যপর্বত একদিন সূর্যকে নিবেদন করলেন, তিনি যেমন উদয়াস্তকালে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন, তেমনি বিন্ধ্যকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে। সূর্য এতে অসম্মত হয়ে বলেন যে তিনি বিশ্বনিয়ন্তার আদিষ্ট পথেই পরিভ্রমণ করেন এবং করবেন। বিন্ধ্য ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের কলেবর এমনভাবে বৃদ্ধি করতে লাগলেন যে তাতে সূর্যের পথ রোধ হল। তখন দেবতারা মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। অগস্ত্য ভক্ত বিন্ধ্যের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এখানে উপস্থিত হলে বিন্ধ্য অবনত মস্তকে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ কা য়হ্ নিয়ম হৈ কি যব তক গুরু উঠনে কী আজ্ঞা ন দে তব তক উঠে নহীঁ। অগস্ত্য বিন্ধ্যকে উঠতে ত বল্লেনই না, পরিবর্তে হুকুম করলেন — 'বেটা'! যব তক হম লোটে নহীঁ তব তক ঐসে হী লেটে রহনা।' বিন্ধ্যকে এই অবস্থাতেই রেখে অগস্ত্য ১লা ভাদ্র দক্ষিণা পথে যাত্রা করলেন, আর ফিরলেন না। সেই ঘটনারই স্মারক চিহ্ন হিসাবে এখানে অগস্ত্যেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিন্ধ্যপর্বতের দিকে তাকিয়ে দেখ, নর্মদাতটের অন্যান্য স্থানে বিন্ধ্যপর্বতের যে আকাশভেদী উচ্চতা দেখে এসেছ, এখানে সে রকম নাই। বিন্ধ্য এখানে একরকম সমতল স্তরে নেমে এসেছেন বল্লেই হয়। উনোনে অগস্ত্যজীকো দণ্ডবৎ কিয়ে থে। দেখিয়ে ইধর বিন্ধ্য দণ্ড কী ভাঁতি লেটা হী রহে।

আমরা অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে মা নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই অগনেশ্বর নামক গ্রামের কাছে এসে পৌঁছালাম। এখানেও গ্রামবাসীরা শঙ্খধ্বনি ও ঢুলুক বাজিয়ে পরিক্রমাবাসীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। এখানের মন্দিরে আছেন কেদারেশ্বর মহাদেব। যাঁরা কাশীতে কেদারঘাটে কেদারনাথকে দেখেছেন, সেই কেদারনাথের অনুরূপই এক শিবলিঙ্গ এখানে বিরাজিত আছেন। আমরা সেই মনোহর শিবলিঙ্গকে প্রণাম করতেই লক্ষ্মণভারতীজী এই মন্দিরের ইতিবৃত্ত শোনাতে লাগলেন — অন্ধ্রপ্রদেশের একজন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিব্রাজন করতে করতে তিনি নর্মদাতটে এসে পৌঁছেন। তিনি নর্মদার ঘাটে দুই বেলাই স্নান ও শিবপূজা করতে করতে যখন এই অগনেশ্বর মহল্লাতে আসেন তখন তাঁর বার্ধক্য পীড়িত দেহ অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে ; ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে তিনি রেবামন্ত্র জপ করতে করতে কাঁদতে থাকেন। রেবানীরে স্নানং কৃত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজং অর্থাৎ দু'বেলাই নর্মদাতে স্নান এবং মহাদেবের অর্চনা করলে যে মা নর্মদা দয়া করেন, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই ব্রাহ্মণের জীবন। ক্ষুৎ পিপাসায় ক্লিষ্ট হয়ে তিনি যখন নিদ্রাচ্ছন্ন, সেই সময় স্বপ্নে তিনি দর্শন পেলেন মহাদেব এবং নর্মদাজীর। তাঁরা মধুর কণ্ঠে বললেন — 'হে ব্রাহ্মণ! মৈঁ তেরে ভক্তিসে প্রসন্ন হোকর য়হীঁ আগয়া হুঁ, তু উঠ কর ভোজন কর। ঔর হিমালয় জানে কে লিয়ে তক্‌লিফ মৎ উঠাও।

ইধরই কেদারনাথ রূপমেঁ হম্ প্রগট হো যাতা হুঁ। ব্রাহ্মণ নিদ্রাভঙ্গের পর উঠে দেখেন তাঁর মাথার শিয়রেই কেদারনাথ শিবলিঙ্গ প্রকট হয়েছেন। কেদারনাথের পূজা করেই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করেন। সেই থেকে নর্মদাতটের পরিক্রমাবাসী মাত্রেই কেদারনাথকে দর্শন করা তাঁদের অবশ্য করণীয় চর্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে রবীশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। রবীশ্বরের কিছুদূরেই কামেশ্বর তীর্থ। নর্মদাতটে এইটাই একমাত্র গানপত্য তীর্থ। এখানে তপস্যা করেই গণেশ সর্বসিদ্ধিদাতা হতে পেরেছিলেন। এখানের কয়েকজন গ্রামবাসী জানালেন যে অগ্রহায়ণ মাসে অষ্টমী তিথিতে এখানে মেলা বসে এবং গৌরী গণেশের পূজা হয়। যাঁরা নর্মদাতটে দীর্ঘকাল তপজপ করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না, তাঁরা এই কামেশ্বর তীর্থে এসে মা নর্মদার কৃপা অতি অবশ্যই অনুভব করে ধন্য হয়ে যান। এখানকার মন্দিরের পাশে কয়েকজন মহাত্মাকে কুশের ঝোপড়াতে থেকে তপস্যায় নিরত দেখতে পেলাম।

সিদ্ধিদাতা বিনায়কের প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে মিনিট সাতেক হাঁটার পরেই আমরা আর একটি শিবমন্দিরে উপস্থিত হলাম। এখানকার মহাদেবের নাম কপিলেশ্বর। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন যে রেবাখণ্ডের ৯২ তম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় মুনি বর্ণনা করেছেন যে উদ্ধত বলদর্পী সগরসন্তানকে স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত করার পর কপিল এখানে এসে তপস্যা করে মনের সাম্য অবস্থা লাভ করেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে এক গহ্বরের মধ্যে রক্তপিঙ্গলবর্ণের এক শিবলিঙ্গ মহর্ষি কপিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই গ্রামের নাম বাসনা।

বাসনা গ্রাম হতে পাঁচ মিনিট হেঁটে যেতে না যেতেই চোখে পড়ল তটের উপরেই আর এক মন্দির। মোহান্তজী তাঁর গুরুদেবের অঙ্কিত কয়েকটি রেখাচিত্র উলটিয়ে ঘোষণা করলেন — এখানে বিরাজিত আছেন মণিনাগেশ্বর মহাদেব। কদ্রু যখন বিনতার কাছে হেরে যাবার আশঙ্কায় ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাকে নিজেদের দেহ দিয়ে ঢেকে ফেলার জন্য নাগপুত্রদেরকে আদেশ করলেন, তখন কদ্রুর অন্যতম পুত্র মণিনাগ মায়ের এই কপট ষড়যন্ত্রের অংশভাগী হতে চাইলেন না। তাতে কদ্রু অভিসম্পাত দেন — 'তোকে জন্মেজয়ের যজ্ঞাগ্নিতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুড়ে মরতে হবে।' মাতৃ অভিশাপে ভীত হয়ে মণিনাগ নর্মদাতটে এসে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। তখন আশুতোষ স্বয়ং চঞ্চল হয়ে পড়লেন। তিনি মণিনাগের নিকট আবির্ভূত হয়ে বললেন — রেবা কোন মাতৃপিতৃদ্রোহীকে কৃপা করেন না। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারলাম না। তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি। আমার সাক্ষাতেই তুমি সমাধিযোগ অবলম্বন কর। আমি তোমাকে হার রূপে আমার কণ্ঠে ধারণ করছি। আমার কণ্ঠে সংলগ্ন থাকলে কোন যজ্ঞাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করতে পারবে না, মাতৃ-অভিশাপও স্পর্শ করতে পারবে না। দয়াল আশুতোষের অহৈতুকী কৃপা এবং ভক্ত বাৎসল্যের জ্বলন্ত স্মারক চিহ্ন হয়ে আছেন এই মণিনাগেশ্বর মহাদেব। তোমারা মা নর্মদার জয়ধ্বনি দিয়ে আশুতোষের চরণে প্রণত হও।

আমরা সকলেই প্রণামান্তে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরেই নর্মদাতটের আর এক প্রসিদ্ধ শিবমন্দিরে এসে পৌঁছালাম। এই মন্দিরের মহাদেবের নাম তিলকেশ্বর। মন্দিরে তখন যজ্ঞ

হচ্ছে। নিত্য বেদপাঠ এবং বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান এই মন্দিরের বিশেষত্ব। পরিক্রমাবাসীদের শিঙ্গা ডম্বরুর শব্দে দুজন বেদপাঠী ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে মোহান্তজীর মাথায় পুষ্প দিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন। আমরা যজ্ঞস্থলীকে প্রণাম করে মন্দিরে গিয়ে মহাদেব দর্শন করলাম। মন্দিরের পুরোহিত বললেন — ইয়ে তিলকেশ্বর মহাদেব বহুৎ প্রাচীন হৈ। ইনকে ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরোমেঁ উন্-উন্ মনুয়োঁকা নাম সে প্রিয়ব্রতেশ্বর, চৈত্রেশ্বর, অজস্রেশ্বর, শান্তীশ্বর, সত্যেকেশ্বর, শতদ্যুম্নেশ্বর, আদি নাম হুয়ে। যব্ বৈবস্বত মনুকে পুত্র তিলক নে গৌতমজী দ্বারা ইনকী মহিমা শুনী ত ইন্হোনে তিলকেশ্বর নাম সে ইনকী পূজা কী ঔর য়হা তপস্যা কী। ইয়ে নর্মদাতটকী বহুৎ পুরাণা তপস্থলী হৈ। ক্রোড় মুনিনে ইধর তপস্যা করকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হো চুকে।'

তপস্যাস্থল বটে। আম, কাঁঠাল, আমলকী, অশ্বত্থ বট অর্জুন ও শালগাছে ঘেরা মনোরম এই উদ্যান-বাটিকার মধ্যস্থলে এই তিলকেশ্বর মন্দির সর্বদা হোমের গন্ধে সুরভিত রয়েছে। সামনেই নর্মদা এখানে বেশ প্রশস্ত। পুরোহিত মশাই আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত করলেন এবং তিলকুশ যব শমী এবং সমিধ ঘৃতসিক্ত করে অন্ততঃ একটি করে আহুতি দিতে অনুরোধ করলেন। আমরা রেবামন্ত্রে আহুতি প্রদান করে তিলকেশ্বরকে পুনরায় প্রণাম করে আবার নর্মদার তট ধরে হাঁটতে লাগলাম।

মহর্ষি গৌতমের তপস্থলীতে গৌতমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় পৌঁছালাম তিলকবাড়া গ্রামে।

আমরা সকাল সাড়ে সাতটায় গরুড়েশ্বর হতে যাত্রা করেছিলাম। একটানা হাঁটলে আমরা বেলা দশটার মধ্যেই চাঁদোদে অতি সহজেই পৌঁছে যেতে পারতাম। একথা মতীন্দ্রজী প্রকাশ করতেই মোহন্তজী বললেন — নর্মদার ঘাটে ঘাটে তীর্থ। মার্কণ্ডেয়জী কি সাধে বলেছেন যে নর্মদায় কোটাতীর্থ বর্তমান। আমরা সখের ভ্রমনকারী নই, পরিক্রমা একটা কঠিন ব্রত। আমাদের সাধন-ভজন নাই। ত্যাগ তপস্যাও নাই। প্রতি তীর্থে যদি শিবের চরণে মাথা লুটিয়ে যেতে না পারি, তাহলে শিবপুত্রী কি কৃপা করবেন?

মতীন্দ্রজী লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন। আমরা তিলকবাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ মাতৃতীর্থের মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। মন্দিরের গর্ভগৃহে সপ্তমাতৃকার অস্পষ্ট রূপ খোদাই করা আছে। এ কোন শিল্পীর অঙ্কিত বলে মনে হল না। পাথরের সুপ্রাচীন দেওয়াল গাত্রে স্বতঃই পাথরের আকার এমন যে, মনে হচ্ছে পাথরের গায়ে সাতটি বিভিন্ন রেখাচিত্র ফুটে আছে। গর্ভগৃহের মূল কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত আছেন একটি রক্তচন্দনের শিবলিঙ্গ। দরজা নাই। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — 'সপ্তমাতৃকায়েঁ এহি স্থানমেঁ শাপমুক্ত অহল্যাকো লেকর গৌতম ঋষিকে সমীপ আঈ। তভী সে সপ্তমাতৃকা য়হাঁ রহকর্ ক্ষেত্র কা কল্যাণ করতী হৈঁ। অষ্টমী নবমী তথা চতুর্দশী কা য়হাঁ বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ। য়হাঁ করনে সে স্ত্রিয়োঁ কা বন্ধ্যাত্ব মোচন হো যাতা হৈ। রেবাখণ্ডমেঁ ৯৩ অধ্যায়মেঁ মার্কণ্ডেয়জী ইন্‌কো বর্ণন কিয়া।'

মন্দিরে তিনজন স্ত্রীলোক হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন। তাঁদের পরিবারের কয়েকজন অদূরেই একটি দোকান ঘরের একপাশে বসে আছেন। দোকানে চাল আটা ডাল মশলা প্রভৃতি পাওয়া যায়। মোহান্তজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — 'বাঙালীবাবা, সপ্তমাতৃকাকে বারেমেঁ

থোড়া কুছ জানতে হো ত বাতাইয়ে। মুঝে বহুৎ পিয়াস লাগী। পানি পিকর দোপাঁচ মিনিট কে লিয়ে থোড়াসা বিশ্রাম কিয়া যায়।'

আমি বললাম — আমি যতদূর জানি, অন্ধকাসুরের সঙ্গে মহাদেবের যখন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন তাঁর শূলের আঘাতে অন্ধকের দেহ হতে পতিত রক্তে সহস্র সহস্র অসুর সৃষ্টি হতে থাকে। এই বিচিত্র ব্যাপার দেখে মহাদেব রুষ্ট হলেন এবং ক্রোধবশতঃ তাঁর মুখ থেকে এক অগ্নিশিখা নির্গত হল। পরে এই অগ্নিশিখা এক দেবীর মূর্তি পরিগ্রহ করে। তাঁর নাম যোগেশ্বরী। এই যোগেশ্বরীই প্রধান মাতৃকা। ক্রমে ব্রহ্মা ইন্দ্র যম বরাহরূপী বিষ্ণু এবং কার্তিকেয় প্রভৃতি আরও ছটি মাতৃকা সৃষ্টি করলেন, এই মাতৃকাদের সমবেত চেষ্টায় অসুররা সদলে নিহত হল। এই সপ্তমাতৃকার নাম — যোগেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, দণ্ডধারিণী এবং বারাহী।

মাতৃতীর্থে প্রণাম করে মা নর্মদার গতিপথের উপর লক্ষ্য রেখে আধমাইলটাক হেঁটে যাবার পরেই দেখলাম তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়ে বিন্ধ্যপর্বতের দিক থেকে একটা ছোট নদী নর্মদাতে এসে মিশেছে। নর্মদার বিস্তারও বেড়ে গেছে। এই নদীর নাম অশ্বপর্ণী বা অশ্বাবতী। এখানকার গ্রামের নাম চুড়েশ্বর। অশ্বপর্ণী ও নর্মদার সঙ্গমের নিকটেই চন্দ্রেশ্বর শিব বিরাজিত। এই চন্দ্রেশ্বর মহাদেব খুবই লাবণ্যময়, প্রায় ৬" দীর্ঘ। এই চন্দ্রেশ্বর তীর্থের কাহিনী হচ্ছে যে, সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্রগর্ভ হতে যেমন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনই আবির্ভাব হয়েছিল উচ্চৈঃশ্রবা নামক এক দিব্য অশ্বের। ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবাকে নিজের বাহন করেছিলেন। উচ্চৈঃশ্রবার চার পুত্র যথাক্রমে — অশ্বপর্ণ, সুপর্ণ, মধুপর্ণ, এবং মরুৎগতি। এদের মধ্যে অশ্বপর্ণ হয়েছিল চন্দ্রের বাহন। চন্দ্র যখন নর্মদাতটে তপস্যা করতে আসেন, তখন অশ্বপর্ণ অন্নজল ত্যাগ করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মাটিতে পড়ে যায় মহাদেবকে স্মরণ করতে করতে। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের দুর্দশা দেখে তার সামনে বটু ব্রাহ্মণের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে অশ্বপর্ণকে রক্ষা করেন। এইজন্য এই চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের অপর নাম 'বটবীশ্বর'।

চন্দ্রেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করে আমরা ১০ মিনিটে হেঁটে পৌঁছে গেলাম নারদেশ্বর তীর্থে। এখানে দেবর্ষি নারদ উগ্রতম তপস্যা করে দেবর্ষি পদে উন্নীত হন এবং স্বর্গ মর্ত্য পাতাল হতে বিষ্ণুলোক শিবলোক এবং ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অবাধ যাতায়াতের অধিকার লাভ করেন। মা নর্মদার আশীর্বাদে নারদ সর্বান্তর্যামিত্ব, দিব্য সংগীতবিদ্যা এবং দিব্য ব্রহ্মবিদ্যারও অধিকার লাভ করেন। নর্মদাতটের এই স্থানে নানাবিধ বনস্পতির মাঝে নানা জাতীয় পুষ্প উদ্যানও আছে। পুষ্প সৌরভে এই অপরূপ তপঃস্থলী সর্বদাই সুরভিত। মোহান্তজী জানালেন — আজ আমরা চাঁদোদে গিয়ে বিশ্রাম করব। বাঙালীবাবা আজ সান্ধ্যক্রিয়ার পরেই আমাকে নারদজীর কথা স্মরণ করিয়ে দিও। আজ আমরা নারদজীর পুণ্যচরিত অনুস্মরণ করব। বায়ুপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে নারদজীর মহিমা মার্কণ্ডেয়জী ব্যক্ত করেছেন।

এই অপরূপ তপঃস্থলীতে ভূলুণ্ঠিত হয়ে আমরা নারদ, নর্মদা ও নারদেশ্বরকে প্রণাম করে একে একে দধিস্কন্দ বা মধুস্কন্দ, তীর্থঘাট, নক নামক মহল্লায় নন্দিকেশ্বর এবং বরুণেশ্বর মহাদেব মন্দিরে প্রণাম ও দর্শন করে প্রসিদ্ধ পাবকেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী বললেন — এই স্থান অগ্নির তপস্যা ক্ষেত্র। মহাভারতের আদিপর্বে আছে — স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় মহর্ষি ভৃগু নর্মদাতে স্নান করতে গিয়ে আশ্রমে অনুপস্থিত থাকাকালে পুলোমা নামক এক

রাক্ষস ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করতে চায়। পূর্বে এই রাক্ষস পুলোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু কন্যার পিতা মহর্ষি ভৃগুকেই কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। সেই দুঃখ ও বিদ্বেষ সর্বদাই রাক্ষসের মনে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ভৃগুর হোমগৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে সম্বোধন করে রাক্ষস জিজ্ঞাসা করে — 'তুমি দেবগণের মুখ। সত্য বল এই সুন্দরী পুলোমা কার স্ত্রী? এই সুন্দরীকে আমি পূর্বেই স্ত্রীরূপে বরণ করেছিলাম কিন্তু ভৃগু অন্যায়ভাবে এঁকে গ্রহণ করেছেন, এখন আমি একে হরণ করতে চাই।' অগ্নি বলেন — 'তুমি সত্যই পূর্বে পুলোমাকে বরণ করেছিলে কিন্তু কন্যার পিতা বরলাভের আশায় ভৃগুকেই কন্যাদান করেছিলেন।' এই কথা শুনেই রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করে মহাবেগে প্রস্থান করলে পুলোমার গর্ভস্থ সন্তান চ্যবিত অর্থাৎ স্খলিত হয়। তাঁর নাম হয় চ্যবন। সূর্যতুল্য তেজোময় এই শিশুকে দেখেই রাক্ষস ভস্ম হয়ে ভূপাতিত হয়। পুলোমা দুঃখিত মনে শিশুকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে চললেন। ইতিমধ্যে ভৃগুও আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি সব শুনে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন — 'তোমার পরিচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল?' পুলোমা বললেন — অগ্নি আমার পরিচয় দিয়েছিল। তখন ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিকে শাপ দিয়েছিলেন — 'তুমি সর্বভুক হও।' শাপগ্রস্থ হয়ে অগ্নি তখন দেবকার্য, পিতৃকার্য, অগ্নি হোত্রাদি সকল যজ্ঞ হতে নিবৃত্ত হয়ে এখানে নর্মদাতটে এসে তপস্যায় ব্রতী হন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই পাবকেশ্বর শিবলিঙ্গ। স্বয়ং ব্রহ্মা, মা নর্মদা এবং মহাদেব অগ্নিদেবের নিকট প্রকট হয়ে অগ্নিকে বলেন — 'তুমি সদাই পবিত্র, কেবলমাত্র তোমার গুহ্যদেশের শিখা ক্রব্যাদ্ সর্বভুক্ হবে। তোমার মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে, তা দেবতার ভাগ হব্য, এবং পিতৃপুরুষদের ভাগ কব্য নামে গৃহীত হবে। এখানে যে লোক এসে বহ্নিসূক্ত পাঠ করবে, তোমার কৃপায় অবশ্যই তার দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হবে।

মোহান্তজী পাবকেশ্বরের এইভাবে মহিমা বর্ণন করে বললেন — 'পাবকেশ্বর মহাদেবকে এখন প্রণাম করে আমরা এগিয়ে যাই চল, আগমীকাল চাঁদোদ থেকে আমরা যথোপযুক্ত দ্রব্যসম্ভার এনে এখানে হবন করব। এখানে হবন কার্যই পূজা।'

নর্মদাতট ধরেই আমরা হাঁটছি। আমাদের ডানদিকে লোকালয় বামদিকে নর্মদাকে দর্শন করতে করতে যাচ্ছি। এই অঞ্চলে দেখছি ফলভারে বৃক্ষ নত বললেই হয়, উর্বর জমিতে নানা ধরনের ফসলও হচ্ছে। বহুলোক নর্মদায় স্নান করছেন, মুখে বলে চলেছেন হর নর্মদে, হর নর্মদে। কাশী হতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গাতটে লোকজনরা যেমন গঙ্গাগত প্রাণ, তেমনি এই অঞ্চলের সবাই নর্মদাকে ধ্যানজ্ঞান করেছেন। নর্মদা যে মহাদেবের স্বেদসম্ভূতা দিব্যা দেবনদী এই জ্ঞান সকলেরই আছে। অধিকন্তু নর্মদাতটের সর্বত্র যে তপস্যাক্ষেত্র, মা যে তপস্যায় সিদ্ধিদায়িনী তা আবালবৃদ্ধবনিতা জানেন এবং সুখে দুঃখে সবাই অহরহ নর্মদার নাম গ্রহণ করে থাকেন।

আমরা পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই কুবেরেশ্বর তীর্থে পৌঁছালাম। কোন এক সময় এক পতিব্রতা সতী কুবেরের কোন অপরাধে কুপিত হয়ে কুবেরকে শাপ দেন — 'জরাগ্রস্তো ভব।' ধনপতি কুবের অনেক অনুনয় বিনয় করলে ঐ সতী উপদেশ দেন — 'নর্মদাতটে গিয়ে তপস্যা করলে মা নর্মদার বরে বার্ধক্য ও জরা হতে পরিত্রাণ পাবে।' মোহান্তজী আমাদের গন্তব্য পথের ধারেই একটি প্রাচীন শিবমন্দির দেখিয়ে বললেন — এহি কুবেরেশ্বরজী হৈ। ইধর তপস্যা করকে কুবেরজী জরামুক্ত হো গয়ে থে। উনোনে হি, কুবেরেশ্বর লিঙ্গ

স্থাপন কিয়া। রেবাখণ্ডকা ১০৫ অধ্যায়মেঁ লিখা হৈ, য়হ্য নর্মদাজীকে জলমেঁ খড়ে হোকর সুবর্ণদানকা বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ। নর্মদা কিনারে কা যহ্ একপ্রকার সে কনখল তীর্থ হৈ।

কুবেরেশ্বর অতিক্রম করে কিছুদূর যাবার পরেই আমরা কর্ণালী গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। কর্ণালীতে এসে নর্মদা বক্রপথে উপর দিকে উঠে গেছেন, বিন্ধ্যপর্বতের দিক থেকে তীব্রগতিতে প্রবাহিত হয়ে একটি নদী মিশেছে নর্মদার সঙ্গে। এই নদীর নাম ঔর নদী। এই সংগমস্থলের নিকটে বিখ্যাত সোমেশ্বর তীর্থ। মোহান্তজী বললেন — ঔর নদীতে সংগমের জলে আমরা স্নান করে নিই চল। মন্দিরে ঝোলা গাঁঠরী রেখে আমরা স্নান করতে নামলাম। স্নান করতে করতে তিনি আমাদেরকে সোমেশ্বর তীর্থের ইতিবৃত্ত শোনাতে লাগলেন। তাঁর কথায় জানা গেল যে, এই সোমেশ্বর মহাদেবকে স্থাপন করেছিলেন চন্দ্রমা। তিনি দক্ষ প্রজাপতির ৬০ জন কন্যার মধ্যে অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিনী প্রভৃতি ২৭ জনকে বিবাহ করেন। রোহিনীর প্রতিই তাঁর ভালবাসা ছিল সর্বাধিক। তাতে কুপিত হয়ে রোহিনীরই উপর ঈর্ষাবশতঃ বাকী ২৬ জন কন্যা গিয়ে দক্ষের নিকট গিয়ে চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাই শুনে দক্ষ চন্দ্রকে রাজযক্ষ্মাতে আক্রান্তে হবার অভিশাপ দেন। চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হয়। চন্দ্র সেই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চলে আসেন এই ঔর-নর্মদার সঙ্গমে। তিনি এখানে সোমেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে নর্মদা ও মহাদেবের পূজা করতে থাকেন এবং অন্তে রোগমুক্ত হয়ে তাঁর স্বস্থানে ফিরে যান। কর্ণালীর এই সোমেশ্বর তীর্থকে নর্মদাতটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে গণ্য করা হয়।

সর্বত্র সুলভা রেবা ত্রিষুস্থানেষু দুর্লভা।
ওঁকারেহথ ভৃগুক্ষেত্রে তথা রেবৌর সংগমে।।

অর্থাৎ নর্মদা ক্ষেত্রে অমরকন্টক হতে ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত সর্বত্রই রেবা সুলভা এবং পবিত্রা। কিন্তু ওঁকারেশ্বরের নর্মদা-কাবেরী সংগমে, ভৃগুক্ষেত্র ভারোচে এবং এই রেবা আর ঔর নদীর সংগমে রেবা বড়ই দুর্লভ পুণ্য দান করেন। এটি পরম পবিত্র তীর্থ।

স্নান তর্পণ সেরে আমরা সোমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করলাম। মতীন্দ্রজীর ঘড়িতে বেলা ১টা বেজে গেছে। সংগম থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে যেখানে ঔর নদীর জল কম, একজন স্থানীয় লোকের সাহায্যে আমরা এক হাঁটু জলে নেমে লাঠি ঠুকে ঠুকে কোনমতে পেরিয়ে গেলাম। কর্ণালী হতে চাঁদোদ মাত্র এক মাইল। বেলা ১টা ২০ মিনিটে আমরা চাঁদোদে এসে পৌঁছালাম। চাঁদোদে একটু উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নর্মদা এবং ঔর নদীর সংগম চোখে পড়ে। এখানে নর্মদার দৃশ্য বড়ই মনোমোহক এবং নয়নাভিরাম। কর্ণালীর কিছু আগে থেকে সোজা উপরের দিকে উঠে এসে ইংরাজী 'A' অক্ষরের শীর্ষদেশে এই চাঁদোদ। চাঁদোদে বেশ লোকজনের বসতি আছে। ধর্মশালা, সদাবর্ত, বাজারহাট, চিকিৎসালয়, বহু সমৃদ্ধ লোকের বাড়ীঘর; হিন্দী, গুজরাটী এবং সংস্কৃতের পাঠশালাও আছে। চাঁদোদ থেকে বরোদা ৩০ মাইল। সেই পথ তৈরী হচ্ছে। ধর্মশালা খালি। মহাত্মা কমলভারতীজীর নিশান দেখে ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া আরও অনেক স্থানীয় সজ্জন অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ধর্মশালা খুলে দিলেন আমাদের থাকার জন্য। আমরা দোতলার সব ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেদের আসন বিছালাম। বেলা এখন দেড়টা। মোহান্তজী নিজের আসনে বসেই স্ফূর্তিতে গেয়ে উঠলেন —

সাত তীরথ্ চাঁদোদ মেঁ, চণ্ডিকা চণ্ডরবি,
চক্র, কপিল, ঋণমোচন হুঁ, পিঙ্গল নন্দাহ্রদ কবুহিঁ কবি॥

অর্থাৎ চাঁদোদে চণ্ডিকাদেবী, চণ্ডাদিত্য, চক্রতীর্থ বা জলশায়ী নারায়ণ, কপিল, ঋণমোচন, পিঙ্গলেশ্বর এবং নন্দাহ্রদ এই সাত তীর্থ বর্তমান।

আমরা ত গল্প করতে করতে বিশ্রাম করতে লাগলাম, কিন্তু লক্ষ্মণভারতীজীর বিশ্রাম নাই। তিনি তখনই ছুটলেন আমাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা করতে। এখানে দোকানদানীর অভাব নাই, চাল ডাল আটা ঘি সবই সুলভ। ভাবলাম, তিনি বোধহয় সেইসব সংগ্রহ করতে গেলেন। কিন্তু না, পাঁচ মিনিট পরেই তিনি ফিরে এলেন একজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে। ভক্তের হাতে কিছু ফুল ও কর্পূরসহ কর্পূরদানী আর তার পত্নীর মাথায় একটি কুঁদা। কুঁদাতে মধু আছে। লক্ষ্মণভারতীজী তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসে মোহান্তজীকে বললেন — এই ভক্তদম্পতি গুরুজীর শিষ্য। গরীব বলে মণ্ডলেশ্বরের গুরুস্থানে যেতে পারে না। তাঁর গুরুর গদীনসীন মোহান্তজীর আগমনবার্তা শুনে এখানে দৌড়ে এসেছেন আপনাকে দর্শন করতে। এঁরা সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার জন্য এক কুঁদা মধু এনেছেন। মোহান্তজী হাত তুলে তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন। ভক্তদম্পতি সাশ্রুনয়নে কর্পূর জ্বেলে তাঁর আরতি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। মোহান্তজী তাঁদেরকে আশীর্বাদ স্বরূপ দুটি রুদ্রাক্ষ দিয়ে তখনকার মত বিদায় করলেন। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে মোহান্তজী সেই মধু উৎসর্গ করার পর আমরা প্রসাদস্বরূপ সেই মধু যে যতটা পারলাম ততখানি গ্রহণ করলাম। মধুপানে পরিতৃপ্ত হয়ে আমরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। মোহান্তজী আমাদেরকে বললেন — তোমরা চিন্তা কর মা নর্মদার করুণার কথা! আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এসেছি, ভোজন প্রস্তুত করতে বেলা গড়িয়ে যাবে। তা জেনেই করুণাময়ী মা ভক্তদম্পতিকে দিয়ে আমাদের জন্য মধু ভিক্ষাস্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন। শূলপাণি ঝাড়ির ভয়ংকর অরণ্যপথেও, যেখানে কোন কিছুই পাওয়া যায় না, সেখানে শুধু বাঘ-চিতার হাত থেকেই আমাদেরকে রক্ষা করেননি, দুর্গমস্থানে প্রতিদিনই আহার জুগিয়ে গেছেন। সেই ধর্মরায়ের মন্দিরে জমিদার গিন্নীই হোন এবং কোটেশ্বর মন্দিরে করপাত্রীজীই হোন, সকলকেই নিমিত্ত করে মা নর্মদাই তাঁর এই অভাজন ভক্তদেরকে প্রতিপদেই খাদ্য পাঠিয়ে বাঁচিয়েছেন। বল, এই মাতৃকৃপা কি ভুলা যায়? সারাজীবন মায়ের আলৌকিক কৃপা এবং মহিমা পরম আস্বাদনের বস্তু।

মোহান্তজীর কথায় বাধা পড়ল। ধর্মশালার তত্ত্বধায়ক দোতলায় উঠে এসে সবিনয়ে জানালেন — সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যক্ষসহ কয়েকজন সজ্জন আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। মোহান্তজীর সঙ্গে আমরাও কয়েকজন নেমে এলাম। এসে দেখি, একতলার হলঘরে প্রায় পনেরজন লোক বসে আছেন। লক্ষ্মণভারতীজী ৪।৫ জন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, আগামীকাল পাবকেশ্বর তীর্থে হবনের উপযোগী সব বস্তু সংগ্রহের জন্য। তাঁর বিন্দুমাত্র অবসর নাই। মোহান্তজীকে দেখে সকলেই প্রণাম করলেন। সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যক্ষ গৌরচন্দ্রিকা করলেন এই বলে যে, তাঁরা মোহান্তজীর উপদেশ শুনতে এসেছেন। মোহান্তজী বললেন — সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করাই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আজ পরিক্রমার পথে নাগাদের মন্দিরে পৌঁছে আমি সংকল্প প্রকাশ করেছিলাম যে আজ এখানে

পৌঁছে, নারদের পুণ্যচরিত্র আলোচনা করব। কাজেই মহর্ষি নারদ সম্বন্ধে কিছু চর্চা করা হোক। আপনি সুপণ্ডিত, কাজেই সর্বাগ্রে আপনারই এই আলোচনার সূত্রপাত করা উচিত।

— লেকিন্ আপ পহেলে থোড়া বাতাইয়ে।

— হম্ থোড়া থক গয়ে। হমারা তরফসে ইয়ে বাঙালীবাবা কুছ বোলেঙ্গে।

এই বলে আমাকে দেবর্ষি নারদ সম্বন্ধে কিছু বলতে আদেশ করলেন। আমি ফাঁপরে পড়লাম। আমি জানালাম যে আমি গুজরাটি আদৌ জানিনা। হিন্দী মোটামুটি বুঝতে পারলেও সড়গড়ভাবে হিন্দী বলতে পারি না। আমাকে বলতে হলে বাংলাতেই বলতে হবে। মতীন্দ্রজীকে তাহলে দোভাষীর কাজ করতে হবে।

পাঠশালার অধ্যক্ষ বললেন — কিসীকো সমঝনেকা জরুরৎ নেহি হ্যায়। হম্ কাশীজীমেঁ মহামহোপাধ্যায় কৈলাশচন্দ্র শিরোমণিজীকে ছাত্র থা। কাশীমেঁ বহুৎ বাঙালী সজ্জন হমারে দোস্ত থা। বাংলা থোড়া বহুৎ হম্ সমঝতে হেঁ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথজীকো দো চারঠো কেতাব ভি হম্ পড়া।

পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় কৈলাশচন্দ্র শিরোমণির নাম শুনে আমি বুঝলাম যে, যাঁর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ১৪ জন মহামহোপাধ্যায় হয়েছিলেন, তাঁর যখন ছাত্র, তাহলে নিশ্চয়ই ইনিও ধুরন্ধর পণ্ডিত হবেন। চাই কি, একজন মহামহোপাধ্যায়ও হতে পারেন! যাইহোক মা নর্মদাকে স্মরণ করে আমি বলতে শুরু করলাম — শ্রীকৃষ্ণ আত্মদৃষ্টিতে গীতায় বলেছেন, দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ। এমন হিন্দু কে আছেন যিনি দেবর্ষি নারদের নাম শুনেন নি? আমাদের বহু ধর্মগ্রন্থে বৃহদারণ্যক উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এমনকি কাব্যগ্রন্থেও নারদের নাম আছে। তবে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট, শুধু তাই নয়, অনেকস্থলে বিকৃত। সাধারণ মানুষের ধারণা — নারদ ঋষির শুভ্রকেশ,শুভ্র শ্মশ্রু, তিনি যেন একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব, দিবানিশি ঢেঁকিবাহনে চড়ে করধৃত বীণাযন্ত্রে হরি গুণগান করতে করতে ত্রিভুবন ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন। কারও সঙ্গে কারও বিবাদ সুরু হলেও দুষ্টলোকে বলে থাকে নারদ! নারদ! অর্থাৎ তিনি যেন একজন কলহ বাঁধিয়ে দেবার দেবতা! উপনিষদে পাই, নারদ ভগবান সনৎকুমারের কাছে লৌকিক সব বিদ্যায় পারদর্শী হবার পর ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য গিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মবিদ্যার পারংগম হয়ে দেবর্ষিপদে উন্নীত হয়েছিলেন। রামায়ণ এবং মহাভারতে তাঁর যে পরিচয় পাই তাতে দেখি, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ক্রান্তদর্শী কবি, মহাভারতে দেখি তিনি রাজনীতি ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা স্বয়ং বেদব্যাস এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুবেরও গুরু তিনি। দেবর্ষির পবিত্র নাম নিয়েই কবিগুরু বাল্মীকির আদি মহাকাব্য রামায়ণ আরম্ভ হয়েছে।

তপঃ স্বাধ্যায়নিরতস্তপস্বী বাগবিদাং বরঃ।
নারদং পরিপ্রপচ্ছ বাল্মীকির্মুনিসত্তমঃ॥

অর্থাৎ বেদজ্ঞ তপস্বী নারদকে মুনিবর বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন। এটাই রামায়ণের প্রথম শ্লোক। এই শ্লোকে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন তপঃস্বধ্যায়নিরতঃ, তপস্বী এবং বেদবিৎ।

একদিন তমসার তীরে এক ব্যাধ একটি ক্রৌঞ্চকে শরদ্বারা বিদ্ধ করলে ক্রৌঞ্চী বিরহে আতুর হয়ে উঠে। সেই দৃশ্য দেখে বাল্মীকির হৃদয় যখন উথলিত, তখন তাঁর মুখ থেকে

স্বতঃই উদ্গত হল, 'মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ' সেই বিখ্যাত ছন্দোবদ্ধ শ্লোক, হৃদয়পটে ধীরে ধীরে একটা সুর তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করছে , তিনি বুঝতে পারছেন না, কোন্ পুরুষকে বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর কাব্যসুধা গলিত হবে, বাল্মীকির সেই হৃদয়-বেদনাকে রূপ দিতে গিয়ে আমাদের কবিগুরু যেমন বলেছেন —

অলৌকিক আনন্দের ভার,
বিধাতা যাহারে দেয়, বক্ষে তার বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নি সম দেবতার দান
ঊর্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ!

এইরকম যখন বাল্মীকির অবস্থা, তখন সেখানে, সেই তমসা তীরে সহসা আবর্ভূত হলেন নারদ। দেবর্ষিকে দেখতে পেয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন বাল্মীকি — ভগবন্! সকল দেশের কথাই আপনি জানেন, তাই জিজ্ঞাসা করি, এমন কোন পুরুষ আপনি দেখেছেন কি যিনি মানবোচিত সকল গুণেই শ্রেষ্ঠ, যাঁর রোষরক্তিম মুখ দেখলে দেবতারাও ভয় পায় অথচ শান্তমূর্তিতে যিনি অশেষ কল্যাণ গুণের অধিকারী — সর্বভূতমনকান্ত। এক কথায়, সমগ্রা রূপিনী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম? — কোন্ একটি মাত্র মানবকে আশ্রয় করে সমগ্র লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করেছে?

সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম? (রবীন্দ্রনাথ)

নারদ বললেন — আপনি যেসব গুণের কথা বললেন তার একত্র সমাবেশ দেবতাদের মধ্যেও ত দেখিনা, তবে যে মানবের মধ্যে এইসকল যে গুণ আছে তাঁর কথা বলছি শুনুন।

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমা।।
কহ মোরে সর্বদেশি হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্যনাম।
নারদ কহিলা ধীরে 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম!

নারদ রামজীবন কীর্তন করলেন। বেদনার মহাকাব্য রচিত হল। রামায়ণ হল এই নরচন্দ্রমার কথা। এ হেন রসোত্তীর্ণ রামায়ণ রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের কাছে।

মহাভারতে দেবর্ষি নারদ বিবিধ ভূমিকায় বহুবার অবতীর্ণ হলেও রাজধর্ম সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন, তাই-ই আমাদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সভাপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে মহাভারতকার নারদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার সম্বন্ধে সকল প্রচলিত ধারণা একেবারে নস্যাৎ হয়ে যায়। দেবর্ষি নারদ একাধারে বেদ-উপনিষদবেত্তা, ইতিহাসপুরাণজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহের তত্ত্ববিৎ, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী, মানব ধর্মের নিগূঢ় রহস্যজ্ঞ।

এই পর্যন্ত বলে আমি সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যক্ষ মশাইকে বললাম, আপনি যে কতবড়

মহাচার্যের শিষ্য তা এখানে সকলে সম্যকভাবে জানেন কিনা জানি না, তবে বাবার মুখে তার পাণ্ডিত্যের মহিমা আমি শুনেছি। তাঁর ছাত্র আপনি। আপনার সামনে আমার বাচালতা করা উচিত হয়নি। আমি কেবল আদেশ পালন করলাম মাত্র। দেবর্ষি নারদ সম্বন্ধে আপনি দয়া করে আমাদের জানান, আমরা এখানে আসার পথে অশ্বপর্ণী সংগম পেরিয়ে যে নারদেশ্বর তীর্থ দেখে এলাম, সেখানে তপস্যার জন্য দেবর্ষিকে আসতে হয়েছিল কেন?

অধ্যক্ষ মশাই বলতে লাগলেন — রেবাতটে সকল বৈদিক ঋষি এবং দেবতাদেরকেও তপস্যা করতে হয়েছে। এই ঘোর কলিকালে মা নর্মদার কৃপাকটাক্ষ ছাড়া অলৌকিক সিদ্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান সুদূরপরাহত। একথা সর্বঋষিজন স্বীকৃত। শুধু সিদ্ধিলাভ নয়, পরমবস্তু প্রাপ্তির পরেও সাধনার সমগ্র রসস্ফূর্তির জন্য নর্মদাতটে আসতেই হয়। কাজেই কোন সময় সর্বজ্ঞ দেবর্ষিকেও আসতে হয়েছিল। কেন তিনি এসেছিলেন, সে রহস্য তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছিলেন একদিন বেদব্যাসের কাছে। দেবর্ষি তাঁর তিন জন্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন — 'প্রথম গন্ধর্বজন্মে দুরাচারণের ফলে দ্বিতীয় জন্মে ঋষি আশ্রমে দাসীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। সর্বদা সাধুসঙ্গ, যজ্ঞাবশিষ্ট শুদ্ধ অন্নে জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপক্ষয় হল, ভক্তমুখে ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে করতে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা ও শুদ্ধারতি জন্মাল। কিন্তু আমি দাসীমায়ের একমাত্র সন্তান, আমাতে তিনি অত্যন্ত আসক্ত — একাত্মজা মে জননী যোষিৎ মূঢ়া চ কিঙ্করী। মাতৃস্নেহের নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করা সহজ নয়। সহসা একদিন সর্প দংশনে জননীর দেহাবসান হল। মাতৃবিয়োগকে ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসলের অনুগ্রহ মনে করে উত্তরদিকে চলে গেলাম।

উত্তরে পুণ্যভূমি হিমালয় সাধনার অনুকূল স্থান। ঋষিদের মুখে যেমন শুনেছিলাম, সেইরকমভাবে স্বীয় বুদ্ধিকে সংযত করে অন্তরাত্মায় কেন্দ্রীভূত করলাম। শ্রীভগবানের রূপ হৃদয়ে আবির্ভূত হল কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তা অন্তর্হিত হল। অদর্শনে আর্ত আমি, কেবলই শুনি অশরীরিণী বাণী — হায়! এ জন্মে আর তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। হে নিষ্পাপ, একবার যে তোমাকে দেখা দিলাম, তা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য — সকৃৎ যদ্দর্শিতং রূপং এতৎ কামায়তেহনঘ! সেই ক্ষণিক দর্শনকে চিরস্থায়ী এবং অবিচ্ছেদে চিরকালীন করবার জন্য নর্মদাতটে আসন পাতলাম। চিরতপশ্চারিণী কৃপাময়ী শিবপুত্রীর করুণায় আমার দিব্য জন্ম ঘটল ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে।'

পিঙ্গল জটাভার, স্নিগ্ধকান্তি যেন তরুণ অরুণ, প্রভাময় অথচ চক্ষুর পরম তৃপ্তিসাধক। ক্ষয়বৃদ্ধি পরিণামাদি বিকারহীন চিন্ময় দেহ, চিরনবীন, উজ্জ্বলকান্তি পরমপুরুষ। হস্তে দেবদত্ত বীণায় অহরহ ভগবানের নাম ছেদহীন, বিরামহীন। বহুল কর্মময় জীবন দেবর্ষির, সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি। যখন যেখানে যে সমস্যা ভক্তহৃদয়ে দেখা দিয়েছে, ভক্তের সমস্যার সমাধান করেছেন, তাঁর চিন্তাস্রোতকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন ইষ্টাভিমুখে।

মহাভারতে পাই , একদিন দেবর্ষি হিমালয়ে গিয়ে দেখেন ব্যাসাশ্রম নীরব। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত নাই, যজ্ঞধূমের পুণ্যগন্ধও নাই , বেদপাঠ শোনা যাচ্ছে না, শাস্ত্রালোচনাও বন্ধ। ব্যাসের আশ্রমে প্রবেশ করে নারদ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন —

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবাসিষ্ঠ ব্রহ্মঘোষ ন বর্ততে।
একো ধ্যানপরস্তূষ্ণীং কিমাস্যে চিন্তয়ন্নিব॥
ব্রহ্মঘোষর্বিরহিতঃ পর্বতোহয়ং ন শোভতে।
রজসা তমসা চৈব সোমঃ সোপপ্লবো যথা॥
ন ভ্রাজতে যথাপূর্বং নিযাদনোমিবালয়ঃ॥ (শান্তিপর্ব)

হে ব্রহ্মর্ষি! আপনি আজ নীরব কেন? কেন এত চিন্তাকুল? ব্যাসাশ্রমের আজ কোন শোভা নাই, পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুগ্রস্ত হয়েছে। ওঁকারধ্বনি বিরহিত হয়ে ব্যাসাশ্রম আজ ব্যাধগৃহে পরিণত।

ভারতের সর্বোচ্চ আসনে স্ব মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাসদেব, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয় ব্যাসোচ্ছিষ্ট জগৎ অর্থাৎ ভারতবর্ষে যিনি যখন যা কিছু বলে গেছেন, তা ব্যাসেরই উচ্ছিষ্ট কথা, ব্যাস বলেননি, এমন নূতন কথা কেউ বলতে পারেনি। এ হেন ব্যাসদেবের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করে বললেন দেবর্ষি — আমি ব্যাসগৃহে প্রবেশ করলাম, না, ব্যাধের গৃহের প্রবেশ করলাম? ব্যাসের আশ্রমে সামগান নাই, ধর্মসাধনা হচ্ছে না, এ বড় আশ্চর্য কথা!

অতি ধীরে উত্তর দিলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন — 'আমার পুত্রাধিক শিষ্যগণ (বৈশম্পায়ন, সুমন্ত, পৈল ও জৈমিনি প্রভৃতি) আর্যাবর্তে চলে গেছেন বেদ প্রচারের জন্য। শিষ্যবিরহে কাতর আমি, মনে শান্তি নাই, তাই কাতর আমি মৌন হয়ে বসে আছি।'

ব্যাসের কথা শুনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন —

অথীয়তাং ভবান্ বেদান্ সার্ধং পুত্রেণ ধীমতা,
বিধুন্বন্ ব্রহ্ম ঘোষেণ রক্ষোভয়কৃতং তমঃ॥

শুনে সুখী হলাম যে, আপনার প্রাণপ্রিয় শিষ্যগণ বেদবার্তা প্রচারের জন্য আর্যাবর্তে গেছেন। তাই বলে কি ধর্মজ্ঞানের কেন্দ্র ব্যাসাশ্রম নীরব থাকবে? ধীমান্ পুত্র শুকদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেদপাঠ করুন, ব্রহ্মঘোষ অর্থাৎ ওঁকার-ধ্বনির দ্বারা রাক্ষসভয় দূর করুন। রাক্ষসরা, ধর্মহীন নরাধমরা যখন দেশে দেশে দুর্নীতির অন্ধকার সৃষ্টি করে ধর্মস্থাপনে বেদ-নির্ঘোষে তা বিদূরিত হবে।

দেবর্ষি আরও জানালেন — ধর্মহীন হলেই দেশ দুর্নীতিপরায়ণ রাক্ষসদের কবলিত হয়। হিংসা বিদ্বেষ অবিশ্বাস আপন আধিপত্য বিস্তারের জন্য পারস্পরিক যে দ্বন্দ্ব এবং নির্বিচারে দুর্বলকে শোষণ করার যে প্রবৃত্তি — তারাই রাক্ষস। ধর্মহীনতাই মানুষকে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত করে। ধর্মহীন হলেই মানুষ মনুষত্ব হারায়, পশুর স্তরে, রাক্ষসের স্তরে নেমে যায়।' — এই পর্যন্ত হিন্দীতে বলে অধ্যক্ষ মশাই আমার দিকে দৃষ্টি হেনে বাংলায় আবৃত্তি করলেন —

বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুঙ্কারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত
যুগ যুগ তাপসদের সাধন ধন যত
দানব পদদলনে হল গুঁড়া।

এ যুগের কবিগুরুর কথা যেন দেবর্ষি বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। জগদগুরু ব্যাসদেবেরও উপদেষ্টা দেবর্ষি নারদকে প্রণাম জানাই।' গুজরাটী পণ্ডিতের মুখে রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতা শুনে অবাক হলাম। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনে সকলেই তৃপ্তি পেলেন। দেবর্ষি নারদ বিষয়ে মোহান্তজীর সংকল্প মত ভালভাবেই চর্চা হল।

অধ্যক্ষ মশাই-এর মুখে এই রকমেরই উচ্চস্তরের আলোচনা শুনব আশা করেছিলাম। কারণ মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির অপূর্ব অধ্যাপনা গুণে একসময় এইরকমই সব পণ্ডিত সৃষ্টি হয়েছিলেন। বিদায় নিবার আগে তিনি বলে চলে গেলেন যে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর গুরুদেব কাশীতে দেহরক্ষা করার পরেই তিনি চাঁদোদে এসে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। তাঁর নাম পণ্ডিত দিবাকর বাচস্পতি। বয়স ৭৫।

রাত্রি ৮টা বেজে গেছে। অভ্যাগতরা চলে যাবার পরেই আমরা চোখে জল নিয়ে যে যার কাজে বসলাম। রাত্রি ১০টা নাগাদ আমরা শুয়ে পড়লাম। লক্ষ্মণভারতীজী মোহান্তজীকে জানালেন — আপকো হবন কে লিয়ে ঘৃত আদি সমুচা বস্তু মজুদ হ্যায়। কাল আশ্বিন মাহিনা কা আখেরী দিন। এতোয়ার (রবিবার) ত হ্যায়ই হ্যায়, ফিন্ জলবিষুব সংক্রান্তি ভি হ্যায়। হর জলবিষুব সংক্রান্তিমেঁ এতোয়ার হোনেসে এহি তিথিমেঁ গুরুজীকা কি নির্দেশ সিরিফ্ জপ করনে কে লিয়ে। ইস্‌লিয়ে সবকী ইচ্ছা ইধরি রহ্‌কর জপ করেগা। ডরসে আপকো কোঈ কুছ্ বোলতা নেহি। আপ্ দো তিনজন কো লেকর পাবকেশ্বরমেঁ যাইয়েগা। হমলোগ্ ইধরি রহেঙ্গে। 'তথাস্তু' বলে মোহান্তজী শুয়ে পড়লেন।

একেবারে সকালে ঘুম ভাঙল। কুয়াশার চারদিক ঢেকে আছে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে মোহান্তজী দুই পণ্ডিতমশাই এবং আমাকে নিয়ে হোমের দ্রব্যাদিসহ পাবকেশ্বরের পথে রওনা হলেন, সেই কুয়াশার মধ্যেই কির্ণালী অতিক্রম করে সোমেশ্বর ও কুবেরেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম করে আমরা পৌঁছে গেলাম পাবকেশ্বর তীর্থে। তখন কুয়াশা অপসৃত হয়ে সূর্য উদিত হয়েছেন। প্রায় দেড় মাইল বা পৌনে দুমাইল হেঁটে এসেছি। মন্দিরের পুরোহিত মশাই সেইমাত্র মন্দিরে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর কাছে হবন দ্রব্য রেখে আমরা নর্মদাতে গেলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণ সেরে এসে দেখি, পুরোহিত মশাই পূজা সেরে হোমের আয়োজন করছেন। পাবকেশ্বর মহাদেবের সামনেই স্থায়ী যজ্ঞকুণ্ড। এখানে নিত্যই হোম হয়। তিনি বললেন আপনারা পরিক্রমাবাসী ভক্ত। আপনারাই আমার আয়োজিত হোম সম্ভার এবং আপনাদের হোম সম্ভার একসঙ্গে মিশিয়ে হোম করুন। আমি আপনাদেরকে সাহায্য করছি। হোম আরম্ভ করার পূর্বে মন্দিরের পুরোহিত হিসাবে অগ্নি সম্বন্ধে আপনাদেরকে কিছু বলা আমার কর্তব্য। মহর্ষি ভৃগু কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে অগ্নি অভিমান ভরে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম হতে তিরোহিত হয়ে অগ্নিদেব নর্মদাতটের এখানে এসে এই পাবকেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করে তপস্যা করেছিলেন। আপনারা বোধহয় অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষের তিনজন অগ্রগণ্য দেবতার মধ্যে অগ্নি একজন। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন দেবতার এতগুলি সূক্তে বন্দনা করা হয়নি। অগ্নিকে প্রায় ২০০টি সূক্তে স্তব করা হয়েছে। অগ্নির ত্রিমূর্তি — আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। পার্থিব সকল দেবতার মধ্যে অগ্নিই প্রধান। সেইজন্য অগ্নিকে বলা হয় 'যুবা যবিষ্ঠ'। দুটি কাঠের ঘর্ষণে

অগ্নি উৎপন্ন হয় বলে এঁর আর এক নাম — প্রমন্থ। অগ্নির অন্য নাম ভরণ্যু। অগ্নি যজ্ঞাগ্নি রূপেই পূজিত হন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে তৃতীয় সূক্তে তিন নম্বর মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হয়েছে ঘৃতপীষ্ঠ, নীলপৃষ্ঠ, তৃতীয় মণ্ডলের ১৪ সূক্তের প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হয়েছে জ্বালাকেশ, হিরণ্যকেশ, পঞ্চম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে অগ্নিকে 'পিঙ্গলশ্মশ্রু' নামে অভিহিত করা হয়েছে। জুহু নামক হাতায় করে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় বলে 'জুহু' অগ্নির মুখ বা জিহ্বা। ইনি জ্বালাময়, মধুজিহ্ব, সপ্তজিহ্ব, ত্রিজিহ্ব। ইনি দেবতাদেরও হব্যবাহক। পিতৃপুরুষগণের জন্য কব্যবাহক। অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না সেজন্য অগ্নি পুরোহিত। সমিধ ইন্ধন এবং ঘৃত অগ্নির পানীয়। অগ্নির দীপ্তি সূর্যের ঊষার ন্যায় এবং বিদ্যুতের ন্যায়। দুই বা ততোধিক পিঙ্গল অশ্বে বাহিত হয়ে ইনি দিব্যপথে যজ্ঞস্থলে প্রকট হন। তাঁর রথও দিব্য। ইনি দ্যুতিমান হিরন্ময় বিদ্যুৎজড়িত। যজ্ঞ সারথি অগ্নি নিজের দিব্য রথে দেবতাদেরকে এবং প্রত্যেকের পিতৃপুরুষকে বহন করে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত করেন। অগ্নি দ্যাবা পৃথিবীর পুত্র। গৃহে গৃহে অগ্নির অধিষ্ঠান বলে অগ্নিকে বহুজন্মা বলা হয়। ইনি একাধারে হব্যবাহন দেববাহন এবং কব্যবাহন। অগ্নি ইন্দ্রের মত বলশালী এবং সহস্রজিৎ। ঋগ্বেদের প্রথমেই অগ্নির বন্দনা আছে (১/১) এবং অগ্নির বন্দনা করেই ঋগ্বেদ সমাপ্ত হয়েছে (১০/১৯১)। এই দুই মন্ত্রেই হবন করা এখানকার প্রত্যাদিষ্ট বিধি। ভৃগুর অভিশাপে ক্ষুব্ধ অগ্নিকে মা নর্মদা, ব্রহ্মা এবং মহাদেব এখান থেকে নিয়ে গিয়ে হব্যবাহন রূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। আপনারা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের পূজা করে নিন। তাঁর নির্দেশ মত আমরা পাবকেশ্বর লিঙ্গে মা নর্মদা এবং মহাদেবের পূজা করলাম। শিবলিঙ্গের অগ্নিবর্ণ জ্যোতি আমাদেরকে মুগ্ধ করল। এইবার হোম। প্রাচীনকালে রীতি অনুসারে পুরোহিত মশাই দুই টুকরো কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করতে করতে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন —

ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥

দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। এক চমস্ ঘি এবং সমিধ চাপিয়ে আমাদের চারজনকে বললেন যজ্ঞকুণ্ডস্থিত সমিধের উপর ঘৃতাহুতি দিতে। অগ্নি জ্বলতে থাকল তিনি আমাদেরকে বলে চললেন — এই মন্ত্রের দ্রষ্টা কণ্বপুত্র ঋষি মেধাতিথি। এর অর্থ হল — হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের দূত এবং দেবতাদের একমাত্র আহ্বায়ক। সমস্ত সাধন ধনের আধার তুমি। তোমাকে বরণ করছি, আমাদের এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হোক।

এখানকার বিধান অনুসারে ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রে হোম করতে বললেন। আমরা প্রজ্বলিত অগ্নিতে ভক্তিসহকারে আহুতি দিতে লাগলাম —

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতম্॥

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা॥

এই ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা বিশ্বামিত্রের পুত্র ঋষি মধুছন্দা। (অঞ্চু গতি পূজনয়োঃ), অগ্, অগি, ইন্ গত্যর্থক ধাতু হতে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যোহঞ্চতি অচ্যতেহগত্যঙ্গত্যেতি বা সোহয়মগ্নিঃ। ' যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, জানবার, পাবার এবং পূজা করবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম 'অগ্নি'। এই মন্ত্রে বলা হয়েছে — অগ্নিম্ ঈলে অর্থাৎ অগ্নিকে বন্দনা করি। সায়নাচার্য এই মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে বিশেষতঃ 'পুরোহিত' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যথা

রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদাভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা অগ্নিরপি অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি অর্থাৎ পুরের মঙ্গল করেন যিনি সেই পুরোহিত যেমন রাজার অভীষ্ট সম্পাদন করেন তেমনি যাঁর দ্বারা যে-কোন ব্যক্তির হবনকার্য নিষ্পন্ন হয় এবং যিনি না হলে কিছুতেই হবন করা যায় না, সেই নিখিল বিশ্বের মঙ্গলকারী, দেবতাদের আহ্বানকারী এবং ঐহিক ও পারত্রিক সমূহ অমূল্য রত্নের অধিকারী যিনি সেই অগ্নিরূপী পরমেশ্বরকে স্তুতি করছি।

২৮ বার এই মন্ত্রে আহুতি দিয়েই আমরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯১ সূক্তের ১ম মন্ত্রটি পাঠ করে আহুতি দিতে আরম্ভ করলাম। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা সংবলন ঋষি —

ওঁ সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর॥
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা॥

এই মন্ত্রের অর্থ হল — হে অগ্নি! তুমি প্রভু পরমেশ্বর। হে অভিলাষিত ফলদাতা, তুমি সকল প্রাণীর মধ্যে সর্বত্র অনুস্যূত আছ। তুমি এখন যজ্ঞবেদীতে দেদীপ্যমান। তুমি আমাদেরকে তপস্যারূপ ধন দান কর।

এই মন্ত্রেও ২৮ বার আহুতি দিয়ে ২৮ বার রেবামন্ত্রে এবং ২৮ বার শিবমন্ত্রে আহুতি দিয়ে হোম শেষ করা হল। পাবকেশ্বর মহাদেবের প্রথম যে রূপ দেখেছিলাম, এখন স্পষ্টতঃই সেই রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। অগ্নিবর্ণ লিঙ্গ অগ্নিবৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। নর্মদাতীরে আজকাল কোন অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেলেও এখন আর আশ্চর্য হচ্ছি না। যাঁরা জীবনভোর তপজপ করেও কোন অনুভূতি হল না বলে হতাশ হয়ে পড়েছেন বা দিব্যশক্তির মহিমায় অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন, সম্ভব হলে এবং সাধ্যে কুলালে ইচ্ছা হয়, তাঁদের সবাইকে ডেকে এনে নর্মদাতটে উপস্থিত করি! হোম ও পূজা শেষ হতে বেলা বোধহয় বারটা বেজে গেল। মোহান্তজী পুরোহিত মহোদয়কে কিছু দক্ষিণান্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন — 'কোন পরিক্রমাবাসীদের কাছে দক্ষিণা গ্রহণের নিয়ম নাই। একটি হরীতকী গ্রহণই যথেষ্ট।'

খুবই পরিতৃপ্ত অন্তরে আমরা ফিরে এলাম চাঁদোদের ধর্মশালায়। নাগা সন্ন্যাসীরা নিজেদের জপ সেরে ভিক্ষা প্রস্তুত করে ফেলেছেন। বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমরা খিঁচুড়ী ভোজন করে ঘন্টাখানিক বিশ্রাম করেই মোহান্তজীর নির্দেশে চাঁদোদের মধ্যেই অবস্থিত সাতটি তীর্থ বা মন্দির পরিক্রমা করতে বেরিয়ে পড়লাম। শিঙ্গা ডম্বরুর সহযোগে হর নর্মদে ধ্বনি করতে করতে ধর্মশালা হতে কিছুদূরেই চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হলাম। এই মন্দির ঠিক নর্মদার তীরে নয়। মন্দিরটি খুব সুপ্রাচীন বলেও মনে হল না। যাইহোক এতকাল পরে নর্মদাক্ষেত্রে শিবলিঙ্গসহ একটি কালীযন্ত্র এখানে স্থাপিত আছে দেখতে পেলাম। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন — চণ্ড ও মুণ্ড যখন সূর্যের তপস্যা করে বর পান যে, নারী ছাড়া ত্রিভুবনে কেউ তাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না, তখন পরাশক্তি এখানে বসে শিবতপস্যা করে চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করার বর লাভ করেছিলেন। এখানে অষ্টমী, নবমী এবং চতুর্দশী তিথিতে বিশেষ মাহাত্ম্য। দেবী কৃপায় এখানে সর্ব কর্ম সিদ্ধ হয়।

চণ্ডিকা দেবীর মন্দির হতে আমরা চণ্ডাদিত্যের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ছোট্ট মন্দির। এখানে বসেই চণ্ড মুণ্ড নামক দুই ভীষণ দৈত্য সূর্যনারায়ণের তপস্যা করে বর

পেয়েছিলেন, কোন দেবী ছাড়া আর তাদেরকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।

সেখান থেকে আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে একেবারে নর্মদা কিনারে এসে পৌঁছালাম। এখানে কোন মন্দির দেখতে পেলাম না। তবুও নাগারা এখানে এসে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে একে একে মোহান্তজীসহ সকলেই নর্মদার ঘাটে নেমে মাথায় জল ছিটিয়ে জপ করতে বসে গেলেন। আমিও নর্মদা স্পর্শ করে জপ করতে লাগলাম কিন্তু কারণ কিছু বুঝলাম না। প্রায় আধঘন্টা জপ সেরে লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — তালমেঘ দৈত্যকো শেষশায়ী ভগবান নে চক্র সে বধ কিয়া। ফির উস্ চক্রকো নর্মদাজীমেঁ ধোয়া। নর্মদাজীকো ক্ষীরসাগর মান কর ভগবান নে উসমেঁ শয়ন কিয়া। য়হাঁ অনন্ত চতুর্দশী ঔর প্রত্যেক একাদশীকা বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ।

তাঁর কথা শেষ হতেই মোহান্তজী বললেন — আমি গুরুদেবের মুখে শুনেছিলাম, আমাদের পরমপূজ্য পরমগুরুদেব মহাত্মা কমলভারতীজী কোন এক অনন্ত চতুর্দশী তিথিতেই এইখানে তপস্যা করতে করতে নর্মদার জলে শেষশায়ী নারায়ণের দিব্যদর্শন লাভ করে কৃতার্থ হন। চাঁদোদের মাহাত্ম্য এই চক্রতীর্থ এবং ঔর নদীর সংগম। চাঁদোদে এসে কেউ যদি এই দুটি তীর্থ দর্শন না করেন তাহলে নর্মদা পরিক্রমার ফল অনেকাংশে খণ্ডিত হয়ে যায়।

চক্রতীর্থের পরেই কপিলতীর্থ। এখানে তীর্থযাত্রা করতে এসে মহর্ষি কপিল কিছুকাল অবস্থান করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। কপিল তীর্থের পরেই ঋণমোচন তীর্থ। এই ঘাটে পৌঁছে লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — য়হাঁ ছয় মহীনে রহকর দেবর্ষি তর্পণ ঔর পিতৃতর্পণ করনেসে পিতৃঋণসে উত্তৃণ হো যাতা হৈ। ইসে ব্রহ্মর্ষিয়োঁ নে ইসী নিমিত্ত বনায়া হৈ। বাঙ্গালীবাবা! আপ ইধর তর্পণ করিয়ে। আপকো লিয়ে হমলোগ ইধর বৈঠকে জপ করুঙ্গা।

সঙ্গী দুজন পণ্ডিত প্রতিবাদ করে বললেন — এখন তর্পণ করবার সময় নয়।

আমি লক্ষ্মণভারতীজীর পাদস্পর্শ করে বললাম — আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আপনাকে প্রণাম করছি। পিতৃপুরুষদের স্মরণ করার জন্য আমি কোন কালাকাল বিচার করতে প্রস্তুত নই। পিতৃঋণ হতে মুক্ত হব, এ প্রত্যাশাও আমি করি না। আমৃত্যু পিতৃঋণ আমি সানন্দে বহন করতে চাই। এই বলে আমি ঋণমোচনের ঘাটে নামলাম। নর্মদার জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা। আমি তর্পণ করতে আরম্ভ করলাম। তর্পণের কোন সামগ্রী আমার কাছে নাই। বাবাকে স্মরণ করে সাশ্রুনেত্রে জানালাম — নরাধম পুত্রের হাতে পবিত্রতম নর্মদা বারি গ্রহণ করে তৃপ্ত হও হে দয়াল।

তর্পণ যখন শেষ হল, তখন যতীন্দ্রজী জানাল পৌনে ছটা বেজেছে। এতক্ষণ জলে দাঁড়ানোর ফলে আমি ঠক ঠক করে কাঁপছি, নর্মদাতটে হিমেল বাতাস বইছে। আমাকে কাঁপতে দেখে পরম স্নেহভরে মোহান্তজী তাঁর কাঁধের চাদরটা আমার গায়ে জোর করে জড়িয়ে দিলেন।

'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা এসে পৌঁছালাম পিঙ্গলেশ্বর তীর্থে। এখানে পিঙ্গলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। পিঙ্গলবর্ণের শিবলিঙ্গ। গর্ভগৃহে ঘি এর প্রদীপ জ্বলছে। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন — একবার মহাদেবের কোপে পড়ে অগ্নির বর্ণ পিঙ্গল হয়ে যায়। অগ্নিদেব এখানে তপস্যা করে স্বরূপ ফিরে পান। অগ্নিই এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। সন্ধ্যা

হয়ে আসছে। মন্দিরে পুরোহিত এসেছেন আরতি করতে। আমরা প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজী বললেন — এই তীর্থে এলে বৎসাপ্রি ঋষির দৃষ্ট একটি মন্ত্র পাঠ করে যেতে হয়। মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র। ঐ মন্ত্রের অর্থ হল, হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের মূর্তি জানি, তোমার স্থান সর্বত্র আছে তাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম তাও অবগত আছি। আর যে উৎস বা উৎপত্তি স্থান হতে এসেছ তাও জানি।

পুরোহিত মশাই আমাদেরকে মন্ত্রোচ্চারণ করাতে উদ্যত হতেই আমি বললাম — আপনি যে মন্ত্র আমাদেরকে পড়াতে চান, তার অর্থ যদি ঐ রূপই হয়, তাহলে ত সে মন্ত্র পাঠ করতে আমি সাহস করছি না। কারণ অগ্নির রহস্য এবং তাঁর নিগূঢ় নাম না জেনে কি করে আমি নর্মদাতটে দাঁড়িয়ে শিবসাক্ষী করে বলব যে আমি জানি! পুরোহিত মশাই বললেন — আমি ত পড়াচ্ছি। যদি অপরাধ হয়, আমার হবে। এখানে চিরপ্রচলিত ঋষিগণ প্রবর্তিত এই ধারা না মানলে আপনি কখনও অগ্নিবিদ্যা লাভ করতে পারবেন না। এই দিব্যতীর্থে এই মন্ত্রপাঠ করলে বরং মা নর্মদার দয়ায় আপনি অগ্নিবিদ্যা লাভ করতে পারেন। মোহান্তজীর ধমক খেয়ে আমি সকলের সঙ্গে পাঠ করলাম —

বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।<br>
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ॥

তোতাপাখীর মত শেখানো বুলি উচ্চারণ করে আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছালাম চাঁদোদের সপ্তম তীর্থ নন্দাহ্রদের ঘাটে। এইমাত্র সূর্য অস্ত গেলেন। এই ঘাটের সামনেই ওর নদীর সংগম। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ স্থিরাসনে বসে সন্ধ্যাহ্নিক করছেন। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন — নন্দাদেবী মহাদেবের প্রেরণায় দৈত্য নাশ করেছিলেন। দৈত্যরা নিহত হলে মহাদেব স্বয়ং এই নন্দিনী তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি কশ্যপও এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

মোহান্তজীর ইচ্ছানুসারে এখানে আমরা সন্ধ্যা করতে বসলাম। সকলের সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হতে আমরা স্থানীয় লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতে করতে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। মোহান্তজী বললেন চাঁদোদ পরিক্রমা শেষ হল, কাল সকালে ১লা কার্তিক আমরা যাত্রা করব কহ্লোড়ী তীর্থের পথে, যার অপর নাম গঙ্গোনাথ।

আজ পাবকেশ্বর তীর্থে হোম করে আসার পর থেকেই মোহান্তজীকে খুব উৎফুল্ল দেখছি। তিনি মাঝে মাঝেই বলছেন গরুড়েশ্বর মন্দিরে মহাত্মা হরানন্দজী ঠিকই বলেছেন, পথে কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ পেলেই সেখানে যথোচিত সময় দিয়ে জপধ্যান করা পরম কল্যাণপ্রদ। আমি আজ ঘুমাবো না। তোমরাও ইচ্ছা করলে এই পরম পুণ্যদ ক্ষেত্রে আজ রাতভোর জপ ধ্যানে মনোনিবেশ কর। জীবনে আর এইসব সিদ্ধস্থানে আসতে পারবে কিনা স্থিরতা নাই। তাঁর কথা শুনে লক্ষ্মণভারতীজী বললেন, তা করলে এখান থেকে ভারোচে পৌঁছতেই আরও তিন বছর সময় জরুর লেগে যাবে।

— লেকিন গঙ্গোনাথ ইয়া কহেলাড়ী তীর্থমেঁ এক রাতকে লিয়ে ঠারেগা কি নেহি?

উধর জরুর ঠারেগা। উধর পাপিয়োঁ কে পাপ সে পীড়িত হোকর্ স্বয়ং গঙ্গাজী য়হাঁ আয়ী ঔর বাদুড়কো রূপ লেকর্ নর্মদামে স্নান করকে পঞ্চপাতকসে মুক্ত হো গয়ী।

আমি লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা গঙ্গার মত কলুষ নাশিনীকেও যে পঞ্চপাতক স্পর্শ করল, কি কি সেই পঞ্চপাতক ?

-- মিত্রদোহ, কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতক, স্বামীদ্রোহ এবং গুরুদ্রোহ , এই গুলির নাম পঞ্চপাতক। ঐ সমস্ত মহাপাপিষ্ঠ ব্যক্তি গঙ্গাতে স্নান করলে তাদের সেই পাপদেহের স্পর্শে গঙ্গা মা তাপিতা হয়ে নর্মদাতে কোন সময় স্নান করতে এসেছিলেন।

-- তাহলে একরাত্রি সেই পরমতীর্থে থেকে জপ ধ্যানে সময় কাটালে ভালই হয়। বিশেষতঃ গঙ্গোনাথের নাম আমি বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি। দেওঘরের বিখ্যাত মহাত্মা বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরুস্থান গঙ্গোনাথ। সেখানেই তিনি নর্মদার বরপুত্র সিদ্ধযোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষালাভ করেছিলেন বলে শুনেছি।

মোহান্তজী বললেন — কাল সকালেই সেই গঙ্গোনাথের দর্শন পাবে। এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থিত। সকলেই জপ করতে বসলেন। আমি স্নেহময় মোহান্তজীর আদেশ পালন করারই সংকল্প করলাম। মা নর্মদার এমনই কৃপা, নর্মদাতটের এমনই প্রভাব যে, গোটা রাত্রি জাগরণেই কাটালাম। সকালে উঠেই কুয়াশার ঘোর কাটতেই আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে নর্মদার কিনারা ধরে যাত্রা আরম্ভ করলাম। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরেই আমরা যমহাস তীর্থের ঘাটে এসে পৌঁছালাম। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — ইসে যমরাজ নে স্থাপিত কিয়া। যোলোগ ইহাঁ স্নান করতে হৈ উন্‌হে ভয়ংকর ঘোর অন্ধকারময় যমলোক নহি দেখনা পড়তা। হম ত ইধর জরুর নাহায়েঙ্গে। এই বলেই তিনি হাসতে হাসতে ঝোলা গাঁঠরী রেখে প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলেন। আমিও ঐসব মহাজনদের পথ অনুসরণ করলাম। কুয়াশা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। স্নান তর্পণাদি সেরে যমহাস তীর্থে প্রণাম করে আমরা শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে এবং হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে কহ্লোড়ী তীর্থে তথা গঙ্গোনাথে যখন এসে পৌঁছালাম, তখন সকাল সাড়ে আটটা মাত্র। ঐ মহল্লার নাম কহ্লোড়িকা, একানকার গ্রাম্য লোকরা বলেন কল্‌থড়িয়া তীর্থ।

মোহান্তজী এখানে প্রবেশ করতে করতে মা নর্মদাকে প্রণাম করে মুখস্থ বলতে লাগলেন —

শ্রী মার্কণ্ডেয় উবাচ —

> ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র কহেলাড়ীতীর্থমুত্তমম্।
> রেবায়াশ্চোত্তরে কূলে সর্বপাপ বিনাশনম্॥
> হিতার্থং সর্বভূতীনামৃষিভিঃ স্থাপিতং পুরা।
> তপসা তু সমুদ্ধৃত্য নর্মদায়াং মহান্তসি॥

অর্থাৎ মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন — অতঃপর কহ্লোড়ী তীর্থে গমন করবে; সর্বপাপনাশন এই কহ্লোড়ী তীর্থ রেবার উত্তর তীরে বিদ্যমান। প্রাচীনকাল সর্বভূতের হিতকামনায় ঋষিগণ কঠোর তপস্যা দ্বারা নর্মদার অগাধ জল থেকে উদ্ধার করে কহ্লোড়ীনাথকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অদূরেই দেখ গঙ্গাখাড়ি, অর্থাৎ গঙ্গার গুপ্তধারা এখানে এসে নর্মদায় মিলিত হয়েছে। ঐ গুপ্তধারাকে এখানকার লোকেরা বলেন গঙ্গাখাড়ি। গঙ্গার গুপ্তধারার সংগমকে স্মরণে রেখেই কল্লোড়ীনাথকে বলা হয় গঙ্গোনাথ। তুমি চাঁদোদে গতকাল রাত্রে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম করেছিলে। তাঁকে আমি দেখি নি বা তাঁর নাম শুনি নি। কিন্তু তাঁর গুরুদেব যিনি এই স্থানকে জাগ্রত করে গেছেন সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯০৬ সালে মাঘী পূর্ণিমার দিনে ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি যখন মরদেহ ত্যাগ করেন, তাঁর সলিল সমাধি অনুষ্ঠানে আমি গুরুজীর আদেশে মণ্ডলেশ্বর থেকে নৌকাযোগে এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি দেহরক্ষার পূর্বদিন আমাদের গুরুজীর সঙ্গে দেখা করে বলে আসেন — 'ম্যায় যা রাহা হুঁ মহারাজ! বিহানমেঁ সবেরেঁ ম্যাঁয় নর্মদামাতাজীকী গোদমেঁ বৈঠেঙ্গে।' গুরুজী তদ্দণ্ডেই একটি নৌকা বন্দোবস্ত করে এখানে পাঠিয়ে দেন। ভেবে দেখ আমার গুরুজীর মহিমামণ্ডিত ধ্যানদৃষ্টির কথা, তার সঙ্গে ভেবে দেখ ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীজীর অলৌকিক যোগবিভূতির কথা, এখানে যে নর্মদার ঘাট এত সুন্দরভাবে বাঁধানো দেখছ, বরোদার গায়কোয়াড় শিউজী রাওয়ের রাজমহিষী যমুনাবাঈ এই পবিত্র তীর্থঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মহারাণী যমুনাবাঈ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের গুরুগতপ্রাণ শিষ্যা ছিলেন।

এই স্থানটি দেখছি শাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন তপোবনের মত একটি সুন্দর তপোভূমি। এখানে নর্মদার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য মনকে মুগ্ধ করে। ভীমগতিতে বয়ে চলেছেন নর্মদা ধনুকাকার ধারণ করে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটি সুউচ্চ টেকরী অর্থাৎ প্রায় তিনতলা সমান উঁচু মাটির পাহাড়ের উপর। ঠিক নিচেই নর্মদা বয়ে চলেছেন।ধনুকাকৃতি এই নর্মদাতটের টেকরীতে দাঁড়িয়েই এখান থেকে চাঁদোদ, কর্ণালী, পাবকেশ্বর অগ্নিতীর্থ প্রভৃতি স্থান ছাড়াও দূরবর্তী বহু গ্রাম চোখে পড়ছে। নর্মদার দক্ষিণতটে ভাঁটা অর্থাৎ শুধু বালি ছাড়া কোন বসতি চোখে পড়ছে না। অথচ এই গঙ্গোনাথ আশ্রমের পিছনের দিকে তাকাতে গাছপালায় ঢাকা অনেক জনবসতিপূর্ণ গ্রাম চোখে পড়ছে। মহাত্মা কমলভারতীজীর নামাঙ্কিত নিশান দণ্ড টেকরীর এক স্থানে পুঁতে আমরা ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করলাম। ঘাট থেকে উঠে এসে দেখি প্রায় চারজন আমার বয়সী ব্রহ্মচারীসহ একজন প্রায় ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রবীন সাধু একটি নারকেল ও কিছু ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরও বেশভূষা একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মত। তিনি সেই ফুল ও নারকেল নমো নারায়ণায় বলে মোহান্তজীর হাতে সমর্পণ করে তাঁর গুরুমহারাজের আশ্রমে স্বাগত জানালেন এবং ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — 'আমাদের ঝোলায় আজকের মত ভিক্ষার উপযোগী আটা আছে। লিট্টি পাকিয়ে নিলেই চলে যাবে।'

আমি এতক্ষণ ধরে ঐ প্রবীন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। এই অঞ্চলে এই গোর্খার মত চেহারা কারও দেখতে পাব আশা করিনি। শান্তসৌম্য প্রকৃতির, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র অংকিত। সাধু লক্ষ্মণভারতীজীর কথা শুনেই বিনম্রভাবে অথচ গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে বলে উঠলেন, যে মহাপুরুষের এটি তপস্যাক্ষেত্র আমার গুরুদেব সেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অতিথি সেবা এবং পরিক্রমাবাসীদের সেবা না করে নিজে কখনও মা নর্মদার প্রসাদ গ্রহণ করতেন না। তাঁর আমলে একটি ঘন্টাধ্বনি করে জেনে নেওয়া হত আর

কেউ অভুক্ত আছেন কিনা। যখন জানা যেত আর কেউ অভুক্ত নেই, তখন তিনি সম্মুখস্থিত ধুনীর আগুনে হয় চারখানি রুটি নতুবা সামান্য পরিমান খিঁচুড়ী স্বহস্তে পাকিয়ে নিয়ে লবন ও মিষ্টহীন অল্প শাক-উপকরণের সঙ্গে অহার করতেন। আজ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে এসে আপনাদের মত নর্মদাভক্ত পরিক্রমাবাসীরা যদি ভিক্ষা গ্রহণ না করে যদি নিজেরাই নিজেদের খাদ্য তৈরী করে নেন, তাহলে আমাকে তাঁর শ্রীচরণে চিরকালের অন্য অপরাধী থেকে যেতে হবে। দয়া করে আপনারা আশ্রমের ধর্মশালায় এসে বিশ্রাম করুন। এখানে যা কিছু দেখছেন সব কিছুর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবন্ধক তিনি। তিনিই এই জীর্ণপ্রায় গঙ্গোনাথের মন্দিরকে সংস্কার করে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। গঙ্গোনাথের মন্দির ছাড়াও ঐ যে সরস্বতী দেবীর মন্দির ও গুহা, ধর্মশালা, গোশালা সবই তাঁরই সৃষ্টি।

মোহান্তজী তাঁর আন্তরিকতা দেখে লক্ষ্মণভারতীজীকে চোখের ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে তাঁর আমন্ত্রণ স্বীকার করে নিলেন। ধর্মশালাতে নিজেদের ঝোলা ও গাঁঠরী রেখে আমরা গঙ্গোনাথের মন্দিরে গেলাম গঙ্গোনাথের পূজা করতে। একটি বিল্ববৃক্ষের পাশেই এই মন্দির। মন্দিরে ঢুকে একে একে আমরা মহাদেবের মাথায় যে যার ইষ্টমন্ত্র জপে পবিত্র নর্মদা বারি অর্পণ করলাম, পূজা এবং প্রণাম করলাম। মন্দিরের মধ্যে চার-পাঁচটি ঈষৎ শুভ্রবর্ণের চিহ্ন সহ ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণের এই মহাদেবকে বারবার জড়িয়ে ধরে ভুলুণ্ঠিত হতে ইচ্ছা করে। এক অপূর্ব সুগন্ধি বিরাজ করছে। একে একে পূজা করে অপরকে পূজার সুযোগ করে দেবার জন্য আমরা বেরিয়ে আসতে থাকলাম। মন্দিরের কাছেই যে বটগাছটি দেখলাম তা প্রায় ৫ জন মানুষ ধরাধরি করে বেষ্টন করলেও এই বটগাছের গুঁড়ি সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে আসবে বলে মনে হল না।

কল্লোড়ীনাথ তথা গঙ্গোনাথের পূজা করে এসে রতনভারতীজী ও মতীন্দ্রজীর সঙ্গে আশ্রমের চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম — যিনি আমাদেরকে ভিক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনিই এখন এখানকার আশ্রমাধ্যক্ষ, নাম স্বামী পৃথ্যানন্দ ব্রহ্মচারী। নেপালী শরীর। ব্রহ্মানন্দজীর সর্বকনিষ্ঠ শিষ্য। অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে পর্যটন করতে করতে তিনি একবার আফগানিস্তান অঞ্চলে গিয়ে এক মুসলমান ফকিরের সাক্ষাৎ পান। তাঁকে গুরুলাভের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন, নর্মদাতটের গঙ্গোনাথে গিয়ে তুমি তোমার গুরুর দর্শন পাবে। তিনি একটি কাঠ দিয়ে মাটিতে গুরুর নামও লিখে দেন — ব্রহ্মানন্দ। ফকিরের কাছে এই সুস্পষ্ট নির্দেশ পেয়ে পৃথ্যানন্দজী নিতান্ত তরুণ বয়সেই এই গঙ্গোনাথে ব্রহ্মানন্দজীর চরণতলে এসে উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দজী তাঁকে দেখেই বলেন — ফকির যখন আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন, তখন তোমাকে দীক্ষা দিব ঠিকই তবে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না; অন্তিমকাল পর্যন্ত আমার সেবা করবে। বহুলোককেই আমি দীক্ষা দিয়েছি, অনেকেই তারা মা নর্মদার দয়ায় কৃত্যকৃত্য হয়ে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকে আশ্রম নাম দিয়ে প্রাসাদপম অট্টালিকাদি স্থাপন করে ধনৈশ্চর্য এবং মান প্রতিষ্ঠার হাতছানিতে মুগ্ধ হয়ে তাতেই আত্মমগ্ন হয়ে আছেন। মূল গুরুস্থান এই গঙ্গোনাথের সেবা বা এখানকার অখণ্ড ধূনী এবং অখণ্ড দীপকে জাগিয়ে রাখার দিকে কারও লক্ষ্য নেই। কেউ কেউ হয়ত দুবছর

পাঁচবছর ছাড়া সশিয়ো এখানে এসে দায়সারা গোছের প্রণাম ঠুকে যায়। তুমি যদি আমার দেহান্তের পরে আমৃত্যু এখানে থাকতে প্রতিশ্রুত হও, তবেই তোমাকে দীক্ষা দিয়ে আমি চিন্তামুক্ত হই। পৃথ্যানন্দজী সেই থেকে এখানেই আছেন। ইং ১৯০৬ সালে ব্রহ্মানন্দজী ব্রহ্মলীন হয়েছেন। এখন ইং ১৯৫৪ সাল, এই দীর্ঘ ৪৮ বৎসরকাল পৃথ্যানন্দজী এই স্থানের সেবা করে চলেছেন। তাঁর অখণ্ড ধূনী এবং অখণ্ড দীপ জাগ্রত রেখেছেন এবং গোসেবা অতিথি সেবার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। চলুন আপনাদেরকে গুরুমহারাজের অখণ্ড ধূনী এবং অখণ্ড দীপ দেখাই গিয়ে।

এই বলে সেই ব্রহ্মচারী একটি বিল্ববৃক্ষের তলায় একটি কুটীরে নিয়ে গেলেন। আমরা গিয়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড ধূনী এবং জ্বলন্ত অখণ্ড ঘৃত প্রদীপকে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে বেরিয়ে আসার পরই ব্রহ্মচারীজী জানালেন প্রায় ২৫০ বৎসর আগে ব্রহ্মানন্দজী যখন এই বিল্ববৃক্ষমূলে আসন পাতেন, তখন এখানে লোকবসতি আদৌ ছিল না, এখন এই কহেলাড়িকা এবং এর আশেপাশে বহু জনবসতি গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মানন্দজী আগে বাস করতেন পর্ণ কুটিরে, মাথার উপর আচ্ছাদন ছিল একটি টিনের চালা, সেখানেই তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই অখণ্ড ধূনী এবং অখণ্ড দীপ জ্বেলে বসে থাকতেন। পরে তাঁর শিষ্যা বরোদার মহারাণী এই পাথরের ঘর তৈরী করে দেন। তাঁর আমলে গোশালায় প্রায় ৫০ টি গাভী ছিল। এখন প্রায় ত্রিশটি আছে। মহারাজ নিজের তপ-জপের ফাঁকে নিজেই স্বহস্তে গোমাতার সেবা করতেন এবং পরিক্রমাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীর শিশুদেরকে দুধ বিলাতেন।

মোহান্তজী সদলবলে পূজা-পাঠ সেরে গঙ্গোনাথের মন্দির হতে ধর্মশালায় ফিরে এলেন। আশ্রমের মনোরম পরিবেশ আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে সন্দেহ নাই, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বারবার নর্মদার ধনুকাকার গতিপথ রৌদ্রকিরণে উদ্ভাসিত দক্ষিণতটের বালুরাশির ঝিকিমিকি এবং বিন্ধ্যপর্বতের শোভা মনকে আকর্ষণ করছে বেশী। আমরা দেখতে পেলাম একটা বিরাট নৌকা নর্মদা বক্ষে ভেসে চলেছে। নর্মদার স্রোত নৌকটাকে টেনে নিয়ে চলেছে ভীমবেগে। আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী জানালেন — বোধ হয় চাঁদোদ থেকে ঐ নৌকা যাত্রী নিয়ে চলেছে রেবাসমুদ্র সংগমে।

বেলা সাড়ে বারোটায় আমরা ভিক্ষা গ্রহণ করলাম। ঘৃতসিক্ত রুটি, বুটের ডাল, তৎসহ প্রচুর দুধ দিয়ে পৃথ্যানন্দজী আমাদেরকে ভোজন করালেন। ভোজনের শেষে দেখলাম অনেক গ্রাম্যলোক বড় বড় ঘাসের বোঝা এনে গোশালায় রাখছেন। স্বয়ং পৃথ্যানন্দজী সেই সব লোককে রুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করে, গাভীদেরকে স্বহস্তে ঘাস খাইয়ে, নিজে চারখানা রুটি খেয়ে নিজের ভোজনকার্য সমাধা করলেন। ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ধারা বজায় রেখেছেন পৃথ্যানন্দজী।

বেলা চারটে নাগাদ আমরা নর্মদাতটে টেকরীর উপর গিয়ে বসলাম। পৃথ্যানন্দজীও এসে আমাদের কাছে বসলেন। লক্ষ্মণভারতীজী তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলতে। পৃথ্যানন্দজী সাশ্রুনেত্রে বলতে লাগলেন — আমার গুরুদেবের কাঁধের ঝুলিতে ঋদ্ধি-সিদ্ধি দুই-ই ছিল। বরোদার মহারাণী যমুনাবাঈজী অসময়ে তাঁর কাছে আঙুর

।াইতে তাঁর ঝুলি হতে একগুচ্ছ আঙুর বের করে তাঁর হাতে দিয়েছিলেন, অথচ রাণী নিজের চোখে দেখেছিলেন সে সময় তাঁর ঝুলিতে শাক-সব্জী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিংবা দুর্ভিক্ষের সময় মাত্র পাঁচ-সাত সের চাল ডাল ঘি-এ ভেজে খিঁচুড়ী তৈরী করে বড় বড় গোলা পাকিয়ে আট দশ মাইল জুড়ে নিরন্ন গ্রামবাসীদের তিনি পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে পারতেন। তাঁর সেইসব অলৌকিক বিভূতির কথা নর্মদাতটের বহু লোকজন নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনারা নিজেরাও তাঁর সেইসব বিভূতির কথা বোধহয় কিছু না কিছু শুনে থাকবেন। তাঁর সবচেয়ে যে ঘটনা আজও আমাকে স্তম্ভিত করে রেখেছে তা হল, তাঁর দেহান্তের অব্যবহিত পরেই যখন তাঁকে এখানে সলিল সমাধি দেওয়া হয় সেই সময় তাঁর পরিচিত বহুলোকই দেখেছিলেন তিনি চাঁদোদের ঘাটে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে নর্মদা পার হয়ে যাচ্ছেন, এবং যেদিন তাঁর অন্তিম ক্রিয়া উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা হয়, ঠিক সেইদিন সেই সময়েই তিনি এখান হতে ৫০ ক্রোশ দূরে ডাকোর রণছোড়জীর মন্দিরের নিকট উপস্থিত, সশরীরে উপস্থিত হয়ে যাঁরা তাঁকে চিনতেন অথচ তাঁর মহানির্বাণের কোন খবর পান নি, তাঁদেরকে ডেকে হাজার খানিক ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে তাঁর কোন ভক্তের হাতে এই গঙ্গোনাথ আশ্রমের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই লোক সেই দিন বেলা তিনটার সময় এসে ভাণ্ডারাদি দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন এবং মাঝে-মাঝেই তিনি আমার কাছে এসে থাকেন। এই অলৌকিক রহস্য আজও আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেছে।

আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা পূজনীয় বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কাছেই শুনেছি, তিনি ২৫০ বৎসর কাল যাবৎ দেহ ধারণ করেছিলেন। মহাত্মা কমলভারতীজী এবং গৌরীশংকরজীর তিনি সমসাময়িক ছিলেন, বয়সে বোধহয় গুরুদেবই ছিলেন সমগ্র নর্মদা খণ্ডের প্রাচীনতম মহাত্মা। আমি জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাদের কাছে শুনেছি, তিনি তাঁদের কাছে বলেছিলেন যে, নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে যখন ইংরাজদের সংঘর্ষ চলছিল, তখন তিনি যুবক ছিলেন। শিবাজীর শৈশবকাল, তাঁর পিতা শাহজী এবং শিবাজীর গুরু দেশ প্রসিদ্ধ সমর্থ রামদাসজীর বিষয়ে বহু অন্তরঙ্গ ঘটনার গল্প বলতেন। বরোদার পরপর পাঁচজন গায়কোয়াড়ের অভিষেক ক্রিয়া তাঁর সামনেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই সময় লক্ষ্মণভারতীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — আপনার গুরুজী একজন তপোনিষ্ঠ মহাযোগী ছিলেন সন্দেহ নাই, তবে ভেইয়া তাঁর কোন্ উপাদেশবাণী আপনার জীবনকে সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে, দয়া করে আমাদেরকে শোনাবেন কি ? প্রশ্ন শুনে পৃথ্যানন্দজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন — আমাকে দীক্ষা দানের সময় বলেছিলেন — তোমাকে দীক্ষা যে দিব, তার দক্ষিণা কি দিবে? তাঁর কথা শুনে আমি হকচকিয়ে যাই ; নীরবে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি তাঁর কাঁধের ঝুলিটি দেখিয়ে বললেন — আমার এই ঝুলিতে ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই-আছে। মা নর্মদার দয়ায় আমার সবই পূর্ণ। লৌকিক প্রথানুসারে শিষ্য যে গুরুকে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, অন্নপানাদি এবং পত্রপুষ্পাঞ্জলি দান করে থাকে, তার নাম ঋদ্ধি। এগুলি যথার্থ গুরুদক্ষিণা নয়। কারণ এই জাগতিক উপঢৌকন সম্পূর্ণ অনিত্য বস্তু, এই জগতেই এগুলি থেকে যায়। ঐ সব অনিত্য বস্তুর

গুরুদক্ষিণা প্রদানে পরকালে স্বর্গসুখ প্রাপ্তি বা পরজন্মে শ্রীমানের কুলে জন্মলাভ ঘটে বটে কিন্তু তার ফলে অনিত্য সংসারে পুনরায় এসে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু সিদ্ধি কোনমতেই অনিত্য বস্তু নয়। সিদ্ধ মন্ত্র থেকে সিদ্ধ ফল উৎপন্ন হয়। তোমাকে এই রুদ্রাক্ষের মালা মন্ত্রপূত করে দিচ্ছি। আমার প্রদত্ত মন্ত্র এই মালায় জপ করবে এবং জপান্তে মন্ত্রের ফল জপের অভীষ্ট স্বরূপ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করবে। তোমার নিত্য জপের ফল আমার কাছে গচ্ছিত থাকবে। যথালগ্নে যথাসময়ে তোমার সেই গচ্ছিত বস্তু শতগুণ বর্ধিত করে তোমাকেই সমর্পণ করব। সেই সিদ্ধফলই যথার্থ মুক্তির সোপান নির্মাণ করে থাকে।

তাঁর সেই কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনার পর তাঁর চরণে আমি প্রণত হতেই তিনি বললেন — 'হ্যাঁ, এই হল সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। তোমার যে মাথা গুরুপদে ঠেকিয়েছ , সেই মাথাই দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ , সেইখানে সহস্রদল কমলের মধ্যে গুরুস্বত্তা সতত বিরাজিত আছেন; সেই সহস্রদল কমলের মধ্যে গুরুস্বরূপের ধ্যান করবে এবং আজ হতে তোমার তন্ মন ধন সকলই গুরুদেবের হল, তুমি যখন যা করবে, গুরুদেব সতত তোমার সঙ্গে আছেন, এই দৃঢ় ভাবনা অবিচলিত নিষ্ঠা রাখতে পারলেই তোমার নিত্য বস্তু লাভ হবে।' তাঁর এই উপদেশই আমার কাছে ধ্যানজ্ঞান। আমি তাঁর সর্বকনিষ্ঠ শিষ্য, সর্বনিকৃষ্ঠও বটে । মা নর্মদাকে স্মরণ করে তাঁর স্থানে তাঁরই নাম নিয়ে পড়ে আছি মাত্র।

তাঁর কথা আমাদের সকলের চিত্তকে স্পর্শ করল। সূর্যাস্ত হতে যায়। আরতির আয়োজন করতে তিনি উঠে গেলেন ছলোছলো চোখে।

সন্ধ্যা হতেই আরতি সুরু হল। ধূপ দীপ কর্পূর দিয়ে গঙ্গোনাথের আরতি করলেন তিনি। শিঙ্গা ডম্বরুর বাদ্যসহ নাগা সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে গাইতে থাকলেন —

দেবি নর্মদে! কৃপা করো অপরাধ বিসারো।<br>
ভব সাগরমেঁ ডুবি-রহে ! আই উবারো॥<br>
পুত্র কুপুত্র কহায় কুমাতা হোয় ন কবহুঁ।<br>
করে ন হম শুভ করম লগায়ে আশা তবহুঁ॥<br>
মাঁ তুম্ অশরণ শরণ হো, গোদীমেঁ বৈঠাই লৈঁ।<br>
ভলে বুরে জৈসে তনয়, কিরপা করি আপনাই লৈঁ॥

আরতি শেষ হতেই সকলে মহাদেবকে প্রণাম করে ধর্মশালার ঘরে যে যার আসনে সান্ধ্যাক্রিয়ায় মন দিলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সকলেই কম্বল মুড়ি দিয়ে জপে বসেছি। রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ জপ সেরে উঠলাম। দেখলাম, অনেকেই আসন ত্যাগ করেছেন কিন্তু মোহান্তজী এখনও স্থির ভাবে বসে আছেন। আমাদের ঘরের এক কোণে একটা ঘি এর প্রদীপ জ্বলছে। শুয়ে পড়লাম, ভাবছি এই গঙ্গোনাথ মহাদেবের কথা। সহস্র বৎসর পূর্বে এই গঙ্গোনাথজী কল্লোড়ীনাথ নামেই পরিচিত ছিলেন, তদনুযায়ী এই স্থানের নাম হয়েছিল কল্লোড়িকা, এখনও সেই নামেই আছে। রেবাখণ্ডে মহামুনি কল্লোড়ীনাথেরই বর্ণনা করেছেন। কালক্রমে তাঁর মন্দির নর্মদাগর্ভে নিমজ্জিত হলে নর্মদাতটবাসী ঋষিগণ সেই কল্লোড়ীনাথকে নর্মদাগর্ভ হতে উদ্ধার করে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারপর কবে যে কল্লোড়ীনাথ গঙ্গোনাথ নামে পরিচিত হলেন, তার কোন ঐতিহাসিক কাল ও তথ্য আমার

জানা নেই। যাইহোক, আমার কাছে মহাদেব সর্বাবস্থায় স্বয়ম্ভু, সদাজাগ্রত, প্রভু পরমেশ্বর, ভক্ত তাঁকে যে নামেই ডাকুন না কেন! মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী এবং অর্বাচীন যুগে আরও কত মহাযোগীর তপস্যাক্ষেত্র এটি, সে মহিমা কম কিসে? এখানকার বায়ুমণ্ডলে তাঁদের চিৎশক্তি প্রবাহ এখনও অব্যাহত আছে, সন্দেহ নাই।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না, প্রস্রাবের বেগে ঘুম ভেঙে গেল। আমার পাশেই ঘুমিয়ে আছেন যতীন্দ্রজী, তাঁর মাথার কাছেই সাধারণতঃ হাতঘড়িটা রেখে থাকেন, টর্চ টিপে দেখলাম, রাত্রি ২টা বেজে ৮মিঃ হয়েছে। আমি ধর্মশালার ঘর থেকে বেরিয়েই গোশালার পাশ দিয়ে কতকটা দূর গিয়ে প্রস্রাব করতে বসলাম। বসা মাত্রই কারও যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি শুনলাম, আমার গায়েই যেন কারও নিঃশ্বাস এসে পড়ল। আমি চমকে উঠে আর একটু দূরে বসলাম। প্রস্রাব নির্গত হবে, এমন সময় শুনতে পেলাম রেবা রেবা ধ্বনি! মাটি ভেদ করে উঠছে। প্রস্রাবের বেগ টেনে ঠিকরে সরে গেলাম আরও কতকটা। সেখানেও বসতে সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় রেবা ধ্বনি! কেউ চাপা কণ্ঠস্বরে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে সুরেলা ধ্বনি তুলছেন রেবা রেবা রেবা! আমি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, অর্ধনমিত হয়ে ছোটাছুটি করছি, প্রস্রাবের বেগে মনে হচ্ছে আমার মূত্রথলি ফেটে যাবে, লিঙ্গমূল ব্যথায় টনটন করছে, এমন সময় পলকের জন্য কৃষ্ণাষ্টমী রাত্রের সেই অন্ধকারময় দৃশ্যপটে এক শ্বেতশ্মশ্রুবিমণ্ডিত সাধুর রেখাচিত্র ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠলো। তিনি তাঁর আজানুলম্বিত দুই বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে টেনে আনলেন পিছন দিকে। আমি মূর্ছা গেলাম। বাবা কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন — অভীঃ! ভয় নাই।

কিসের ভয় নাই? কোন কিছুরই না, 'ন মৃত্যুঃ ন শঙ্কা।' ভগবান যুগ যুগান্তরে, কল্প হতে কল্পান্তরে আমার এবং তোমার হাত ধরে চলেছেন, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্য দিয়ে। সকল জন্ম-মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেছেন। জরা নাই, মৃত্যু নাই, এমন কত গভীর রাত্রে কত নিরন্ধ্র অন্ধকারে পথের সাথীর সাহায্য পাবে, কখনও পাবে না, কখনও বা জ্যোৎস্না রাত্রে নির্মল ধারায় দুচোখ ভরে দেখতে পাবে তাঁর নয়নাভিরাম রূপ। জীবনে কত সুখের সূর্য উদিত হবে, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেই সুমধুর আয়ুকালগুলি! কত কোকিল ডাকবে, শঙ্খচিলের ডাকে কত মধ্যাহ্ন প্রহর শিহরিত হবে, কত পদ্ম, কত রক্তপলাশের সমারোহ দেখতে পাবে। এই জীবন ও জন্ম দু-দিনের, কিন্তু মা নর্মদা আমাদের অনন্তকালের জননী — মা নর্মদা আমাদের চিরকালের মা, আমরাও তাঁর চিরকালের সন্তান। একই মায়ের সন্তান। মায়ের এক সন্তান অপর সন্তানকে ভালবাসেন, ভাই ভাইকে না দেখলে, দরদের মূল্য কী রইল, আবার বলছি — অভীঃ।'

যখন চেতানা এল তখন দেখি গাঢ় কুয়াশায় চারদিকঢেকে আছে; মন্দিরে মঙ্গল আরতির ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। কল্লোল শুনে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমি টেকরীর শেষ সীমা হতে মাত্র দু হাত দূরে বসে আছি। বহু নীচে নর্মদা বয়ে চলেছেন। কারও আজানুলম্বিত বাহু আমাকে যথাসময়ে জড়িয়ে না ধরলে আমি নর্মদার অতলতলে তলিয়ে যেতাম! আমি নর্মদা এবং গঙ্গোনাথ মহাদেবকে যুক্তকরে প্রণাম করলাম।

মূর্চ্ছিত অবস্থায় অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে গেছে। আমার কোমর, জঙ্ঘা, জানু ও পা দুটো কাদায় লটপট করছে। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি ধীরে ধীরে বাঁধনো ঘাটে নেমে

স্নান করে নিলাম। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। মঙ্গল-আরতি তখনও চলছে। সকাল হয়ে গেছে বললেই চলে, কুয়াশার আস্তরণ ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে ধর্মশালায় ঘরে ঢুকে আমার কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে এলাম। গোশালা হতে কতকটা গোবর নিয়ে এসে যেখানে প্রস্রাব করে ফেলেছি, সেখানটা গোবর জল দিয়ে মার্জনা করে দিলাম। এই সময় কয়েকজন নাগা উঠে পড়েছেন। আমাকে সেই স্থানটা গোবর জল দিয়ে ধুতে দেখে মোহান্তজীর কাছে উল্টো-পাল্টা রিপোর্ট করেছেন বলে মনে হল। তিনি দৌড়ে এলেন আমার কাছে, জিজ্ঞাসা করলেন — বাঙালীবাবা, আপকা পেটমেঁ কোঈ গড়বড়ি হুয়া?

— নেহি জী।

— ধরমশালাকা কামরা সে ইধর ক্যায়সে আগয়ে থে? হম্ শোনা থা ইধর রুদ্রপিশাচ ঠারথে হৈ। আপ্ কোঈ রুদ্রপিশাচকো দৃষ্টিমে পড়া থা?

— নেহি জী।

তিনি তবুও আমার গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে নিলেন 'বুখার' হয়েছে কি না।

— এতনা সুবে কেঁও নাহায়া? অন্দরমেঁ যাকর কম্বল চড়াইয়ে।

তিনি চলে গেলেন প্রাতঃকৃত্য করতে। বিছানায় কম্বল না দেখেই মনে পড়ল, রাত্রে কম্বল মুড়ী দিয়েই প্রস্রাব করতে গিয়েছিলাম, হয়ত কোথাও পড়ে গেছে। আলখাল্লাটা গায়ে চাপিয়ে কম্বলটা খুঁজতে গেলাম। গোশালার পাশ দিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে পঞ্চবটির ধারে গিয়ে কম্বলটা পড়ে থাকতে দেখলাম। গোটা রাত্রি শিশির পড়ে কম্বলটা ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতে নিয়ে এসে কম্বলটা সকলের অলক্ষ্যে পাট করে গাঁঠরীর সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। যেদিকে কম্বলটা পড়ে ছিল, তার বিপরীত দিকে নর্মদার কিনার টেকরীর নিচেই। বুঝতে পারলাম কতখানি স্থান আমি রাত্রে ঘুরপাক খেয়েছিলাম অন্ধকার রাত্রে প্রস্রাবের জ্বালায়। এখন ধর্মশালায় কেউ নেই, সবাই গেছেন প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নানাদি করতে। আমি কমণ্ডলু হাতে করে গেলাম গঙ্গোনাথের মন্দিরে। ইতিমধ্যেই কোন আশ্রমিক মন্দির ধুয়ে মুছে একটা বড় তাম্রপাত্রে অনেক বেলপাতা গুছিয়ে রেখে গেছেন, বোধ হয় নিত্যপূজার জন্য, আমি তাতে হাত দিলাম না। আচমনাদি সেরে আমি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ থেকে একটি মন্ত্র পাঠ করে গঙ্গোনাথ তথা প্রাচীন ঋষিগণ সেবিত কহেলাড়ীনাথের মাথায় জল ঢালতে লাগলাম —

ওঁ যদাহতমস্তৎ ন, ন দিবা ন রাত্রির্নসৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং সবির্তুবরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥

অর্থাৎ হে মহাদেব! যখন অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন দিবা বা রাত্রি থাকে না, কার্য বা কারণ থাকে না, একমাত্র তুমিই নির্বিকারভাবে বিরাজমান থাক, তুমিই নিত্য, তুমি সূর্যেরও বরেণ্য, তোমা হতেই অনাদিসিদ্ধ আত্মবিদ্যা নির্গত হয়েছে।

ওঁ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

হে দয়াল! তুমি নিয়ন্তাদেরও পরম নিয়ন্তা, দেবতাগণের পরম দেবতা এবং প্রভুগণেরও পরম প্রভু; অবিদ্যার অতীত, নিত্য স্তবনীয়, স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ হে জগদীশ্বর! তোমাকে আমরা যেন জানতে পারি।

প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সূর্যোদয় হচ্ছে। নদী মেখলা শান্ত গম্ভীর বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ায় চূড়ায় সোনালী রং ছড়িয়ে পড়ছে। মোহান্তজী, যতীন্দ্রজী, লক্ষ্মণভারতীজী এবং রতনভারতীজীকে সঙ্গে নিয়ে স্নানান্তে উঠে আসছেন সুউচ্চ সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে। তিনি হাঁপিয়ে পড়েছেন। কৌষিক বস্ত্র পরিহিত সদ্যস্নাত পৃথ্যানন্দজী দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরের গায়ে সোপান শ্রেণীর মুখে। তিনি মোহান্তজীকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করে বললেন — 'শুধু আপনি কেন আমরাও এক কমণ্ডলু জল নিয়ে উপরে উঠে আসতে হাঁপিয়ে যাই, অথচ গুরুদেব তাঁর অতি বৃদ্ধাবস্থাতেও 'রাম' ও 'লছমন' নামক দুটি তামার ঘড়ায় নিজ হাতে নর্মদার জলে পূর্ণ করে এতগুলি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে গঙ্গোনাথের মন্দিরে উঠে আসতেন। প্রত্যেকটি ঘড়ায় প্রায় এক মন করে জল ধরত। তাঁকে ক্লান্ত হতে বা হাঁপাতে দেখিনি। এমনই ছিল তাঁর আজানুলম্বিত বাহুতে অপার শক্তি! অমিতশক্তিধর সেই মহাপুরুষের অস্বাভাবিক দীর্ঘ আজানুলম্বিত বাহুর মত বাহু আর কারও মধ্যে দেখিনি।'

তাঁর মুখে বারবার দুবার 'আজানুলম্বিত বাহু' শব্দটি শুনে আমি চমকে উঠলাম!

নাগারা সবাই একে একে গঙ্গোনাথের মন্দিরে ঢুকতে লাগলেন, পূজার উদ্দেশ্যে। আমি গিয়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত সেই অখণ্ড ধূনী এবং অখণ্ড প্রদীপের কাছে বসে নর্মদার ষড়ক্ষরী মহাবীজ কিছুক্ষণ ধরে জপ করলাম। গঙ্গোনাথের পূজা করে এসেই নাগারা এখান থেকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হলেন। পৃথ্যানন্দজীকে বিদায় জানিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে নর্মদা কিনারে কিনারে প্রায় ১৭ মিনিট হেঁটে গিয়েই আমরা নন্দীকেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। শিবগতপ্রাণ মহাভৈরব নন্দী এইখানে নন্দিকেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করে কঠোর শিব তপস্যা করেছিলেন। নন্দীকেশ্বর মহাদেবের প্রধান অনুচর এবং গণনায়ক। মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে নন্দী নামে এক অযোনিসম্ভব পুত্র লাভ করেন। সেই পুত্রই এখানে এই নর্মদাতটে তপস্যা করে মর্ত্য শরীরকেই দিব্যদেহের পরিবর্তিত করতে পেরেছিলেন। প্রত্যেকেরই স্থূলদেহের সূক্ষ্মদেহ বর্তমান। সেই স্থূলদেহের খোলস ত্যাগ করে তবেই সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র ভগবান নন্দীকেশ্বরই তপোবলে স্থূলদেহের অনুরূপ অবিকল দিব্যদেহ লাভ করেছিলেন। প্রত্যেক শিবস্থানের রক্ষক ইনি। যে সমস্ত যোগীশ্বর তাঁদের ধ্যানদৃষ্টিতে এঁর দর্শনলাভ করেছেন তাঁদের মতে এঁর করাল রূপ, বামনাকৃতি, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ এবং বানরের মত মুখাকৃতি। রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি লিখেছেন রাবণ কুবেরকে জয় করে পুষ্পক রথে চড়ে একদিন কৈলাসের পথে যাচ্ছিলেন, তখন সহসা তাঁর রথের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। রাবণ নন্দীর দর্শন পান। তিনি রাবণকে কৈলাসে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন, কারণ তখন শিব-শিবানী একত্র ছিলেন। রাবণ নন্দীকেশ্বরের মুখ দেখে হেসে উঠলেন। তখন নন্দীকেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন — আমার মুখাকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোমাকে সবংশে ধ্বংশ করবে।

লক্ষ্মণভারতীজী মন্তব্য করলেন মহাভাগ্য রাবণের; তিনি নন্দীকেশ্বরের দর্শন পেয়েছিলেন। মোহান্তজী তাঁকে বললেন — রাবণকে তুমি সাধারণ লোক বলে ভাবো নাকি। বিশ্রবা ঋষির পুত্র, মহর্ষি পুলস্ত্যের পৌত্র রাবণ বেদবিৎ মহাশৈব ছিলেন। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে

নন্দিকেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে মিনিট পাঁচেক হেঁটেই নান্দরিয়া গ্রামে এসে পৌঁছালাম। এখানে ঘাটে দু'চারজন গ্রামবাসী স্নান করছিলেন। লক্ষ্মণভারতীজী তাঁদেরকে হাল্কা সুরে প্রশ্ন করলেন — ইধর দেখনেকে লায়েক কোন্ কোন্ চীজ হ্যায়?

— আপ্ পরিক্রমাবাসী হোকর এহি নর-নারায়ণ মহাতীর্থকো নাম নেহি শোনা? অব যাইয়ে উধর, ওহি যো নন্দরাজাকো টুটা ফুটা কিল্লা দেখাই দেতা হৈ, উধর বৈঠকে ধ্যান লাগাইয়ে। তব তীর্থকা স্বরূপকো পতা লাগে গা। মুখের মত জবাব পেয়ে লক্ষ্মণভারতীজী চুপ করে গেলেন।

মোহান্তজী বললেন — লছমন ভেইয়া, তুমি ত এত হাল্কা স্বভাবের নও। হঠাৎ ঐ লোকগুলির সঙ্গে রসিকতা করতে গেলে কেন? নর্মদাতটের এমনই প্রভাব যে এখানকার সাধারণ লোকও আমাদের চেয়ে বেশী তত্ত্ব জানেন। ওঁরা কোন কাজে কথা বলেন নি। সত্যই এখানে প্রসিদ্ধি আছে যে এস্থান এক সময়ে নন্দ রাজার রাজধানী ছিল। এস, আমরা সকলে এই নর-নারায়ণ তীর্থকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করি। প্রণাম করে উঠতেই তিনি বললেন — বাঙালীবাবা! নর-নারায়ণ সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকলে তাঁদের মহিমা কীর্তন কর।

— আমি যতদূর জানি, মহাভারতের বনপর্বে পড়েছি, শকুনি ও দুর্যোধনের দ্বারা কপট পাশা খেলায় রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির যখন বনবাসী হলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁকে শান্ত করার জন্য অর্জুন তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃত তপস্যার যে বিবরণ জানিয়েছিলেন, তাতেই নর-নারায়ণের স্বরূপ সুপরিস্ফুট হয়েছে। অর্জুন বলেছিলেন —

দশবর্ষ সহস্রানি যত্র সায়ং গৃহোমুনিঃ।
ব্যাচরস্তং পুরা কৃষ্ণ! পর্বতে গন্ধমাদনে।।
দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষ শতানি চ।
পুষ্করেষ্ববসঃ কৃষ্ণ ! ত্বমপো ভক্ষয়ন্ পূরা।।
ঊর্ধ্ববাহু বিশালায়াং বদর্যাং মধুসূদন!
অতিষ্ঠ একপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ।।
অবকৃষ্টোত্তরাসঙ্গঃ কৃশো ধমনী সন্ততঃ।
আসীঃ কৃষ্ণ! সরস্বত্যাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।।
প্রভাসসমপ্যথাসাদ্য তীর্থং পুণ্যজনোচিতং।
তথা কৃষ্ণ! মহাতেজা! দিব্যবর্ষ সহস্রকম্।।
অতিষ্ঠস্ত্বমিহৈকেন পাদেন নিয়মস্থিতঃ।
লোকপ্রবৃত্তিহেতোস্ত্বমিতি ব্যাসোমামব্রবীৎ।।

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ। তুমি পূর্বকালে গন্ধমাদন পর্বতে দশহাজার বছরকাল যত্রসায়ংগৃহমুনি হয়ে বিচরণ করেছিলে। তুমি বিশাল বদরিকাশ্রমে ঊর্ধবাহু হয়ে বিচরণ করেছিলে, তুমি এগার হাজার বছর শুধুমাত্র জলপান করে পুষ্কর তীর্থে বাস করেছিলে। তুমি বিশাল বদরিকাশ্রমে ঊর্ধবাহু হয়ে বায়ু ভক্ষণ করে একপদে দাঁড়িয়েছিলে। তুমি সরস্বতীর তীরে উত্তরীয় বস্ত্র বিবর্জিত শিবাসঙ্কুল শীর্ণ শরীর হয়ে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করেছিলে এবং সাধুজন সেব্য প্রভাস তীর্থে গিয়ে নিয়ম অবলম্বন পূর্বক দেবতাদের পরিমিত সহস্র বৎসর একপদে অবস্থিত ছিলে ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনের এই কথা স্বীকার করে নিয়ে অর্জুনকে জানালেন —

নরস্ত্বমসি দুর্ধর্য হরিনারায়নোহহম্ কালো লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়নৌ ঋষী।

হে দুর্ধর্য! তুমি নর ঋষি এবং আমি নারায়ণ ঋষি। আমরা কালক্রমে এই লোকপ্রাপ্ত হয়েছি।

— হাঁ, আপনে ঠিকসে বর্ণন কিয়া। ওহি নর নারায়ণ ঋষি ইধরভি তপস্যা কিয়ে থে।

কিন্তু ঐ উদ্ধৃত শ্লোকে গন্ধমাদন পর্বত, পুষ্কর, প্রভাস, সরস্বতী তট, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তাঁদের তপস্যাস্থলীর নাম থাকলেও রেবাতটের ত নাম নেই।

— এই নান্দরিয়া মহল্লারই বহু প্রাচীন যুগে নাম ছিল বদরিকাশ্রম। বদরিকাশ্রম বলতে হিমালয়স্থ বদরীনারায়ণ ক্ষেত্রকে যেমন বুঝায়, তেমনি রেবাতটস্থ এই বদরিকাশ্রমকেও বুঝায়। তোমার সংশয় অপনোদনের জন্য স্নানরত মহল্লাবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। এই বলে তিনি সেই লোকগুলিকে নিজেই ডাক দিলেন। তাঁরা কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন — ভেইয়া, এহি নান্দরিয়া মহল্লেকো য্যায়সে নর-নারায়ণ তীর্থ কহা যাতা হ্যায়, ঐসাই দুসরা ঔর কোঈ নাম হৈ কি নেহি?

— হাঁ জী, ইসকা দুসরা নাম হৈ বদরিকাশ্রম।

আমি আর কোন কথা বাড়ালাম না! সেখানে মা নর্মদাকে প্রণাম করে তাঁদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। লক্ষ্মণভারতীজী কথায় কথায় জানালেন — ঔর দো মিল জানেসে মালথা মহল্লেমেঁ কোটেশ্বর তীর্থমেঁ পৌঁছ যাউঙ্গা। বেলা তখন পৌনে নটা বেজেছে। মোহান্তজী বললেন — নর-নারায়ণ প্রসঙ্গে আমি আরও কিছু বলছি শুন। পথ চলতে চলতে তীর্থ মহিমা বর্ণনা করলে জপেরই সমান হয়। আমার এই পৌরাণিক গল্প বাঙালীবাবার ভাল লাগবে না জানি, তবুও শোনাচ্ছি। বামন পুরাণের মতে নর ও নারায়ণ এই দুজন প্রাচীন ঋষি ধর্মের ঔরযে এবং অহিংসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা মহাভারতে বর্ণিত পূর্বোক্ত দুর্গম পর্বত এবং অরণ্যে বসে কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন। তাঁদের অমিত তেজ এবং তপোবলে ভীত হয়ে দেবতারা তাঁদের তপোভঙ্গের জন্য দুইজন অপ্সরা পাঠালেন। অপ্সরারা নানাভাবে প্রলুব্ধ করেও তাঁদেরকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারলেন না। বরং নারায়ণ ঋষি একটি করে ফুল নিয়ে উরুর উপর স্থাপন করা মাত্র একটি অপ্সরার আবির্ভাব ঘটল। ঋষির উরু হতে উৎপন্ন হল বলে তাঁর নাম হল উর্বশী। উর্বশীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরারা দুঃখে লজ্জায় মাথা হেঁট করল। শুধু তাই নয়, ঋষি নারায়ণ তদ্দণ্ডেই আরও কয়েকশত সুন্দরী অপ্সরা সৃষ্টি করে স্বর্গবেশ্যাদের পরিচর্যায় নিয়োগ করলেন। তিনি দেবতা প্রেরিত অপ্সরাদেরকে উর্বশীসহ সেইমাত্র সৃষ্ট অন্য অপ্সরাদেরকে নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অপ্সরারা ফিরে গেলেন স্বর্গে। ইন্দ্রাদি দেবগণের গর্ব খর্ব হল। নর নারায়ণ ঋষি দেবতাদেরকে প্রকারান্তরে বুজিয়ে দিলেন যে, দেবশক্তির চেয়ে তপোবলের মহিমা অনেক বেশী। এই নর ও নারায়ণই দ্বাপরের শেষ ভাগে অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বেলা ১০ টার কিছু পরেই আমরা কোটেশ্বর তীর্থে পৌঁছে গেলাম। সেখানে প্রণাম করে আবার পশ্চিম মুখে হাঁটতে লাগলাম নর্মদার ধারে ধারে। খুব উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে দেখে

আমি লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — এত দ্রুত আমাদেরকে হাঁটাচ্ছেন কেন?

— আপ নাহি জানতে হেঁ ঔর এক মিল জানেসে হমলোগ ব্যাসক্ষেত্রমে পৌঁছে জায়েগা। নর্মদাতটমেঁ ইসকো 'ব্যাসজীকা বেট ' কহা যাতা হ্যায়, দেখনেসে আপলোগোকোঁ পতা মিলেগা, ইয়ে ক্যায়সী মনোরম অত্যদ্ভুত স্থান হৈ। এক মাইল কতটুকুই বা সময় লাগে, দূর থেকেই দেখতে পেলাম নর্মদার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপের মত স্থান দেখা যাচ্ছে। সেই দ্বীপের দুই দিকে নর্মদার ধারা দুভাগ হয়ে বয়ে চলেছেন। শিঙা ডম্বরু বাজিয়ে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা এগিয়ে চলেছি। নর্মদার জলধারা যেন উপর থেকে নীচে আসছেন। স্রোত প্রচণ্ড। বেলা ১০টা ৪০ মিনিটের সময় আমরা ব্যাসক্ষেত্রে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী নর্মদা স্পর্শ করে বলতে লাগলেন — ভগবান বেদব্যাস তাঁর পিতা পরাশর মুনির পরামর্শে ওপারে নর্মদার দক্ষিণতটে থেকে ঘোর তপস্যা করে মহাদেবের দর্শন পান। তাঁর তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর একদিন অত্রি যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, অঙ্গিরা, আঙ্গিরস প্রভৃতি মহর্ষিরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে আসেন, বেদব্যাস মহর্ষিদেরকে পাদ্যার্ঘ্য নিবেদন করে তাঁদেরকে তাঁর আশ্রমে মা নর্মদার প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে বসলেন কিন্তু তাঁরা কেউ প্রসাদ গ্রহণে সম্মত হলেন না। তাঁরা জানালেন নর্মদার দক্ষিণতট রাক্ষসী ভূমি, উত্তরতট উত্তরাখণ্ডের মত পবিত্র। রাক্ষসী ভূমিতে তাঁরা সন্ধ্যাবন্দনাদি করতে পারেন না, সেইজন্য কিছু খাদ্য গ্রহণেও অপারগ। কেবল মা নর্মদার প্রসাদ বলে মাথায় ঠেকাবেন মাত্র। এই কথা শুনে ক্ষোভে দুঃখে ব্যাসদেব কাতর হয়ে মা নর্মদাকে আকুলভাবে ডাকতে থাকেন। মা নর্মদা দর্শন দিলে ব্যাস তাঁর আশ্রম যাতে উত্তরতটে হয় সেজন্য নিবেদন করেন। প্রথমতঃ মা নর্মদা ব্যাসের প্রার্থনা পূরণ করলেন না। হতাশ হয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত হলে শেষ পর্যন্ত দয়াময়ী মা ঋষির প্রার্থনা মত তাঁর আশ্রমটিকে মধ্যস্থলে রেখে দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে গেলেন। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার ফলে এই নর্মদা মধ্যস্থ দ্বীপকে ' ব্যাসের বেট ' বলা হয়। হিন্দী ভাষায় বটগাছ সমন্বিত ক্ষুদ্র দ্বীপের মত জল বেষ্টিত ভূ-ভাগকে 'বেট' বলা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে নর্মদার গতিপথ বদলের ফলে ব্যাসক্ষেত্র উত্তরতটে অবস্থিত হয়ে গেলে সমাগত ঋষিরা পরিতৃপ্ত অন্তরে ব্যাসপ্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব সাধন ক্ষেত্রে ফিরে যান।

মোহান্তজী বলে চললেন — 'ভাল করে তাকিয়ে দেখ এই অপূর্ব তপোবনটিকে। অশ্বত্থ বট আমলকী পাকুড় বিল্ব যজ্ঞডুমুর, শমী প্রভৃতি বৃক্ষে এই স্থান কেমন শোভা ধারণ করেছে। যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ তপস্বী সাধনা করে এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। ব্যাসের বেটের পূর্বধারায় জল বেশী আছে কিন্তু পশ্চিম ধারায় দিকে লক্ষ্য করে দেখ , এখানে জল অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। বর্ষাকাল ভিন্ন সকল সময়েই এখানে পদব্রজে আসা যায়, এখন শীতকাল আরম্ভ হয়েছে বলেই আমরা এখানে পদব্রজে আসতে পারলাম, বর্ষাকাল হলে নৌকায় আসতে হত। যদিও এই স্থানে বেটের মধ্যে তবুও উত্তরতট হিসাবে পরিগণিত হয় বলে প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীকে এখানে এসে ব্যাসেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে হয়। এখন সকলে চল এখানে পত্রপুষ্পাদি সংগ্রহ করে নিয়ে ব্যাসেশ্বরকে পূজা করি।'

ব্যাসেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গিয়ে দেখি প্রায় শতখানিক ভক্ত সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এইস্থান গুজরাটের মধ্যে একটি প্রধান তীর্থ বলে বহু যাত্রীর এখানে সমাগম ঘটে। নাগা সন্ন্যাসীদের শিঙ্গা ডম্বরুর বাদ্যের সঙ্গে হর নর্মদে ধ্বনি শুনে পুরোহিতজী মন্দির হতে

বেরিয়ে এলেন। সব মন্দিরেই পরিক্রমাবাসীদের অগ্রাধিকার। কাজেই পুরোহিতজী আমাদেরকে সর্বাগ্রে ব্যাসেশ্বরের পূজা করতে অনুমতি দিলেই মোহান্তজী সে সুযোগ নিতে রাজী হলেন না। তিনি প্রকাশ্যেই হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন — এই তপোভূমিতে কে যে গৃহী আর কে যে পরিক্রমাবাসী সাধু তা নির্ণয় করা কঠিন। কাজেই পুরোহিত মশাই আপনি এঁদেরকেই আগে পূজা করতে সুযোগ দিন, এঁদের পূজান্তে আমরা পূজা ও দর্শন করব। এখন সবেমাত্র এগারটা বাজতে যাচ্ছে। আমরা আজ এখানেই রাত্রিবাস করব। কাজেই কোন তাড়া নেই। তাঁর কথায় লক্ষ্মণভারতীজী বেশ উষ্মার সঙ্গেই বললেন — আমার ইচ্ছা ছিল আজ সিনোর পর্যন্ত যাবো। বেলা ২টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে যেতে পারতাম। এখানে যে থাকবেন কোথায় রাত্রিবাস করবেন!

— এই তরুতলে। এই বলে, মাথার উপরে বটগাছ দেখিয়ে দিলেন।

ব্যাসেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সামনেই এই গাছ। এই গাছের তলাতেই আমরা ঝোলা গাঁঠরী রেখে মন্দিরে পূজা করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম।

মোহান্তজীর মনোভাব বুঝতে পেরে লক্ষ্মণভারতীজী কুড়ুলাদি নিয়ে চার পাঁচজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে কাঠ কাটার উদ্দেশ্যে হাঁটিতে লাগলেন। মোহান্তজী উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, এখানে ত দণ্ডীসন্ন্যাসীদের নাগা সন্ন্যাসীদের এবং ব্রহ্মচারীদের জন্য অন্নক্ষেত্রের ব্যবস্থা আছে। তবে কাঠের কি প্রয়োজন?

— আপ্ একেলে যাকর্ অন্নক্ষেত্রসে ভোজন করকে আয়েগা। হমলোগ কোঈ যায়েগা নেহি। চাঁদোদসে ঝোলামে আটা বহন করতা হঁ। ঝোলামেঁ আটা রাখকর অন্নক্ষেত্রকা অন্নভোজন ক্যা সমীচীন হোগা? জাড়াকা কাল আ গয়ে। রাতমেঁ ধুনীকা জরুরৎ হ্যায় কি নেহি? এইবলে লক্ষ্মণভারতীজী হন্ হন্ করে চলে গেলেন। মোহান্তজী চুপ করে বসে মিটমিট হাসতে লাগলেন।

আমরা গাছতলায় বসে মন্দিরের মধ্যে ভক্তদের স্তোত্রপাঠ শুনতে পাচ্ছি। প্রায় আধঘন্টা পরেই লক্ষ্মণভারতীজী ফিরে এলেন। তাঁর হাতে কতকগুলি শ্বেতসুর্পণা শাক এক ভাঁড় ঘি আর নাগাদের মাথায় চার বোঝা কাঠের বাণ্ডিল। কিছুক্ষণ পরেই মন্দির থেকে পুরোহিত মশাই আমাদেরকে ডাক দিলেন পূজা করার জন্য। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরের মধ্যে ১০ জন প্রবেশ করলাম। মন্দিরের মধ্যে ঘি এর বাতি জ্বলছে। অদ্ভুত সুন্দর অর্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গ অর্ধাংশ সাদা এবং অর্ধাংশ পিঙ্গলবর্ণ। পুরোহিত মশাই বললেন — যে স্তবপাঠ করে ব্যাসদেব এখানে নর্মদার গতিপথ বদলে দিয়েছিলনে সর্বাগ্রে সেই মন্ত্রপাঠ করাই এখানকার বিধি। আপনারা আচমন করে পুষ্পপাত্র হতে তিনটি করে বিল্বপত্র হাতে নিন। আমি ব্যাসকৃত সেই মন্ত্র আপনাদেরকে পাঠ করাচ্ছি —

জয় ত্রিতাপবিমর্দিনি শূলকরে জয় লোকসমস্তক পাপহরে,
জয় যন্মুখসায়ক ঈশনুতে জয় সাগরগামিণি শম্ভুনুতে,
জয় দেবি সমস্ত শরীর ধরে জয় নাকবিদর্শিনি দুঃখহরে,
জয় ব্যাধি বিনাশিনি মোক্ষকরে জয় বাঞ্ছিতদায়িনি সিদ্ধবরে।
বাকপতির্নৈব ত বক্তুং স্বরূপং বেদ নর্মদে।
কথং গুণানহং দেবি ত্বদীয়ান জ্ঞাতুমুৎসহে॥

মা নর্মদে! তুমি ত্রিতাপনাশিনী, তুমিই অখিল লোকের পাপ হরণ করে থাক। তুমি ষড়াননের শায়ক-শক্তি, স্বয়ং শম্ভুও তোমাকে মান্য করে থাকেন। তুমি সাগরগামিনী, দেহিগণের দেহধারণ তোমার দয়াতেই সম্ভব হয়, তোমার প্রসাদেই সকলে স্বর্গপদ দর্শন করে, তুমি দুঃখহন্ত্রী, মোক্ষদাত্রী, ব্যাধিনাশিনী এবং সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদা। হে সিদ্ধেশ্বরি। তোমার জয় হোক, জয় হোক। তোমার স্বরূপ বর্ণনে বাক্‌পতিরও ব্যক্যস্ফূর্তি হয় না। অতএব আমরা কি সাহসে তোমার গুণানুবাদে সমুৎসুক হব?

মন্ত্রপাঠ করে আমরা স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্রে ব্যাসেশ্বরের পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করলাম। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে, আরও দশজন নাগা ঢুকলেন।

পূজা ও প্রণাম করে এসেই লক্ষ্মণভারতীজী আগুন জ্বেলে লিট্টি তৈরী করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। সকল নাগাদের পূজা যখন সমাপ্ত হল, তাঁরা গাছতলায় ফিরে এলে লক্ষ্মণভারতীজী মোহান্তজীকে বললেন, রান্না হতে অনেক দেরী আছে। আপনি এঁদেরকে অল্প কিছু দূরে কৈলাস দেখিয়ে আনুন। যে পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রান্নার আয়োজন করছিলেন, তাঁদেরকে দেখিয়ে লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — আমরা তিন তিনবার পরিক্রমাকালে ব্যাসক্ষেত্র দর্শন করেছি, কাজেই নূতন করে আর কৈলাস দেখার প্রয়োজন নাই। মোহান্তজী আমাদেরকে নিয়ে চললেন কৈলাসে। এই বেটের মধ্যেই এটি একটি জঙ্গলের ঘন ঝোপে এবং বড় বড় গাছে সমাকীর্ণ। তপোবন সুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে এমন এখানে সাত্ত্বিক পরিবেশ যে মন এখানে স্বতঃই শান্ত এবং স্থির হয়ে আসে, স্থানটির নামও কৈলাস, যথার্থ কৈলাস বলেই মনে হয়। এখানে একটি বড় গুহা আছে, সেই গুহার মধ্যে বিচিত্র বর্ণ ও বিচিত্র আকারের শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। মোহান্তজী বললেন — 'গুরুজীর মুখে শুনেছি, এইটাই ভগবান বেদব্যাসের সাধনক্ষেত্র।' আমরা এখানে প্রণাম করে প্রায় প্রায় ১৫ মিনিট কাল জপ করলাম। গাছের ছায়ায় ব্যাসেশ্বরের মন্দিরে আসার পথে রামচন্দ্র, বিষ্ণু লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মন্দির দেখলাম। স্থানে স্থানে ঝোপড়া করে অনেক দণ্ডীস্বামী এবং নাগা সাধুকে বাস করতে দেখলাম। বেলা ২টা নাগাদ আমাদের নিবাসস্থল সেই বটগাছের তলায় এসে পৌঁছালাম। লক্ষ্মণভারতীজী আমাদের জন্য লিট্টি প্রস্তুত করে ফেলেছেন। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে আমরা প্রসাদ পেলাম। গাছতলায় যে যার আসন পেতে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

মোহান্তজী বিশ্রম্ভালাপ করতে করতে বলতে লাগলেন, এই ছোট দ্বীপটি দেখলে মনে হয়, প্রবল বর্ষা বা প্রবল বন্যা হলে এস্থল ডুবে যেতে পারে। কিন্তু নর্মদাতে বড় বড় 'বাঢ়' (বন্যা) কম হয়নি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনই এই ব্যাসের বেট প্লাবিত হয়েছে বলে শুনিনি। নর্মদাতটে আমার ৫০ বৎসর কেটে গেল। এখানে সর্বত্র এমনকি বায়ুস্তরেও চিৎকণার প্রবাহ অহরহ প্রবাহিত হচ্ছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় রেবাখণ্ডের ৯৭ তম অধ্যায়ে বলেছেন —

ঋচা ঋগ্বেদজং পুণ্যং সাম্না সামফলং লভেৎ।
যজুর্বেদস্য যজুষা গায়ত্র্যা সর্বমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ এই তীর্থে ঋক্‌মন্ত্রে সমস্ত ঋগ্বেদ ফল, সামমন্ত্রে সমুদয় সামবেদ ফল যজুর্বেদ মন্ত্র জপে মানুষের অখিল যজুর্বেদ ফল লাভ আর একমাত্র গায়ত্রী জপে ঋগ্বেদাদি সমগ্র বেদের

ফললাভ হয়ে থাকে। কাজেই আমি তোমাদের সকলকেই বলছি, তোমাদের যে কোন বেদের যে কোন মন্ত্র জানা থাকলে তা আজ আচ্ছা করে মনন কর। মনন কর সর্বপ্রযত্নে, একাগ্রনিষ্ঠায়। লছমন ভেইয়া যেমন একবার গুরুদেবের সঙ্গে পরিক্রমা করতে এসে হাপেশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্রে তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, সেইজন্য এবারেও তোমরা দেখেছ তিনি হাপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি আমারও একবার গুরুদেবের সঙ্গে এই ব্যাসের বেটে এসে মহাদেবের মহিমা যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এইজন্য গঙ্গোনাথের মন্দির থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাইল এসেও আমি এখানে একরাত্রি বাস না করে যেতে পারলাম না। লছমন ভেইয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হলেও আমি জবরদস্তি এখানে থেকে গেলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — বাঙালীবাবা, তুমি ভগবান বেদব্যাস দৃষ্ট কোন বেদমন্ত্র জান কি ?

— বেদব্যাস দৃষ্ট কোন মন্ত্র আমার জানা নেই। তিনি বেদের বিভাগ করে বেদব্যাস নামে অভিহিত হয়েছিলেন, এইটুকু মাত্র জানি। তবে তাঁর পিতা পরাশর, পিতামহ শক্তি এবং প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব, সকলেই বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।

— ব্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাসদৃষ্ট কোন বেদমন্ত্র জপ করতে পারলে ভাল হত। তা যখন আমাদের জানা নাই, তখন ব্যাসের পিতা ঋষি পরাশরের দৃষ্ট একটি মন্ত্র গুরুদেব এইখানে আমাকে শিখিয়েছিলেন। সেইটি উচ্চারণ করছি শুন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৬৯ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিতে ঋষি পরাশর বলছেন, তোমরাও আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বল —

ওঁ শুক্রঃ শুশুক্কাঁ উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো না জ্যোতিঃ।
পরিপ্রজাতঃ ক্রত্বা বভূত ভুবো দেবানাং পিতা-পুত্রঃ সন্।। ১

অস্য মন্ত্রার্থ, হে অগ্নি! শুভ্রজ্যোতির্মণ্ডিত তনু তোমার, উষাপ্রেমিক সূর্যের মত দ্যাবাপৃথিবীকে তোমার জ্যোতিচ্ছটায় ভরে রেখেছ, পূর্ণত্ব দান করেছ তোমারই সুদীপ্ত জ্ঞানের শোভায় জগৎ পরিব্যাপ্ত। তুমি দেবতাদের পুত্রতুল্য হলেও তাঁরা তোমাকে পিতার মর্যাদায় বরণ করে নিয়েছেন।

বারবার এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এই 'বেটের' বাইরে তখনও সূর্যকিরণের আভা থাকলেও এই তপোবন সদৃশ স্থানে বটবৃক্ষের তলায় অন্ধকার নেমে এসেছে। আজ নর্মদার দুইদিকের ধারা হতেই ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে, শীতের কাঁপন লাগছে গায়ে। লক্ষ্মণভারতীজী ধূনী জ্বালাবার কাঠ সাজিয়ে ফেললেন। আমরা মন্দিরের পিছনে গিয়ে নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। মন্দিরে আরতি হবে, দলে দলে দণ্ডীস্বামী, নাগা এবং স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যাসেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে সমবেত হলেন। খুব ঘটা করে নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড সহকারে পুরোহিত মশাই আরতি করলেন। এখানকার তপস্যারত কয়েকজন নাগার দমকে দমকে শঙ্খধ্বনি এখানকার ভাবগম্ভীর পরিবেশে এক নূতন তান ও ছন্দ এনে দিল। কয়েকটি পঞ্চমুখী শঙ্খ ছাড়াও এমন কয়েকটি বড় বড় মতিশঙ্খ দেখলাম, যা এর আগে কোথাও দেখিনি। আরতি শেষ হতেই আমরা বটগাছের তলায় যে যার আসনে বসলাম। ধূনীতে আগুন দেওয়া হল, আমাদের সকলের কেন্দ্রস্থলে ধূনী জ্বলছে ; সকলের গায়ে ধূনীর তাপ লাগছে। সবাই জপে বসেছেন। রাত্রি বোধহয় ১০টার সময় আমরা জপ শেষ করে হর

নর্মদে ধ্বনি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি শোবার পূর্বে লক্ষ্মণভারতীজীকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলাম — মন্দিরে যে এতলোক দেখলাম, এঁরা কি সকলেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা?

— 'আলবৎ! ইয়ে 'বেট' সিদ্ধ তপোক্ষেত্র হ্যায়। সাধুয়োঁনে ইধর তপজপ গায়ত্রী পুরশ্চরণকে লিয়ে বহুৎসা আনাজানা করতেঁ হ্যায়।'

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, রাত্রি প্রায় একটার সময় মোহান্তজী ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। জেগে উঠতেই মোহান্তজী মন্দিরের দিকে আঙুল বাড়াতেই শুনতে পেলাম মন্দিরের মধ্যে হতে দীর্ঘঘন্টা নিনাদবৎ অবিচ্ছেদে প্রণবধ্বনি উঠছে; রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। ওঁকারের ধ্বনি রোমে রোমে ঝঙ্কাঁর তুলছে। মন্দির মধ্যস্থ সেই ধ্বনি স্তব্ধ হতেই দেখতে পেলাম মন্দিরের শীর্ষদেশ হতে উর্ধগামী ধূম্রকুণ্ডলীর মত তাল তাল অতি শুভ্র বাষ্পকুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেই শুভ্রকুণ্ডলীকে সাদা মেঘের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু এ যে প্রকৃত সাদা মেঘের কুণ্ডলী নয়, তা বুঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে অজস্র জ্যোতির কণা দেখে। মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ জোনাকী পোকা বাষ্পতালের সঙ্গে মিশে মুহুর্মুহু জ্বলছে আর নিভছে। মিনিট দুই এর মধ্যে তা মিলিয়ে গেল আকশে, 'বেটের' চতুর্দিক হতে ধ্বনি উঠল — হর নর্মদে হর! আমাদের নাগারাও সমস্বরে সহর্ষে ধ্বনি দিলেন — হর নর্মদে হর! কৈলাস দর্শন করতে গিয়ে আজ দুপুরেই যেখানে দণ্ডীসন্ন্যাসীদের ঝোপড়া দেখে এসেছিলাম সেইদিক থেকে স্তোত্রপাঠের শব্দ ভেসে আসছে —

একো রুদ্রো ন দ্বিতীয় যতস্তদ্ব্রহ্মৈবৈকং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ।
যদ্যপ্যব্যঃ কোহপি বা কুত্রচিদ্ বা ব্যাচষ্টাং তদযস্য শক্তির্মদগ্রে॥

এই মন্ত্র বেদব্যাসেরই স্বরচিত। তিনি শিবসত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিলোকবাসী মুনি এবং দেবতাবৃন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন, এ জগতে একমাত্র রুদ্র ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ নাই, রুদ্রই একমাত্র পরব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, যদি কেউ থাকেন, তিনি কে এবং কোথায়? আর তিনি কারই বা শক্তি, তা আমার সম্মুখে বলুন।

দণ্ডীস্বমীদের এই মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই পরপর তিনবার মতিশঙ্খ বেজে উঠল। মন্দিরের আরতির সময় নাগাদেরকে মতিশঙ্খ বাজাতে দেখেছিলাম। তাঁরা যে দিকটায় বাস করেন সে দিক থেকে একই ছন্দে স্তোত্রমন্ত্র ভেসে এল —

যঃ ক্ষীরাব্ধের্মন্দরঘাতজাতো জ্বালামালী কালকূটোহতিভীমঃ।
তং সোঢুং বা কোহপরোভূন্মহেশাদ্ যৎকীলাভিঃ কৃষ্ণতামাপ বিষ্ণুঃ॥

অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্র হতে মন্দরাঘাতে যে ভয়ংকর জ্বালাময় কালকূট বিষ উৎপন্ন হয়েছিল, যে বিষের তেজে স্বয়ং বিষ্ণুও কৃষ্ণবর্ণ হয়েছিলেন, মহেশ্বর ভিন্ন সেই বিষকে আর কেই বা সহ্য করতে সমর্থ হয়েছেন? ভাবার্থ এই যে, একমাত্র মহেশ্বরই একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই।

সমগ্র ব্যাসক্ষেত্রের বাতাবরণ বদলে গেছে। তপস্বীদের কণ্ঠ নীরব হলেও তাঁদের মন্ত্রধ্বনি যেন গুঞ্জরিত হয়ে বেড়াচ্ছে পত্রের মর্মরে মর্মরে। লক্ষ্মণভারতীজী ধূনীর আগুনে একটু উসকিয়ে দিলেন। গাছের পাতা হতে টপ্ টপ্ করে শিশির ঝরে পড়ছে। সকাল ৫টা বেজে গেলেও ঘন কুয়াশার জালে ঢাকা এই দ্বীপে বসে মনে হচ্ছে এখনও রাত্রি আছে। বন্যকুক্কুট

এবং কোকিলের ডাকে মুখরিত হয়ে উঠেছে এই তপোবন। মাথায় কম্বল ঢেকে সকলে বসে বসে জপ করছি। মন্দিরে যে অত্যদ্ভুত দৃশ্য কিছুক্ষণ আগে সবাই সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করলাম, তার কার্যকারণ রহস্য কিছুই উপলব্ধিতে ফুটল না। মতীন্দ্রজী জানালেন, তাঁর ঘড়িতে সাড়ে ছটা বেজেছে। এখনও সূর্যোদয়ের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মোহান্তজী উঠে পড়ে সকলকে ঝোলা গাঁঠরী গুছিয়ে নিতে বললেন। ধূনীর আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল। ব্যাসেশ্বরকে প্রণাম করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে বেট থেকে বেরিয়ে এসে আবার তটরেখা ধরে পশ্চিমমুখে যাত্রা করলাম। মোহান্তজী তাঁর লছমন ভেইয়াকে লক্ষ্য করে বললেন — কাল তুমি তিনবার ব্যাসের বেট দেখে গেছ। তাই এখানে রাত্রি বাসেও যেমন তোমার অনিচ্ছা ছিল, তেমনি এখানকার কৈলাস-কাননে যেতেও দরকার বোধ কর নি। এখন ত বুঝলে নর্মদা তীর্থে কোনও স্থান একবার দুবার তিনবার দেখলেও তা ফুরিয়ে যায় না। মা নর্মদার অনন্ত লীলা নিত্য-নূতনভাবে ব্যক্ত ও স্ফূরিত হয়ে চলেছে!

বেটের সম্মুখভাগে কৈলাস-কাননের পিছন হতে শুকতীর্থ দেখা যায়। শুকদেব সেখানে তপস্যা করতেন। ব্যাসদেব কৈলাস এবং বেটের যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে পুত্রের তপস্যাক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে পুত্রকে দেখতে চেষ্টা করতেন। শুকতীর্থ দক্ষিণতটে বলে আমাদেরকে দূর থেকে দর্শন করে ফিরে যেতে হচ্ছে। বেট থেকে মিনিট সাতেক হাঁটার পরেই আমরা প্রভাস তীর্থে এসে পৌঁছালাম। তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হচ্ছে। লক্ষ্মণভারতীজী জানিয়ে দিলেন যে, সূর্যপত্নী প্রভা স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা হয়ে মনের দুঃখে এখানে ঘোর তপস্যায় ব্রতী হন। তাঁর তপস্যার ফলে সূর্যের তেজ হ্রাস পেতে থাকে। শিবের আদেশে সূর্যদেব প্রভাকে সাদরে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। প্রভাকে লাভ করে সূর্য তাঁর পূর্ব তেজ ফিরে পান। মা নর্মদার দয়ায় প্রভা সূর্যসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বলে এই পুণ্যস্থল তীর্থের মর্যাদা পেয়েছে। সূর্যপত্নী প্রভা এখানে যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে তপস্যা করেছিলেন, তাঁর নাম প্রভাসেশ্বর। এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলেছেন — অন্যানি যানি তীর্থানি কালে তানি ফলন্তি বৈ। প্রভাসেস্তু রাজেন্দ্র সদ্যঃ কামফলপ্রদঃ অর্থাৎ অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে তা কালে ফলদ হয় কিন্তু প্রভাসেশ্বর সদ্য কাম্যফল প্রদান করে থাকেন।

এখানে নর্মদা স্পর্শ করে প্রভাসেশ্বরকে প্রণাম করে প্রায় ১০ মিনিট হাঁটার পরেই সংকর্যণ তীর্থে এসে পৌঁছালাম। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন যে এই স্থান চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির পুত্র যদুর যজ্ঞস্থল। যযাতি শুক্রাচার্যের অভিশাপে অকালে জরাগ্রস্থ হলে তিনি তাঁর প্রথমা পত্নী দেবযানীর গর্ভজাত পুত্র যদুকে এই জরা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। যদু তা প্রত্যাখ্যান করায় যযাতির পত্নী শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু পিতার জরা গ্রহণ করেন। জৈষ্ঠ্য পুত্র যদু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় রাজা যযাতি পুত্রকে অভিশম্পাত করেন। যদু পিতৃশাপ হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এখানে নর্মদাতটে এসে অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র উক্থ্য এবং বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রাহ্মণদেরকে প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। যজ্ঞফল এবং ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে অবশেষে যদু পিতৃ অভিশাপ থেকে মুক্ত হন। যজ্ঞস্থলের যজ্ঞবট এখনও জীবিত আছে। আমরা সেই যজ্ঞবট দেখতে গেলাম। বিশাল বটগাছ, তার মোটা

মোটা ঝুরি মাঠিতে প্রবেশ করেছে। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন, মূল বটগাছের কাণ্ড নষ্ট হয়ে গেছে, মোটামোটা ঝুরি কয়েকটিই যা বেঁচে আছে। এখানে মাটি খুললে এখনও যজ্ঞভস্ম পাওয়া যায়। মোহান্তজী জানালেন যে বলরামজী তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে এই যজ্ঞবটের মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। সেইজন্য তাঁর নামানুসারে এই তীর্থের নাম হয়েছে সংকর্ষণ তীর্থ। এখানে শুক্লা একাদশী তিথিতে মধুদ্বারা মহাদেবের অর্চনা করা বিধি।

যজ্ঞবটকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে আমরা প্রায় আধ মাইলটাক হাঁটার পরেই বড়কাল গ্রামে এসে পৌঁছালাম। এখানে বহু লোকজনের বসতি চোখে পড়ল। মাঠভরা ফসল এবং ক্ষেতি-খামার দেখে বুঝা গেল এই গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ। এইখানে আমাদের দলের অনেকেই প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলেন। মতীন্দ্রজী জনালেন — মাত্র সকাল ৮টা বেজেছে। এখানকার ঘাটে অনেক শিখা উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে স্নান ও তর্পণ করতে দেখছি। একজনকে ডেকে রতনভারতীজী আলাপ করতে জানা গেল যে, এই বড়কাল গ্রামে বহু বেদজ্ঞ ও কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণদের বাস। বড় বড় পণ্ডিতদের গৃহে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের জন্য চতুষ্পাঠী আছে। তাঁরা বহু ছাত্রকে গৃহে রেখে অধ্যাপনা করে থাকেন। আধঘন্টা পরেই আমরা এখান থেকে দু'মাইল হেঁটে গিয়ে নর্মদাতটের ঝাঁঝর গ্রামে পৌঁছালাম। এটি একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামে ঢুকে প্রথমেই একটি সুন্দর বাঁধান ঘাট পেলাম। ঘাটের উপরেই অশ্বত্থ, আমলকী এবং বিল্ববৃক্ষের সমারোহ চোখে পড়ল। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষে একটি রেশমী কাপড়ের ধ্বজা টাঙ্গানো আছে, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষে অনেক ডুরি বাঁধা আছে। মোহান্তজী বললেন — এই তীর্থের নাম জনকেশ্বর তীর্থ। মহারাজ জনক এখানে তপস্যা করে বহু দান ধ্যান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম — এখানে কোন্ জনক তপস্যা করতে এসেছিলেন? মিথিলার সকল রাজাই ত জনক উপাধিধারী। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই বংশে ৫৬ জন রাজা রাজত্ব করে গেছেন, প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল জনক। বাল্মীকির রামায়ণে অবশ্য দুজন জনকের নাম পাওয়া যায়। একজন মিথির পুত্র, যিনি উদাবসুর পিতা, অন্যজন হ্রস্বরোমার পুত্র, সীতার পিতা, যাঁর প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। মা জানকীর পিতা সীরধ্বজ কি এখানে তপস্যা করতে এসেছিলেন।

— না। যিনি মহারাজ মিথির পুত্র মিথিলার সিংহাসনে প্রথম জনক, তিনিই এসেছিলেন নর্মদাতটে তপস্যা করতে ! তাঁরই একটু বিশদ পরিচয় আমার কাছে শুনে নাও। জনক বংশের আদিপুরুষ ছিলেন নিমি, যিনি নিজের দেহের মাংস দিয়ে শোনের হাত থেকে আশ্রয়প্রার্থী আর্ত কপোতকে রক্ষা করেছিলেন। সেই অসাধারণ দাতা নিমি একবার বশিষ্ঠকে ত্যাগ করে যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। এতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাপ দেন। তখন উপস্থিত অন্যান্য ঋষিরা নিমির দেহ পূজা করে মন্থন করতে আরম্ভ করেন। সেই মথিত দেহ হতে এক পুত্র জন্মায়। সেই পুত্রের নাম হয় মিথি। বিচেতন দেহ থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর আর এক নাম হয় বৈদেহ। মিথি রাজার নাম হতেই রাজ্যের নাম হয় মিথিলা। এই মিথির পুত্র প্রথম জনক এই জনকেশ্বর তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা।

এর আগের গ্রাম বড়কাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা অধ্যুষিত হলেও সেখানে পরিক্রমাবাসীদেরকে স্বাগত জানাতে কেউ আসেনি; কিন্তু এই ঝাঁঝর গ্রামে দেখলাম নাগাদের শিঙ্গা, ডম্বরুর শব্দ

শুনে অনেক নরনারী শাঁখ বাজাতে বাজাতে পুষ্প অর্ঘ্য হাতে নিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে এসেছেন। আমরা জনকেশ্বর ঘাট হতেই এই গ্রামেরই শেষ প্রান্তে এক হ্রদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের নিকটে উপস্থিত হলাম। বহু প্রাচীন পাথরের মন্দির, চাঁরদিকে জল, মোহান্তজী বললেন — এই হল মন্মথেশ্বর মন্দির। মহাদেবের কোপদৃষ্টিতে মন্মথ অর্থাৎ মদন ভস্মীভূত হওয়ার পর মন্মথ ছায়া দেহ অবলম্বন করে এখানে এসে তপস্যা করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ। এই মহাদেবকে দর্শন করার উপায় নাই, কারণ তিনি জলের মধ্যে ডুবে আছেন। হ্রদের জল স্পর্শ করে, প্রণামান্তে আবার হাঁটতে লাগলাম নর্মদার তট ধরে। প্রায় আধমাইলটাক হাঁটার পরেই আমরা অনুসূয়া মাতার স্থানে এসে পৌঁছালাম। এখানকার দৃশ্য মনোরম। এখানে বৎসরে দুবার মেলা বসে; তখন গুজরাটের বহু দূর দূরান্ত গ্রাম হতে বহু লোকের সমাগম ঘটে। মোহান্তজী এই তীর্থ প্রসঙ্গে বললেন — আদিযুগে ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ঋষি স্বীয় পত্নী অনুসূয়াকে পুত্রলাভের জন্য নর্মদা তীরে তপস্যা করতে পাঠান। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনেই বর দেন এবং তিনজনের বরে তিন পুত্র হয়। ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় এবং শিবের অংশে দুর্বাসা মুনি উৎপন্ন হন। এখানে পূজা ও তপস্যা করলে স্ত্রীলোকের পুত্র প্রাপ্তি ঘটে।' অনুসূয়া মাতার স্থানে যাত্রীদের খুব ভীড় দেখলাম। বহুলোক নানা কামনা নিয়ে মাকে পূজা দিতে এসেছেন। এখানে ভক্তদের যে প্রণামী পড়ে সেই আয় থেকেই বরোদার মহারাজা একটি বড় কুষ্ঠাশ্রম করে দিয়েছেন। শুনলাম এখানে কুষ্ঠরোগীদের সুচিকিৎসার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। একটা বড় বট গাছ আছে, তার তলায় বসে কিছু লোককে গায়ে মাটি মাখতে দেখলাম। মোহান্তজী জানালেন যে তারা সবাই কুষ্ঠরোগী, অনুসূয়া মাতার আশীর্বাদে অঙ্গে এই মাটি লেপন করলে কুষ্ঠরোগ হতে মুক্তি হয়। অনুসূয়া মাতার স্থান বড়ই জাগ্রত। এখানে ধ্যান জপ করলে শীঘ্রই মায়ের কৃপা অনুভব করা যায়।

ঝাঁঝর গ্রাম থেকে পাকা দু'মাইল রাস্তা হাঁটা হয়ে গেল। অনুসূয়া মাতার স্থানে প্রণাম করে আমরা মিনিট দশেক হাঁটার পরেই দেখলাম একটি নদী বিন্ধ্যপর্বতের দিক হতে গর্জন করতে করতে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এখানে পৌঁছে সকলেই আবেগের সঙ্গে প্রণাম নিবেদন করতে করতে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নর্মদা মাতাজীকী জয় হো, এরণ্ডী মাতাজীকী জয় হো, হর হর শংকর মহাদেও ধ্বনি দিতে লাগলেন। মোহান্তজী ঘোষণা করলেন — এহি পুণ্যস্থান মেঁ হমলোগ আভি নাহায়েগা।'

তাঁর কথা শুনে আমরা ঝোলা গাঁঠরী রেখে সকলেই স্নান করতে নামলাম। স্নান করতে করতে মোহান্তজী বলতে লাগলেন — প্রাচীনকালে গোবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে স্বামীরই সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর একটি শিশুপুত্র ছিল, গোবিন্দ পত্নী সেই শিশুর দিকেও বেশী দৃষ্টি দিতেন না। পতি চিন্তাতেই মত্ত থাকতেন। মার্কণ্ডেয়জী রেবাখণ্ডের ১০৩ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন একদিন সেই গোবিন্দনামা ব্রাহ্মণ একটি গো-শকটে কাষ্ঠভার নিয়ে গৃহে প্রত্যবর্তন করলেন। দূর থেকে স্বামীকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর এবং ক্লান্ত শ্রান্ত দেখে তাঁর পত্নী তাঁর সেবা পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। গোবিন্দের কোন সহকারী ছিল না। তিনি গো-শকট গৃহ প্রাঙ্গণে রেখে কাঠের বোঝা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। এদিকে তাঁর শিশুপুত্রটি কখন যে হামাগুড়ি দিতে

দিতে গাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, গোবিন্দ তা লক্ষ্য করেন নি। তাঁর নিক্ষিপ্ত কাটের বোঝা পড়ে শিশুটি নিহত হল। তাঁর পত্নী এই নির্মম ঘটনা লক্ষ্য করলেও ক্লান্ত স্বামীকে তা জানালেন না। স্বামীকে সেবা ও পরিচর্যা করতে লাগলেন। সেই রাত্রেই গোবিন্দের গায়ে ক্ষত হয়ে বড় বড় কৃমি জন্মাল। সকালে উঠে গোবিন্দ সন্তানের খোঁজ নিতে গিয়ে পত্নীর কাছে সব জানতে পারলেন। পুত্রশোকে কাতর হয়ে উভয়েই হাহাকার করতে লাগলেন। পত্নী গোবিন্দকে বললেন — পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি,

কীর্তনাৎ নশ্যতে ধর্মো বর্ধতেহসো নিগূহনাৎ।
ইহলোকে পরে চৈব পাপস্যাপ্যেবমেব চ॥

অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানের কীর্তন বা প্রচার করলেই তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সম্যক গোপন করতে পারলে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কি ইহলোক কি পরলোকে ধর্মের কীর্তন এবং গোপনে যেমন উপচয় ও অপচয় হয়, পাপেরও সেই রকমই ব্যবস্থা অর্থাৎ পাপেরও কীর্তনে ক্ষয় ও গোপনে বৃদ্ধি হয়ে থাকে। পুত্র হত্যার অপরাধে আপনার গাত্রে সদ্য সদ্যই দূষিত ক্ষত ও কৃমি উৎপন্ন হয়েছে। আমার মানসিক যন্ত্রণাও ততোধিক; চলুন যাই এই দণ্ডে এই পুত্রশূন্য গৃহ ত্যাগ করে নর্মদার তটে তটে আমাদের পাপের কথা লোকের কাছে নিজমুখে ঘোষণা করতে করতে যাই। এই বলে তাঁরা উভয়ে নিজেদের পুত্র হত্যার জঘন্য বিবরণ লোকের কাছে বলতে বলতে এই এরণ্ডী সংগমে এসে গায়ের জ্বালা জুড়াবার জন্য জলে নামলেন। স্নান করে উঠেই দেখলেন, ব্রাহ্মণের দূষিত ক্ষত ও জঘন্য কৃমিকুল সম্পূর্ণভাবে শরীর থেকে দূর হয়ে গেছে। পুণ্য রেবা-এরণ্ডীর জল ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলল। তাঁরা বুঝলেন, পুত্র হত্যার পাপ বিদূরিত হয়েছে। সেইদিন থেকে এই রেবা-এরণ্ডী সংগম হত্যাহরণ তীর্থ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এখানে স্নান করলে পুত্র হত্যা, ভ্রূণ হত্যার পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তাঁর গল্প শেষ হলে আমরা সূর্যার্ঘ্য দান ও তর্পণাদি করে সংগম হতে উঠে এলাম।

আমরা বস্ত্রাদি পরিধান করে আবার হাঁটতে লাগলাম। তখন বেলা সওয়া এগারটা বেজেছে। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই সুবর্ণশিলা নামক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে সুবর্ণবর্ণ রঞ্জিত একটি বড় রকের উপর সুবর্ণবর্ণেরই এক সুন্দর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে দেখলাম। লক্ষ্মণভারতীজী এখানে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেই আমাদেরকে বলতে লাগলেন — 'ইয়ে সুবর্ণশিলা তীর্থ হৈ। যহাঁ প্রাচীনকালমেঁ অনেক ঋষি ঘোর তপস্যা করতে থে। শিবজীনে উনকী পরীক্ষার্থে বড়ী সুন্দরী সুবর্ণশিলা সুকুমারী বনাকর ভেজা। কিন্তু ঋষিয়োঁ কা চিত্ত বিচলিত নহীঁ হুয়া। তভ উসী শিলাকে স্থানমেঁ শিবলিঙ্গ প্রকট হো গয়া।'

আমরা শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে সকলেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম। আবার যাত্রা সুরু হল, প্রায় আধমাইলটাক হেঁটে যাবার পরেই আমরা অম্বালী নামক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। মোহান্তজী বললেন, এখানে নর্মদার দৃশ্য দেখ। মা নর্মদা যতই সমুদ্রের নিকটবর্তী হচ্ছেন, ততই তাঁর রূপ ও প্রবাহধারার গতি-প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। সমুদ্রে মিলিত হবার জন্য মায়ের যেন আর তর সইছে না। এই অঞ্চলে দেখে এলে ত কত কাছাকাছি সব তীর্থ গড়ে উঠেছে। যতই এগিয়ে যাবে দেখবে এখানে নর্মদার প্রতিঘাটেই তীর্থ, প্রত্যেক স্থানই

দেবস্থান এবং কারও না কারো তপস্যা ক্ষেত্র। এই অম্বালী গ্রামের সামনে বাঁধানো ঘাট দেখা যাচ্ছে, কাশীরাজের মধ্যম পুত্রী অম্বিকা উত্তম পতিলাভের জন্য মা নর্মদার তপস্যা করেছিলেন। মা নর্মদার আশীর্বাদেই তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পিতা বিচিত্রবীর্যকে স্বামীরূপে লাভ করেছিলেন। অম্বিকা এখানে অম্বিকেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ঘাটের উপরেই মন্দির। আমরা অম্বিকেশ্বরকে প্রণাম করে কিছুদূরেই বালব্রহ্মচারী করঞ্জ ঋষির তপস্যাস্থলে পৌঁছে করঞ্জেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে পাঁচমিনিট হেঁটে ভরতেশ্বরের মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। বিশাল মন্দির। দরজা বন্ধ। বেলা ১২ টা বাজতে মাত্র তিন মিনিট বাকী। এত বেলায় পুরোহিতের দর্শন আশা করা যায় না। অনেক আগেই তিনি পূজাপাঠ সেরে চলে গেছেন। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে এসে মন্দিরে দরজা খুলে ভরতেশ্বরকে দর্শন করলাম। মোহান্তজী বললেন — মহারাজ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভারতসম্রাট ভরত এখানে একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং পাঁচটি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই ভরতেশ্বর মহাদেব।

সেখান থেকে দশমিনিট হেঁটে যাবার পর আমরা নাগেশ্বর তীর্থে পৌঁছালাম। এখানে শিবমন্দিরের নাম নাগেশ্বর মহাদেব। মন্দিরে মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করে মোহান্তজী আমাদেরকে জানালেন যে ত্বষ্টা-ঋষির পুত্র পুণ্ডরীক নাগ ইন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে এখানে তপস্যা করে মা নর্মদার বরে শাপমুক্ত হয়েছিলেন। এই তীর্থ দর্শন করলে জীবনে আর সর্প-দংশনের ভয় থাকে না।

এই সময় দেখা গেল, প্রায় কুড়ি বাইশ জন সন্ন্যাসী হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁদের দলের অগ্রবর্তী সাধুকে দেখেই লক্ষ্মণভারতীজী মন্দির থেকে নেমে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। যাবার সময় মোহান্তজীকে বলে গেলেন, এই নাগেশ্বর তীর্থ পুণ্ডরীক নাগেরই নয়, খগম ঋষি এবং রুরু ঋষিরও তপস্যাক্ষেত্র, সে কথা এঁদেরকে বলুন।

মুঝে ইয়াদ নাহি আতা হৈ। আপ্ কহিয়ে।

— হম আকর বাতায়েঙ্গে, ওহি সাধুয়োঁকা দলমেঁ মেরি এক পুরাণা দোস্তকা দেখাই দেতা হৈ। উনকা সাথ থোড়া বাৎ চিৎ করকে অভি আতা হুঁ।

পাঁচ সাত মিনিট কথা বলে আসার পরেই লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন — বাঙালীবাবার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে। ঐ সাধুরা আদিত্যেশ্বর মন্দির থেকে সংকল্প উঠিয়ে তাঁদের রুণ্ডা পরিক্রমা বিমলেশ্বর মন্দিরে গিয়ে সমর্পণ করবেন বলে পনের দিন ধরে হরিধানে গিয়ে বসেছিলেন কিন্তু পূষণ গিরি ওঁদেরকে নৌকার চিঠি দেন নি বলে কোন নৌকাই ওঁদেরকে সমুদ্র পার করে বিমলেশ্বরে নিয়ে যেতে রাজী হয় নি। তাই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। জেলাধীশের সঙ্গে পূষণ গিরি এমনই এক পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন যে, তাঁর দস্তখৎ করা চিঠি ছাড়া কোন সরকারী নৌকাই পরিক্রমাবাসীদেরকে বিনা শুল্কে সংগম পার করাবে না। মাঝিদেরকে টাকা দিলে তারা খেয়া পার করবে কিন্তু তাতে বহু টাকা তারা দাবী করে বসে। সরকারী নৌকায় ত্রিশজনের বেশী নেয় না। ঐ সাধুদের কাছে বেশী টাকাও নাই। ওঁরা পূষণ গিরির চিঠিও দেখাতে পারেন নি তাই ১৫ দিন সংগমক্ষেত্রে

অপেক্ষা করে করে সেখানেই পরিক্রমা সমর্পণ করে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা ত সোজা ভারোচ যাবো, কাজেই পূষণ গিরির তোয়াক্কা আমরা করি না। কিন্তু বাঙালী বাবাকে ত দক্ষিণতটে যেতেই হবে, সেইজন্য ভাবছি বাঙালী বাবা ত খুবই ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। আমার দোস্তের কাছেই শুনলাম, পূষণ গিরির গুরু পাথর গিরি মহারাজ ত বিকট মহাত্মা ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনিও পরিক্রমাবাসীদেরকে নানা বিকট প্রশ্ন করে নাজেহাল করতেন, পরিক্রমাবাসীদের উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে তাঁদের চুটি কেটে জোর করে নর্মদা অতিক্রম করিয়ে পরিক্রমা খণ্ডন করাতেন কিন্তু পূষণ গিরির প্রশ্নের ধারা নাকি আরও বিকট। পাথর গিরি মহারাজের সে সব প্রশ্ন কালক্রমে সাধু পরম্পরা জানাজানি হয়ে যাবার ফলে পূষণ গিরি তাঁর প্রশ্নের ধারা বদলেছেন। এইজন্য সাধুমহলে পূষণ গিরি পাষাণ গিরি নামে নিন্দিত হচ্ছেন।

— ক্ষেত্র কর্ম বিধীয়তে। পূষণ গিরির মুখোমুখি হয়ে বোঝাপড়া করা যাবে। এখন তুমি এদেরকে খগম ঋষি এবং রুরুর বিবরণ দিয়ে সৌভাগ্য সুন্দরীর ক্ষেত্রে পৌঁছে যাই চল।

লক্ষ্মণভারতীজী আমাদেরকে বলতে লাগলেন — খগম একজন সত্যব্রতধারী তপোনিষ্ঠ ঋষিকুমার। সহস্রপাদ নামে এক ঋষিপুত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। একদিন সহস্রপাদ ঠাট্টার ছলে একটি ঘাসের তৈরী সাপ দেখিয়ে খগমকে ভয় দেখান, তাতে তিনি ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞানলাভের পর তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সহস্রপাদকে অভিশাপ দেন যে তাকে ডুণ্ডুভ অর্থাৎ ঢোঁড়া সাপে পরিণত হতে হবে। পরে সহস্রপাদের কাতর অনুনয়ে করুণার্দ্র হয়ে বর দেন যে প্রমতির পুত্র রুরুমুনির দর্শন লাভ করলে সে আবার স্বশরীর প্রাপ্ত হবে।

প্রমতি ছিলেন মহর্ষি চ্যবন ও সুকন্যার পুত্র। তাঁর পুত্র রুরু। মহর্ষি স্থূলকেশীর পালিতা কন্যা প্রমদ্বরা ছিলেন রুরুর প্রণয়িনী। রুরুর সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই এক বিষাক্ত সর্পের দংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু হলে রুরু নিজের অর্ধেক আয়ু দিয়ে তপোবলে প্রমদ্বরাকে বাঁচিয়ে তুলেন। তারপর তিনি সর্পকুলের উপর রুষ্ট হয়ে একের পর এক সাপকে দেখা মাত্রই বধ করতে থাকেন। একদিন তিনি এক ডুণ্ডুভ সাপকে বধ করতে উদ্যত হতেই সে বলতে থাকে যে, সে সত্যব্রতধারী ঋষি খগমের বন্ধু। তাঁর অভিশাপেই সে ডুণ্ডুভে পরিণত হয়েছে। সত্যনিষ্ঠ খগমের বাক্য মিথ্যা হয় না। সে বর দিয়েছে আপনার দর্শন পেলেই আমি শাপ মুক্ত হব। সব কথা শুনে রুরু ডুণ্ডুভকে আশীর্বাদ করেন। ডুণ্ডুভ স্বশরীর প্রাপ্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যান। এইসব ঘটনা নর্মদাতটের এই নাগেশ্বর মন্দিরেই ঘটেছিল।

তীর্থের মহিমা শোনার পর প্রণামান্তে আমরা দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের বাঁদিকে নর্মদা বয়ে চলেছেন। ডান দিকে শাল, মহুল, হরীতকী, বাঁশ পিয়াল বেল বট কদম্ব প্রভৃতি গাছের সারি। গ্রামের মধ্যে কোঠাবাড়ীও দেখা যাচ্ছে। মাঠে মাঠে ধান জোয়ার ও ভুট্টার চাষ হয়েছে। স্বচ্ছতোয়া খরস্রোতা নর্মদার শোভাও যেমন সুন্দর লাগছে তেমনি ঐসব গাছের সৌন্দর্যও কেবলই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এই সব স্থান তপস্যার উপযুক্ত। মাইল খানিক হাঁটার পরেই বেলা প্রায় একটার সময় আমরা একটি সমৃদ্ধ গ্রামে এসে পৌঁছালাম, নর্মদাতটেই একটি সুদৃশ্য মন্দির চোখে পড়ল। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — এই গ্রামের নাম কঞ্জেঠা, ঐ মন্দিরে বিরাজিত আছেন সৌভাগ্য সুন্দরী মাতাজী। গুজরাটের জনসাধারণ এই

দেবীকে খুবই জাগ্রতা বলে মনে করেন। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। একটি পাথরের বেদীতে কতকগুলি জ্যামিতিক চিহ্ন, বৃত্তবেষ্টিত একটি ত্রিকোণ এবং তিনটি বীজ ক্ষোদাই করা আছে। তার মধ্যে হ্রীং বীজটিই কেবল পড়া যাচ্ছে, আর সমগ্র বেদীটি সিঁদুরে লিপ্ত। বেদীটি এবং তার মধ্যে ক্ষোদিত চিহ্নগুলি দেখে মনে হচ্ছে এটি একটি সিদ্ধ যন্ত্র। নাগারা শিঙ্গা, ডম্বরু বাজিয়ে মন্দির পরিক্রমা করলেন। পরিক্রমা করে আমরা যখন প্রণাম করছি , তখন লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন যে, এই পরম পবিত্র স্থান যোগেশ্বরী খ্যাতিদেবীর তপস্যা ক্ষেত্র। ইনি ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে বিবাহ হবার পর বহুকাল তাঁর কোন পুত্র কন্যাদি হয় নি। বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীর পরামর্শে খ্যাতি দেবী তখন নর্মদা তীরের এখানে এসে তপস্যা করে লক্ষ্মী নামে কন্যা এবং ধাতৃ ও বিধাতৃ নামে দুই পুত্র লাভ করেন। দানধর্মের মহিমা এখানে খুব বেশী।

মন্দির হতে কিছুদূরেই একটি একতলা পাকাবাড়ী আছে। বাড়ীর গায়ে লেখা আছে 'সাধুনিবাস'। সাধুনিবাসের পাশেই আছে অন্নক্ষেত্র। লছমনভারতীজী আমাদেরকে 'সাধুনিবাসে' নিবাসে গিয়ে তুললেন। নাগাদের শিঙ্গা ডম্বরুর শব্দ এবং 'হর নর্মদে' ধ্বনি শুনেই কয়েকজন লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। সাধুনিবাস এবং অন্নক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক এসে 'সাধুনিবাসের' তালা খুলে আমাদের থাকার বন্দোবস্থ করে দিলেন। মোহান্তজীকে প্রণাম করে সসম্ভ্রমে জানালেন — পরিক্রমাবাসীদের সেবা পরিচর্যার জন্য এখানে সব ব্যবস্থা আছে। আপনারা দয়া করে বিশ্রাম করুন, ঘন্টাখানিকের মধ্যে আপনাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা করছি। তত্ত্বাবধায়কের বিনম্র ও সশ্রদ্ধ বাক্যে মোহান্তজী খুবই তুষ্ট হলেন বলে মনে হল। সাধুনিবাসে ঝোলা গাঁঠরী রেখে আমরা মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। বেলা দুটার সময় তত্ত্বাবধায়ক জনা আষ্টেক ব্রাহ্মণ যুবককে সঙ্গে নিয়ে ছটি 'বড়' ডেক্চী শালপাতায় ঢেকে 'সাধুনিবাসের' হলঘর পরিষ্কার করে আমাদেরকে ভিক্ষা দিলেন গরম খিঁচুড়ী, তার সঙ্গে একটা শাকের তরকারী এবং ঘি। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমাদের ভোজন পর্ব সমাপ্ত হল।

বিশ্রাম করতে করতে আমি ভাবতে লাগলাম পূষণ গিরির পরীক্ষার কথা। আমার মনে পড়ছে মহাত্মা প্রলয়দাসজীর কথা। তিনি ওঁঙ্কারেশ্বরেই পূষণ গিরির পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেছিলেন। মা নর্মদার যা ইচ্ছা তাই ঘটবে। পাঁচটা বাজতেই মোহান্তজী আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সৌভাগ্যসুন্দরী মাতাজীর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। আমরা মন্দিরের বাইরে গাছতলায় বসে রইলাম নর্মদার দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যা হতে না হতেই পুরোহিত এসে আরতি সুরু করলেন। মন্দিরের আরতি দেখবার জন্য অনেক নর-নারীর সমাবেশ ঘটল। এদেরকে এই কঞ্জেঠা গ্রামের অধিবাসী বলেই মনে হল; তাঁরা বোধ হয় নিত্যই আরতি দেখতে আসেন, আমার এই অনুমানের কারণ পুরোহিতমশাই যখন আরতি সুরু করলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই সমস্বরে পাঠ করতে লাগলেন —

দর্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্নখচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্য মাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

অর্থাৎ মাগো, তোমার দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণ ও বিচিত্র রত্নে খচিত দর্বী, বাম হস্তে সুমিষ্ট চরুপূর্ণ পাত্র অবস্থিত; তুমি সৌভাগ্য-বিধাত্রী, ভক্তবাঞ্ছিত ফলপ্রদায়িণী, কটাক্ষে মঙ্গল বিধায়িণী, কাশীপুরীর অধীশ্বরী কৃপাময়ী মা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা। তুমি আমাদেরকে ভিক্ষা দাও।

মন্ত্র শুনেই বুঝতে পারলাম এতো আদি শংকরাচার্য রচিত বিখ্যাত অন্নপূর্ণা স্তোত্রম। শংকরাচার্য সর্বপ্রথম যখন কাশীধামে উপস্থিত হন, তখন তিনি কাশীশ্বরী মা অন্নপূর্ণার দিব্যরূপ দর্শন করে তাঁর কণ্ঠ নির্গত এই স্বতঃস্ফূর্ত মন্ত্রে বন্দনা করেছিলেন। বুঝতে পারলাম এখানে নর্মদাতটে যাঁকে সৌভাগ্যসুন্দরী নামে অভিহিত করা হচ্ছে, তিনি স্বরূপতঃ মা অন্নপূর্ণা। আরতি শেষ করেই পুরোহিতমশাই নিকটস্থ নর্মদা ঘাটে গিয়ে কর্পূর জ্বেলে আরতি করলেন।

প্রণাম করে আমরা ফিরে এলাম সাধুনিবাসে। সবাই জপে বসলেন। রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ সকলের সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হলে আমি মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্রেও এরণ্ডী-সংগম দেখে এসেছি। সেখানেও শুনে এসেছি এরণ্ডীর সন্নিহিত বিন্ধ্যপর্বতের গুহায় মহর্ষি অত্রি এবং সতী অনুসূয়ার সাধনগুহা আছে। মাতা অনুসূয়া পুত্রলাভের কামনায় তপস্যা করেছিলেন সেখানে। আবার এখানেও এরণ্ডী সংগম দেখে এলাম। এখানকার এরণ্ডী এবং সেই এরণ্ডী কি একই? এরণ্ডী নদী কি সেখানে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগম সৃষ্টি করে এখানে এসেও দ্বিতীয়বার সংগম সৃষ্টি করেছেন? এখানে আসার পথে এরণ্ডীর কাছেই মাতা অনুসূয়ার স্থান দেখলাম। আপনারা বললেন, পুত্রলাভের জন্য মাতা অনুসূয়া তপস্যা করে এখানে সোম দত্তাত্রেয় এবং দুর্বাসাকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। একই গল্প সেখানেও শুনে এসেছি। মাতা অনুসূয়া তাহলে কোথায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন? কোথায় তপস্যা করে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল? শূলপাণির ঝাড়িতে হিরণ্যপাণির মন্দিরকে সূর্যতীর্থ বলা হয়, এমনকি সেখানে সূর্যমন্ত্রে মহাদেবের অর্চনা করা বিধি। আদিতেশ্বর মন্দির ও সূর্যতীর্থ মুণ্ডমহারণ্যের মধ্যেও এক রবিতীর্থ দেখে এসেছি। চাঁদোদের কাছে জলশায়ী তীর্থের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়েও আপনারা বলেছিলেন যে তালমেঘাদি দৈত্যকে বধ করে নারায়ণ সেখানে নর্মদার জলে সুদর্শন ধৌত করে সেখানে শয়ন করেছিলেন — আমার কথা শেষ হতে না হতেই মোহান্তজী বললেন — আগামীকাল সিনোরে পৌঁছেও চক্রতীর্থ নামে আর এক তীর্থের বর্ণনাকালে শুনতে পাবে যে দৈত্য বধ করে নারায়ণ সেখানে তাঁর চক্র ধৌত করেছিলেন। গরুড়েশ্বরের কাছে কুমারেশ্বর তীর্থ দেখে এসেছ, সেইরকম সিনোরে পৌঁছেও আর একটি স্কন্দতীর্থ দেখতে পাবে।

আমি তাঁর কথা সোৎসাহে লুফে নিয়ে বলতে লাগলাম, কর্ণালীর কাছে যেমন পাবকেশ্বর তীর্থ দেখেছি, এইরকম আরও অন্ততঃ দুটি অগ্নিতীর্থ দর্শন করেছি মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতেও। দক্ষিণতটেও গিয়ে হয়ত একই দেবতার নামে ডবল ডবল তীর্থ দেখতে পাব। তাহলে ব্যাপারটা কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, হয় একই দেবতা নর্মদার বিভিন্ন স্থানে তপস্যা করেছিলেন নতুবা একই দেবতার নাম নিয়ে মুনি-ঋষি বা ভক্তরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তীর্থ সৃষ্টি করে গেছেন। নর্মদা তীর্থের একস্থানে কোন দেবতা বা ঋষির সিদ্ধিলাভ ঘটলে তিনি সিদ্ধকাম হয়ে ফিরে যান। বিশেষতঃ দেবতারা তাহলে নর্মদার অন্যান্য ঘাটে তাঁদের খাওয়া থাকা এবং পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে যুক্তি কোথায়?

মোহান্তজী বললেন — বৈদিক ঋষি বা দেবতাবৃন্দের তপস্যাই হল প্রাণ। নর্মদার একতীর্থে সিদ্ধিলাভ অন্যান্য ঘাটে গিয়ে সেই তপস্যার ফল আস্বাদন করতে বাধা কোথায়? শাপমুক্তি কর্মপাপমুক্তি ঘটার পর পূর্ণ আনন্দের স্ফুরণে কৃতকৃত্য হয়ে তাঁরা এই পাবন-তীর্থের বিভিন্ন স্থানে মা নর্মদার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃও কিছুকাল কাটিয়ে যেতে পারেন। তার ফলেই নর্মদার উভয়তটে একই নামে বিভিন্ন তীর্থ গড়ে উঠতে পারে। নর্মদাতটের প্রত্যেকটি তীর্থই সত্য, প্রত্যেকটিই পাপমোচনকারী এবং তপস্যার অনুকূল স্থান, এবিষয়ে কারো মনে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়।

আমরা শুয়ে পড়লাম। আজ এখানে লক্ষ্মণভারতীজী ধুনী জ্বালেন নি। ফলে শীতের জন্য ঘুম ধরতে দেরী হল। কম্বল জড়িয়ে কোনমতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে অতিরিক্ত কুয়াশার জন্য মোহান্তজী বাইরে বেরোতে দিলেন না। কুয়াশার আস্তরণ কেটে যেতেই সকলে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে যে যার ঝোলা গাঁঠরী ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মাতা সৌভাগ্যসুন্দরী এবং নর্মদাকে প্রণাম করে। মতীন্দ্রজী ঘড়ি দেখে মোহান্তজীকে জানালেন যে সাড়ে সাতটা বেজেছে। নাগারা শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে চলেছেন, মাঝে মাঝেই হর নর্মদে ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। নর্মদার বিস্তার যেন ক্রমেই বাড়ছে। প্রায় মাইলখানেক রাস্তা হেঁটে আসার পরেই আমরা দাবাপুর নামক এক মহল্লায় এসে উপস্থিত হলাম। নর্মদার ঘাটেই এক মন্দির। অনেক লোকজনের ভীড়। কিছু দূরে দোকান পসার বসে গেছে। তিন চারটি মোটর গাড়ীও দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্মণভারতীজী এই তীর্থের মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন — ইয়ে ধনদেশ্বর তীর্থ হৈ। যহাঁ ধনদ কুবেরজীনে তপস্যা করকে দেবোঁ কা কোষাধিকার,পুষ্পক বিমান ঔর অলকাপুরী প্রাপ্ত কী। য়হ তীর্থ বিশেষ কর বৈশ্যোঁ কা হৈ। জিসকা দিবালা নিকল গয়া হো ইয়া ব্যাপারমেঁ ঘাটা হো যঁহা তপজপ করনেসে তৎকাল ফল মিলতা হৈ। দীপাবলীমেঁ ইধর বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ। নিত্যপূজা করনেবালে কী ধনবৃদ্ধি হোতী হৈ। আমরা ভিড় কাটিয়ে ধনদেশ্বর মন্দিরে প্রণাম করে এগিয়ে চললাম।

মন্দিরের চত্বরে অনেক সম্ভ্রান্ত ও স্থূলোদর ব্যক্তিকে রুদ্রাক্ষমালায় জপ করতে দেখলাম। আমি মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলাম এঁরা কি গুজরাটের শেঠ, দেউলিয়া হয়ে ধনদেশ্বরের কৃপায় ভাগ্য পরিবর্তন করতে এসেছেন।

— হ্যাঁ হ্যাঁ তাছাড়া আবার কি ?

লক্ষ্মণভারতীজী মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটলেন — এখানে সারাদিন রাত থেকে আমাদের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করলে হত না?

— চুলোয় যাক ধনবৃদ্ধি। আর আধঘন্টা পরেই আমাদেরকে পূষণ গিরির সম্মুখে গিয়ে পড়তে হবে। আমাদের ত কোন ভাবনা নাই, আমি ভাবছি বাঙালী বাবাকে নিয়ে। পূষণ গিরি কি যে ঝঞ্ঝাট পাকাবে, তা বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম — আপনি এত ভাবনা করছেন, মা নর্মদার দয়ায় এতদূর যখন আসতে পেরেছি, বাকী পথও তিনি নিশ্চিন্তে পার করে দিবেন। এই যে দাবাপুর গ্রামে কুবেরের তপস্যা ক্ষেত্র দেখে এলাম, তিলকবাড়া অতিক্রম করে কর্ণালীর সোমেশ্বর তীর্থের কিছু আগেও ত কুবেরেশ্বরের তীর্থ আছে। সেখানেও ত আপনারা জানিয়ে ছিলেন সেটিও

কুবেরের তপস্যা ক্ষেত্র। আমি হাণ্ডোয়াতেও উত্তরতটে সিদ্ধিনাথ দর্শন করেছি , সেখান থেকে দক্ষিণতটেও ঋদ্ধিনাথের মন্দিরে ধ্বজা দেখে এসেছি। সেখানে উভয়তটেই নাকি কুবের তপস্যা করেছিলেন বলে শুনে এসেছি। এক কুবের তাহলে ত নর্মদাতটের বহুস্থানেই তপস্যা করেছিলেন?

— হ্যাঁ জী! উনোনে কিয়ে থে, উসমেঁ ক্যা হরজা?

তাঁর মেজাজ ভাল নাই দেখে আমি চুপ করে গেলাম। মিনিট পাঁচেক পরেই লক্ষ্মণভারতীজী ঘোষণা করলেন — ইয়ে হ্যায় সিনোর। ইসকো সেনাপুর মহল্লে ভী কহতে হৈ। বিদুরজীনে ইধর ঘোর তপস্যা কিয়ে থে। য়হাঁ আটতীর্থ মুখ্য হৈ — ধূতপাপেশ্বর, মার্কণ্ডেয়শ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, কেদারতীর্থ, ভোগেশ্বর, উত্তরেশ্বর, চক্রতীর্থ ঔর রোহিণেশ্বর তীর্থ।

মোহান্তজী তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে নিয়ে নর্মদা স্পর্শ করিয়ে মা নর্মদা, মহাদেব এবং বিদুরজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে বললেন — এইসব বিকট মহাত্মাকে তুমি চেন না, তাঁরা যা জিজ্ঞাসা করবেন শান্ত মনে উত্তর দিবে। কত কষ্ট করে মানুষ পরিক্রমা করে, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল উত্তরতটে কি যে কষ্ট তাতো নিজেই দেখেছ। এঁরা অতকষ্টের পরিক্রমাকে সামান্য দোষত্রুটি ধরে খণ্ডন করে দেন, এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি থাকতে পারে।

— তাঁদেরকে এই ঠিকেদারী করার ভার কে দিয়েছেন, মা নর্মদা, না, গুজরাট সরকার তা কি পূষণ গিরিকে প্রশ্ন করতে পারি?

— না, না, উলটা পালটা কথা কিছুতেই বলবে না, আমার হুকুম।

হাসতে হাসতে বললাম — না, না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শান্ত মনেই উত্তর দিব। আপনি বারবার তাঁদের বিকট পরীক্ষা সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী দেওয়ায় আমি নার্ভাস বোধ করছি, আমার স্নায়ুর উপর চাপ পড়ছে। যাইহোক, আপনি কিছু ভাববেন না।

দূর থেকে কতকগুলি তাঁবু দেখতে পাচ্ছি , প্রত্যেক তাঁবুর মাথায় কতকগুলি শ্বেত পতাকা উড়ছে। রাস্তার দুধারেই বড় বড় তাঁবু। শিঙ্গা, ডম্বরু বাজাতে বাজাতে আমরা তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছতেই পাঁচজন বিকট চেহারার ভস্মাচ্ছাদিত নাগা বেরিয়ে এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। দেখে মনে হল একজন যেন কালান্তক যমদূত !

মোহান্তজী তাঁদেরকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — হমারা নিশান সে আপ্‌কো জরুর পাতা চলতা হৈ , হম্‌লোগ মহাত্মা কমলভারতীজীকো মণ্ডলেশ্বর আখড়া সে ইধর পধারেঁ। হম্‌লোগ ভারোচ যাতা হুঁ। আপ্‌কো গুরুজীকো হমারা বারেমেঁ সমাচার দিজিয়ে। প্রায় দশমিনিট পরেই একটা লাঠিতে ভর দিয়ে একজন জটাজুট শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃদ্ধ নাগা সামনে এসে দাঁড়ালেন। মোহান্তজীকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন — স্বাগতম্ স্বাগতম্! হমারা বহুৎ সৌভাগ্য হৈ, আপকো আজ দর্শন কী মোকা মিলি। আপ হমারা গুরু মহারাজজীকে আস্থান মণ্ডলেশ্বরকী আদমী হ্যায়, আজ আপকো হম্ ছোড়ুঙ্গা নেহি। ইধরই আপকো ভিক্ষাকা অঙ্গীকার করনেই পড়েগা।

— আপকো ইধর ঠারেঙ্গে জরুর। আপ্ পহেলে হমারা দো চার বাৎ শুন লিজিয়ে। হমারা নাগা লোগোঁকা লিয়ে নৌকাকী চিঠিকো কোঈ জরুরৎ নেহি। হম্ উস্ তরফ যায়েঙ্গে নেহি। সিধা ভারোচমেঁ পৌঁছেঙ্গে। লেকিন্ হমারা সাথমেঁ ইয়ে বাঙালী বাবা 'জলহরি'

পরিক্রমাকী শপথ লেকর্ পরিক্রমা করতে হেঁ। ধর্মপুরী সে এলোগ্ হমারা আখড়ে কে সাথ হ্যায়।

— লেকিন মহারাজ ইনকো ত হমলোগ্ থোড়াসা পরীক্ষা করেঙ্গে। অব্ আপ্ বিশ্রাম করিয়ে এক ঘন্টাকা বাদ ইন্‌কো হম্ বুলা লেঙ্গে।

এই বলে তিনি একজন নাগাকে ডেকে আমাদেরকে সাত আট নয় নম্বর তাঁবুতে নিয়ে যেতে বললেন। চারদিকেই নাগাদের ভীড়। প্রায় দেড়শ দুশো নাগা।

পূষণ গিরিজীকে খুব ভয়ংকর বলে মনে হল না। তাঁর 'এক' নাগা শিষ্য আমাদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। আমরা পর পর তিনটি তাঁবুতে গিয়ে যে যার আসন পাতলাম। সকাল ৯টায় আমরা এখানে পৌঁছেছিলাম। এখন ১০ টা বেজে গেছে। আমরা সবাই স্নান তর্পণাদির জন্য নর্মদার ঘাটে নামলাম। নর্মদা থেকে আসার পরেই একজন নাগা এসে খবর দিলেন — বাংলা মুলুক সে যো আদমী আয়া উনকো গুরুজীনে তলব কিয়া। মোহান্তজী দোভাষী হিসাবে কাজ করার জন্য মতীন্দ্রজীকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে পূষণ গিরির কাম্পে এসে ঢুকলেন। কাম্পের মুখে দুজন নাগা ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। পূষণ গিরিজী উঠে দাঁড়িয়ে মোহান্তজীর হাত ধরে বসালেন। বললেন — আপ্ কেঁও তকলিফ উঠায়া। মালুম হোতে হৈ আপ ইন লেড়কাকো বহুৎ পিয়ার করতা হৈ।

মোহান্তজী কোন উত্তর দিলেন না। আমি তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' বলে বসলাম। কাম্পের ভিতর তাকিয়ে দেখলাম — পাথর গিরি মহারাজের এক বিশাল তৈল চিত্র পত্র পুষ্প দিয়ে শোভিত। পাশেই একটি বিদুরেরও ফটো আছে। ছবিটিতে একটি পর্ণকুটীর। কুটীরের দ্বারে বসে তিলক ও কণ্ঠী ধারণ করে বিদুরজী যেন খঞ্জনী বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করছেন।

পূষণ গিরিজীর হাতের কাছেই একটি ছোট চৌকীতে রেশমের কাপড় পাতা, তার উপর রয়েছে একটি তাম্রপাত্রে কতকটা খুদ কুঁড়া জাতীয় জিনিষ।

গুরুমহারাজের ইঙ্গিতে তাঁর এক চেলা আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

১ম প্রশ্ন — আপ্ কেঁও পরিক্রমা কররহা হো?

উত্তর — বড়ই বিচিত্র প্রশ্ন। বৈদিক ঋষি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেবতারাও নর্মদা পরিক্রমা করে থাকেন আত্মশুদ্ধি এবং তপোবৃদ্ধির জন্য। যিনি নর্মদাতীরে তপস্যা করেন নি তাঁর পক্ষে সিদ্ধি লাভ সুদূর পরাহত। আবহমানকাল ধরে ভারতের ঋষিরা বলে আসছেন, নর্মদা পরিক্রমা নিজেই একটি পরিপূর্ণ তপস্যা। আমি অবশ্য তপস্যা করতে আসিনি। আমার ঋষি পিতা ব্রহ্মলীন হওয়ার পর মনের জ্বালা জুড়াবার জন্য নর্মদার অভয় ক্রোড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছি। বাবার নির্দেশও ছিল, 'শিবপুত্রী নর্মদার কূলে কূলে পরিক্রমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে জানবি।' বিপন্ন পুত্র কেন মায়ের পায়ে এসে আকুল হয়ে আছড়ে পড়বে, এই রকম বিচিত্র প্রশ্নের কি কোন জবাব দেওয়া যায়?

আমার উত্তর শুনে দেখলাম প্রশ্নকর্তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

২য় প্রশ্ন — বিপন্ন? ক্যায়সে তুম বিপন্ন হো গয়ে থে? বিবরণ দিজিয়ে।

উত্তর — আমি, আপনি, আপনার গুরুমহারাজ এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় এই মোহান্তজী মহারাজ আমরা সবাই বিপন্ন। ত্রিতাপ দগ্ধ জীব মাত্রই অনুক্ষণ বিপদের মধ্যে থাকতে বাধ্য

হন। ত্রিতাপ দগ্ধ জীব, ত্রিতাপ মুক্ত শিব।

এইবার দেখলাম স্বয়ং পূষণ গিরি মহারাজের মুখ চোখও থমথমে হয়ে উঠল। তিনি আমাকে তৃতীয় প্রশ্ন করলেন — পরিক্রমা করনেকে লিয়ে আপকো কোন্ ভেজা?

উত্তর — পিতাজী।

৪র্থ প্রশ্ন — পহেলে ত আপনে কহা আপ্‌কো পিতাজী চোলা ছোড় দেনে কি বাদ শোকসন্তপ্ত হো কর্ নর্মদা মেঁ আগয়ে, শান্তি কে লিয়ে। আপকো পিতাজী ক্যা স্বপনমেঁ কহা থা?

উত্তর — জী হাঁ।

৫ম প্রশ্ন — হম্ কহতে হৈ, উহ বিলকুল ঝুট বাত। স্বপনমেঁ যো দেখা যাতা হৈ, উহ, সদৈব সচ্ নেহি হো সকতে হৈ।

উত্তর — পরিক্রমাবাসীদের প্রথম শপথ, নর্মদার তীরে মিথ্যা বলতে নাই, কোন ঘটনারই অতিরঞ্জন বা অনুরঞ্জন করতে নাই। আমি খাঁটি কথাই বলছি নর্মদা মা সাক্ষী। স্বপ্ন মাত্রই যদি মিথ্যা হয়, তাহলে পাথর গিরি মহারাজের জীবনীতে যে আছে, মা নর্মদা স্বপ্ন দিয়ে নাকি তাঁকে পরিক্রমাবাসীদেরকে পরীক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং আজও আপনারা যে সেই ধারার অনুবর্তন করে চলেছেন, সেই স্বপ্ন বৃত্তান্তও কি বিলকুল ঝুট্?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন — আপনে কাঁহা হমারা গুরুজীকী পুণ্যজীবন চিত্র পড়া হৈ?

উত্তর — মণ্ডলেশ্বরে। আপনার গুরুজীর যেখানে মূল আখড়া সেখানেই মণ্ডলেশ্বর মহাদেব মন্দিরে আমি দুদিন ছিলাম পুরোহিতজীর বাড়ীতে। তাঁর বাড়ীতেই ঐ বইটি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

উত্তর শুনে পূষণ গিরিজীর মুখে চোখে স্পষ্টতঃই প্রসন্নতা কিঞ্চিৎ ফুটে উঠেছে দেখলাম। আমি এক পলকের জন্য, মোহান্তজীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম তাঁর দৃষ্টিতে বেদনার ভাব ফুটে উঠেছে। 'সকাল থেকে পড়ালাম 'ক' সন্ধ্যাবেলায় দন্ত্য-স,' শুনলে যেমন ভাব হয়, তার মুখ চোখেই সেইরকম ভাব।

৭ম প্রশ্ন — আপনে পরিক্রমা কাঁহাসে উঠায়া? কোন বিধিসে? কিসকা সাথ পরিক্রমা উঠায়ে থে সমুচা বাতাইয়ে।

উত্তর — আমি 'জলেহরি' পরিক্রমার শপথ বাক্য পাঠ করে নর্মদা-উদ্‌গম মন্দিরের কোটিতীর্থের ঘাট হতে পরিক্রমা উঠিয়েছিলাম মা নর্মদা ও অমরকন্টকেশ্বর মহাদেবের পূজার্চনা এবং কড়াই প্রসাদ নিবেদন করে। মহাত্মা শঙ্করনাথজীর তত্ত্বাবধায়কত্বে আমি তাঁর দলের সঙ্গেই পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলাম দক্ষিণতট ধরে। কিন্তু কপিলধারাতে আমি পড়ে গিয়ে জলপ্রপাতের টানে আমি উত্তরতটে টানা হয়ে যাই, সেই থেকে আমি উত্তরতট ধরেই পরিক্রমা করছি।

৮ম প্রশ্ন — বাতাইয়ে মোহান্তজী, ইস্‌মেঁ ইনকো পরকরমা খণ্ডিত হো চুকা কি নেহি?

উত্তর — মোহান্তজী বললেন— নেহি জী ইস্‌মে পরকরমা খণ্ডিত নেহি হুয়া। যব গির গিয়া থে উস বখৎ উনোনে বেহোঁস হো গয়ে থে। হমারা বিচারমেঁ ক্ষুদ্ নর্মদামায়ী আপনা মর্জিসে উনকো উত্তরতটমেঁ লে গয়ে থে। ইসমে পরকরমা খণ্ডিত হোনেকা কোঈ সওয়াল নেহি।

৯ম প্রশ্ন — এক মিনিট চুপ থেকে তিনি আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন — আপ শোনা কি নেহি , পরকরমা কী এ্যায়সাই বিধি হ্যায়, মাতাজীকো ডাইনা তরফ রাখকে পরকরমা করনা চাহিয়ে। দক্ষিণতটসে আকর উত্তরতটমেঁ আনেসে দোনো তরফ মাতাজী ডাহিনা তরফমেঁই হরবখৎ বিরাজ করতেঁ হৈ। লেকিন আপ্ বাঁয়া তরফ মাতাজীকো রাখ কর পরকরমা কর রহা হৈ। ক্ষুদ্ কহিয়ে ইস্‌মে আপকা পরকরমা খণ্ডিত হুয়া কি নেহি?

উত্তর — আমার বিচারে পরিক্রমা খণ্ডিত হয় নি। কারণ আমি কখনও মনে করি না যে এই দুর্গম মহা ভয়ংকর অরণ্যপথে পরিক্রমা করার কোন সামর্থ্য বা যোগ্যতা আমার আছে। আমি কেবল মাকে প্রণাম করতে করতে এতদূর এগিয়ে আসছি। শিশু যখন মাকে প্রণাম করে, সে মায়ের ডানদিকেই প্রণাম করুক, বাঁদিকেই করুক, সামনেই করুক আর পিছনেই করুক, সর্বাবস্থায় মা তাঁর সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করে থাকেন। আমিও সেইরকম পরিক্রমা করতে করতে মাকে বলতে বলতে যাচ্ছি 'নমো নমোহস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।' মাগো তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করছি, তোমাকে পুনঃ পুণঃ প্রণাম করছি ; অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব,' ঐয়ি সর্বাত্মা জননি, তোমার সম্মুখে প্রণাম করছি, তোমার পিছনে প্রণাম করছি, তোমাকে সকল দিক হতেই প্রণাম করছি। এই প্রণামই আমার পূজা, এই প্রণামই আমার পরিক্রমা।

১০ম প্রশ্ন — আপ্ শাস্ত্রানুসারে চাতুর্মাস্য কিয়া কি নেহি?

উত্তর — চাতুর্মাস্য বলতে যদি আষাঢ় মাসের শুক্লাপ্রতিপদ হতে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষার চারমাস যদি একস্থানে বাস করা বুঝায়, তাহলে ত আমি দুটি মাত্র চাতুর্মাস্যের কাল পেয়েছি। ১৯৫২ সালে আমি অমরকন্টক হতে পরিক্রমা আরম্ভ করি। তখন সে বৎসরের চাতুর্মাস্যের সময় আর ছিল না, ১৯৫৩ সালের বর্ষাকাল কাটিয়েছি মুণ্ডমহারণ্য অতিক্রম করার পর মান্দালায়, এই বৎসরের ১৯৫৪ চাতুর্মাস্য শেষ করেছি ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির ধাবড়ী কুণ্ডে মহাত্মা একলিঙ্গস্বামীর আশ্রমে। চাতুর্মাস্যের নিয়মানুসারে ঐসময় একস্থান হতে অন্যস্থানে আসন উঠাতে নাই। কড়াই ভোগ ও হালুয়া মা নর্মদাকে নিবেদন করে আবার যাত্রা সুরু করতে হয়। তাতো প্রতি বর্ষান্তেই করতে হয়েছে, তবে পয়সার অভাবে সব চাতুর্মাস্যকালে ভোগ নিবেদন সম্ভব হয় নি। আমি নিঃস্ব অবস্থাতেই পরিক্রমা করছি। প্রথম যখন কোটীশ্বর তীর্থ হতে পরিক্রমা উঠাই তখন বাড়ী থেকে আসার সময় যে পয়সা এনেছিলাম তা সেখানে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ভোজনে সব নিঃশেষ করে দিই। তারপর নিঃস্ব অবস্থাতে, কড়াই প্রসাদ মা নর্মদাকে নিবেদন করব কি করে। এতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে হয়েছে। মা নর্মদা বিচার করে বুঝবেন যে চাতুর্মাস্য বিধি সন্ন্যাসীর কৃত্য, তাঁর এই অযোগ্য সন্তান আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নি। কাজেই সন্ন্যাসীর নিয়ম আমার প্রতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

একাদশ প্রশ্ন — আপনে ত হর তীর্থমেঁ মহাদেও কো পূজা জরুর কিয়া? কোন বিধিসে কিয়া? কোন রীতিসে?

উত্তর — আমাকে ওঁকারেশ্বরের এক প্রাচীন মহাত্মা মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাদেবের ১০০৮ নাম পাঠ করে মহাদেবের পূজা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি তাঁর সেই নির্দেশ মতই পূজা করে আসছি।

দ্বাদশ প্রশ্ন — উন্ মহাত্মাজীকী ক্যা নাম হ্যায়?

উত্তর — নাম প্রকাশ করতে তাঁর নিষেধ আছে।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন — আপ মহর্ষি তণ্ডিকৃত স্তবরাজ কো পহেলী ঔর আখেরি মন্ত্র শুনাইয়ে ত, তব সমঝেগা আপ ঠিক রীতিসে পূজা কিয়া।

উত্তর — এই স্তবরাজ মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে আছে।

সেই স্তবরাজের প্রথম মন্ত্র —

ওঁ স্থিরঃ স্থাণুঃ প্রভুর্ভীমঃ পূবয়ো বরদো বরঃ।
সর্বাত্মা সর্ববিখ্যাতঃ সর্বঃ সর্বকরো ভবঃ॥ ৩১

আর শেষ মন্ত্র — ব্রতাধিপঃ পরং ব্রহ্ম ভক্তাণাং পরমাগতিঃ।
বিমুক্তো মুক্ত তেজাশ্চ শ্রীমান্ শ্রীবর্ধনো জগৎ॥ ১৫২

আমার উত্তর শুনে পূষণ গিরিজী তাঁর চৌকীর উপর তাম্রপাত্রস্থিত এক চিমটি সেই খুদ কুঁড়া নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন — ইয়ে বিদুর তীর্থমেঁ বিদুরজীকো পরসাদী, মুঁহ্ মে ডাল লিজিয়ে। আমি তাঁর প্রসাদ হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকালাম, বললাম, আপনার সম্মানের জন্য এই প্রসাদ মাথায় স্পর্শ করছি। একে আমি বিদুরের প্রসাদ বলে মানছি না। শুধু আপনার এই ক্যাম্পের মধ্যস্থিত ছবিটিতে নয়, সারা ভারতেই বিভিন্ন স্থানে বিদুরকে ভিক্ষোপজীবী তুলসী মালার কণ্ঠীধারী একজন নিতান্ত কাঙাল বৈষ্ণব হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। আমাদের বাংলাদেশেও বৈষ্ণবদের অপপ্রচারের ফলে অধিকাংশ বাঙালী বিশ্বাস করেন যে দরিদ্র বৈষ্ণব বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে নিজের জীর্ণ কুটীরে বসিয়ে খুদ কুঁড়া দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। কিন্তু মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বিদুরের অন্য চিত্র, অন্য পরিচয় পাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা বিদুর মহারাজোচিত ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করতেন। তিনি কদাপি খুদ কুঁড়া ভোজী নিঃস্ব দরিদ্র ছিলেন না। বহু প্রচলিত 'বিদুরের খুদ কুঁড়া' নামক প্রবাদ বাক্যের মূলে কোন সত্য নাই। মহাভারতে পাই, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ শান্তির দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে গেলে তিনি অতিথি হিসাবে বিদুরের রম্যগৃহে বাস করেছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বসবার জন্য সাদরে এক সুবর্ণ-নির্মিত অতিশ্রেষ্ঠ সর্বতোভদ্র নামক আসন স্থাপন করেছিলেন, নিজেও সেই রকম মহামূল্য আসনে উপবেশন করেছিলেন। স্বয়ং বেদব্যাস বর্ণনা দিয়েছেন —

বিদুরো মণিপীঠে তু শুক্লস্পর্ধ্যাজিনোত্তরে।
সংস্পর্শন্নসেনং সৌরেমহামতিরুপাবিশৎ॥

(উদ্যোগপর্ব ৯৪ অধ্যায় ৫১ শ্লোক।)

অর্থাৎ কৃষ্ণের আসন স্পর্শ করে অবস্থিত মণিপীঠে এবং শুক্লবর্ণ অতি মহার্ঘ্য চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত আসনে বিদুর উপবেশন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিদুর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে এবং তার সাথী সাত্যকি ও কৃতবর্মা প্রভৃতি উপস্থিত সমূহ ব্রাহ্মণকেও উপাদেয় পরম স্বাদিষ্ট বহুমূল্য অন্নপানাদি দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন—

ততঃ ক্ষত্রান্নপানানি শুচীনি গুণবন্তি চ।
উপাহরদনেকানি কেশবায় মহাত্মনে॥

(উদ্যোগপর্ব, ৯১ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক।)

মহাভারতের ঐ বর্ণনা হতেই প্রমাণিত হয় বিদুর তিলক কাঁধারী দীন দরিদ্র বৈষ্ণব ত ছিলেনই না, তিনি কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ এবং পঞ্চপাণ্ডবের পূজিত ও অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হস্তিনাপুরে অতি সমৃদ্ধ অবস্থাতেই বাস করতন। হস্তিনাপুরীর বর্হিভাগে জরাজীর্ণ পর্ণকুটীরে বিদুরের বাস সম্বন্ধে সারাভারত জুড়ে যে ভুল ধারণা বিদ্যমান তার মূলে কোন সত্য নাই। আজকাল উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মীরাট জেলায় গঙ্গাতটের কাছাকাছি এক স্থানকে প্রাচীন হস্তিনানগরীর অবস্থান বলে নির্দেশ কর যায়। আমার ছাত্রজীবনে একবার সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি, সেখান কিছু বৈষ্ণব সধু একটি পর্ণকুটীর দেখিয়ে বলেন — এইটিই ছিল বিদুরের আশ্রম। সেখানে প্রতিবৎসরইসারা ভারত হতে দলে দলে ভক্ত গিয়ে সেই পর্ণকুটীর দর্শন করেন এবং সেই পর্ণকুটীরে রক্ষিত, আপনার এই তাঁবুতে যেমন আছে , সেই রকম খুদ কুঁড়াকে 'বিদুরের খুদ কুঁড়া' মনে করে ভক্তিভরে গ্রহণ করে থাকেন। কিমাশ্চর্য অতঃপরম? সেই কুটীরে রক্ষিত অতি পুরতন শুষ্ক তৃণশয্যা দেখিয়ে সেখানকার পূজারীরা বলে থাকেন যে, এই শয্যায় বিদূর শয়নকরতেন, আর সেই শয্যার পার্শ্বস্থিত একটি পুরাতন কাঠের চৌকী দেখিয়ে বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ নাকি অতিথি হিসাবে বিদুর-গৃহে এসে সেই খাটে শয়ন করেছিলেন। সেখানকার বৈষ্ণবদের কী বিচিত্র ও বিস্ময়কর সত্যভাষণ! স্বয়ং সর্বদর্শী বেদব্যাস মহাভারতে বিদুরের গৃহকেরম্য বা পরম রমণীয় বলে বর্ণনা করেছেন —

তৈঃসমেত্য যথা ন্যায়ং কুরুভিঃ কুরুসংসদি।
বিদুরাবসথং রম্যমুপাতিষ্ঠত মাধবঃ॥

(উদ্যোগ , ৮৯ অধ্যায় ২৩ শ্লোক)

অর্থাৎ কুরুরাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সঙ্গে কথাবার্তারপর কুরুসভা হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিদুরের রম্যগৃহে গমন করেছিলেন। বিদুর যদি সত্যই পর্কুটীরবাসী হতেন, তাহলে তার গৃহকে ব্যাসদেব কোনমতেই রম্যগৃহ বলে বর্ণনা করতেননা। শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণ বিদুর গৃহে যে শয্যায় শয়ন করেছিলেন, বেদব্যাস তাকে 'যদুসুখবহ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরম সুখপ্রদ এবং আরামদায়ক বলে বর্ণনা করেছেন —

ইত্যেবমুক্তা বচনং বৃষ্ণীনামৃষভস্তদা।
শয়নে সুখ সংস্পর্শে শিশ্যে যদুসুখাবহঃ॥ (ঐ, ৯৩ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

এই শ্লোকের অর্থ, কুরুপাণ্ডব সভায় সন্ধি বিষয়ে কৌরবদের সঙ্গে যেসব কথা হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ তা বিদুরকে বলে সুখ সংস্পর্শ আরামপ্রদ শয্যাতে শয়নকরেছিলেন, বর্তমানে মিথ্যা প্রচারিত একফালি জীর্ণ কাঠের খাট বা খাটিয়াতে নয়। মহভারতের টীকাকার আচার্য নীলকণ্ঠও সুখসংস্পর্শে ও 'যদুসুখাবহ' শব্দে 'মহার্ঘশয্যা', এইঅর্থই করেছেন।

চতুর্দশ প্রশ্ন — আচ্ছা কহিয়ে ত, আপ ক্যা বিদুরজীকো বৈষ্ণব মানতে হেঁ কি নেহি? উন্‌কা আধ্যাত্মিক শক্তিকা প্রতাপকা বারেমেঁ আপ ক্যা জানতে হেঁ?

উত্তর — কোন ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমার বেতাবী বিদ্যায় আমি কতটুকু বলতে পারি? তবে এইটুকু মানি বিদুর তথাকথিত তিলককণ্ঠীধরী সাধারণ বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, শ্রেষ্ঠ যোগী এবং শ্রষ্ঠ তত্ত্ববিদ্। মহাভারতের

শল্যপর্বে স্কন্দ-প্রাদুর্ভাব প্রকরণে পড়েছি, বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে লৌকিক সমূহ উপদেশ দিবার পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কাছে অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে বলেন যে ভগবান সনৎকুমার তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদশে দিবেন। এই সনৎকুমারের নামই সনৎ সুজাত। তিনিই ব্রহ্মার মানসপুত্র, ব্রহ্মবিদ্যার নিধান, ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রজ। তাঁকে কেউ মহাদেবপুত্র, কেউ অগ্নিপুত্র, আদ্যাশক্তি পার্বতীর পুত্র, ছয় কৃত্তিকার পুত্র বলে অভিহিত করে থাকেন। তাঁরই অপর নাম স্কন্দ বা ভগবান কার্তিকেয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে এই ভগবান সনৎকুমারকে দেবর্ষি নারদের উপদেষ্টা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিদুরের কাছে এই কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বলেন — হে বিদুর! ভগবান সনৎকুমার আমাকে যে উপদেশ দিবেন, তা কি তুমি জান না — কিং ত্বং ন বেদ? তদুত্তরে বিদুর বলেন —

শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোহন্যদ্ বক্তুমুৎসহে ।
কুমারস্য তু যা বুদ্ধির্বেদ শাশ্বতীমহম্॥

(উদ্যোগ, ৪১ অধ্যায়, পঞ্চম শ্লোক)

ভগবান সনৎকুমার তোমাকে যে বিদ্যা বলবেন, সেই শাশ্বতী ব্রহ্মবিদ্যা আমিও জানি। কিন্তু আমি তা তোমাকে উপদেশ করতে পারি না, কারণ আমি শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হয়েছি, এজন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের অধিকার আমার নাই।

এখানে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বিদুর তত্ত্বদর্শনে সনৎকুমারের তুল্য হলেও সনাতন ধর্মমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন না। একেই যথার্থত মর্যাদা প্রতিপালন বলে।

যাই হোক বিদুরের এই কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তখন বললেন, বিদুর! আমি স্থূলদেহে এই মর্ত্যলোকে থেকে কিভাবে ব্রহ্মলোকবাসী সনৎকুমারের সাক্ষাৎ পাবো? তখন বিদুর সনৎকুমারের ধ্যান করা মাত্রই সেখানে তদ্দণ্ডেই সনৎকুমার আবির্ভূত হলেন। বিদুরের আধ্যাত্মিক শক্তির এইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

— বাঙালী বাবা! তুমহারা বাৎ শুনকে হমারা দিলমেঁ বহৎ সন্তোষ হুয়া। এহি সিনোরকা নর্মদাতট্‌মে মহাযোগী বিদুর তপস্যা কিয়ে থে। ইধরই যোগস্থ হোকর্ উনোনে ব্রহ্মলীন ভি হুয়ে থে।

— তপস্যার পরিপূর্তির জন্য দেবতারাও যুগে যুগে মা নর্মদার ক্ষেত্রে এসেছেন। কাজেই বিদুরও এসেছিলেন, একথা অবনত মস্তকে মানছি, কিন্তু ভগবন্। মহামতি বিদুরের এখানে দেহান্ত হয়েছিল একথা মানতে পারছি না, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। ভগবান বেদব্যাস বিদুরের অন্তর্ধান সম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণনা করেছেন। সেই ব্যাসবাক্যকে অস্বীকার করতে পারছি না। আশ্রমবাসিক পর্বে আছে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সব শ্মশান হয়ে গেলে, শোকে দুঃখে দীর্ণ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদির কাছে বিদায় নিয়ে, মৃত স্বজনবর্গের পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করার জন্য গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়কে নিয়ে কুরু-জাঙ্গাল প্রদেশে জঙ্গলের মধ্যে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে যখন অবস্থান করেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্রপ্রস্থ হতে যুধিষ্ঠির গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করছিলেন — মহারাজ! মহামতি বিদুরকে ত দেখতে পাচ্ছি না, তিনি কোথায়? তখন ধৃতরাষ্ট্র বলেন — 'বিদুর বায়ুভক্ষ নিরাহার অবস্থায়, নগ্ন, মলদিগ্ধাঙ্গ, জটাযুক্ত এবং মুখে বীটাধারন (কাষ্ঠধারন)

করে এই বনের কোথাও ঘোর তপস্যায় মগ্ন আছেন। যুধিষ্ঠির বনের মধ্যে অন্বেষণ করতে করতে দেখতে পেলেন, অস্থিচর্মসার বিদুর একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছেন। যুধিষ্ঠির তাঁর সামনে দাঁড়াতেই বিদুর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে যোগাবলম্বনপূর্বক যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করে গেলেন —

বিবেশ বিদুরো ধীমান গাত্রৈর্গাত্রাণি চৈব হ।
প্রাণান্ প্রাণেষু চ দধদিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েষু চ।।
স যোগবলামাস্থায় বিবেশ নৃপেতেস্তনুম্।। (আশ্রমবাসিক পর্ব,২৬ অধ্যায়)

অর্থাৎ বিদুর নিজের প্রাণ যুধিষ্ঠিরের প্রাণে, স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রিয়ে স্থাপন করে যোগবলে গতচেতন হয়ে পূর্বের মতই স্তব্ধলোচন অবস্থায় বৃক্ষাশ্রিত হয়ে রয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তার সেই মৃতদেহ সৎকারের জন্য উদ্যোগ করতেই সহসা দৈববাণী হল —

ভো ভো রাজন্ ন দগ্ধব্যমেতদ্ বিদুর সংজ্ঞকম্।
কলেবরমিহৈবং তে ধর্ম এষ ভবিষ্যন্তাস্য এষ সনাতনঃ।।
লোকাঃ সান্তানিকানাম্ ভবিষ্যন্তাস্য অস্য ভারত।
যতিধর্ম মবাপ্তোহসৌ নৈষ শোকা পরন্তপ।।

হে রাজন! বিদুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করো না। বিদুরের দাহ ক্রিয়া না হলেও তাঁর সান্তানিক লোক অবশ্যই লাভ হবে। বিদুর যতিধর্ম গ্রহণ করে দেহত্যাগ করেছেন বলে তাঁর জন্য শোক করাও উচিত নয়।

মহাভারতের এই বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে বিদুর নর্মদাতটে দেহরক্ষা করেন নি।

আমার বক্তব্য শুনে পূষণ গিরি মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর ১৫শ প্রশ্ন করলেন — ইয়ে মেরা আখেরী প্রশ্ন হৈ। আচ্ছা কহিয়ে ত নর্মদাতটমেঁ এতনা রোজ আপ জো পরকরমা কর রহে হৈ , কুছ অনুভব কিয়া কি নেহি?

উত্তর — পদে পদে অনুভব করেছি যে, পরিক্রমাবাসীদেরকে যেমন মা নর্মদাকে সর্বদা চোখ চোখে রেখে পরিক্রমা করতে হয়, তেমনি মাতাজীও তাঁর পরিক্রমাবাসী সন্তানকে প্রতি মুহূর্তে চোখে চোখে রাখেন। আর কিছু বলতে আমি অপারগ।

আমার কথা শেষ হতেই তিনি তাঁর সহকারী চেলাকে বললেন — জগদানন্দ, ইনকো লিয়ে নৌকাকী চিঠি বানা দিজিয়ে, উস্‌মেঁ শিল মোহর ভি মার দো। কাগদ্‌মেঁ হম্ খুদ্ দস্তখৎ করেঙ্গে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — হম্ আপকো লিয়ে দুসরা এক চিঠি বানা দুঙ্গা। যব্ দক্ষিণতট পরকরমা করেঙ্গে, পিপরিয়া গাঁওমেঁ পিপ্পলাদ আশ্রমকি পাশ হি হমারা ছাউনি হৈ, দক্ষিণতটকা শূলপাণি কী ঝাড়ি উধর খতম হো যাতা হৈ। হমারা দো নম্বর চিঠি নাগালোগোঁকে দেখানেসে, উহ্ লোগ আপকো হর তরেসে মদৎ দেঙ্গে।

আমি তাঁকে প্রণাম পূর্বক বহুৎ 'সুক্রিয়া' (ধন্যবাদ) জানিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। মোহান্তজী বললেন — যাক বাবা মস্ত ফাঁড়া কাটল। এই অঞ্চলে ইনি দোর্দণ্ড প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন যে এঁর নৌকার চিঠি কাছে না থাকলে তোমার হরিধাম অতিক্রম করা দুষ্কর হত। ভবসাগর অতিক্রম করতে গিয়ে স্বয়ং যমরাজের কাছেও বোধহয় এমন বিষম ও উৎকট পরীক্ষা দিতে হয় না।

আমরা আমাদের তাঁবুতে যেতে না যেতেই ঘন্টাধ্বনি পড়ল। তাঁবুতে পৌঁছুতেই দেখি, সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি জেনে তাঁরা সবাই খুশী হলেন। প্রায় ৫ মিনিট যেতে না যেতেই ভোজন সামগ্রী নিয়ে পূষণ গিরির পাঁচজন নাগা উপস্থিত হলেন। পুরী ও লাড্ডু সহযোগে আমাদের ভিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হল। বেলা তখন আড়াইটা।

খাওয়া দাওয়ার পর মোহান্তজী বললেন — ঘন্টাখানেক জিরিয়ে নিয়েই আমরা সিনোরের যে আটটি তীর্থের নাম বলেছি, সেগুলি দর্শন করতে যাব। সেই আটটি তীর্থের মধ্যে নিষ্কলঙ্কেশ্বর এবং কেদারতীর্থ বাদ দিলে বাকী ছটি তীর্থই ভগবান স্কন্দকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে! ভগবান স্কন্দ বা কার্তিকেয়ই যদি বেদব্যাসের মতানুসারে ব্রহ্মবিদ্যার জনক ভগবান সনৎকুমার হন, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর কৃপাধন্য মহামতি বিদুর নিশ্চয়ই এখানে তপস্যা করেছিলেন। পূষণ গিরিজীর প্রশ্নের উত্তরে বিদুর এখানে ব্রহ্মলীন হন নি বলে বাঙালী বাবা তুমি মহাভারত থেকে যেসব অকাট্য যুক্তি দিয়েছিলে তা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য, কারণ ব্যাসবাক্যের উপর আর কার কি কথা থাকতে পারে? তবে ভগবান সনৎকুমারের সঙ্গে যখন স্মরণাতীত কাল হতেই এই তীর্থের এত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং বিদুরজীও যখন ভগবান সনৎকুমারের কৃপাতে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার লাভ করেছিলেন, তখন কোন না সময়ে তিনি নর্মদাঘাটের স্কন্দ তীর্থে তপস্যা করতে এসেছিলেন একথা স্বচ্ছন্দ্যে আমরা মেনে নিয়ে পারি। ভেবে দেখছ কি, দেবসেনার পতি, দেবসেনাদের সেনাপতি কার্তিকেয়ের নামের সঙ্গে সিনোরের অপর নাম সেনাপুর নামকরণটিতে কত সামঞ্জস্য আছে?

এইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতেই বেলা চারটা বেজে গেল। আমরা 'উঠব উঠব' করছি, এমন সময় ত্রিশূল হাতে পূষণ গিরিজী এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। মোহান্তজী তাঁকে হাত ধরে স্বাগত জানিয়ে নিজের আসনের একপাশে বসালেন। তাঁর হাতে দুখানি চিঠি। তিনি চিঠি দুটি আমার হাতে দিয়ে বললেন — বেটা। তুমহারা উপর হাম বহুৎ খুশ হুয়ে। নাওয়ালাকো চিঠি নাওয়ালাকো দে দেনা। ইয়ে চিঠি পড়নেসে, ঔর কোঈ যাত্রী ন রহে তবভি আপকো একেলা হি নাও মেঁ চড়াকর উসতরফ্ বিমলেশ্বরজী মেঁ উতারেঙ্গে। দুসরা চিঠি পিপরিয়া মহল্লেমেঁ হামারা নাগালোগকো দে দেনা। আমি চিঠি দুটি তাঁর হাত থেকে নিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তিনি আবার স্বগতোক্তি করতে লাগলেন — হম্‌লোগোকা ইসলিয়ে হর আদমী বদনামী করতা হৈ, বিকট কহতে হৈ, 'পরেশানীওয়ালা পাষান গিরি' ভি কহতে হৈ, লেকিন্ ইয়ে ঘোর কলিযুগমেঁ হম দেখতে হৈ, বাহারসে বহোৎ ঝুটা আদমী আকর বহুৎ ঝুট বোল দেতে হৈ। পরিক্রমাবাসীয়োঁকো শুচিতা, সদাচরণ তপজপ, উনকী নর্মদামায়ী কী লিয়ে আকুতি ঔর শরণাগতি থোড়াসা পরীক্ষা হম লেতে হৈ। হমারা গুরুজী রেবামায়ীসে প্রত্যাদেশ পা কর এ্যায়সাই বিধান প্রবর্তন কিয়ে থে! ইসমেঁ সাচ্চা পরিক্রমাবাসীয়োঁকো আচ্ছাই হোতা হৈ।

এই পর্যন্ত বলে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। এদিকে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। আট ও ন নম্বর তাঁবু হতে লক্ষ্মণভারতীজী মন্দির দর্শনে যাবেন বলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের তাঁবুর ভিতর পূষণ গিরিজী আছেন বলে সবাই বাইরে

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করে তিনি মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলেন — ইধরসে কব যানেকী বিচার হৈ?

— কাল সুবে যাত্রা করেঙ্গে। মোহান্তজীর কথা শুনেই সহসা পূষণ গিরি গর্জন করে উঠলেন কভি নেহি। আপ লোগ্ ক্যা শোচতে হো? পাথর গিরি মহারাজজীকো গদীকা কোঈ ইজ্জৎ নেহি হ্যায়? দুসরা দুসরা সাল মেঁ হমনে দেখা আপ মণ্ডলেশ্বর সে ভারোচ সিধা চল্ যাতা হৈ। হমারা আদমীকো আপ্ বোলতা হৈ, উসতরফ্ হম যায়েঙ্গী থোড়ি, নাওকী চিঠিকো কোঈ জরুরৎ নেহি। এক মিনিটকো লিয়ে আপ্ রুখতা নেহি। হমারা সাথ ভেটভী নেহি করতা হৈ। ক্যা শোচতে হো হম্ ইধর বেওয়ারিস্ লাবারিশ কুত্তে কী মাফিক পড়া হুয়া হৈ? হমারা ইয়ে স্কন্দতীর্থ ইয়া বিদুরতীর্থকা ক্যা কোঈ ইজ্জৎ নেহি হ্যায়?

এইবলে তিনি ভ্রূকুটি করে গর্জাতে লাগলেন। রোষ কষায়িত লোচনে সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চীৎকার করে উঠলেন — আরে ইধর কৌঈ হ্যায়? তাঁর বজ্রনিনাদ শুনেই তাঁর দুজন নাগা উঁকি মারতেই তিনি হুকুম জারী করলেন — জগদানন্দকো বোল দেনা, সিনোরকা চারো তরফ বন্দ্ কর্ দেনা। ইয়ে মণ্ডলেশ্বরওলাকো কিধর্ জানে মৎ দো।

আমরা তাঁর এই হঠাৎ ক্রুদ্ধভাব দেখে হকচকিয়ে গেলাম। এতক্ষণ তিনি শান্ত মনে অত্যন্ত ভদ্র ভাবেই কথা বলেছিলেন, সহসা কি ঘটল যে তিনি এতখানি মারমুখী হয়ে উঠলেন। উন্মাদ নাকি? মোহান্তজী স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। পূষণ গিরির তর্জন গর্জন শুনে লক্ষ্মণভারতীজী উঁকি মারতেই ক্রুদ্ধভাবে তাঁকে তেড়ে গেলেন। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে লক্ষ্মণভারতীজীর হাত ধরে তিনি টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। মোহান্তজী সহ সকলেই আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁদের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। প্রধান তাঁবুর পিছন দিকে যেখান থেকে নর্মদার অবারিত দর্শন পাওয়া যায়, সেখানে একেবারে কিনার ঘেঁসে তিনি বসলেন। লক্ষ্মণভারতীজীকে সেখানে বসবার হুকুম দিলেন। আমাদের দলের সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেছে। সেখানে দেখলাম, নর্মদার বালুতটে প্রায় শতখানিক দুর্ধর্ষ বিশাল দেহী নাগা নানারকম কসরৎ করছেন; তরবারি নিয়ে, ত্রিশূল নিয়ে Mock Fight করছেন, আর মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন। আমাদের মনে হল ক্ষমতা ও নিজের প্রতাপ দেখানোর জন্য তিনি আমাদেরকে বধ্যভূমিতে উপস্থিত করেছেন। একটু পরেই হয়ত তাঁর নাগা বাহিনী আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মোহান্তজী হাতজোড় করে কম্পিত কণ্ঠে বললেন — হমলোগকো কোঈ গলতি হো তো কৃপয়া মাফি কিয়া যায়। তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে পূষণ গিরি আবার ভ্রূভঙ্গি করে হুঙ্কার দিয়ে বললেন — আপকো ইম্তেহান দেনে পড়েগা। আপ্‌কো পরীক্ষা লেঙ্গা। একঠোই প্রশ্ন করতা হুঁ। উসকা জবাব ঠিক হোনেসে মুক্তি দেঙ্গা, নেহিত সবকো পাকড়কে নর্মদামে বিক্ দেঙ্গে।

মোহান্তজী ভয়ে ভয়ে বললেন — পুছিয়ে।

পূষন গিরি বললেন - কহিয়েত ইস্ শ্লোককা ক্যা মতলব?

বি-রাজ-রাজপুত্রারের্যন্নাম চতুক্ষরম।
পূর্বার্ধং তব শত্রূনাং, পরার্ধং তব বেশ্মনি॥

তিনি এই উদ্ভট শ্লোকটি বারবার উচ্চারণ করলেন। বলা বাহুল্য মোহান্তজীসহ আমরা কেউই ঐ শ্লোকের কোন অর্থ বলতে পারলাম না। আমরা দেখলাম, মোহান্তজী তখন ঘেমে নেয়ে গেছেন। একজন বিকট উন্মাদের পাল্লায় পড়ে আশু কোন বিয়োগান্তক শোচনীয় ঘটনা ঘটে যাবে — মনে হল, এই ভেবে তিনি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মৃদুকণ্ঠে 'হর নর্মদে', 'হর নর্মদে' বলতে লাগলেন।

পূষণ গিরি অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসতে হাসতেই তিনি মোহান্তজীকে জড়িয়ে ধরে সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে কাছে বসিয়ে বলতে লাগলেন — আপনারা ত উত্তর দিতে পারলেন না, এবার আমি ঐ শ্লোকের অর্থ বলছি, যেহেতু আপনারা এই ইস্তেহানে অকৃতকার্য হলেন; সেইজন্য তারু শাস্তি হল — কাল, পরশু ঔর দো রোজ আপনাদেরকে এই তীর্থে বাস করতে হবে এবং আমাদের কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আমাদের সকলের কাছে এসে সবাইকে আলিঙ্গন করে শিরোচুম্বন করলেন, তারপর শ্লোকের ব্যাখ্যা দিবার জন্য নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। মোহান্তজী তাঁকে হাসতে হাসতে বসলেন — এইজন্য আপনার এত উগ্ররসের অভিনয় করার দরকার ছিল না।

— ক্যা কিয়া জায়েগা, বিকট মহাত্মাকী রঙ্গরসভি এ্যায়সাই বিকট ও উদ্ভট হোতা হৈ! শুনিয়ে শ্লোক কী অর্থ — বিঃ-পক্ষী। বি-বিষ্কিরঃ — পতত্রয় ইত্যমরঃ। তস্য রাজা গরুড়ঃ, তস্য রাজা প্রভুঃ (তস্মিন্ রাজতে ইতি বা) শ্রীকৃষ্ণঃ, তস্য পুত্র কামঃ, তস্য অরেঃ শত্রোঃ শিবস্য যৎ চতুরক্ষরং বর্ণচতুষ্টয় ঘটিতং নাম (মৃত্যুঞ্জয় ইতি) তস্য নাম্নঃ পূর্বার্ধং মৃত্যুরূপং তব শত্রুণাং বেশ্মনি গৃহে, তথা পরার্ধং জয়রূপং তব বেশ্মনি অস্তুইতি শেষঃ।

তাঁর এই ব্যাখ্যার বাংলা করলে এই দাঁড়ায় যে বি মানে পক্ষী, তার রাজা অর্থাৎ গরুড়, আবার তার রাজা বা প্রভু হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর পুত্র কাম, তাঁর অরি কিনা মহাদেব। মহাদেবের যে চার অক্ষরযুক্ত অপর সিদ্ধ নাম মৃত্যুঞ্জয়, সেই নামের পূর্বার্ধ অর্থাৎ মৃত্যু তোমার শত্রু গৃহে থাক আর পরার্ধ অর্থাৎ জয় তোমার গৃহে বিরাজ করুক।

পূষণ গিরিজী বলে চললেন — আমি যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে এই বিদুর তীর্থ জেগে বসে আছি, আমার কর্তব্য এই তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিদুরজী সম্বন্ধে কিছু বলা। অতি প্রাচীন যুগে মাণ্ডব্য নামে এক মৌন ব্রতী ঊর্ধ্ববাহু তপস্বী মৌনব্রত ভঙ্গ না করায় এক তস্করদলের সঙ্গে ধৃত হয়ে সে দেশের রাজার আদেশে শূলবিদ্ধ হোন। কিন্তু তপঃপ্রভাবে তিনি জীবিত থাকেন। পরে তার পরিচয় জানতে পেরে রাজা তাঁকে শূল থেকে নামিয়ে দিলেও শূলের ভগ্ন অগ্রভাগ বা অণী তাঁর গুহ্যদ্বারে থেকে যায়। এই জন্য তাঁর নাম হয় অণীমাণ্ডব্য। বাঙালী বাবা! তুমি দক্ষিণতট পরিক্রমাকালে অণীমাণ্ডব্যের তপস্যাস্থল দেখতে পাবে। এই অহেতুক যন্ত্রণা ভোগের জন্য ঋষি অণীমাণ্ডব্য ধর্মরাজের নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করে জিজ্ঞাসা করেন, কোন পাপে তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হল? ধর্মরাজ উত্তরে বললেন যে, মাণ্ডব্য বাল্যকালে এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে এক তৃণ প্রবিষ্ট করেছিলেন বলে তাঁকে এই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। তখন মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন যে, লঘুপাপে এই গুরুদণ্ড দেওয়ার অপরাধে তাঁকে শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। সেই অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্মরাজ বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই বিদুরের তপস্যাক্ষেত্রের অর্থ এইস্থান ধর্মরাজের

তপস্যাক্ষেত্র, অর্থাৎ এটি শ্রেষ্ঠ ধর্মক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্রে আপনারা তিন রাত্রি বাস করলে আপনাদের মঙ্গলই হবে।

মোহান্তজীকে বললেন — কি করি বলুন গুরুজী আমাকে সাধুদের অপ্রীতিকর এই কঠিন কাজে ব্রতী করে গেছেন। যাঁরা পরিক্রমাবাসী তাঁদের মধ্যে এমন সব উচ্চকোটির মহাত্মা থাকেন, তাঁদের পাদস্পর্শ করার যোগ্যতা হয়ত আমার নাই। তাঁদেরকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে কি আমার ভাল লাগে? তবু গুরুকে স্মরণ করে তাঁরই প্রদত্ত গুরুদায়িত্ব আমি পালন করে যাচ্ছি। এই অপ্রিয় কাজে আমি স্বস্তি পাই না। কোন মহাত্মাই আমার এখানে থাকেন না। তার ফলে সৎসঙ্গ এবং সাধুসেবা থেকে আমি প্রায়শঃই বঞ্চিত থাকি। এমন কথাও শুনতে পাচ্ছি, পরিক্রমাবাসী সাধুদের মধ্যে নাকি আমাকে কেন্দ্র করে একটা আতঙ্ককর পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছে। এই সিনোর তথা আমার পরীক্ষা পর্বকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আজকাল অনেক সাধুই ঘুরপথে সরাসরি মালসরে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন কিংবা কেবল দক্ষিণতট পরিক্রমা করেই পরিক্রমা সমাপ্ত করেছেন। তার ফলে বাধ্য হয়েই আমি সরাসরি জেলা সমার্হতার সাহায্য নিয়ে তীর্থের শুচিতা বজায় রাখার জন্য এমন বন্দোবস্ত করেছি, যে, কি সরকারী কি বেসরকারী কোন নৌকাতেই পরিক্রমাবাসী সেজে কারও পক্ষেই রেবাসংগম লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। তাই ঐ পারেও আমার অর্ধেক বাহিনীকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করেছি যে, সেখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে ওপার থেকেও কেউ যেন এপারের হরিধামে সমুদ্র লঙ্ঘন করে না আসতে পারে। আপনার সঙ্গলোভেই উগ্রসেনের অভিনয় করে আপনাদেরকে আটকে দিলাম। কোন অপরাধ নিবেন না। কাল যখন এখানকার তীর্থ ও মন্দির দর্শন করতে যাবেন, আমার একজন চেলাকেও আপনাদের সঙ্গে দিব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিনি তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। আমরাও নর্মদা স্পর্শ করে তাঁবুতে গিয়ে সন্ধ্যা করতে বসলাম। রাত্রি তখন দশটা, আমাদের সবেমাত্র সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হয়েছে, 'হর নর্মদে' বলে তিনি আমাদের তাঁবুতে ঢুকলেন, তার সঙ্গে একজন নাগা, তাঁর হাতে একটি হিন্দী মহাভারত। মোহান্তজী তাঁদেরকে সমাদরের সঙ্গে বসালেন। তিনি বললেন — আমার এই চেলা নাকি বিদ্বান। বাঙ্গালী বাবার যখন পরীক্ষা নিচ্ছিলাম, তখন সে সময় ইনি বসে বসে বাঙ্গালী বাবার সব বক্তব্য শুনেছেন। ইনি সন্ধ্যার পর এই মহাভারতটি আমাকে দেখালেন এঁর কিছু বক্তব্য আছে। বাঙালী বাবা, তুমি এর সঙ্গে কথা বল, তার আগে তুমি এই মহাভারতের ছবিটি দেখ।

আমি মহাভারতটি হাতে নিয়ে দেখলাম, বইখানি কোন এক টি.আর কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, মাদ্রাজের মধুবিলাস পুস্তকালয় হতে প্রকাশিত। বইখানিতে উদ্যোগ পর্বের প্রারম্ভে হস্তিনার সন্ধিসভার একখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এই চিত্রে সন্ধিসভার উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবায় বিদুর নিযুক্ত, বিদুর মাটিতে বসে শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করছেন, এইরকম দেখানো হয়েছে। বিদুরের কণ্ঠে তুলসীমালা এবং কপালে হরিচন্দনের তিলক অঙ্কিত। মোহান্তজী নিজেও আগ্রহে ছবিটি দেখলেন, আমাদের সাথীরাও বইখানি একে একে হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখলেন। মোহান্তজী এবং পূষণ গিরি একসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — এরপরেও কি তুমি বলবে যে বিদুর শ্রীকৃষ্ণভক্ত কণ্ঠীধারী বৈষ্ণব ছিলেন না? আমি উত্তর

দিলাম — না। কোন বৈষ্ণব শিল্পীর আঁকা বিদুরের এই ছবি তাঁর কণ্ঠীধারণ বা তিলকসেবার প্রমাণ হিসাবে কোনমতেই গ্রাহ্য হতে পারেনা। মধ্ব-সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, আমাদের বাঙালী বৈষ্ণবরাও মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। ঐ বিশেষ সম্প্রদায় হতেই সুপরিকল্পিতভাবে বিদুরকে বৈষ্ণব সাজিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। বেদব্যাস অঙ্কিত মহাভারতে বিদুর চরিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাতে বিদুরকে শ্রেষ্ঠ মহাযোগী এবং তত্ত্ববিৎ হিসাবে দেখানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পদলেহী দাস হিসাবে তাঁকে কোথায় ভিখারী নিত্যপদচুম্বনকারী এই যুগের কণ্ঠীধারী বৈষ্ণব হিসাবে দেখানো হয়নি। আমার এই কথায় পূষণজীর সেই নাগাশিষ্য বেশ উষ্মার সঙ্গে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ৮৯ তম অধ্যায়ের ২৪ নম্বর শ্লোকটি দেখিয়ে বললেন, আপনা আঁখসে পড় লিজিয়ে, শ্লোকমে কেয়া লিখা হৈ?

আমি উচ্চৈঃস্বরে পড়ে শোনালাম —

যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ। তদ্দর্শন-সমুদ্‌ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাহসি দেহিনঃ ॥

অর্থাৎ বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন — হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমাকে দর্শন করে আমার যে প্রীতি, যে আনন্দলাভ হয়েছে, তা তোমার কাছে আর মুখে কি ব্যক্ত করব, তুমিই সমস্ত জীবেরই পরমাত্মা।

আমি অর্থসহ শ্লোকটি পাঠ করেই বললাম, কি আশ্চর্য এই শ্লোকের মধ্যে বিদুরের কণ্ঠীধারণের কি পরিচয় পেলেন? ঐ উদ্যোগ পর্বের ১৩৪ অধ্যায়ে ত বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে, কৃষ্ণই জগতের কর্তা, তাঁর বিরোধিতা করলে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এইসব কথাতে প্রমাণিত হয় যে বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে মানতেন। এই জন্যেই ত আপনার পরীক্ষাকালে আমি মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত বলে অভিহিত করেছি। আপনারা কি বলতে চান যেহেতু বিদুর শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত, সেইজন্য তাঁকে তিলক কণ্ঠীধারণ করতেই হবে, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ পদলেহনকারী দীনাদ্দিদীন তথাকথিত বৈষ্ণবের মত বেশভূষা ধারণ করতেই হবে? মহাভারতে বেদব্যাস বিদুরের এইরকম বিশেষ কোন বেশভূষার বর্ণনা দেন নি। বেদব্যাস বরং দেখিয়েছেন, বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং পরমেশ্বররূপে জানলেও, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেবকের মত ব্যবহার না করে সুহৃদের মত ব্যবহার করতেন। আন্তর বিশুদ্ধিই ভক্তের অসাধারণ লক্ষণ, তা বিদুরের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল, সাম্প্রদায়িকদের কল্পিত এবং চিত্রিত বেশভূষা বা আচরণ বিদুরের ছিল না। সেইরকম বর্ণনা বেদব্যাস দেন নি। কৃষ্ণ বা বিষ্ণুভক্ত হতে হলে বিশেষ কোন বেশভূষা যথা তুলসীমালা বা তিলক আদি ধারণ করতেই হবে, এমন কোন কথা নাই। শুধু বিদুর নন, দ্রৌপদী অর্জুন প্রভৃতিরাও অসাধারণ কৃষ্ণগত প্রাণ ভক্ত হলেও তাঁদেরও অর্বাচীন ভক্তদের মত কোন বাহ্য বেশভূষা ছিল না। কী আশ্চর্য স্বয়ং বেদব্যাস যেখানে বিদুরকে ব্রহ্মবিদ্যার নিধান ভগবান সনৎকুমারের সমতুল্য শক্তিধর হিসাবে দেখিয়েছেন, স্কন্দতীর্থে তা মানা হবে না কেন?

আমার কথা শেষ হতেই পূষণ গিরিজী তাঁর নাগাশিষ্যকে মহাভারতসহ বিদায় করে আমাকে বললেন — 'বাঙালী বাবা! আজ রাতমেঁ হমারা সাথমেঁ ঠারেঙ্গে? মোহান্তজী আপ্ অনুমতি দিজিয়ে, ঘাবড়াইয়ে মৎ, ডর নেহি।' মোহান্তজী চোখের ইসারায় আমার মন বুঝে

নিয়ে সানন্দে মত দিলেন। আমি কম্বল জড়িয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তিনি পাহারারত একজন নাগাকে ডেকে চুপি চুপি কি বললেন। তারপর তাঁর তাঁবুতে গিয়ে কৌপীনটি মাত্র পরিধানে রেখে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে, যেখানে আজ অপরাহ্নেই তাঁর নাগাবাহিনীর যুদ্ধের মহড়া দেখেছিলাম, সেই মল্লভূমি অতিক্রম করে একেবারে নর্মদার কিনারাতে এসে পৌঁছলেন। দেখলাম ইতিমধ্যেই সেখানে দুটি চৌকী পাতা রয়েছে। আমাকে একটি চৌকীতে বসতে বলে নিজেও অপর চৌকীটিতে বসলেন। নর্মদার জল আমার মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন — কম্বল খুলে একধারে রেখে দাও। জ্যাড়া জ্যাদা নেহিজী। কোন দেশ থেকে কত কষ্ট করে তুমি তপোভূমি নর্মদার কোলে এসে পৌঁছেছ। মা নর্মদার দয়া তুমি নিশ্চয় পাবে। তুমি আমার কাছে জেনে নাও যাঁরা পরিক্রমার উদ্দেশ্যে আসেন, মা নর্মদার সদাজাগ্রত দৃষ্টি তাঁদের উপর থাকে। এ কথা ধ্রুব সত্য। তোমার কথাবার্তা শুনে আমি খুশী হয়েছি বলে আমাদের গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত একটি গুহ্য ক্রিয়া তোমাকে শেখাতে চাই। নর্মদার ঘাটে ঘাটে তীর্থ। প্রতি তীর্থেই যুগ যুগ ধরে দেবতা, কত ব্রহ্মর্ষি এবং মহর্ষিরা দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করে গেছেন। তাঁরা অপ্রকট হয়েছেন কিন্তু তাঁদের সেই চিৎস্পন্দন, তাঁদের ধ্যানশক্তি মননশক্তির চিৎকণা এখনও ইথারের তরঙ্গের মধ্যে বিদ্যমান। এ জিনিষ কখনো ধ্বংস হয় না। শত সহস্র তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যেও ক্ষণিকের জন্যও যদি সেই শুদ্ধ চিৎকণার ধারার সঙ্গে একীভূত হতে পার তাহলে মনের অবস্পন্দন চিত্তবিক্ষেপের যা হেতু তা মুহূর্তে অপসৃত হয়ে যাবে। যে তীর্থে যে ঘাটে বা যে গুহায় তুমি থাকবে সেখানে পূর্বে যিনি সাধনা করে গেছেন, তাঁর চৈতন্য শিখার ঢল যা ইথারের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে তা ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উর্ধের পথে চৈতন্য সমুদ্রের দিকে টানতে থাকবে। এই যেমন মা নর্মদার ধারা বয়ে চলেছে সাগরগামিনী হয়ে, এই ধারার মধ্যে তুমি আমি যদি পড়ে যাই, তাহলে যেমন স্রোতের টানে পড়ে অবশভাবে ভেসে যাব রেবা সংগমে, এই ব্যাপারটাও কতকটা সেই রকম। এই জন্যেই তীর্থে যেতে হয়। তীর্থে ঘুরে গেলেই কোন কাজ হয় না। পূর্বে যেসব সাধক তীর্থে গিয়ে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন, তাঁদের চিৎকণার ধারাকে ইথার হতে টানতে পারলে তবেই সিদ্ধি সুগম হয়। এই পদ্ধতি কতকগুলি গুহ্য ক্রিয়াসাপেক্ষ। আমি সেই গুহ্ ক্রিয়া তোমাকে শেখাচ্ছি তুমি শিখে নাও, আয়ত্ত করার চেষ্টা কর। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া তিনটি। তনথির, মনথির, বায়ুথির নামক তিনটি পদ্ধতি তিনি বারবার দেখাতে লাগলেন। আমিও তাহা পুনঃপুনঃ অনুসরণ করতে লাগলাম। মোটামুটি কতকটা যৎদৃষ্টং ততকৃতং হবার পর তিনি বললেন, এইবার তোমার ইষ্টমন্ত্রকে কিভাবে অনুলোম ও বিলোম ক্রমে জপ করবে তা শিখিয়ে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করে অনুলোম বিলোম ক্রমে জপের কৌশলটি শিখতে পারলাম। তিনি বললেন, নর্মদা ক্ষেত্রের যেখানেই রাত কাটাবে সেখানেই এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করবে। ক্রিয়া কিছুটা আয়ত্ত হলেই তুমি কাউকে দেখামাত্রই সেই লোকটা কি প্রকৃতির এমনকি কোন জীবজন্তু পশুপক্ষী এমনকি কোন বৃক্ষলতাদিও কোন প্রকৃতির তা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে। তাদের দেহোদ্ভূত গন্ধ ও বর্ণ হতেই তাদের সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির পরিচয়ও তোমার কাছে ধরা পড়া যাবে। কিন্তু এই বাহ্য। মূল কথা, তীর্থক্ষেত্রে বা ঋষি মুনি তপস্বীদের সাধনক্ষেত্রে কোন শুদ্ধ চিৎকণার প্রবাহ ধরতে পারাটাই

মূল লক্ষ্য। অনুলোম বিলোম ক্রমে জপের কৌশলটাই মূল। কারণ তার সাহায্যেই ইথারে নিত্য প্রবহমান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিৎকণাকে তুমি টানতে পারবে।

এই বলে তিনি প্রত্যেকটি ক্রিয়া পুনরায় দেখাতে লাগলেন। এক নজর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি পূর্বাকাশে শুকতারার উদয় হয়েছে। তাঁর শেখাতে কোন ক্লান্তি নাই। প্রাচীন ঋষি মুনিরা বা এযুগের কোন ছাত্র-প্রাণ আচার্য যেমন মনপ্রাণ ঢেলে প্রিয় ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন বা দিয়ে থাকেন নর্মদাতটের এই সাধুরও দেখছি তেমনি অদম্য উৎসাহ। তিনি পুনরায় অনুলোম বিলোম ক্রমে জপের কৌশল দেখাতে দেখাতে নিজেরই ইষ্টমন্ত্র একবার অনুলোম ক্রমে আর একবার বিলোম ক্রমে অতি স্পষ্ট স্বরে তালে তালে গমকে উচ্চারণ করতে লাগলেন। তারপর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। সকাল হয়ে গেল। দুতিনবার জোরে জোরে ডাক দিলাম। কোন সাড়া নেই। বড়ই বিব্রত বোধ করছি। চৌকী থেকে উঠে তাঁর তাঁবুতে গিয়ে তার কোন নাগাশিষ্যকে ডেকে আনবার জন্য এগোতে গিয়ে দেখি, চারজন নাগা এই দিকেই আসছেন। তাঁরা আমাকে বললেন — কোঈ ফিকর নেহি। হর রোজ এ্যায়সাই হোতা হৈ। আপ যা কর্ উনকো তাঁবুমেঁ লেট যাইয়ে। হমারা গুরুজী জিতনিদ্র হৈ। সূর্যোদয় হোনেকা সাথ সাথ উনকো ব্যুত্থান হোগা। হম্‌লোগ উনকো লে যাউঙ্গা।

তাঁরা বারবার তাগিদ্ দিতে বাধ্য হয়ে পূষণ গিরিজীর তাঁবুতে গিয়ে কার্পেটের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন দেখি তিনি গায়ে ভস্ম মাখছেন। তাঁর স্নানপর্ব শেষ হয়েছে। তিনি বললেন — সুবে আট বাজ গিয়া। আভি যাইয়ে মোহান্তজীকে পাশ। কিসীকো কুছ মাৎ বোলনা। নায়ে ধোয়ে কর, হমারা পাশ আইয়ে, হম্ সবকো লেকর অষ্টতীর্থ দেখা দেঙ্গা।' আমি তাঁকে প্রণাম করে ফিরে এলাম মোহান্তজীর কাছে। তিনি আমাকে দেখামাত্রই বললেন — আমাদের স্নান তর্পণ হয়ে গেছে, তুমি তাড়াতাড়ি স্নানাদি সেরে এস। তুমি আসার পরেই আমরা এখানকার তীর্থগুলি দর্শন করতে বেরোব। আমি সঙ্গে সঙ্গে কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে নর্মদার ঘাটে গেলাম। আমি মনে মনে ভাবছি, এই দলের সঙ্গে এতদিন রয়েছি, এঁদের অনাবিল স্নেহ এবং অনেক মহত্বের পরিচয় পেয়েছি। ভারতে অনেক ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশার অনেক সুযোগ হল। তারা সকলে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি মুক্ত, একথা বলতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা স্বসম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছাড়া আর কাউকে আপন ভাবতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে অনেক কৌতূহল অনেক জিজ্ঞাসা সন্দেহ প্রভৃতি পদে পদে লক্ষ্য করেছি; স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করতে তাঁদের ক্রমাগত চেষ্টা থাকে। কিছুতেই না পারলে দুর্ব্যবহারও করে থাকেন। পরিক্রমাকালে এই নর্মদাতটেই আমি সেইরকম অনেক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু মহাত্মা নগেন্দ্রভারতীজীর এই দলটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এঁদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কারও মনে আত্মপর ভেদবুদ্ধির কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি। প্রথম থেকেই এঁরা আমাকে স্বজনরূপেই স্নেহদৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। এঁদের কখনও কোন বিষয়ে অহেতুক কৌতূহল, অনাবশ্যক জিজ্ঞাসার কুৎসিৎ আগ্রহ দেখলাম না। মা নর্মদার দয়ায় মোহান্তজীর মত এই রকম মহৎ ও উদার চরিত্র মানুষের সঙ্গলাভ সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই।

যাইহোক স্নান তর্পণাদি সেরে যখন ফিরে এলাম, তখন মতীন্দ্রজী জানালেন যে সওয়া ন'টা বেজেছে। আমরা সবাই প্রস্তুত। মোহান্তজীকে বললাম — পূষণ গিরিজী আমাদের সঙ্গে গিয়ে তীর্থ দর্শন করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

— বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আপ্ যাকর নিবেদন করিয়ে হমলোগ তৈয়ার হো গয়া।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁকে মোহান্তজীর কথা নিবেদন করতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন 'উনোনে কমণ্ডলু পুষ্প-বগেরা জরুর লিয়ে হোঙ্গে। উনকো ঐসাই করনে দিজিয়ে, আপকো হম্ দুসরা তরিক্কা শিখা দেতে হেঁ। যো কোঈ সিদ্ধস্থানমেঁ পূজা ইয়া দর্শনকে লিয়ে যায়েগা উধর খাড়া হোকর দীর্ঘ বিলম্বিত শ্বাস আয়েস্তা আয়েস্তা ছোড় দেকর কুম্ভককি অবস্থামেঁ স্থিত হোকর্ উন্ শিবলিঙ্গকো স্বরূপ স্মরণ করকে আজ্ঞাচক্রমেঁ প্রণাম করেগা। উসমেঁ পূজাভি হো জাবেগা, এ্যায়সা দেখিয়ে ......... বলে তিনি দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দীর্ঘ বিলম্বিত অবস্থাতেই শ্বাস ছেড়ে কুম্ভকে স্থিত হলেন। তিনবার ঐ পদ্ধতিটি দেখিয়ে বললেন — এ্যায়সা এক দফে করিয়ে ত? দেখতা হৈ, কুম্ভক ছোড়কে যব শ্বাস গ্রহণ করতে থে ত উস বখৎ ক্যায়সা মেরুদণ্ডকা অন্দরমেঁ বম্ বম্ করকে আওয়াজ হোতী থী। বম-বম-ববম্-বম্ মহাবীজ পরব্রহ্মস্বরূপ শিউজী কী মহাবীজ। ঔর ইয়ে তরিক্কাকী নাম ব্রহ্মপ্রাণায়াম।

তিনি আমার সঙ্গে সাত নম্বর তাঁবুতে আসতেই সকলেই তাঁর কাছে এসে অভিবাদন করলেন।

— আরে ভেইয়া, পহেলে নর্মদামায়ীকো অভিবাদন করনা চাহিয়ে।

মা নর্মদাকে প্রণাম করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম পশ্চিমদিকে ; তাঁর তাঁবুর এলাকা পেরিয়ে প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পরেই নর্মদাতটেই একটি মন্দির দেখেই তিনি বললেন —

(১) ইয়ে হ্যায় ধূতপাপেশ্বর। স্কন্দস্বামী নে দেবসেনাপতি বনকর অসুরোঁ কা সংহার কিয়া। বহ্ য়হাঁ তপ করকে নিষ্পাপ বনে।

আমি লক্ষ্য করলাম তিনি আমাকে যে পদ্ধতিতে প্রণাম ও পূজা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেইভাবেই পূজা ও প্রণাম সারলেন। মন্দিরের দরজা নাই। নাগারা তাঁদের প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজা সারলেন।

(২) ধূতপাপেশ্বর মন্দির হতে নিয়ে গেলেন নিকটস্থ মার্কণ্ডেশ্বর তীর্থে। বললেন — স্কন্দকো বিজয়প্রাপ্ত করানে কে নিমিত্ত মার্কণ্ডেয় মুনি নে ইনকো স্থাপনা কী। এখানকার মন্দিরটির ভগ্নদ্দশা।

(৩) সেখান থেকে নিয়ে গেলেন ভোগেশ্বরের ঘাটে। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রণাম ও পূজা করে বললেন — স্কন্দজীকে সেনাপতি বননে পর দেবোঁ নে শিবজী কো হিঁয়া নানা ভোগ অর্পিত কিয়ে থে।

(৪) ভোগেশ্বর তীর্থ থেকে নিয়ে গেলেন নিষ্কলঙ্কেশ্বরের ঘাটে। সকলে নর্মদা স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। পূষণ গিরিজী বললেন — পরশুরামজীকো ক্ষত্রিয় বধ কা জো কলংক থা বহ্ পাপ য়হাঁ তপ করকে দূর হুয়া।

(৫) ইনকে বাদ উধর জো ঘাট দেখাই দেতে হৈ উহ্ হ্যায় রোহিনেশ্বর তীর্থ, নারদজী কী আজ্ঞা সে চন্দ্রকো বশ করনেকে লিয়ে রোহিনী নে য়হাঁ তপ কিয়া। য়হাঁ স্ত্রীয়োনে যাস্তি আতা হৈ। কেঁওকি, ইধর দান ধর্ম করনেসে উনকী পতিয়োঁ বশমেঁ হো যাতা হৈ। হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটলেন — আপকো নাগা লোককো পত্নীয়োঁকা বশ করনে কো জরুরৎ হো ত ইধর তপ করনে বলিয়ে জী। তাঁর কথায় সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

(৬) সেখান থেকে কয়েক মিনিট হেঁটেই আমাদেরকে নিয়ে চললেন আর একটি ঘাটে। বললেন — 'ইয়ে হ্যায় চক্রতীর্থ। স্কন্দকী প্রার্থনা পর ভগবান বিষ্ণুনে চক্রসে দৈত্যো কা বধ করকে চক্রকো ইধর নর্মদামেঁ ডাল দিয়া। নাগারা সেখানে নর্মদা স্পর্শ করার জন্য ঘাটে নামলেন। সেই সুযোগে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — নর্মদাতটমেঁ দেখতা হুঁ এক এক দেওতাকো নামমেঁ নর্মদা কা ঘাটমেঁ বহুৎসা তীর্থ বন গয়া। চাঁদোদমে দেখা উধর ভি ভগবান নে দৈত্য বধ করকে সুদর্শনচক্র ডাল দিয়ে থে। উহ্ তীর্থকী নাম — জলাশয়ী তীর্থ। কয়দফে ভগবান নে উনকী চক্র নর্মদামেঁ বিক দিয়ে থে।

— এক হি দৈত্য ত নেহি, হর যুগমেঁ হাজারো দৈত্যকো আবির্ভাব ঘটতা হৈ, ভগবান নে উনকো বধ করতা হৈ। নর্মদা স্পর্শ করনেসে ভগবান কী ভি ঈশীত্ব বশীত্ব প্রাকাম্য বগেরা দিব্যসিদ্ধি ঔর সুদর্শনকো ভি দিব্য শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হো যাতা হৈ। বেগর নর্মদামায়ী — তপঃশক্তি কৌন্ দে সকতা হৈ। ইসলিয়ে হরেক তীর্থ বনচুকা।

(৭) নর্মদা স্পর্শ করে আমাদের নাগারা ফিরে আসতেই পূষণ গিরিজী আমাদেরকে আর একটি ঘাটে এনে বললেন — ইয়ে হ্যায় কেদারতীর্থ। এক দৈত্যকে ভয় সে ভাগকর বদ্রী-কেদার য়হাঁ নর্মদা কিনারমেঁ আগয়ে থে।

এই কথা শুনেই আমি বললাম, তব ত ভগবন! বদ্রী-কেদারজীকে লিয়ে ইয়ে বহুৎ শরমকী বাত হৈ!

— নেহি জী, এভি হো সকতা হৈ, কোঈ মহাভক্তকী ইধর তপস্যাকী প্রভাব ঔর দর্শনকী লালচ আর্তিসে ভগবান কেদারবদ্রীজীকা রূপ লেকর নর্মদামে প্রকট হো গয়ে থে।

(৮) এখানে নাগাদের নর্মদার জলস্পর্শ শেষ হলে, তিনি আমাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন এক অতি প্রাচীন পাথরের মন্দিরে। তিনি নিজেই দরজা খুলে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর প্রণামের রীতি অনুযায়ী প্রণাম হয়ে গেলে তিনি সকলকে জানালেন — ইয়ে উত্তরেশ্বরজীকা মহাপুণ্যস্থান, ভগবান স্কন্দজীকো তপস্থলী হ্যায়।

মোহন্তজীসহ সকল নাগারা উত্তরেশ্বর মহাদেবের মাথায় জল ঢেলে বেরিয়ে এলে পূষণ গিরিজী মোহান্তজী এবং আমার হাত ধরে পুনরায় মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে ভাল করে শিবলিঙ্গকে দর্শন করতে বললেন। তিনি হাত দিয়ে ভাল করে মার্জনা করে দেখালেন প্রায় ছয় ইঞ্চি শিবলিঙ্গে অর্ধেক অংশ গোলাপী আভা এবং বাকী অধিকাংশ শুভ্র অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর। তিনি বললেন — উত্তরেশ্বরজী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। স্কন্দজী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত বিগ্রহ ভগবান সনৎকুমারের তপস্যাবলে ইনি প্রকট হয়েছেন। এই উত্তরেশ্বর নামটির তাৎপর্য গভীর অর্থবহ। আমার গুরুদেব পাথর গিরি মহারাজ আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মেরুদণ্ডের মজ্জার সঙ্গে যে স্থানে মস্তিষ্কের মজ্জার সংযোগ বা সম্মিলন ঘটেছে, সেই স্থানের নামই

প্রকৃত আজ্ঞাচক্র। মস্তিষ্ক মধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র হতে নিঃসৃত প্রাণাত্মার চিদাত্মক এই কেন্দ্র হতে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে বলেই এই কেন্দ্রের নাম আজ্ঞাচক্র। সুষুম্না এই স্থান হতে দুভাগ হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়েছে। আজ্ঞাচক্র হতে সম্মুখস্থ ললাট প্রদেশের অভ্যন্তরপথে অর্ধবৃত্তাকারে বেঁকে ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে তার একটি মুখ, অপর মুখটিও অর্ধবৃত্তাকারে বেঁকে ব্রহ্মরন্ধ্রের অপর পাশে গিয়ে ঠেকেছে বটে তবে সেটি গিয়েছে আজ্ঞাচক্রের পিছন দিক দিয়ে। এই উভয় পথই শূন্যনালা অর্থাৎ আকাশময়। ব্রহ্মতালুদেশে এই দুই মুখের মধ্যস্থলে ব্রহ্মরন্ধ্র ; ব্রহ্মরন্ধ্রের অর্থ, যে রন্ধ্র বা ছিদ্রপথে জীবাত্মার উৎক্রমণ ঘটে কিংবা যে রন্ধ্র দিয়ে পরমাত্মা শরীরস্থ সীমায়িত স্থানে এসে জীবাত্মা রূপে প্রকট হন।

সুষুম্নার যে দুটি ভাগের কথা বলেছি তার একটির নাম উত্তরা সুষুম্না, অপরটির নাম অপরা সুষুম্না। আজ্ঞাচক্রের নিচের মণ্ডলগুলি দক্ষিণাপথ, দক্ষিণায়নের পথ। এইজন্য মূলাধার স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি ভেদ করে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারলেও, যতই অলৌকিক সিদ্ধি এবং দিব্যানুভূতি লাভ করুন না কেন সাধককে পুনরাবর্তন করতেই হয়, অন্ততঃ তাঁর পুনরাবর্তনের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু উত্তরা সুষুম্মা পথে গমন করতে পারলে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। উত্তরা সুষুম্মার পথই উত্তরাপথ, উত্তরায়ণের পথ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মমার্গ।★ ব্রহ্মবিদ্যার রাজপথ। ভগবান সনৎকুমার বা স্কন্দজী নর্মদাতটের এইস্থানে তপস্যা করার ফলেই তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যার রাজপথ, উত্তরাপথ প্রকটীভূত হয়েছিল এবং সেই পরম পুণ্যলগ্নে স্বয়ম্ভূ প্রকট হন। সেইজন্যই এখানে স্বয়ম্ভুর নাম উত্তরেশ্বর আর এইজন্যই স্কন্দকে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যার নিধি। দেবর্ষি নারদ এবং মহামতি বিদুর তাঁর কাছ হতেই এই দেবদুর্লভ পরমাবিদ্যা লাভ করেছিলেন।

মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন — এখন আমার আখড়াতে ফিরে যাই চলুন। আমার ইচ্ছা, আপনারা কাল এই মন্দিরে এসে যে যতটা সময় ব্যয় করতে পারবেন, ততই মঙ্গল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে অঙ্গুলি সংকেত করে পশ্চিমদিকে দেখালেন যে, ধূতপাপেশ্বর মন্দিরই সিনোর বা সেনাপুরের শেষ সীমা। সেখান থেকে দশমিনিট হেঁটে গেলেই যে কোটীশ্বর তীর্থ পাবেন। সেটিও স্কন্দতীর্থ।

তাঁবুতে প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি জগদানন্দকে বললেন — ভিক্ষার ব্যবস্থা করতে। আসার সময় তাঁর মূল তাঁবুর পিছনে একটা প্রায় ২০০ ফুট লম্বা একতলা ব্যারাকবাড়ী চোখে পড়ল। তিনি সেইদিকে গেলেন, আমরা আমাদের নির্দিষ্ট তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম। মতীন্দ্রজীর ঘড়িতে দেখলাম বেলা একটা বেজেছে। মিনিট পাঁচেক পরেই আমাদেরকে একজন নাগা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন সেই ব্যারাকবাড়ীতে। আজ সেখানেই আমাদের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। নর্মদার দিকে মুখ করে যে সুদীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দা আছে, সেখানে বসেই আমরা ভোজনপর্ব শেষ করলাম। তিনি নিজেও আমাদের সঙ্গে বসে চারখানা চাপাটি এবং পুয়াখানিক দই খেলেন।

---

* উৎসাহী পাঠক লেখক প্রণীত 'পিতরৌ' গ্রন্থের ১০-১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়লে উত্তরাপথ, উত্তরা সুষুম্না সম্বন্ধে সচিত্র তথ্য সবিস্তারে জানতে পারবেন।

হাত মুখ ধুয়ে আমরা তাঁবুতে ফিরে বিশ্রামের জন্য যে যার আসনে শুয়েছি, এমন সময় পূষণ গিরিজী আমাদের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন। তাঁর পিছন পিছন ঢুকলেন এক নাগা হাতে একটি প্রকাণ্ড তাকিয়া নিয়ে। গেরুয়া কাপড়ে আচ্ছাদিত সেই তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে তিনি মোহান্তজীর কাছেই অর্ধশায়িত হলেন। মোহান্তজী বললেন — গিরিজী এতনা ভূরি ভোজকা সামান আপকা পাশ কাঁহাসে আতা হৈ।

— রেবামায়ীকী কৃপাসে সব কুছ আ যাতা হৈ। হম লে আতা হৈ থোড়ি। ধূতপাপেশ্বর তীর্থ সে আনেকা বখৎ আপনে ক্যা আগলবগলমেঁ দেখা কি নেহি, সিনোর ছোটা সা শহর বন যাতা হৈ। ইধর ক্ষেতি উতিমেঁ ফসল ভি য্যাদা হোতা হৈ, দোকান পসরা সব কুছ হ্যায়, কৌঈ চিজকা কমি নেহি।

আচ্ছাজী, আপতো জরুর গঙ্গোনাথ ইয়া কহ্লোড়ীনাথ হোকর আয়ে হোঙ্গে। উধর ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীজী কা আশ্রম কা ক্যা হালৎ হৈ? হমনে দো দফে উনকো দর্শন কিয়, মহা তপস্বী থে।

মোহান্তজী বললেন — তাঁর গদীতে এখন বসছেন পৃথ্যানন্দ ব্রহ্মচারীজী, বড়া গুরুভক্ত হৈ। আচ্ছিতরেসে আশ্রমকা সেবা করতা হৈ। তিনি আমাদের খুবই যত্ন করেছেন, গো-সেবা অতিথি সেবার ধারাও বজায় রেখেছেন। তাঁর কাছে তাঁর গুরুর বহু অলৌকিক সিদ্ধির গল্প শুনে এলাম। তাঁর যেদিন দেহান্ত হয়, আশ্রমের সবাই যখন তাঁর সলিল সমাধির আয়োজন করতে ব্যস্ত, তখন নাকি ডাকোর থেকে একজন ভক্ত সন্ধ্যাকালে এসে জানায় যে সেদিন সকাল দশটায় তিনি সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদেরকে ভাণ্ডারা দিয়েছিলেন। অথচ সেই দিন ব্রাহ্মমুহূর্তেই তাঁর নাকি দেহান্ত হয়। তারপর দিনই কয়েকজন ভীল এসে আর এক আশ্চর্যকর সংবাদ দেয় যে, তারা সকাল ৭টার সময় ঝুলি কাঁধে তাঁকে চাঁদোদের দিকে যেতে দেখেছেন। তাদের বর্ণিত সময় মিলিয়ে দেখা যায়, সে সময় তিনি মহাসমাধিতে প্রবিষ্ট হয়েছেন! আপনি বলতে পারেন এইরকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা কিভাবে ঘটে ?

— যে সকল মহাযোগী কায়কল্পের সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁদের পক্ষে এইরকম অত্যাশ্চর্যভাবে জীর্ণদেহ ত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেহ গ্রহণ করা বা পূর্বদেহের অনুরূপ আর এক দেহ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আমি গুরুজীর মুখে শুনেছিলাম তিনি এই নর্মদাতটের ওঁকারক্ষেত্রে একজন ৫০০/৬০০ বৎসরের কায়সিদ্ধ মহাযোগীর একবার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি নাকি তাঁর সেই দিদ্ধদেহে এখনও বর্তমান। এই তপোভূমিতে সবই সম্ভব। একমাত্র নর্মদার তট ও হিমালয়ের শতোপন্থ ছাড়া কোথাও এই ধরণের মহাযোগীরা বাস করতে পারেন না। এই দুটি স্থানে যেমন বিশুদ্ধ বাতাবরণ এবং শুদ্ধ চিৎকণার প্রবাহ বর্তমান, তেমনটি আর ভারতবর্ষের কোথাও নেই।

তাঁর কথা শুনতে শুনতে বারবার মহাত্মা প্রলয়দাসজীর কথা মনে পড়ছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, তাঁর গুরু পাথর গিরিজী নিশ্চয়ই ওঁকার তীর্থে মহাত্মা প্রলয়দাসজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সেইকথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তা লক্ষ্য করে পূষণ গিরিজী বললেন — ক্যা আপ্‌কো নিদ্ আতে হৈ, নেহিত দুসরা কুছ শোচতে হো?

আমি প্রলয়দাসজীর প্রসঙ্গ চেপে গিয়ে বলে বসলাম — ২১/২২ বৎসর আগেও বাংলাদেশে এইরকম একজন মহাযোগী বিরাজমান ছিলেন। যাঁকে দেহান্তের পর গঙ্গোনাথের

ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর মতই অন্যত্র হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছিল। তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাঁর পুণ্যসঙ্গ করেছিলেন, এমন দু'পাঁচজন লোক এখনও জীবিত আছেন। তাই আপনি যে বলছেন, নর্মদাতট এবং হিমালয়ের শতোপন্থ ছাড়া ভারতের অন্য কোন স্থানে কায়কল্পধারী কোন উচ্চকোটির মহাযোগী বাস করতে পারবেন না, একথা মানতে পারছি না। তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

তুমি ত বলছ বাংলাদেশের সেই মহাযোগী ২১/২২ বৎসর আগে জীবিত ছিলেন। তাহলে ত তখন তুমি জন্মাও নি। জন্মালেও নিতান্ত শিশু ছিলে।

— না, আমি সে মহাপুরুষকে দেখিনি, তবে ১৩৪২ সালে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামক একটি পুরাতন মাসিক পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) আমি সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে বিবরণ পড়েছি। ঐ পত্রিকা ছিল জগৎ প্রসিদ্ধা ব্রহ্মবিদ্যার সাধিকা শ্রীমতী এ্যানি বেসান্ত নামক এক বিদেশী মহিলা প্রতিষ্ঠিত থিয়োসফিকাল সোসাইটির মুখপত্র। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মনীষী নীতিনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই ঐ পত্রিকার লেখক, সম্পাদক এবং পরিচালক হতে পারতেন। তাই সেই বিবরণ আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

— কহিয়ে, কহিয়ে উন্ মহাযোগীকো বিবরণ শুনাইয়ে।

সকলের আগ্রহ দেখে আমি বলতে লাগলাম — পূর্ববঙ্গে মেঘনা নদীর তীরবর্তী সেরাজাবাদ গ্রামে সুধারাম নামে একজন বাউল এসে ঝোপড়া বেঁধে বাস করতে থাকেন। বাউলরা হেথায় সেথায় যেখানে ইচ্ছা বাস করে থাকেন আবার কিছুকাল পরে হয়ত অন্যত্র চলে যান। কাজেই ৬০/৭০ বয়স্ক এই সুধারামকে দেখে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সুধারাম ছিলেন সরল প্রকৃতির নির্বিকার সদানন্দ সাধুপুরুষ। তিনি নানাস্থানে উদাসীনের ন্যায় ঘুরে বেড়াতেন। তখন দেশে বেশী ডাক্তার কবিরাজ ছিল না, বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের লোকরা সাধু সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ তুক্‌তাক্ বা ঝাড়ফুঁক বেশী বিশ্বাস করতেন। কারো কোন অসুখ হলে সুধারামের ডাক পড়ত, সুধারামও হাসিমুখে উপস্থিত হয়ে যার অসুখ তার নাম ধরে ডেকে বলতেন — ওঠরে! ওঠ তোর জ্বর ত সেরে গেছে! কঠিন নিমুনিয়া রোগীকে বলতেন — ওঠ্ ওঠ্ মেঘনায় স্নান করে এসে পান্তা ভাত খাগে যা।'

বলা বাহুল্য, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ঐসব রোগীরা সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে যেতেন! 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় 'সুধারাম' সম্বন্ধে যিনি লিখেছিলেন, তিনি নিজে ছিলেন সেরাজাবাদ গ্রাম সংলগ্ন বাঘিয়া গ্রামের অধিবাসী। তাঁর এক কাকা একবার দুরারোগ্য উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন মৃতপ্রায় তখন লেখকের পিতা গিয়ে সুধারামের করুণা ভিক্ষা করেন। সুধারাম সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে রোগীকে বলেন — 'তোর খেতে কি ইচ্ছা করে! রোগী উত্তর দেন — শোলমাছ ও লাউ এর তরকারী খেতে ইচ্ছা করে!' তাই খাগে যা, তবে বাবার নামে অর্থাৎ মহাদেবের নামে নিবেদন করে খাবি'— সুধারাম এই উত্তর দিয়ে চলে যান। মৃতপ্রায় রোগী তাই খেয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠেন।

একবার সুধারাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীনগরের সম্ভ্রান্ত জমিদার কৃষ্ণকুমার বসুর নিকট গিয়ে তাঁর বাসের উপযোগী একটু স্থান প্রার্থনা করলেন। জমিদার তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ পাটোয়ারী বুদ্ধিতে উত্তর দেন — দেখছ না মেঘনাতে কিরকম প্রবল ভাঙ্গন ধরেছে। গ্রামকে

গ্রাম ধুয়ে মুছে চলেছে; রাক্ষসী নদী মেঘনা। আমার যা আছে, তাই যায় যায় করছে। এমতবস্থায় তোমাকে একটুখানি জমি কোথা থেকে দিই? সুধারাম তাঁকে উত্তর দেন — আচ্ছা, আমি নদীর গতি ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনার প্রজাদেরকে বলুন নদীর দিকে বসে বাহ্যকৃত করতে। সেরাজাবাদ গাঁ ত নদীগর্ভে ভেঙে পড়েছে, নদীর পাড়ে শ্মশানেই একটু জায়গা দিন। জমিদার ভেবে দেখলেন — নদীপাড়ের শ্মশান ত আর একটা বর্ষাও টিকবে না, কাজেই তিনি সুধারামকে তাঁর প্রার্থিত স্থানটুকু দিলেন। সুধারাম সেখানেই আখড়া স্থাপন করলেন। সে আখড়া আজও সেখানে বর্তমান। জমিদারের নির্দেশে এবং সুধারামের প্রতি ভক্তিবশতঃ জনসাধারণ নদীর পাড়ে বসেই বাহ্যকৃত্য করতে লাগল। কয়েকমাস পরেই দেখা গেল, নদীর গতি ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছে। বর্তমানে মেঘনা নদী সেরাজাবাদ হতে তিন চার মাইল দূরে অবস্থিত।

একবার সুধারাম সেরাজাবাদের নিকটস্থ পল্লী পুরুয়া নামক গ্রামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন কয়েকজন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোক কলেরায় মৃত একটি মেয়েকে দাহ করার জন্য চিতা সাজাচ্ছে। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বলেন, মেয়েটিকে যদি আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, তাহলে তাকে দান করবে কি না। তারা ভাবল, মেয়েটি ত মারাই গিয়েছে, সাধুর কৃপায় যদি বেঁচে উঠে ভালই। এই ভেবে তারা সম্মতি জানাতেই, সুধারাম মৃতদেহে পদাঘাত করে বললেন — ওঠ, ওঠ আর কত ঘুমাও? মেয়েটির নাম ছিল যমুনা। সাধুর পাদস্পর্শে সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। সুধারাম তাঁকে নিজের কন্যার মত প্রতিপালন করেছিলেন।

এই ঘটনার পরেই সুধারাম 'সিদ্ধপুরুষ সুধারাম' নামে বিখ্যাত হন। মেঘনা নদীর ধারে বসে নদীর ধারার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গাইতেন —

'জল বলে চল্ মোর সাথে চল্
তোর আঁখিজল হবে না বিফল।'

কখনও বা গাইতেন —

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে।
সুখের পিছে মরি ঘুরে
তাই তো রে সুখ পালায় দূরে —
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ,
বন্ধ মনের সিন্দুকে !

পূর্ববঙ্গে একবার হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সে সময় সিদ্ধপুরুষ সুধারাম হিন্দু ও মুসলমান পল্লীতে ঘুরে ফিরে গাইতেন —

মন্দিরে মসজিদে লড়াই
প্রবেশ করে দেখবে দু-ভাই
অন্দরে যে একজনাই।
ও তার অন্তরে যে একজনাই।

পরিণত বয়সে সুধারাম 'শিবম্ শিবম্' বলতে বলতে দেহ রক্ষা করেন। সেরাজাবাদের দু'মাইল উত্তরে সাকোহাটি নামক গ্রামে একটি খাল আছে। যে সময়ে সুধারামের দেহান্তর ঘটে, ঠিক তার অল্প পরেই সেরাজাবাদ নিবাসী দুজন লোকের সঙ্গে খেয়াঘাটে সুধারামের সাক্ষাৎ হয়। সুধারাম খাল পার হওয়ার জন্য যেন ব্যস্ত। তিনি কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করলে সুধারাম বললেন, তিনি আবদুল্লাপুরের আখড়ায় যাবেন। তারপরে সেই দুজন সেরাজাবাদে এসে শুনলেন সুধারামের দেহান্তর ঘটেছে। তাদের কাছে এই সংবাদ শুনে গ্রামবাসীরা বিস্মিত হয়ে আবদুল্লাপুরের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর জনৈক ভক্তের বাড়ীতে তারা শুনল — কিছুক্ষণ পূর্বেই সুধারাম সাধু তাড়াতাড়ি শাকান্ন দুটি খেয়ে ঢাকার দিকে চলে গেছেন! এরপর সুধারামকে আর কেউ কখনও দেখতে পান নি।

আমি সুধারামের জীবন-চরিত বর্ণনা করে মহাত্মা পূষণ গিরিজী এবং মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গোনাথের মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীজীর দেহান্তের দিনেই অপরাপর স্থানে দেখতে পাওয়ার যে কথা তাঁর শিষ্যের কাছে শুনে এসেছি, সিদ্ধ পুরুষ সুধারামের জীবন-বৃত্তান্তে তার কম কি কিছু পাচ্ছি? যে অলৌকিক দিব্য বিভূতির প্রকাশ নর্মদাতটের ঐ মহাত্মার মধ্যে দেখা গিয়েছিল, মেঘনাতটের সিদ্ধপুরুষ সুধারামের মধ্যেও কি সেইরকম দিব্যলীলা দেখা যায় নি? অধ্যাত্ম রাজ্যে **The far and no further** বলে কোন কথা থাকতে পারে না। তাই বলছিলাম নর্মদাতটের বিশুদ্ধ বাতাবরণ ছাড়া অন্য স্থানে মহাযোগীরা বাস করতে পারেন না, একথা সর্বান্তঃকরণে আমি মানতে পারছি না। মা নর্মদার তটে তটে বহু বহু ঋষি ও মহাযোগীর সর্বসিদ্ধির সুযোগ করে দেন স্বয়ং মা নর্মদা, একথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করে নিয়েই আমার মনের ভাব প্রকাশ করলাম, আপনারা কোন অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

— নেহিজী, নেহিজী আপনে জো মহাপুরুষকী কিস্যা শুনায়া উস্‌মে হমলোগ বহুৎ খুশ্ হুয়ে।

এইভাবে গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পূষণ গিরিজী তাঁর মূল তাঁবুতে ফিরবার আগে মোহান্তজীকে বলে গেলেন, আজভি সান্ধ্যক্রিয়াকী বাদ বাঙালী ব'বাকো হমারা পাশ কৃপায়া ভেজ দেনেসে হম বহোৎ খুশ্ হোঙ্গে।

তিনি চলে যাওয়ার পরেই মোহান্তজী আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে নর্মদা প্রণাম করিয়ে আনলেন। আমাদের সন্ধ্যার কার্য যখন শেষ হল, তখন রাত্রি ১০টা বাজতে মাত্র ১৭ মিনিট বাকী। মোহান্তজী বললেন — তুমি এবারে পূষণ গিরিজীর কাছে চলে যাও। বেচারা একা থাকেন। শাস্ত্রচর্চা বা শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ নিয়ে মনের আনন্দে কথা বলার মত সমঝদার লোক পান না, তাই তোমাকে ডাকেন। আমি এই ভেবে আনন্দিত যে তোমাকে তাঁর ভাল লেগেছে। অথচ বাইরে দেখ তাঁর কত দুর্ণাম। সাধুদের কাছে তিনি যেন মূর্তিমান আতঙ্ক। মা নর্মদার দ্বারপালের মত কাজ করছেন উনি। বাইরে ভৈরব মূর্তি ভিতরে কত রসিক!

আমি চলে গেলাম মহাত্মার কাছে। পাঁচমিনিট পরেই তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন নর্মদার তট ধরে। আজ ১৩৬১ সালের ৫ই কার্তিক শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি। চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। হিমেল বাতাস বইছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। যে যার তাঁবুতে

হয় শুয়ে পড়েছেন নতুবা সাধনায় বসেছেন, কিছুই দেখা যাচ্ছে না; কেবল উর্ধাকাশে কতকগুলি তারা ঝিকমিক্ করেছ। আমি অনুমান করলাম, তাঁর তাঁবুর সীমানা পেরিয়ে আজ দুপুরে যে তীর্থগুলি দেখাতে এসেছিলেন, সেই পথেই আমাকে নিয়ে চলেছেন। মিনিট পনের হাঁটার পরেই একটি মন্দিরে এসে বললেন — ইয়ে হ্যায় উত্তরেশ্বর তীর্থ, ভগবান স্কন্দকী তপঃস্থলী।

মন্দিরের মূল দরজায় সামনে দুজন বসলাম নর্মদার দিকে মুখ করে। আমাকে বললেন, ভগবান সনৎকুমারের এই তপস্থলীতে যুগ যুগ ধরে কত যে মুনি ঋষি তপস্যা করে কৃতকৃত্য হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এখানকার ইথারে, এখানকার বায়ুমণ্ডলে চিদ্‌রশ্মি সততই কম্পমান। ধ্যানস্থ হলেই সাধক মাত্রেই তা অনুভব করতে পারেন। তোমাকে গত রাত্রিতে যেসব ক্রিয়া দেখিয়ে ছিলাম, কমণ্ডুলুর জলে আচমন করে সেইগুলি এক এক করে দেখাও ত।

আমি ক্রিয়াগুলি দেখাতেই তিনি বললেন — থোড়াসা গলতি আভিতক্ হ্যায়। পহেলে হমারা পাশ থোড়া শুন লিজিয়ে।

এই বলে তিনি যা বললেন তার সরল বাংলা হচ্ছে — 'আমাদের সৃষ্টির প্রথম পরিচয় আমাদের বিরাজিত প্রত্যক্ষ পদার্থ সমূহ। বৃহতের দিকে সৃষ্টির অনুসন্ধান চলে না, কারণ পৃথিবীতে বৃহৎ কিছু, এইসব পদার্থেরই স্তূপ। অতি বৃহৎ তারকাদির পরিচয় পাওয়া যায় আলোর মারফৎ, যা সূক্ষ্ম পদার্থের খবর নিয়ে আসে। সুতরাং মূলের অনুসন্ধান করতে সূক্ষ্মের দিকেই যেতে হয়, একথা সবাই জানে, পুঁটলীতে কি আছে তা দেখতে হলে পুঁটলী খুলতে হয়। যাবতীয় পদার্থ ক্রমাগত বিশ্লেষণ ক্রমে তা দৃষ্টিশক্তির বাইরে চলে যায়। তখন অনুমান করতে পারি যে ঐ সূক্ষ্মতম পদার্থ হয় সূক্ষ্মভাবে অসীম অনন্তে মিলিয়ে গেছে অথবা শেষ সীমায় ক্ষুদ্রাকারে অনু-পরমাণুরূপে অবিভাজ্য সত্তায় বর্তমান থাকতে পারে। যে কোন মানুষ এখানে একজন সাধকের কথাই ধর, তাঁর শরীরের কেন্দ্রবস্তুগুলি একত্র করলে একটি আলপিনের মাথারও সমান হবে না। এইভাবে পদার্থের কেন্দ্রবস্তুগুলি একত্রিত না হবার কারণ এই যে কেন্দ্রবস্তুর চারদিকেই পরমাণুরই অংশ কতকগুলি ইলেকট্রন কণা, কেন্দ্রবস্তুর মাপে বহু দূরে দূরে দ্রুতবেগে নির্দিষ্ট পথে ঘুরতে থেকে পরমাণুর আকার নির্দেশ করে চলেছে। প্রতি পরমাণুতে প্রোটন নির্দিষ্ট সংখ্যায় একটি মাত্র জড় কেন্দ্রবস্তু আছে। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে তাল রেখে বলা যায় এই জড় কেন্দ্রবস্তু হল তাঁর মন। কিন্তু পরমাণুর পরিধিতে বহুসংখ্যক হাল্কা ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন যেমন থাকতে পারে, তেমনি মনের মধ্যেও আছে অনেক পূর্ব পূর্বজন্মকৃত ভাবকণা। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুগুলি বিভিন্ন কিন্তু সব পরমাণুর ইলেকট্রনই এক জিনিষ। প্রোটন ও নিউট্রনে গঠিত একটি মাত্র অতিসূক্ষ্ম কেন্দ্রবস্তু পরমাণুর মধ্যে থাকে। তার চতুর্দিকে পরমাণুর পরিধিতে প্রায় বৃত্তাকারে কতকগুলি ইলেকট্রন বিপরীত বিদ্যুৎবাহী প্রোটনের আকর্ষণে, দড়িতে বাঁধা ঢিলের মত কতকগুলি খোলসে, ভাগে ভাগে, নির্দিষ্ট বিভিন্ন পথে, কখনও পথভ্রষ্ট না হয়ে বিনা মিলনে দ্রুতবেগে আয়তনের আন্দাজে বহু দূরে দূরে থেকে অনবরত ঘোরে। ঠিক এই রকমই ঘটনা বৈজ্ঞানিক নিয়মে ঘটে যখন সাধক মনের বিভিন্ন ভাবকণা একমুখী করার চেষ্টা করেন। আজকাল বিজ্ঞানীরাই এ রহস্য জানতে পেরেছেন যে, পদার্থ মাত্রেরই অনু-পরমাণুগুলি

সর্বদাই কম্পমান একটা কিছু ঢেউ বা রশ্মি বিকীরণ করে থাকে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও দেখা গেছে সাধকের মনঃকেন্দ্র যা সাধকের স্থূল দেহের কেন্দ্র, তা যতই চিন্ময় বীজমন্ত্র জপ বা চিন্ময় নিত্য বস্তুর ভাবনা করতে থাকে, ততই তাঁর সেই ভাবনা সঞ্জাত অনু-পরমাণু হতে কম্পমান চিদরশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা যেমন এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হয়েছেন যে, কেন্দ্রের উপর দূরত্বের ইলেকট্রনের বেগ নির্ভর করে, কারণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী ইলেকট্রন কেন্দ্রের আকর্ষণ বেশী থাকে এবং তার আকর্যণের জন্য বাইরে ছিটিয়ে পড়ার চেষ্টাও বেশী থাকে সুতরাং তার ঘুরবার গতিও বেশী হয়। এইজন্য কেন্দ্রের নিকটস্থ পথের ইলেকট্রনের শক্তিও বেশী হয়। ঠিক এই রকমই সাধক যখন বিশ্বজগৎ ও বিশ্বাতীত জগতের মূল কেন্দ্র বিশ্বন্তরতত্ত্বে লীন হন, তখন তাঁর আত্মা আমাদের পরিভাযায় পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়ে গেলেও, তিনি যেখানে বসে এই পরম চিন্ময় অবস্থা লাভ করেন সেখানের ইথারে বায়ুমণ্ডলে যে বেগের সৃষ্টি হয়, যে চিদ্‌কণার তড়িৎরশ্মি ঘূর্ণমান থাকে, তার কোনদিন লয় হয় না। সাধকের তীব্র ঊর্ধায়িত গতির তাল ও ছন্দ সেখানে অবিনাশী অবস্থায় থেকে যায়। কাজেই যুগ যুগ পরেও কেউ যদি সেই মণ্ডলে সেই স্থানে বসে চিৎ-এরই সাধনায় মগ্ন হয়, তাহলে সমজাতীয় বস্তু যেমন সমজাতীয় বস্তুকে আকর্ষণ করে তেমনি সেইখানকার পরিমণ্ডলে যে কম্পমান রশ্মি থাকে তা ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে সাধকের মনবুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধের পথে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এইজন্য কোন সিদ্ধ সাধকের তপস্থলীতে বসে ধ্যান জপের গুরুত্ব এত বেশী। নর্মদাতটের প্রায় প্রতিটি স্থানে বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত কত যে লক্ষ লক্ষ সাধক সিদ্ধকাম হয়েছেন তার কেউ কখনও ইয়ত্তা করতে পারবে না। পূর্ব যুগের মহাযোগীদের এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিদের তপস্যা সঞ্জাত চিদ্‌কণা এ যুগের ঋষি ও সাধকদের সাহায্য করে থাকে। অনুলোম ও বিলোম ক্রমে সিদ্ধবীজ জপ করলে সিদ্ধ ঋষিদের সিদ্ধ পরিমণ্ডলে অনুস্যুত বীজ অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে প্রকট হয় এবং প্রকট হয়ে তাঁর মন্ত্রনিহিত চিদ্‌কণাকে ঊর্ধের পথে টেনে নিয়ে যায় এমন কি সেই স্থানের সিদ্ধ মহর্ষিরও অনেক সময় আবির্ভাব ঘটে যায়। এইজন্যই তোমাকে বলছি নর্মদাতটের যে স্থলেই রাত্রি কাটাবে সেইখানেই অনুলোম বিলোম পদ্ধতিতে ইষ্টবীজ জপ করবে।

অনুলোম শব্দটির অর্থ — প্রথম হতে শেষ এবং বিলোম অর্থ — শেষ হতে প্রথম। বিষয়টি আরও স্পষ্টীকৃত করার জন্য আমি একটি সংস্কৃত শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন ধর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে —

একবর্গ-সমুদ্ভূতং চতুর্বর্গ-ফলপ্রদং।
অনুলোম-বিলোমভ্যাং যস্য নাম সপাতুবঃ॥

অর্থাৎ কোন দেবতার নাম একবর্গ সমুদ্ভূত হলে যেমন ধর একই ৩য় বর্গ হতে উৎপন্ন একটি দেবতার নাম — নন্দনন্দন। এই শব্দটির প্রত্যেকটি বর্ণ ৩য় বর্গ হতেই সমুৎপন্ন হয়েছে। শব্দটিকে অনুলোম বিলোম ক্রমে একবার প্রথম থেকে শেষ আর একবার শেষ থেকে প্রথম উচ্চারণ বা জপ করলে একই থাকে। কাজেই শ্লোকটির অর্থ দাঁড়াল 'নন্দনন্দন' শ্রীকৃষ্ণ অনুলোম বিলোম ক্রমে পঠিত হলে চতুবর্গ ফল প্রদান করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদেরকে রক্ষা করুন। প্রশ্ন উঠতে পারে কারও বীজ যদি কৃষ্ণবীজ হয় তাহলে কৃষ্ণশব্দের

প্রতিশব্দ 'নন্দনন্দন' শব্দটি নির্বাচন করে প্রথমে কিছুক্ষণ 'নন্দনন্দন' জপ করে পরে অনুলোম বিলোম ক্রমে জপ করতে হবে। কিন্তু যদি ধর কারও যদি গুরুদত্ত বীজ একাক্ষরী ''ক্রীং'' হয় তাহলে ত তা অনুলোম বিলোম ক্রমে সর্বাবস্থায় একই থাকবে তখন তা জপ করার পূর্বে কালীর এমন কি নাম আছে যা অনুলোম বিলোম ক্রমে প্রথমে জপ করে পরে মূল বীজ জপ করা যাবে? কালীর অপর নাম 'কালিকা', এই শব্দটি অনুলোম বিলোম ক্রমে জপ করলে নন্দনন্দনের মত একই থাকে।

আমি প্রশ্ন করলাম — আপনি ত বলেছেন একই বর্গ সমুদ্ভূতং। কালিকা শব্দটি ত এক বর্গ সমুদ্ভূত হল না। ক বা ল এক বর্গ হতে উৎপন্ন নয়।

— তা নয়, তবে কালীর এমন প্রতিশব্দ আছে যা একবর্গ সমুদ্ভূত অথচ অনুলোম বিলোম ক্রমে জপ করলে একই থাকবে। তোমার ত ইষ্টবীজ কালীর নয়, কাজেই এবিষয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। যাঁর ইষ্টদেবতা কালী হবেন, তার গুরুই তাঁকে সেই নাম বলে দিবেন। তুমি ত মহর্ষি তণ্ডিকৃত স্তবরাজ পড়েছ সেখানে মহাদেবের ১০০৮টি নামের মধ্যে মহাদেবের এমন নাম আছে, যা অনুলোম বিলোম ক্রমে একই অবস্থায় থাকে। তোমাকে ইতিপূর্বে কোন মহাপুরুষ তা বলে দিয়েছেন, তা ত তোমার মধ্যে ঘুটঘুট করছে দেখতে পাচ্ছি। কাজেই বৃথা বাক্য ব্যয়ে সময় নষ্ট না করে এখানে জপে মন দাও। আমি আর একবার বাহ্যক্রিয়া এবং আন্তর ক্রিয়াগুলি দেখিয়ে দিচ্ছি।

দয়ালু মহাত্মা আমাকে ক্রিয়াগুলি পুনরায় দেখিয়ে দিবার পর আমি নিজের ইষ্টবীজ অনুলোম বিলোম ক্রমে জপ করতে লাগলাম...। আমার জপ যখন শেষ, হল তখন গাছেপালায় ঘন কুয়াশার জন্য অন্ধকার থাকলেও বুঝতে পারলাম সকাল হয়ে আসছে। আমি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন — আমাকে নয় প্রণাম কর মা নর্মদাকে, প্রণাম কর এই স্কন্দতীর্থ তথা বিদুরতীর্থকে। অতঃপর কোন সিদ্ধ তপস্থলী পেলে সেখানে অনুলোম বিলোম ক্রমে জপ করতে ছেড়ো না। এইবলে তিনি হাত ধরে ধরে নর্মদার ঘাটে এনে নর্মদাকে প্রণাম ও স্পর্শ করালেন।

তিনি ধরে ধরেই আমাকে নিয়ে এলেন তাঁর তাঁবুতে। সকাল হয়ে গেছে। আমি তাঁর তাঁবুতেই শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, বেলা দশটা বেজে গেছে। বললেন মোহান্তজী এসেছিলেন তোমার খোঁজ করতে আমি বলেছি তোমার তবিয়ৎ ঠিক নাই। তাঁরা আমার কথা মত উত্তরেশ্বর তীর্থে গেছেন পূজা করতে। তুমি স্নান করে সূর্যার্ঘ্য প্রদান ও তর্পণ করে এসো।

আমি তাঁকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনার পূষণ নামটি কে রেখেছিলেন?

— কেঁও? মেরে গুরুজীনে 'পূষণ' নাম দিয়ে থে।

আমি বললাম এটি পবিত্র ঔপনিষদিক নাম। ঈশোপনিষদের ১৫ নম্বর মন্ত্রটি হল —

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

অর্থাৎ, হে জগৎ-পোষক সূর্যদেব! তোমার সুবর্ণজ্যোতির্মণ্ডলের দ্বারা তোমার অমৃতরূপ আবৃত রয়েছে, তোমার সেই সত্যস্বরূপ উপলব্ধির জন্য এ আবরণ অপাবৃত কর।

— ছোড়িয়ে জী, হম বিকট হ্যায়, পাযাণ গিরি হ্যায়, এহি নাম জো চলতা হ্যায়, উসকো চলনে দো।

আমি স্নান করতে গেলাম। তিনি ভিখনদাস নাম একজন নাগাকে আমার সঙ্গে দিলেন। স্নান তর্পণাদি সেরে এসে দেখলাম, মোহান্তজীর দল এখনও ফেরেন নি। মহাত্মা আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন — তোমাকে এই দুদিন ধরে যা বললাম, তা ডায়েরীতে লিখে আমাকে দেখাও। আমি তাঁর আদেশমত সবকিছু লিখে তাকে দেখিয়ে সংশোধন করে নিলাম। বেলা প্রায় একটা নাগাদ্ মোহান্তজী সশিষ্যে ফিরলেন উত্তরেশ্বর মন্দির হতে। আমাকে দেখেই তিনি সস্নেহে আমার বুকে মাথায় হাত দিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন — আভি ক্যায়সা হৈ? আভি ক্যায়সা হৈ? পণ্ডিত কবিরাজকে বললেন নাড়ী দেখতে। আমি তাঁকে বললাম — আপনি চঞ্চল হবেন না। এখন বিলকুল আরাম বোধ করছি। আমি দেখেছি সব আয়োজন প্রস্তুত হয়েছে আমার খুব খিদে পেয়েছে, আগে খেয়ে নিই চলুন। আমার কথা শেষ হতে না হতেই জগদানন্দজী এসে সবাইকে ডেকে নিয়ে গেলেন। ভিক্ষাপ্রাপ্তির পর্ব শেষ হল, তখন বেলা ২টা ১৫ মিনিট। আমরা প্রায় ৫টা পর্যন্ত বিশ্রাম করে নর্মদাতটে বেড়ানোর জন্য বেরিয়ে পড়লাম, তট ছেড়ে পাশাপাশি দু'একটি মহল্লা ঘুরে ফিরে আসতেই সন্ধ্যা হল। পূযণ গিরিজীর সঙ্গে দেখা করে মোহান্তজী সহস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, আজ আর তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে না। কাল সকালে যখন যাত্রা করবে, আমার সঙ্গে দেখা হবে না। সকলকেই তিনি আশীর্বাদ জানিয়ে মোহান্তজীকে আলিঙ্গন করলেন। আমরা তাঁবুতে ঢুকে সান্ধ্যক্রিয়ায় বসলাম। সন্ধ্যা সেরে মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সমুদ্রতীরস্থ পুরীধামে শীত কম লাগে, কিন্তু এখন দেখছি রেবাসংগমের যতই কাছাকাছি হচ্ছি, শীতের প্রকোপ যেন বাড়ছে। তিনি উত্তর দিলেন, এখানকার জলবায়ু আলাদা। সমুদ্র এখনও অনেক দূরে। আমরা আগামীকাল মালসর নামক স্থানে পৌঁছলে বুঝবে মাতা অনুসূয়া হতে মাত্র ৬ মাইল হাঁটা হল। মালসর হতে শুক্লতীর্থ প্রায় ৩০ মাইল। শুক্লতীর্থ পেরিয়ে গেলে বুঝবে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেছি। পুরীতে ত আর পাহাড় নেই, কিন্তু এ অঞ্চল ত বিন্ধ্যপর্বতের নিকটে ; পার্বত্য অঞ্চলে শীত বেশী হতে বাধ্য।

আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠেই যে যার গাঁঠরী ইত্যাদি গুছিয়ে যাত্রা সুরু করলাম। তখন সবে মাত্র সূর্য উদিত হচ্ছেন। এতদ্ঞ্চলে সূর্যোদয় হয় অনেক দেরীতে। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে সিনোরের শেষ সীমা ধূতপাপেশ্বর তীর্থ অতিক্রম করে কাঁটাই নামক মহল্লায় কোটীশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী বললেন — মহাত্মা পূযণ গিরি সেদিন আমাদেরকে এই তীর্থের নামোল্লেখ করে বলেছিলেন যে, এটিও স্কন্দতীর্থ। স্কন্দজী দেবসেনাপতিরূপে নিযুক্ত হওয়ার পর প্রায় এককোটি ঋষি এখানে সমবেত হয়ে আনন্দোৎসব উপলক্ষে এখানে তীর্থ স্থাপন করেছিলেন। এককোটি ঋষির দ্বারা স্থাপিত বলে এই তীর্থের নাম কোটীশ্বর তীর্থ। তাঁর বর্ণনা শুনে আমার মনে পড়ল অমরকন্টকে নর্মদা-উদ্গম মন্দিরের মধ্যে কোটীশ্বর তীর্থের কথা। এখনও পর্যন্ত তাহলে নর্মদাতটে দুটি কোটীশ্বর তীর্থের দর্শন পেলাম। কোটীশ্বর ছাড়া চারটি কোটেশ্বর তীর্থের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা সেখানে প্রণাম করে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর আর একটি তীর্থে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী বললেন — এই তীর্থের নাম আঙ্গরিস তীর্থ।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — আঙ্গিরস্ না আঙ্গরিস কিংবা অঙ্গিরস? আঙ্গিরস বা অঙ্গিরস শব্দের অর্থ সহজেই বোধগম্য হয়। আঙ্গিরসগণ বেদে দেবতা ও মানুষের মধ্যস্থ দৈবীপুরুষ এবং অগ্নির অনুচর হিসাবে বর্ণিত। এই তীর্থের নাম যদি অঙ্গিরস তীর্থ হয়, তাহলে বুঝতে হবে অগ্নির অনুচর সেই সব দৈবীপুরুষ দ্বারা এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত; আর যদি আঙ্গিরস হয় তাহলে বুঝতে হবে অঙ্গিরা ঋষির দুই পুত্র উতথ্য ও বৃহস্পতির মধ্যে যে কেউ এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অঙ্গিরা ঋষি ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি কর্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রদ্ধার গর্ভেই উতথ্য ও বৃহস্পতির জন্ম।

মোহান্তজী বললেন — লেকিন্ ইস্ তীর্থকা নাম আঙ্গরিস। কহতে হেঁ অঙ্গিরাজীনে ১১২ তম অধ্যায়ে অঙ্গিরস তীর্থ বলেই উল্লেখ করেছেন। হিন্দীভাষা ত হিন্দীভাষী দেহাতি লোকদের মুখে অনেকস্থলে বিকৃত ভাবেই উচ্চারিত হয়, এমন অপভ্রংশের রূপ নেয় তার থেকে শুদ্ধ সংস্কৃত রূপ উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। আঙ্গরিস কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। অঙ্গিরাই এখানে স্বয়ং তপস্যা করেছিলেন। মহাদেবের দর্শন পেয়ে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন —

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতং সর্বশাস্ত্রবিশারদং।
দেবানাং মন্ত্রিণং তথা সর্বলোকেষু পূজিতং।
ব্রহ্মলক্ষ্ম্যা সদাবাসমক্ষয়ং চাব্যয়ং সুতম॥

অর্থাৎ আমার বেদবিদ্যা সম্পন্ন ব্রতস্নাত সর্বশাস্ত্রবিশারদ অখিললোকপূজিত অক্ষয় অব্যয় এক পুত্র হোক। আমার তনয় দেবমন্ত্রী হবে এবং ব্রহ্মদ্যুতি তার দেহে সতত বিদ্যমান থাকবে।

মহাদেব অঙ্গিরাকে প্রার্থিত বরই দান করেন। বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করেন।

অঙ্গিরা প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গে প্রণাম করে আমরা নিকটস্থ মঙ্গলেশ্বরের মন্দিরে গেলাম। আমাদের সঙ্গী সেই বৈষ্ণব সাধু বললেন — এই স্থানটি আঙ্গারক তীর্থ নামে অভিহিত। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হিন্দী ভাষীরা এই তীর্থকে অঙ্গরেশ্বর বলে থাকেন। এখানে ভূমিসূত মঙ্গল দীর্ঘকাল উগ্র তপস্যা করে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করেন — তব প্রসাদাদ্দেবেশ সর্বলোক মহেশ্বর, আমি যেন আপনার প্রসাদে গ্রহগণের মধ্যগত হয়ে আকাশমণ্ডলে নিত্য বিচরণ করতে পারি। মহাদেব-তথাস্তু বলে অন্তর্হিত হন। যাঁরা মঙ্গলের দশায় গ্রহকোপে বিপর্যস্ত হন তাঁরা এখানে এসে পূজা ও জপ করে অব্যর্থ ফল পেয়ে থাকেন। এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করে গেছেন আমাদের পরম গুরুদেব মঙ্গলদাস বাবাজী।

মঙ্গলদাসজীর নাম উচ্চারণ করবার সময় বৈষ্ণব সাধু বার কয়েক নিজের নাক-কান মূলে দণ্ডবৎ করলেন। বাংলাদেশের ছেলে হিসাবে বৈষ্ণবদের এই রীতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। সে মায়াপুর নবদ্বীপই হোক, বৃন্দাবন বা নর্মদাতটের এই মালসরই হোক সর্বত্রই এই অতি বিনয় এই অতি ভক্তি এবং অতি আড়ম্বরের সঙ্গে কথায় কথায় আভূমিপ্রণত প্রণামের ঘটা!

মঙ্গলেশ্বরের মন্দির থেকে তিনি আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন একটি সুন্দর ঘাটে। ঘাটটি মজবুত করে বাঁধানো। বৈষ্ণব সাধু বললেন — এইটির নাম অযোনিজ তীর্থ। মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন — অযোনিজং মহাপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনং। তত্র তীর্থে তু বিধিনা

প্রাণত্যাগং করোতি য। স কদাচিন্মহারাজ যোনিদ্বারং ন পশ্যতি। অর্থাৎ এই অযোনিজ সর্বপাপপ্রণাশক পরমপাবন তীর্থ। এখানে যথাবিধি তনু ত্যাগ করলে তার কদাচ যোনি দর্শন হয় না।

এই বলে তিনি কিছুদূরেই একটি ছোট মন্দির দেখিয়ে আমাদেরকে বললেন এইটির নাম পাণ্ডুতীর্থ। পাণ্ডুর কথা ত মহাভারতে নিশ্চয়ই পড়েছেন যে তিনি ছিলেন চন্দ্রবংশীয় শান্তনু পুত্র বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। শ্বশ্রূ সত্যবতীর অনুরোধে বংশরক্ষার তাগিদে বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যুর পর অম্বালিকা শয়নগৃহে প্রবেশ করে ব্যাসের ভীষণ মূর্তি দেখে ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যান। সেইজন্য তাঁর গর্ভজাত পাণ্ডুও পাণ্ডুবর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডবের পিতা। তিনি এখানে তপস্যা করতে এসেছিলেন।

এই পর্যন্ত বলে তিনি আমাদেরকে জানালেন — আপনারা পাণ্ডুতীর্থ দর্শন করে অতি অবশ্যই ঐ যে দেখা যাচ্ছে আমাদের মঠবাড়ী ঐখানে যাবেন। পরমগুরুদেব ঐ মঠের সংস্থাপক, মঠের পাশেই তিনি ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করে গেছেন। মন্দিরের ষড়্ভুজ মহাপ্রভু ছাড়া সত্যনারায়ণজীরও বিগ্রহ আছেন। সমগ্র গুজরাটে প্রসিদ্ধ লোনেবালা যোগাশ্রমের সংস্থাপক স্বামী কুবলয়ানন্দজী বর্তমানে এই আশ্রমের মোহান্ত। তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে আপনারা খুবই আনন্দ পাবেন। আমার সেবাপূজার কাজ আছে কাজেই এখন বিদায় নিচ্ছি।

আমি বললাম — সে কি আপনি অযোনিজ তীর্থের যে বিবরণ দিলেন তাতে যে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হল না। অযোনিজ বলতে মায়ের যোনিদ্বার হতে প্রসূত হন নি, তপস্যার অগ্নি হতে স্বয়ং স্বতঃই আবির্ভূত হয়েছেন, এই মুহূর্তে এমন ৫ জনের নাম আমার মনে পড়েছে — অগস্ত্য, দ্রোণ, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সীতা। এঁদের মধ্যে অগস্ত্য হলেন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদে আছে ইনি মিত্র অর্থাৎ তেজোময় সূর্য ও বরুণের পুত্র বলে এঁর নাম হয় মৈত্রাবরুণী, যজ্ঞকুম্ভ হতে উৎপন্ন বলে তাঁকে কলসীসূত, ঘটোদ্ভব, কুম্ভসম্ভবও বলা হয়। দ্রোণও কুম্ভসম্ভব। কারণ মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুষ্ঠিত যজ্ঞকুম্ভে হতে তাঁর উদ্ভব হয়। দ্রোণ বা পরিমাপক যজ্ঞপাত্র এঁর জন্মের কারণ বলে তাঁর নাম হয়েছিল দ্রোণ। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নও যজ্ঞ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। দ্রোণ বধের জন্য পুত্র লাভেচ্ছায় মহারাজ দ্রুপদ যখন গঙ্গা ও যমুনার তীরে যাজ ও উপযাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের সহায়তায় পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করেন, তখন যজ্ঞাগ্নি হতে বর্ম মুকুট খড়্গ ও ধনুর্ধারী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন হতে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী আবির্ভূতা হয়েছিলেন। মহাদেবী সীতারও এইভাবে জন্ম হয়। মিথিলার রাজা জনক যাঁর প্রকৃত নাম সীরধ্বজ, তিনি যজ্ঞান্তে হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় হলের সীতায় অর্থাৎ লাঙ্গলের রেখায় সীতাকে শিশুরূপে প্রাপ্ত হন। এই ৫ জনের মধ্যে সীতা বা দ্রৌপদীর তপস্যাস্থল এটি নিশ্চয়ই নয়, কেননা তাহলে এই তীর্থের নাম হত অযোনিজা তীর্থ। কিন্তু নাম যখন অযোনিজ, তাহলে অগস্ত্য দ্রোণ বা ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে যে কেউ বা প্রত্যেকেই এখানে তপস্যা করেছিলেন। আপনি দয়া করে এ স্থান কার তপস্যা ক্ষেত্র বলে যান।

তিনি বললেন — আমার জানা নাই। এই বলে তিনি এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, দ্রুতপদে চলে গেলেন। মোহান্তজীসহ আমরা সকলেই সেই অযোনিজ তীর্থের ঘাটে কিছুক্ষণ

বিশ্রামের জন্য বসলাম। সকাল ৯টা তখনও বাজেনি। মোহান্তজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — বাঙালী বাবা! তোমার এই স্থানটি কেমন লাগছে?

— খুবই মনোরম স্থান সন্দেহ নাই। ঝাড়ি অঞ্চল বাদ দিলে সমতল অঞ্চলে যত সুন্দর সুন্দর স্থান দেখে এলাম, তার মধ্যে এই মালসর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। এত সুদৃশ্য মন্দির শোভিত নানারকম গাছপালা পুষ্পোদ্যান সমন্বিত স্থান খুব বেশী দেখছি বলে মনে পড়ছে না। নর্মদার বিপরীত দিকে অজস্র বাড়ীঘর দেখে মনে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই মালসর মহল্লা একটা বড় শহরে পরিণত হবে। এখানকার মঠবাড়ীটিকেও খুব সমৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। বৈষ্ণবদের মঠ বলে দেখছেন, কেমন খোলকরতালের শব্দে আশ্রমটি মুখরিত রয়েছে!

এমন সময় বেশ খানিকটা দূর হতে ট্রেনের হুইশেল শুনতে পেলাম। বেশ চমকে উঠে উঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম — এখান পর্যন্ত ট্রেনের লাইন এসেছে নাকি?

— হাঁ, হাঁ, এখানে ষ্টেশন বাজার, পোষ্টাফিস, বড় বড় বাজার, সবই আছে। এইসব কিছু হয়েছে একজন সিদ্ধ মহাত্মার প্রভাবে। প্রতি বৎসর এখানে হাজার হাজার লোক যাতায়াত করেন। আমরা নর্মদার ধারে বসে আছি বলে এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। ঐ যে বিশাল গৌরাঙ্গ মন্দির দেখা যাচ্ছে ঐখানে গেলেই বিরাট ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভক্তশিষ্যদের থাকার জন্য অন্ততঃ ৫০ খানা পাকাবাড়ীও দেখতে পাবে। এইসব কিছুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাত্মা মাধবদাসজী। তুমি জেনে সুখী হবে যে তিনি বাঙালী ছিলেন, একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ হঠযোগী এবং অন্নপূর্ণাসিদ্ধ মহা-বৈষ্ণব ছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম — এই ত্রিধারার সমন্বয় ঘটেছিল তার মধ্যে। তোমাদের দেশে নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ কোন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল যাদব মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবনে দুবার বিবাহের সুযোগ এসেছিল। প্রথমবারে বিবাহের পূর্বদিন তাঁর মাতাঠাকুরাণীর দেহান্ত হয়, বিবাহ সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়বার পুনরায় যখন বিবাহের উপক্রম তখন তাঁর পিতা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহামায়া যাঁকে অন্য কোন ঐশী কার্যের জন্য নর্মদাতটে টেনে আনবেন, তার পক্ষে পারিবারিক বন্ধনে জড়িত হয়ে পড়া সম্ভব নয়। তিনি কিছুদিন সরকারী চাকুরীও করেছিলেন। পরে স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে কোন মহাত্মার কাছে হঠযোগের সাধনা এবং অন্নপূর্ণার মন্ত্রলাভ করেন। ৪০/৫০ বৎসর ধরে নানাস্থানে পরিভ্রমণ এবং সাধনা করার পর বাল্যের সংস্কার অনুযায়ী তিনি এই গুজরাটেরই ঘোড়াভারা নামক স্থানের বড়ে আখড়ার মোহান্ত গোবিন্দদাসজীর কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করে মালসরে এসে সাধনা করতে থাকেন। মালসরের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করে। ধীরে ধীরে তাঁর যোগসিদ্ধির খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন বরোদার গাইকোয়াড় তাঁর অনন্য ভক্ত হন। তিনিই তাঁর গুরুর মঠকে সর্বসাধারণের কাছে সুগম করার জন্য বরোদা থেকে মালসর পর্যন্ত ট্রেনের লাইন টেনে এনেছেন। মহাত্মা মাধবদাসজী গুজরাটের সর্বজনমান্য মহাত্মা। তাঁর অনেক অলৌকিক সিদ্ধির ঘটনা লোকমুখে প্রচারিত আছে। ১৯৭৭ সংবতে অর্থাৎ আজ হতে ৩৪ বৎসর পূর্বে আনুমানিক ১২৫ বৎসর বয়সে গৌরাঙ্গের নাম নিতে নিতে তিনি দেহরক্ষা করেন। ঐ ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ মন্দিরের নিকটেই

তাঁর সমাধি মন্দির আছে। 'এখন লছমন ভেইয়া বল, আজ এখানে তোমার থাকতে ইচ্ছা আছে কিনা। কারণ বর্তমান মোহান্ত স্বামী কুবলয়ানন্দ আমার পরিচিত। তিনি আমাকে দেখতে পেলে হয়ত ছাড়তে চাইবেন না।'

লক্ষ্মণভারতীজী বললেন যে তাঁর সেখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। কপর্দীশ্বর মহাদেবের স্থান পর্যন্ত তাঁর আজকেই পরিক্রমা করার ইচ্ছা।

— বাঙালী বাবা, তোমার কি মত ? তোমাদের বাংলাদেশেরই এক বাঙালী মহাত্মা হাজার মাইল দূরে নর্মদাতটে এসে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার সেই কীর্তিকলাপ তোমার দেখতে ইচ্ছা হয় কি না?

মোহান্তজীর এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, মহাত্মা মাধবদাসজী বাংলার সন্তান বিশেষতঃ সিদ্ধ মহাত্মা বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পুণ্যপীঠ ঘুরে ফিরে দেখতে ইচ্ছা হয় ঠিকই কিন্তু তিনি ত এখন স্বদেহে নাই , বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত গোঁড়ামিকে আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। অর্চা ধরা চূড়া এবং মূর্তিপূজায় আমার প্রচণ্ড অনীহা। যড়ভূজ গৌরাঙ্গের মন্দিরে গিয়ে সেখানে ভদ্রতার খাতিরেও অন্ততঃ একটিবার ঐ গৌরাঙ্গ মূর্তি এবং সত্যনারায়ণের বিগ্রহকে প্রণাম ঠুকতেই হবে। কিন্তু তা আমি কিছুতেই পারব না। ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ — যজুর্বেদের (অ ৩২ ম ৩) এই মন্ত্রবাণী বাল্যাবধি আমার তন্ত্রীতে গাঁথা আছে। অথচ প্রণাম না করলেই ওঁরা ব্যথা পাবেন, আপনার বন্ধু এখানকার বর্তমান মোহান্ত স্বামী কুবলয়ানন্দজী ক্ষুণ্ণ হবেন, চাই কি চৈতন্যচরিতামৃতের পদ্য আউড়িয়ে হয়ত বলেই বসবেন —

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।<br>অস্পর্শ অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।।

কারও মুখে 'পাষণ্ডী' 'যমদণ্ডী' প্রভৃতি কুৎসিৎ গালি শুনলে কারই বা ভাল লাগবে বলুন? তার চেয়ে লক্ষ্মণভারতীজীর পরামর্শ মত এইবার আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

মোহান্তজী আবার প্রশ্ন করে বসলেন — লেকিন চৈতন্যমহাপ্রভুজীকা ষড়্ভূজ মূর্তিকা ক্যা মতলব? উনকো ত ছয়টো হাত জরুর নেহি থে।

— সম্প্রদায়ীদের কোন কার্যকলাপের কোন কার্যকারণ ব্যাখ্যা হয় না। তাঁদের ইচ্ছা হয়েছে চৈতন্যদেবকে যড়ভুজ করবেন তাই সেইভাবেই তাঁর যেন সত্য সত্যই ছটি হাত ছিল, এইটি প্রচার করার জন্যই যড়ভুজ মূর্তি গড়েছেন। চৈতন্যদেব শুধু বাংলা বা ভারতেরই গৌরব নন তিনি ছিলেন বিশ্বগৌরব। তাঁর বিশ্বোদার ভাব, প্রেম ও ভালবাসার কোন তুলনাই হয় না। হরিনামের যাদুতে তিনি তৎকালীন বাংলাকে উথলিত করে তুলেছিলেন, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ সব ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। তার অভয় অমৃত প্রেমময় কোলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে টেনে নিয়ে তিনি প্রচার করেছিলেন — ভক্তের কোন জাতিভেদ বা বর্ণবিচার নাই। চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ। কিন্তু পরে তাঁর নামধারী সম্প্রদায়ীরা এমনও বর্ণনা করে গেছেন যে চৈতন্যদেব নাকি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দুই-ই মানতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় লেখা হয়েছে তিনি নাকি কটক হতে বৃন্দাবন

যাত্রার পথে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ বাস করতেন, সেখানেই অন্নগ্রহণ করতেন, যেখানে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেখানে তাঁর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য তাঁকে রান্না করে খাওয়াতেন। বৃন্দাবন হতে ফিরবার সময় প্রয়াগে মাধ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য বল্লভ রূপ ও অনুপমকে আলিঙ্গন করতে গেলে, তাঁরা দুরে সরে গিয়ে বলেন — 'অস্পৃশ্য পামর মুঞিঁ না ছুঁইহ মোরে।' তাদের পক্ষে এটা বৈষ্ণবোচিত দৈন্য হতে পারে, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তিনি যেন বল্লভভট্টকে বলেছেন —

দোঁহা ন স্পর্শিহ ইহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীন॥

একথা সত্য জানবেন যে, বর্তমান বৈষ্ণবদের পরমমান্য চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের প্রণেতারা জীবনে চৈতন্যদেবকে চক্ষেও দেখেন নি। চৈতন্য-পার্ষদ রূপ-সনাতনের শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী, তাঁর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের গ্রন্থকার, তারও পরবর্তীকালে চৈতন্যভাগবত লিখেছিলেন জনৈক বৃন্দাবন দাস। সম্প্রদায়ীরা তাঁদের প্রণীত গ্রন্থ দুটি সবচেয়ে বেশী মান্য করেন। ঐ দুটি গ্রন্থের শিক্ষায় ও প্রচারে বর্তমানে তথাকথিত বৈষ্ণব সমাজে মহাপ্রভুর জীবন ও বাণীকে মালসাভোগের খুরীতে সুকৌশলে চাপা দেওয়া হয়েছে। কাজেই ঐ ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের কথা কি, চৈতন্য-ভাগবতের লেখক এমনও লিখে গেছেন—

বরাহ আকার প্রভু হইলা সেই ক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জে যজ্ঞবরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু কহ মোর স্তুতি বলহ মুরারী॥

অপরং বা কিং ভবিষ্যতি? আমরা এখন এগিয়ে যাই চলুন। আমরা যে যার গাঁঠরী, ঝোলা, কমণ্ডলু নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় একজন বৈষ্ণব সাধু দৌড়ে এসে জানালেন — প্রভু মাধবদাসজীর বরোদাবাসিনী এক বৈষ্ণবী বাঙালী মায়ী গান গাইছেন, শুনে যাবেন না? ১০ মিনিট এই মধুর গান মায়ীর অতীব সুরেলা কণ্ঠে কি রকম প্রাণকে মাতিয়ে তুলবে তার আস্বাদন পরখ করে যান। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের আগ্রহাতিশয্যে আমরা মন্দিরের দিকে ধীরে ধীরে মন্ত্রচালিতবৎ এগিয়ে চললাম। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের পাশেই মহাত্মা মাধবদাসজীর সমাধি মন্দির। সেই মন্দিরে বসে আছেন ৪০/৪৫ বর্ষ বয়স্কা এক বাঙালী মহিলা, হাতে বীণা যন্ত্র, তাঁর কপালে হরি চন্দনের তিলক, গলায় তুলসীর মালা, তিনি হিন্দীতে সবেমাত্র একটি গান শেষ করেছেন, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে আছেন। আমাদের সেখানে পৌঁছে বসতে বসতেই তিনি বীণাযন্ত্রের ঝঙ্কার তুলে তাঁর গুরুর বিরাট তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে গাইতে লাগলেন —

কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়,
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।
বলিব না রেখ সুখে
চাহ যদি রেখ দুখে
তুমি যদি ভাল বোঝ তাই করিও॥

যে পথে চালাবে নিজে
চলিব চাব না পিছে
(আমার) ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবিও।
(শুধু), তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও॥
সকলে আনিল মালা
ভকতি চন্দন থালা
(আমার) যে শূন্য ডালা তুমিও ভরিও।
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও॥

দরবিগলিত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে গায়িকার দু'গাল বেয়ে। তাঁর আর্তি ও গুরুভক্তি আমাদেরকে বিহ্বল করে তুলল। তাঁর গান শেষ হতেই আমরা চলে এলাম সেখান থেকে। সেখানের দৃশ্য তখন বড় করুণ। স্বয়ং কুবলয়ানন্দজীসহ আর তিন চারজন তখন দশাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে আছেন। আমাদের বুকের ভিতরটাও গুর্ গুর্ করছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে লক্ষ্মণভারতীজী 'হর নর্মদে' ধ্বনি তুললেন পাণ্ডুতীর্থের ঘাটে পৌঁছে। কারও কণ্ঠস্বর বেরুল, কারও বেরুল না। আমার বুকের মধ্যে কেবলই গুণ্ গুণ্ করছে '(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।"

মোহান্তজী নিজের চোখ মুছে মতীন্দ্রজীক বললেন — ইস্ গানাকো হিন্দি অনুবাদ শুনাইয়ে। মতীন্দ্রজী তাঁদেরকে শোনালেন — ইয়ে গানাকো রচয়িতা বাংলা মুলুককা এক মরমী কবি অতুলপ্রসাদ সেনজী হ্যায়। ইস্‌কী হর শব্দকী মতলব ইয়ে হ্যায়......বলে তিনি হাঁটতে হাঁটতেই ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে যাবার পর নর্মদা তটের দিবেল গ্রামে এসে কপিলেশ্বর এবং ত্রিলোচন নামক দুটি পাশাপাশি শিব মন্দিরের চত্বরে এসে পৌঁছালাম। মন্দিরের পুরোহিত পূজা করছিলেন। দুটি মন্দিরের দরজাই খোলা ছিল। মহাদেবের তৎক্ষণাৎ দর্শন পেয়ে আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হল —

কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও॥

মন্দিরের পূজা শেষ হতেই মোহান্তজী পুরোহিত মশাইকে অনুরোধ করলেন ঐ দুই মন্দিরের মহাত্ম্য বর্ণনা করতে। তিনি বললেন বহুকাল পূর্বে এখানে পুণ্ডরীক নামক এক মহারাজার সমগ্র গুর্জর প্রদেশে আধিপত্য ছিল। তাঁরই পুত্র ত্রিলোচন এই ত্রিলোচন নামক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন সিদ্ধর্ষিদের মতে, পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরমস্থান আর ত্রিলোচন হচ্ছে শিবেরই অন্য নাম। মহাভারতে দেখা যায়, মহাদেব যখন ঘোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, তখন পার্বতী রহস্যচ্ছলে মহাদেবের দুই চক্ষু হাত দিয়ে চেপে ধরেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কপালে জ্বলন্ত তৃতীয় নেত্রের উদ্ভব হয়, এটি মহাদেবের ধ্বংসকারী নেত্র। কামদেব এই চক্ষুর অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হন। মন্দিরে ঢুকে আপনারা এই ত্রিলোচন লিঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন, লিঙ্গের উর্ধভাগে স্পষ্ট ভাবে একটি চোখের আকার ফুটে আছে। শিবের এই তৃতীয় নেত্রের পরিপূর্ণ প্রকাশ স্পষ্টভাবে রেবাসংগমে হরিধামে সমুদ্রের জলের মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে নিত্য জাগ্রত আছে। মা নর্মদার দয়া হলে কোন কোন ভাগ্যবানের চোখে তাঁর স্বরূপ ভেসে উঠে।

এই পরমস্থানে তপস্যা করেছিলেন আদি বিদ্বান মহর্ষি কপিল। তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক সাংখ্যদর্শন প্রণেতা। কর্দম ঋষির ঔরষে দেবহুতির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তিনি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে গেছেন। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবের কথা স্পষ্টভাবে সাংখ্যদর্শনে লেখা আছে। তাঁর মতে জগৎ জড়-প্রকৃতি হতে উদ্ভূত। সাংখ্যমতে প্রকৃতি অনাদি, প্রকৃতির ন্যায় পুরুষও (আত্মাও)অনাদি। আত্মা সৃষ্টি করে না, সে দ্রষ্টা মাত্র। মানুষের কর্মফল অনুসারে আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন কর্মক্ষয় হয়, তখন আত্মা আর দেহান্তরে প্রবেশ করে না। এই দর্শনের মতে বস্তু মাত্রই সৎ, সৎ হতেই সৎ-এর উৎপত্তি।

সাংখ্য দর্শনে একথাও আছে — মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। সাংখ্য সূত্র (অ ১/সূ ৬৭)।

মূলের মূল অর্থাৎ কারণের কারণ হয় না। অতএব যা সকল কার্যের কারণ, তার কারণ নাই।

পুরোহিত মশাই এর এই কথা শুনে আমি বললাম, এই যদি মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের মত হয়, তাহলে আমার বলতে ইচ্ছা হয়, কারণ যার অভাব আছে অর্থাৎ যা বর্তমান নয়, তার ভাব অর্থাৎ বর্তমান হওয়া অসম্ভব। এ কথাটি কেমন হল, যদি কেউ গল্পচ্ছলে বলে, 'আমি বন্ধ্যার পুত্র কন্যার বিবাহ দেখেছি, তারা নরশৃঙ্গের ধনুক এবং আকাশকুসুমের মালা ধারণ করেছিল এবং মৃগতৃষ্ণিকার জলে স্নান ও গন্ধর্ব নগরে বাস করত ; সেই স্থানে বিনামেঘে বৃষ্টি এবং মাটি ছাড়াই চাষ আবাদ হত !' এ সকল ঘটনা যেমন অসম্ভব, সেই রকম কারণ ব্যতীত কার্যোৎপত্তি ত অসম্ভব। আবার যদি কেউ বলে, 'মম মাতাপিতরৌ ন স্তোহমমেবজাতঃ। মম মুখে জিহ্বা নাস্তি বদামি চ,' অর্থাৎ 'আমার পিতামাতা ছিল না, এমনই এমনই জন্মে গেছি; আমার মুখে জিহ্বা নাই কিন্তু কথা বলছি, গর্তে সাপ ছিল না, কিন্তু এখন নির্গত হয়েছে; আমি কোন স্থানে ছিলাম না, এঁরাও কোন স্থানে ছিলেন না, কিন্তু আমরা সকলে মিলে এসে পৌঁছেছি — এই রকম অসম্ভব কথাকে 'প্রমত্তস্য গীত্‌ম' অর্থাৎ পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি বলা যায়?

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মোহান্তজী আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বললেন — চল চল, এখানে প্রণাম করে এগিয়ে যাই চল, বেলা ১২টা বাজতে বেশী দেরী নাই। কপর্দীকেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পৌঁছাতে আরও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। পুরোহিত মশাই-এর দিকে তাকিয়ে তিনি হাতজোড় করে বললেন — এই বালকের কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে লেড়কার মাথা গরম হয়ে গেছে।

মন্দিরের সীমা পেরিয়ে আসার পর মোহান্তজী আমাকে বললেন — তোমার তর্ক - প্রবৃত্তি ছাড়বে কবে? তুমি নর্মদায় এসেছ শিখতে, জানতে, মা নর্মদার মহিমা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে। বেকার তর্ক করনেসে ক্যা ফ্যায়দা ? আমি নীরবে তাঁর ভর্ৎসনা হজম করলাম।

মা নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে আমরা হেঁটে চলেছি দিবেল গ্রামের মধ্য দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণভারতীজী মুখ খুললেন।

— লেকিন্ মোহান্তজী! ঐ পুরোহিতজী যে বললেন, হরিধামে সমুদ্রের মধ্যে জলের তলায় এক বিশাল তৃতীয় নেত্র জ্বলজ্বল্ করছে, আপনার কি কোনদিন চোখে পড়েছে? আমি

ত তিনবার নৌকাতে করে এপার ওপার হয়েছি, আমার চোখে ত কখনও পড়েনি।

—— ব্রাহ্মণ যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই সমুদ্রের মধ্যে কোথাও না কোথাও তৃতীয় নেত্র প্রকট আছে। মন্দিরের সেবাইৎরা বংশপরম্পরা যা শুনে আসছেন বা পরিক্রমাবাসীদের কাছে যা বরাবর বলে আসছেন, তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। হয়ত তোমার নৌকা সমুদ্রের উপর দিয়ে যে পথে গিয়েছিল, সে পথে হয়ত নাই, অন্য কোথাও নিশ্চয়ই আছে। দিবেল গ্রাম অতিক্রম করে প্রায় দু'মাইল হেঁটে যাবার পর আমরা রাণীপুর মহল্লায় এসে পৌঁছালাম। বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। নাগাদের শিঙ্গা ডম্বরুর ধ্বনি শুনে অনেক গ্রামবাসী শঙ্খধ্বনি করতে করতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন, হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে। কিছুটা হাঁটার পরেই আমরা কম্বুকেশ্বর তীর্থে এসে উপস্থিত হলাম। উৎসাহী কিছু বালক দৌড়ে গিয়ে কম্বুকেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত মশাইকে ডেকে আনলেন। তিনি দরজা খুলে দিতেই আমরা মহাদেবকে দর্শন করলাম। প্রায় দেড়ফুট দীর্ঘ হরিৎ বর্ণের শিবলিঙ্গ।

পুরোহিত মশাই কম্বুকেশ্বর তীর্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন — হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের তনয় বলি, বলির পুত্র বাণ, বাণের পুত্র শম্বর। এই শম্বরের পুত্র মহাসুর কম্বু। কম্বুর মনে একদিন উদয় হল — বিষ্ণুর চেয়ে দানবদের আর কেউ বড় শত্রু নাই। ভগবান বিষ্ণুই যুগে যুগে দানদেরকে বিনাশ করছেন, বিষ্ণু ব্যতীত দানব নাশের অন্য কারণ বিদ্যমান নাই — দানবানাং বিনাশায় নান্যো হেতুঃ কদাচন। এই চিন্তা করে কম্বু বা কম্বুক নর্মদাতটের এই মনোরম স্থানটিকে নির্বাচন করে শিব তপস্যায় রত হলেন। তাঁর উগ্র তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে দর্শন দিলেন। কম্বু তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন, সমস্ত দেবদানব একত্র হয়ে যুদ্ধ করলেও আমাকে যেন কেউ পরাজিত করতে না পারে। আমার সবচেয়ে বেশী ভয় বিষ্ণুকে। বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে আপনি আমাকে সমর সামর্থ দান করুন। তাঁর কথা শুনে মহাদেব বলেন —

কিং পুনর্যেঃ দ্বিষত্যেনং লোকালোকপ্রভুং হরিম্।
স সুখী বর্ততে কালং ন নিমেষং মতং মম॥

লোকালোককর্তা শ্রীহরির প্রতি যে দ্বেষ করে, আমার মনে হয় সে নিমেষের তরেও সুখী হয় না। তবে আমি এই নর্মদাতটে সতত বিরাজমান। তুমি যদি এখানে থেকে সর্বভূতের হিতকামনায় তপস্যাতে রত থাক তাহলে ভগবান বিষ্ণু হতে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না। মহাদেবের আশ্বাস পেয়ে কম্বুক এখানে এই কম্বুকেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। কালান্তরমেঁ য়হ লিঙ্গ গুপ্ত হো গয়া। কুছ সময় পশ্চাৎ ঋষিপুত্রোঁনে ইসে সীপী কে ডেরমেঁ প্রাপ্ত কিয়া। য়হা গায়ত্রী জপকা বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ। য়হা শঙ্খ জল সে শিবজীকা অভিষেক তথা সংকল্পাদি করনা চাহিয়ে।

পুরোহিতজী এইসকল কথা বর্ণনা করে মোহান্তজীকে বললেন — মন্দিরের মধ্যে ১০টি পাঞ্চজন্য দক্ষিণাবর্ত এবং মতিশঙ্খ আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে মহাদেবের মাথায় শঙ্খজল ঢেলে প্রণাম করে যেতে পারেন। মোহান্তজীর ইঙ্গিতে আমরা সবাই নর্মদার ঘাটে স্নান করে ১০ জন ১০জন করে মন্দিরে ঢুকে কম্বুকেশ্বরের মাথায় শঙ্খজল ঢেলে প্রণামান্তে পুনরায় শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে হাঁটতে লাগলাম।

বেলা তখন ১টা বাজতে দশ মিনিট বাকী, মতীন্দ্রজী তাঁর ঘড়ি দেখে জানালেন। লক্ষ্মণভারতীজী আমাদেরকে দ্রুতবেগে হাঁটবার জন্য তাগিদ দিলেন। প্রায় ২৫ মিনিটে আড়াই মাইল রাস্তা হেঁটে আমরা কোঠিয়া গ্রামে এসে পৌঁছালাম। এই গ্রামেই চন্দ্রপ্রভাস তীর্থ, নর্মদার কিনারাতেই চন্দ্রেশ্বরের প্রাচীন মন্দির। কৃষ্ণবর্ণের প্রায় দু ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ, শিবলিঙ্গের উর্ধভাগে কৃষ্ণবর্ণের অতি উজ্জ্বল এক অর্ধচন্দ্র বিরাজিত। মন্দিরে বসে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জপ করছিলেন। পরিক্রমাবাসীদেরকে দেখে তিনি তাঁর জপের রুদ্রাক্ষমালা হাতে করেই উঠে দাঁড়ালেন। শ্রদ্ধাভরে আমাদেরকে শিবলিঙ্গ দর্শন করতে দেখে তিনি আমাদেরকে বলতে লাগলেন — ইয়ে চন্দ্রমা দ্বারা স্থাপিত শিবলিঙ্গ হৈ। চন্দ্রদেব তো নিত্য হৈ, কল্প কল্পমেঁ ভিন্ন ভিন্ন স্থানোঁ সে উৎপত্তি হোতী হৈ। প্রথম চন্দ্রমা কী উৎপত্তি ব্রহ্মাজী কে মন সে হুই। ফির ব্রহ্মাজী দ্বারা সোনবল্লীসে প্রকট হুয়ে, ফির সমুদ্রসে নিকলে। বরাহ কল্পমেঁ অত্রি ঋষিসে অনুসূয়ামেঁ ব্রহ্মাজীকে অংশ সে উৎপন্ন হুয়ে। ইসী কল্পমেঁ গুরুপত্নী গমন কা দোষ লগনে পর মহাকালকী আজ্ঞা সে হিঁয়াসে এক মিল দূরমেঁ কোহিন তীর্থমেঁ আকর তপস্যা কী, প্রসন্ন হোকর শিবজীনে আপনে মস্তক পর ধারণ করকে শিরোভূষণ বনায়া। উসীকা স্মারক ইয়ে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ হৈ। চন্দ্রগ্রহণ, সংক্রান্তি, ব্যাতিপাতাদি পুণ্য পর্বোঁ পর য়হা বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ।

চন্দ্রেশ্বরকে প্রণাম করে আমরা আবার হাঁটতে লাগলাম। সকাল থেকে কারও পেটে দানাপানি পড়েনি, কাউকে এক গণ্ডূষ জলপান করতেও দেখিনি। সকাল থেকে একটানা হেঁটেই চলেছি। লক্ষ্মণভারতীজীর মাথায় অদ্ভুত এক ঝোঁক চেপেছে। যতক্ষণ না কপর্দীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌঁছাবেন তিনি নিশান কোথাও রাখবেন না। এসব অঞ্চলের ছিমছাম বাড়ী ঘর এবং রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের হাঁটতে ভালই লাগছে। নর্মদার গতিপথ এ অঞ্চলে বড়ই আঁকা-বাঁকা, কখনও উপর ঘেঁসে বয়ে চলেছেন, কখনও বা উপর থেকে সোজা জলপ্রপাতের মত নীচে পড়ছেন, তাঁর বিস্তৃতিও যেমন বেড়েছে , তেমনি গতিবেগও দেখছি অতি প্রচণ্ড। কম্বুকেশ্বর ঘাটে স্নান করতে নেমে জলের টান অনুভব করে, এক কোমর পর্যন্ত জলে নামা যা আমাদের পরিক্রমাকালে নিয়ম, তাও আমরা নামতে সাহস করি নি। লক্ষ্মণভারতীজীর বারবার হুঁশিয়ারীতে কোনমতে পা টিপে টিপে এক জানু পর্যন্ত নেমে কমণ্ডলু ভরে ভরে গা মাথা ভিজিয়ে নিলাম। জলের কন্‌কনে ঠাণ্ডা ভাবও অনুভব করছিলাম। আমরা তট ধরে কোথাও বা কিনারা ঘেঁসে হাঁটছি, গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করছি কিন্তু পথে আসতে আসতেই শুনে এসেছি, আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে ডান দিকের পর পর কয়েকটি মহল্লা অতিক্রম করতে পারলে সিনোর নামে একটি সদ্য গড়ে ওঠা শহর দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের কাছে গুজরাটের কোন শহরেরই কিছু মূল্য নাই। নর্মদার তট ও নর্মদার জলই আমাদের এখন পরম বাঞ্ছিত বস্তু। কারণ নর্মদার তটে তটেই যত তীর্থ, যত মহাদেবের মন্দির। আর তীর্থ ও মন্দির মানেই তা কোন ঋষির তপস্যা ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রের রেণু স্পর্শ করতে পারলে তবেই আমাদের পরিক্রমা সার্থক।

চন্দ্রেশ্বর থেকে প্রায় দু'মাইল হেঁটে এসে আমরা কোহনেশ্বর তীর্থের ঘাটে এসে পৌঁছালাম। ঘাটের উপরেই মন্দির। মোহান্তজী বললেন — এই মহাদেবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোহন

নামক এক ঋষি। এখানে মৃত্যুঞ্জয় তথা শতরুদ্রীয় পাঠ বিশেষ ফলপ্রদ। সংস্কৃত 'কো হনিষ্যতি' শব্দ হতে এই তীর্থের নাম হয়েছে 'কোহনশ্ব', কোহনশ্ব হতে কালক্রমে কোহনেশ্বর। এ সম্বন্ধে রেবাখণ্ডে ১২২তম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় মহামুনি এক সুন্দর উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। মন্দিরে প্রণাম করে তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সংক্ষেপে সেই উপাখ্যান আমার কাছে শুনে নাও। পূর্বকালে এই পবিত্র স্থানে কোহন নামক এক বেদবেদাঙ্গপারগ স্বধর্ম-নিরত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। একদিন তিনি সহসা শুনতে পান কেউ যেন উর্ধাকাশ হতে বজ্রকণ্ঠে বলছেন — 'নিহত কর, নিহত কর'। ব্রাহ্মণ হতচকিত হয়ে শৃঙ্খল হস্তে যমদূত সহ যমরাজকে দেখতে পান। কৃষ্ণাঞ্জন সন্নিভ লোহিতলোচন যমরাজের ভীষণ মূর্তি দর্শন করে ব্রাহ্মণ মনে মনে শতরুদ্রীয় জপ করতে থাকেন। তখন তিনি ভয়ে কাঁপছেন। কৃতান্তদেব তাঁকে বলেন — শতরুদ্রীয় জপ পরিত্যাগ কর, আমি তোমাকে বন্ধন করে যমালয়ে নিয়ে যাব। এইকথা শুনে ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণ নিজের ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন — রক্ষ রক্ষ মহাদেব শরণাগত বৎসল! হে মহাদেব! তুমি শরণাগত বৎসল! আমাকে রক্ষা কর। ব্রাহ্মণ ভূপতিত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলে সহসা মহাদেব শিবলিঙ্গ হতে আবির্ভূত হয়ে বললেন —

কো হনিষ্যতি মা ভৈস্ত্বং হুঙ্কারমকরোত্তদা।

অর্থাৎ ভয় নাই, ভয় নাই, কে তোমাকে হত্যা করবে? এই বলে শঙ্কর হুঙ্কার দিলেন। শঙ্করের হুঙ্কার শব্দে যমদূত সহ যমরাজ অন্তর্হিত হলেন। শঙ্কর যে 'কো হনিষ্যতি' শব্দে উচ্চারণ করেছিলেন পূর্বেই বলেছি, সেই শব্দ হতেই এই তীর্থ কোহেনশ্ব তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়েছে। এই তীর্থ স্মরণ করিয়ে দেয় মহাদেবের ভক্তবাৎসল্য ও করুণার কথা। শতরুদ্রীয় জপের যে মৃত্যুকে প্রতিহত করার কী অমোঘ ফল তাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা কোহনেশ্বর মন্দিরে প্রণাম করে আবার যাত্রা সুরু করলাম। নর্মদার কিনারে হাঁটিতে হাঁটিতে প্রায় বেলা আড়াইটার সময় ফতেপুর নামক একটি ঘাটে এসে পৌঁছালাম। এখানকার গ্রামের নামও ফতেপুর। ফতেপুর ঘাট থেকে মিনিট পাঁচেক পরেই আমরা বিশাল এক শিবমন্দিরের চত্বরে এসে পৌঁছালাম। দূর থেকে মন্দির দর্শন করেই লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — ঐ মন্দিরের ধ্বজা দর্শন করা মাত্রই ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করা নিয়ম, উচিতও বটে। কারণ ঐ মন্দিরের নাম নর্মদেশ্বর, ঐ মন্দিরের সংস্কারক বা স্থাপয়িতার নামানুসারে ঐ মন্দির এখন নারেশ্বর নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ; প্রকৃত নাম — নর্মদেশ্বর। এই ফতেপুর ঘাট থেকে মাইলখানেক গেলেই কপর্দীশ্বর তীর্থে গিয়ে পৌঁছাব। সেখানেই রাত্রিবাস করব। তাঁর নির্দেশানুসারে — আমরা সেইখানেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠতেই মোহান্তজী আর একবার ভূলণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করতে বললেন মা নর্মদার উদ্দেশ্যে। পুনরায় আমরা সকলেই প্রণাম করলাম। মূল মন্দিরে পৌঁছাতে প্রায় একশ গজ বাকী। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মন্দির হতে যজ্ঞধূম উঠছে, হোমের সুগন্ধি ভেসে আসছে। মোহান্তজী বললেন — লছমন ভেইয়া যখন সংকল্প করেছে কপর্দীশ্বর তীর্থে গিয়ে রাত্রিবাস করবেন, তখন তাঁর এই নর্মদাতটের শপথ বা সংকল্প আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে। তবে তোমরা সবাই শুনে রাখ, এই মন্দিরে যে শিবলিঙ্গের দর্শন পাবে, তিনিই প্রকৃত কপর্দীশ্বর মহাদেব। মূল কপর্দীশ্বর

তীর্থে না থেকে তিনি এখানে কেমনভাবে এলেন, সে সব বিবরণ কপর্দীশ্বর তীর্থে গিয়েই বলব। এখন শুধু এই তীর্থের রহস্য বলছি শুনে রাখ। স্বয়ং মার্কণ্ডেয়জী বলে গেছেন — 'অত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মচ্যুতে সর্ব কিল্মিষৈঃ — নর্মদেশ্বর তীর্থে স্নান করলে জীব অখিল কলুষ হতে মুক্ত হয়। অনিবর্তিকা গতিস্তস্য যথা মে শঙ্করোহব্রবীৎ — এখানে যিনি প্রাণত্যাগ করেন তাঁর পুনরাবৃত্তিরহিত উত্তম গতিলাভ হয়, একথা স্বয়ং মহাদেব আমাকে বলেছিলেন।' এই তীর্থের প্রাচীন কাহিনী হচ্ছে — একবার শিব এবং পার্বতী ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে এই স্থানে এসে উপস্থিত হন। শিব-শিবানীকে একত্র দেখে মা নর্মদা স্বয়ং দিব্যস্বরূপে প্রকট হয়ে তাঁদেরকে বিধিবৎ অর্চনা করেন। আশুতোষ মা নর্মদাকে বলেন — বরং বৃণীষ্ব ভদ্রে ত্বং যত্তে মনসি বর্ততে — তোমার মনে যা ইচ্ছা হয়, বর প্রার্থনা কর। তদুত্তরে মা বলেন — আপনি এখানে নিত্যকাল বিরাজমান থেকে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, হে কল্যাণেশ্বর! কলিহত জীবের তুমি মঙ্গল কর।' মা নর্মদা স্বয়ং এখানে প্রকট হয়েছিলেন, স্বয়ং শিব-শিবানীর আবির্ভাব ঘটেছিল এখানে, সেইজন্য এই স্থানের নাম নর্মদেশ্বর তীর্থ। এখন চল আমরা হর নর্মদে ধ্বনি তুলে সেই প্রাচীনতম মূল কপর্দীশ্বরকে দর্শন করি। আমরা কয়েক পাপড়ি মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় মন্দিরের মূল মণ্ডপ থেকে কয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং কয়েকটি বালক বেরিয়ে এসে হর্ষধ্বনি করে বলে উঠলেন — উন্‌হনে আগয়া, উন্‌হনে আগয়া। সহসা একথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম। যাইহোক মন্দিরের মূল মণ্ডপে গিয়ে উঠতেই দেখি সেখানে যজ্ঞ হচ্ছে। চারজন ব্রাহ্মণ সুবৃহৎ চারটি কাঠের চমসে করে মন্দিরের স্থায়ী যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছেন —

ওঁ রেবায়ৈ স্বাহা।
ওঁ অজশ্চ বহুরূপশ্চ গন্ধধারী কর্পদ্যপি
ঊর্ধ্বরেতা ঊর্ধ্বলিঙ্গ ঊর্ধ্বশায়ী নভস্থলঃ।।
ওঁ কপর্দিনে স্বাহা।।

আমরা মণ্ডপে প্রবেশ করার মুখে মণ্ডপের বাহিরে ঝোলাকম্বল গাঁঠরী ইত্যাদি রেখেই মণ্ডপে প্রবেশ করেছিলাম যজ্ঞে ব্রতী ঋত্বিক অধ্বর্যু ব্রহ্মা ছাড়া উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণরা আমাদেরকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে যজ্ঞ-কুণ্ডের চারদিকে যত্ন করে বসালেন। যজ্ঞাহুতি চলতে থাকল উপরোক্ত দুটি মন্ত্রে। যজ্ঞ শেষ হয়ে আসছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই পূর্ণাহুতি দেওয়া হল। উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিলেন। মোহান্তজী সহ আমরা সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। পূর্ণাহুতির পর বসবার উপক্রম করতেই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাত নেড়ে বসতে নিষেধ করলেন — কৃপয়া বৈঠিয়ে মৎ, মৎ বৈঠিয়েজী! অগত্যা আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। তাও মিনিট খানিক সময় মাত্র! যজ্ঞরত সেই চারজন ব্রাহ্মণ চারটি পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে নিয়ে এসেই মোহান্তজী সহ আমাদের সকলের সামনেই পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাতে লাগলেন মন্ত্রপাঠ করতে করতে —

ওঁ অজশ্চ বহুরূপশ্চ গন্ধধারী কর্পদ্যাপি।
ঊর্ধ্বরেতা ঊর্ধ্বলিঙ্গ ঊর্ধ্বশায়ী নভস্থলঃ।।

সর্বনাশ! এ যে মহর্ষি তণ্ডিকৃত স্তবরাজের ৪৬ নম্বর মন্ত্র। স্বয়ং কপর্দীশ্বর মহাদেবের মহাসিদ্ধ মন্ত্র! যাঁরা আরতি করছেন তাঁদের সর্বত্র শিবজ্ঞান জন্মাতে পারে কিন্তু মাদৃশ অধম

ব্যক্তি কি করে, এই আরত্রিক গ্রহণ করতে পারি। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। আমি মন্দিরস্থ কপর্দীশ্বরের দিকে তাকিয়ে পূষণ গিরি প্রদত্ত ব্রহ্ম-প্রাণায়ামের ক্রিয়া অবলম্বন করে কাতর ভাবে প্রণাম করতে লাগলাম, মন্দিরের গর্ভগৃহে উজ্জ্বল ঘৃত প্রদীপের আলোতে কপর্দীশ্বরের চকিত চমক যেন অতুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল আমার চোখে। কথঞ্চিৎ স্বস্তি পেলাম মনে। আমাদের প্রত্যেকেরই চোখে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আরতির বিড়ম্বনা শেষ হতেই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদেরকে হাতজোড় করে বললেন — 'এইভাবে অভ্যাগত পরিক্রমাবাসীদেরকে আরতি করা এই মন্দিরের রীতি। আবহমান কাল ধরে এই ধারা এই ফতেপুর মহল্লার নর্মদেশ্বর মন্দিরে চলে আসছে। আজ ৭ই কার্তিক রবিবার ত্রয়োদশী তিথি রাত্রি ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত আছে। তারপরেই এসে যাবে ভূত-চতুর্দশীর রাত্রি। আজ সন্ধ্যাতে বর্হিযমদীপদানম্ কৃত্য হয়ে যাবার পর আগামীকাল রাত্রি ৯টা ১৮ মিনিট গত হলেই শ্যামাপূজা সুরু হবে। প্রতি বৎসর এই রকম ভূতচতুর্দশীর পূর্বলগ্নে কপর্দীশ্বরের মন্দিরে হবন করা বিধি। এই যজ্ঞের শেষে পরিক্রমাবাসীদেরকে কপর্দীশ্বর ও মা নর্মদার প্রসাদ দান করে তুষ্ট করাও অবশ্য পালনীয় কৃত্য। যদি এই সময় আপনাদের এখানে পদার্পণ না ঘটত অর্থাৎ যদি পূর্ণাহুতির পর কোন পরিক্রমাবাসীকে ভিক্ষা দেওয়া সম্ভব না হত, তাহলে এতদঞ্চলে মড়ক হওয়ার সম্ভবনা ছিল। আমার এখন বয়স ৯২ বৎসর। আমার ১৩ বৎসর বয়স হতে এই ৭৯ বৎসর কাল ধরে এই মন্দিরের এ বিধান দেখে আসছি, দেখে আসছি কপর্দীশ্বর ও মা নর্মদা কি অসীম দয়া, প্রতি বৎসরই যজ্ঞান্তে এখানে পরিক্রমাবাসীদের আগমন ঘটে থাকে। আমার পিতৃদেবের এবং অন্যান্য প্রবীণদের মুখে শুনেছি, আমার বাল্যকালে একবার সেইরকম ভীষণ কাণ্ড ঘটেছিল, সে বৎসর যজ্ঞান্তে যজ্ঞের প্রসাদ গ্রহণ করতে কোন পরিক্রমাবাসীর আবির্ভাব ঘটেনি। প্রচণ্ড মড়ক লেগেছিল সেই বৎসর। এতদঞ্চলের মানুষের দুর্দশার অন্তঃ ছিল না। তাই আপনাদের আগমন দেখে আমরা সহর্ষে 'উনোনে আগয়া, উনোনো আগয়া' অর্থাৎ আপনারা এসে গেছেন, আপনারা এসে গেছেন বলে সহর্ষে কলরব করেছিলাম।'

তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কিন্তু মন্দিরে উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণরা ইতিমধ্যেই আমাদের ভিক্ষার আয়োজন করে ফেলেছেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মোহান্তজীর হাত ধরে ভিক্ষা গ্রহণ করতে সবিনয় অনুরোধ জানালেন। মোহান্তজী বললেন — প্রসাদ সানন্দে গ্রহণ করব, তবে প্রথমে কপর্দীশ্বরকে দয়া করে দর্শন করতে দিন। আমরা সকলেই গর্ভগৃহের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কপর্দীশ্বরকে দর্শন করে প্রণাম করলাম। কপর্দী ত কপর্দীই বটে ! সুবৃহৎ শ্বেত শিবলিঙ্গের শীর্ষদেশ হতে একগুচ্ছ কুঞ্চিত তাম্রবর্ণের কেশদাম নেমে এসেছে যোনিপীঠ পর্যন্ত। এই জটা স্বাভাবিক, কোন খোদাই করা চিহ্ন নয়।

পরম পরিতৃপ্ত সহকারে পঞ্চ মেওয়া (কিসমিস, মনাক্কা, খেজুর, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি) সহযোগে ক্ষীর প্রসাদ আমরা গ্রহণ করলাম। মতীন্দ্রজীর ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা বেজেছে।

আহারের পর মন্দিরে বিশ্রাম করতে করতে মোহান্তজী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করলেন — যে দুটি মন্ত্রে হবন হচ্ছিল, তার একটি মন্ত্র ত মা নর্মদার, অপরটি যে মহাদেবের তা বুঝতে পেরেছি। মহাদেবের সম্পূর্ণ মন্ত্রটির অর্থ কি ? বিশেষ করে কপর্দী শব্দটির অন্তর্নিতি

তাৎপর্য জানতে চাই, দয়া করে বলবেন কী?

—অজো জন্মরাহিত্যাৎ, বহুরূপো বিশ্বরূপত্বাৎ, গন্ধধারী সেবক প্রদত্ত চন্দনাদি ধারণাৎ, কপর্দী জটাজূটবান্, উর্ধ্বরেতা যোগকালে ব্রহ্মচারী, উর্ধ্বলিঙ্গো লিঙ্গমূর্তেরূর্ধ্বস্থিতেঃ, উর্ধ্বশায়ী সর্বোর্ধ্বাবস্থানাৎ নভো হার্দাকাশং স্থলং যস্য সঃ।

অর্থাৎ মহাদেব স্বয়ং পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, তাঁর জন্ম হয় না, তাই তিনি অজ, বিশ্বের প্রতি বস্তুতে, প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি ব্যাপ্ত বা অনুস্যূত আছেন, তাই তিনি 'বহুরূপ', ভক্তদের প্রদত্ত কুঙ্কুম কেশর কস্তূরীযুক্ত চন্দনাদি ধারণ করেন, তাই তিনি 'গন্ধধারী', তিনি জটিল অর্থাৎ জটাধারী, তাই তাঁর নাম 'কপর্দী', অচ্যুত ব্রহ্মচর্যের অধিকারীকে সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী বলা হয়, ব্রহ্মচারী শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মণি বিচরিত যঃ সঃ ব্রহ্মচারীঃ; মহাদেব অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্যের অধিকারী ত বটেই তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম, তাই তিনিই 'উর্ধরেতা'; লিঙ্গস্থিত উর্ধ্বদেশে তিনি উদ্ভাসিত চৈতন্যস্বরূপে বিরাজমান, তাই তিনি 'উর্ধ্বলিঙ্গ', সর্বোচ্চস্থানে তাঁর নিত্যস্থিতির জন্য তিনি 'উর্ধ্বশায়ী' রূপে বন্দিত, জীবের হৃদয়াকাশে তিনি অনুভব গম্য তাই তাঁকে 'নভস্থলঃ' বলা হয়।

কপর্দী শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় কপঃ + ঋদঃ = কপর্দী। কং জলং পিবতীতি কপঃ — যিনি জলপান করেন, তিনি কপঃ। ঋতমৈশ্বর্যং দদাতীতি ঋদ্দঃ — যিনি যুগপৎ ধনৈশ্বর্য এবং যোগৈশ্বর্য প্রদান করেন তিনি ঋদ্দঃ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁর 'ভারতভাবদীপঃ' নামক টীকায় ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন — মহাদেবস্য হি জটাজূটেন স্বর্গাৎ পতন্তী গঙ্গা প্রথমং পীতা পশ্চাদ্ভগীরথ প্রার্থনয়া তস্যাঃ নির্গমনসামর্থ্যঞ্চ দত্তমতঃ স কপর্দস্তদ্বান মহেশ্বরঃ কপর্দী।

এই পর্যন্ত বলে সেই বৃদ্ধ মোহান্তজীকে যুক্তকরে নিবেদন করলেন — আমার মত গৃহীর পক্ষে মন্দিরে বসে আপনার মত সন্ন্যাসীকে কিছু শাস্ত্রোপদেশ ব্যাখ্যা করা অপরাধ। আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি। এই শরীরের নাম মহীকণ্ঠ সূরী। মহাভারতের টীকাকার আচার্য নীলকণ্ঠ সূরী ছিলেন আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ১৬শ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। অনেকে তাঁর সমসাময়িক দেবী ভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠকে এবং আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের এই প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দেবী ভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ শাক্তবেদান্তী ছিলেন, তাঁর প্রণীত সপ্তদশী চণ্ডীর উপর 'শক্তি-বিমর্ষিণী' একখানি উপাদেয় গ্রন্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন। রঙ্গনাথ দেশিকের ঔরষে লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই দেবী ভাগবতের টীকাকারের প্রকৃত নাম নীলকণ্ঠ দেশিক। ভারত প্রসিদ্ধ 'ভারতভাবদীপ' নামক মহাভারতের প্রামাণ্য টীকার রচয়িতা আচার্য নীলকণ্ঠ সূরী চিলেন শৈবাদ্বৈতবাদী। ভারতভাবদীপের অন্তর্গত তাঁর গীতা ব্যাখ্যা পড়ে অনেকে তাঁকে অদ্বৈতবাদী রূপে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর মহাভারতের টীকা পড়লে সহজেই ধরা পড়ে তিনি সর্বাংশে সর্বত্র শাংকর মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে যান নি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য আমার পিতামহ ধনপতি সূরী 'ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করে প্রপিতামহের শৈবাদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

কথা বলতে বলতে সাড়ে চারটা বেজে গেল। আমরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অজস্র শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। তিনি আমাদেরকে মন্দিরেই থাকতে বললেন কিন্তু আমাদের মূল কপর্দীশ্বর তীর্থে থাকার সংকল্পের কথা বলায় বললেন — আর এক মাইলের কম হাঁটলেই সন্ধ্যার পূর্বেই সায়র গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবেন। এখানে মূল কপর্দীনাথকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করলেও বাবার মূলস্থান সেখানেই বটে। তবে সেখানে আপনাদের থাকতে কষ্ট হবে। কারণ ঘাটের সংস্কার হলেও সেখানে একটি ছোট শিবমন্দির এবং বড় একটি টিনের চালা ছাড়া আর কিছু নাই। শীত পড়েছে, আপনাদের থাকতে কষ্ট হবে। তবে যদি রঙ্গ অবধূত স্বামীর আশ্রমে স্থান পান, তাহলে অন্য কথা। তাঁর আশ্রমে ত ভীড়-ভাড়েক্কা! মোহান্তজী হেসে বললেন — আমরা পরিক্রমাবাসী, মুক্ত আকাশের তলায় হলেও আমরা থাকতে পারব, মা নর্মদার নাম করেই রাত্রি অতিবাহিত করব। কিন্তু সেখানে থাকার কথা যখন মনে উদিত হয়েছে, তখন সংকল্প রক্ষা করতে আমরা বাধ্য।

নারেশ্বর তীর্থে প্রণাম জানিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম, নাগারা শিঙা ডম্বরু বাজিয়ে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে এগোতে লাগলেন, হিমেল বাতাস বইছে। শীতকাল, কাজেই হয়ত ৬টা বাজতে না বাজতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাই নাগারা দ্রুততালে হাঁটছেন। নর্মদা যে ক্রমেই প্রশস্ততরা হচ্ছেন, তা স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে। বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের সময় আমরা সায়র গ্রামে এসে পৌঁছলাম। গ্রামটিতে বড় বড় দু তিনটি অট্টালিকা এবং বেশী লোকের বসতি দেখে সায়রকে বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম বলে মনে হল। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে পর পর দুটি বট এবং একটি অশ্বত্ত গাছ নর্মদাতটের উপরেই দেখলাম। গাছের কাছে তটরেখা ভেঙে পড়েছে। গাছগুলি অতিক্রম করতেই একটি সুবৃহৎ মঠ বাড়ী এবং মন্দির চোখে পড়ল। মোহান্তজী বললেন —'ঐটিই শ্রীরঙ্গ অবধূতজীর আশ্রম, ঐ আশ্রমের কথাই ফতেপুর ঘাটে পণ্ডিতজী বলেছিলেন।' নর্মদার ঘাট হতে বেশ কিছুটা দূরে ঐ আশ্রম। আমরা সোজা কপর্দীশ্বরের ঘাটেই গিয়ে পৌঁছাই চল। কিছুটা এগিয়ে সেই ঘাটে পৌঁছে গেলাম। ঘাটের উপরেই একটি পাথরের ছোট মন্দির, মন্দিরের পিছনেই পণ্ডিতজী কথিত টিনের আচ্ছাদন দেওয়া একটি হলঘরের মত আস্তানা চোখে পড়ল। চারদিক খোলা। পণ্ডিতজী যত ছোট বলেছিলেন, ততখানি ছোট বলে মনে হল না। আমাদের ৩০ জনের দল স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারব। তবে শীতের জন্য কষ্ট হবে এই যা। আমরা ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরে প্রণাম করলাম। সেই টিনের ঘরে গিয়ে ঝোলা গাঁঠরী রেখেই পাঁচ-ছয় জন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণভারতীজী বেরিয়ে গেলেন ধূনীর কাঠ সংগ্রহ করতে। আমি মোহান্তজীকে বললাম — এখানে ত আর জঙ্গল নাই, লক্ষ্মণভারতীজী কোথায় ছুটলেন কাঠ আনতে ?

— তা আমাদের ভাবনা করে লাভ নাই। লছমন ভেইয়া জরুর কোথাও না কোথাও হতে লকড়ি সংগ্রহ করে আনবেনই। তোমরা যে যেখানে পার আসন বিছিয়ে নাও।

সূর্য পাটে বসেছেন, মনে হচ্ছে আর আধঘন্টার মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় লক্ষ্মণভারতীজী ফিরে এলেন কয়েক বোঝা কাঠ নিয়ে। তাঁর সঙ্গে একজন গেরুয়াধারী সাধু। সেই সাধুর কয়েকজন অনুচরই কাঠ বয়ে এনেছেন। সাধু এসে মোহান্তজীকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করে গুজরাটি ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তাঁদের

কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পালাম না। লক্ষ্মণভারতীজী সেই লোকগুলিকে সঙ্গে নিয়ে হলঘরে কোথায় ধূনী সাজাবেন, তদনুযয়ী ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সেই সাধু চলে গেলে মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন — কাঠ যে শুকনো দেখছি, কোথা থেকে আনলে, কিনে আনলে নাকি, সদ্য সদ্য কেটে এনেছ বলে ত মনে হচ্ছে না। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন যে তিনি প্রথমে শ্রীরঙ্গ অবধূতজীর আশ্রমেই গিয়েছিলেন, তাঁর আশ্রমে রাত্রিবাসের স্থান সঙ্কুলান হয় কিনা দেখতে। কিন্তু অবধূতজী আজ তিনমাস যাবৎ গুজরাটের বিভিন্ন জেলাতে সৎসঙ্গ করে বেড়াচ্ছেন। আগামীকাল তিনি আশ্রমে ফিরবেন, তাঁর দর্শন প্রত্যাশায় পায় হাজার খানিক শিষ্য-শিষ্যা এখানে এসে পৌঁছেছেন, আশ্রমে তিল ধারণের স্থান নাই। অনেককে তাঁবু খাটিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যে সাধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনিই ঐ আশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ, তিনি আশ্রমে স্থান দিতে না পেরে, ধূনীর জন্য কাঠ সংগ্রহ করে দিলেন; লোকটা বামুন, অনেক দুঃখও প্রকাশ করেছেন।

— হাঁ, আমার কাছেও অনেক দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন। আমাকে আজ এক আশ্চর্য কথা শুনিয়ে গেলেন যে, এখানে নাকি ত্রিপুরাসুরের বধ পর্ব যাতে সুকর ও সহজসাধ্য হয়, সেজন্য ভগবান বিষ্ণুর আদেশে গণেশজী এখানে ঘোর তপস্যা করেছিলেন। এ কাহিনী নাকি রেবাখণ্ডের ১৩২ তম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে কিন্তু আমার কাছে যে রেবাখণ্ড আছে, তাতে বরাহতীর্থের বন্দনা আছে, কপর্দীশ্বর ভগবানের কোন বর্ণনা নাই। হতে পারে, ত্রিপুরাসুর যেমন দুর্ধর্য এবং সকলের অবাধ্য ছিল, তাতে দেবাদিদেব মহাদেবের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুত্র হিসাবে গণেশ পিতার জয় কামনায় এখানে তপস্যা করে থাকতে পারেন। তবে গুরুদেবের সঙ্গে পরিক্রমা করতে এসে এখানে তাঁর শ্রীমুখে যা শুনেছিলাম, তাই তোমাদেরকে শোনাব। এখন চল, এই প্রসিদ্ধ তীর্থের জল মাথায় নিয়ে মন্দিরে শঙ্কর ভগবানকে দর্শন করে আসি, এখানে কুমীরের উপদ্রব আছে বলে ঐ সাধু হুঁশিয়ারী দিয়ে গেছেন।

টর্চ জ্বেলে আমরা ধীরে ধীরে ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করলাম, জল বেশ ঠাণ্ডা। মন্দিরে দরজা খুলে দেখলাম, কেউ আগেই এসে শিবের সামনে প্রদীপ জ্বেলে রেখে গেছেন। ফতেপুর ঘাটে নর্মদেশ্বর বা নারেশ্বর তীর্থে যে কপর্দীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করে এসেছি, এই লিঙ্গ তাঁরই অনুরূপ। পাশেই একটি ছোট শিবলিঙ্গ বিগ্রহও আছে, এটি যে সাম্প্রতিককালে স্থাপন করা হয়েছে, তা দেখলেই বুঝা যায়। আমরা সেখানে প্রণাম করে এসেই সন্ধ্যা করতে বসলাম। নর্মদা হতে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। লক্ষ্মণভারতীজী ধূনীতে আগুন দিয়েছেন। রাত্রি ৯ টা নাগাদ প্রায় সকলেরই সন্ধ্যা কার্য শেষ হল। কম্বল মুড়ি দিয়ে আছি। মাথার উপর কেবল আচ্ছাদনটুকু আছে আর চারিদিক খোলা বলে গা কিছুতেই গরম হচ্ছে না। আমি মোহান্তজীকে বললাম — আপনি ফতেপুরে বলেছিলেন, কপর্দীশ্বর সম্বন্ধে এখানে এসে কি সব বলবেন, বলতে আরম্ভ করুন না, গল্প শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হব, তখন এত শীত অনুভব হবে না। তিনি বললেন — আমাদের সকলেরই সোয়েটার আছে, তোমার গায়ে সোয়েটার নাই বলেই তুমি কাতর হয়ে পড়েছ, তুমি ধূনীর কাছে সরে এসে বস, তাহলে শীত লাগবে না। আমি ধূনীর কাছে সরে বসতেই তিনি আরম্ভ করলেন — পহিলে য়হাঁ কপর্দীশ্বর কা হী মন্দির থা, উহ্ নর্মদাজীকে বিলকুল তটপর থা, প্রত্যেক চর্তুর্মাস কী বর্ষামেঁ

প্রাচীন মন্দির গিরতে গিরতে একবার পুরা গির গিয়া. জলের মধ্যে এইভাবে ভগ্নমন্দির কতকাল পর্যন্ত পড়ে রইল। তারপর মুসলমান শাসন শেষ হলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদের শাসনাধীনে এল এই গুজরাট। পেশোয়া, নারোপন্ত নামক এক মারাঠা বীরকে এখানকার রাজ্যপাল নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন শৈব। একবার কপর্দীশ্বর তাঁকে স্বপ্নে জানালেন — 'আমার মন্দির ভগ্ন হয়ে জলের মধ্যে পড়ে আছে। ঐ ধ্বংসপ্রপ্ত মন্দিরের তলাতেই আমি কপর্দীশ্বর বিরাজমান। জীর্ণোদ্ধার করে আমার স্বরূপলিঙ্গকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা কর।' এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে শিবভক্ত নারোপন্তজী বহু অর্থব্যয় করে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের তলা থেকে কপর্দীশ্বর লিঙ্গকে উদ্ধার করে এখান থেকে কিছুদূরেই ফতেপুর মহল্লার ঐ নর্মদেশ্বর তীর্থের বিশাল মন্দিরে বিশাল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কপর্দীশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারোপন্তের নামানুসারেই মহাদেব নারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। কালক্রমে কপর্দীশ্বরের এই মূলস্থান ঘোর জঙ্গল ও শ্মশান হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যক্রমে মা নর্মদার ইচ্ছাতেই দণ্ডীস্বামী বাসুদেবানন্দ সরস্বতীজী যাঁর তপস্যাস্থল গরুড়েশ্বর তীর্থ পরিক্রমা পথে আমরা দেখে এসেছি, তিনি তাঁর শিষ্য শ্রীরঙ্গ অবধূতস্বামীকে নিয়ে পর্যটন করতে করতে এখানে এসে দৈবাৎ উপস্থিত হন। বাসুদেবানন্দজী এই তীর্থের এই জঙ্গল ও শ্মশানময় অবস্থা দেখে অবধূতস্বামীকে এখানে থেকেই তপস্যা করতে নির্দেশ দেন। তিনি নিজে ফিরে যান গরুড়েশ্বরে। ফির্ ত জঙ্গলমেঁ মঙ্গল হোনে লাগা। বড়া ভারী আশ্রম বন গয়া হৈ। তাঁরই সাধুশিষ্য প্রদত্ত কাঠের আগুন এখন আমাদেরকে শীতে আরাম প্রদান করছে। লক্ষ্মণভারতীজীর কাছে ত তোমরা সবাই শুনলে যে আগামীকাল তিনি তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হবেন। এই অবধূতস্বামীর জীবন-বৃত্তান্ত আমি জানি, তিনিও আমাকে ভালভাবেই চেনেন। ইনি মারাঠার লোক। মাহরাষ্ট্রের অন্তর্গত রত্নাগিরি জেলার দেব্‌লে গ্রামে ইনি জন্মেছিলেন। এঁর পিতাঠাকুর বিট্ঠল বলামেঁ গুজরাটের গোধরা গ্রামস্থিত বিট্ঠল মন্দিরের পূজারী ছিলেন। তাঁর যখন দেহান্ত হয়, তখন এই অবধূতস্বামীর বয়স ছিল পাঁচ। বাল্যকালের নাম পাণ্ডুরঙ্গ। তাঁর মা অতি দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাণ্ডুরঙ্গ কিছুদিন অধ্যাপক, লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও রাজনীতিক হিসাবেও কাজ করেছেন। তারপর বাসুদেবানন্দজীর শিষ্য হয়ে নাম গ্রহণ করেছেন শ্রীরঙ্গ অবধূতস্বামী। ইনি গুজরাটি ও মারাঠী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক। সংস্কৃতে 'রঙ্গহৃদয়ম্' গুজরাটিতে 'গুরুলীলামৃত' এঁর এ দুটি গ্রন্থ বহু প্রচারিত। এঁর শিষ্য নর্মদানন্দজী কর্তৃক লিখিত গুজরাটি ভাষায় 'হমারী নর্মদা পরিক্রমা' নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ডই আমি পড়েছি।'

এই সময় মতীন্দ্রজী জানালেন — রাত্রি ১১ টা বেজে গেছে এবারে গুরুজী শুয়ে পড়ুন। তাঁর কথা শুনে সকলেই আমরা শুয়ে পড়লাম। ধূনীর আগুন বেশ গনগনিয়ে উঠেছে। সকালে সবার আগে ঘুম ভেঙ্গেছে মোহান্তজীর, তিনি উচ্চৈঃস্বরে শিবস্তোত্র পাঠ করতে আরম্ভ করতেই সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকলেই আমরা উঠে বসলাম। বাইরে বেশ অন্ধকার। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারদিক। টিনের শেডে শিশির পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মতীন্দ্রজী জানালেন — সকাল ৫টা বেজেছে মাত্র। কুয়াশা কাটুক, তবেই যাত্রা করা ভাল হবে। মোহান্তজী বললেন — এখনই যাত্রা করতে হবে না, তবে আর ঘুমানোও চলবে না। এস আমরা কপর্দীশ্বরের মূল স্থানে বসে তাঁর কথাই মনন করি। তিনি আমাকে বললেন

— পণ্ডিত মহীকণ্ঠ সূরীজী ফতেপুরের মন্দিরে কি সুন্দরভাবে কপর্দী শব্দটি আমাদেরকে শোনালেন। তোমাদের সকলের মনে আছে ত? আচ্ছা বাঙালী বাবা, কপর্দী শব্দের প্রয়োগ বেদে কোথাও দেখেছ কি ? যদি দেখে থাক, তাহলে টর্চ টিপে বেদ থেকে সেই মন্ত্রটি শোনাও। আমি বললাম — টর্চ টিপে দেখতে হবে না। আজকালকার স্বদেশী ও বিদেশী মহাপ্রাজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে নাকি আবিষ্কার করতে পেরেছেন যে, শিব বৈদিক দেবতা নন, বেদে নাকি কুত্রাপি তাঁর নামোল্লেখ নাই। বিশেষতঃ মহেঞ্জোদাড়ো সংস্কৃতির উপর যাঁরা গবেষণা করে বই লিখেছেন, তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে শিবকে অনার্যদের দেবতা বলে ঘোষণা করেছেন। তাই নিজের গরজেই বেদে যেখানে যেখানে শিবের উল্লেখ আছে, তা বাবার কাছে জেনে নিয়ে দু' একটি মুখস্থ রেখেছি। বেদদ্রষ্টা মহর্ষি অঙ্গিরার চার পুত্র হিরণ্যস্তূপ, সব্য, কুৎস্য, গৃৎসমদ — তাঁরা প্রত্যেকেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। অঙ্গিরার তৃতীয় পুত্র কুৎস ঋষি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের এগারটি মন্ত্রের দ্রষ্টা। ঐ মন্ত্রগুলির দেবতা রুদ্র। ঐ মন্ত্রগুলিকে বৈদিক 'রুদ্রসূক্ত'ও বলা হয়। একবার কুৎস তাঁর শত্রু দানব-প্রকৃতির শুষ্ণ কর্তৃক কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁর কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে পরম কারুণিক দেবাদিদেব শুষ্ণকে হত্যা করে কুৎসকে কূপ হতে উদ্ধার করেন। সেইক্ষণে কুৎস ঋষির অতীন্দ্রিয় ধ্যানদৃষ্টিতে যে ১১টি মন্ত্র প্রকট হয়, তা প্রথম মন্ত্রটিতেই কপর্দী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

ওং ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীবায় প্র ভরামহে মতীঃ
যথা শমসদ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্॥

অর্থাৎ ভগবান কুৎস ঋষি মহাদেবের উদ্দেশ্যে স্তুতি করছেন —

জটাজূট মহান্ রুদ্রে — অর্পি স্তুতি মহনীয়,
বীরের তিনি নেতা মহান্ — নিত্য তিনি বরণীয়।
সুস্থ রাখুন কৃপায় তিনি — দ্বিপদ এবং চতুষ্পদে,
গ্রামে সবাই নীরোগ রহুক — রহুক পুষ্ট নিরাপদে॥

কুৎস দৃষ্ট ঐ রুদ্র সূক্তের পাঁচ নম্বর মন্ত্রেও কপর্দী শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা —

ওঁ দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নি হ্বয়ামহে।
হস্তে বিভ্রদ্ভেষজা বার্যানি শর্ম বর্ম ছর্দিরস্মভ্যং যংসৎ॥

'দিব্যগুণের আহরক যে — অরুণ বরণ জটাধারী,
জ্বলছে তাঁহার সুদীপ্ত রূপ — নমস্কারে পূজা তাঁরি।
হস্তে তাঁহার পুণ্য ভেষজ — ধন্য করুন শর্ম দানে,
বর্মে মোদের দৃঢ় করুন — রাখুন শোভন গৃহপানে।'

এখানে 'কপর্দী' শব্দের বিশেষণ হিসাবে বরাহ শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণতঃ বরাহ শব্দে শূকরকে বুঝায়। পৌরাণিকদের মতে বরাহ বিষ্ণুর এক অবতার। কিন্তু বাবার কাছে আমি এই বৈদিক বরাহ শব্দটির অন্য অর্থ শুনেছি। বর + আ + হন্ + উ প্রত্যয় করে বরাহ শব্দটি নিষ্পন্ন — বরায় অভীষ্টায় দিব্যগুণানি খনতি আহরতি ইতি বরাহঃ; জড় ও জীবের মধ্যেও যিনি দিব্যগুণকে কর্ষণ করে প্রকটিত ও বিকশিত করে তুলেন তিনি বরাহ। কপর্দী অর্থাৎ জটাধারী মহাদেবের এইটি যে অনন্য বৈশিষ্ট্য তাতে কোন সন্দেহ নাই।

কথা বলতে বলতে সকাল হয়ে গেল। লক্ষ্মণভারতীজী ধুনীগুলি নিভিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় কালকের ঐ সাধুটি গুজরাটিতে শ্রীরঙ্গস্বামী অবধূতজীর লেখা 'গীর্বানি ভাষ্য প্রবেশ' এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'উপনিষদ কী কহানিয়া' নামক দুখানি বই নিয়ে এসে মোহান্তজীর হাতে উপহার দিলেন। মোহান্তজী অশেষ ধন্যবাদের সঙ্গে তা গ্রহণ করলেন। সাধু বললেন বেলা ১০ টা পর্যন্ত আপনারা এখানে থাকলে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত ! মোহান্তজী বললেন — তাঁর সঙ্গে দর্শন হলে সুখী হতাম সন্দেহ নাই কিন্তু আজ শুক্লতীর্থে গিয়ে পৌঁছাবার ইচ্ছা। মালসর থেকে মাত্র ১১ মাইল হাঁটা হয়েছে, অজকের মধ্যে ১৯ মাইল হেঁটে যেতে পারলে তবে শুক্লতীর্থে পৌঁছাতে পারব, কাজেই সকাল সকাল যাত্রা করতে না পারলে বড় অসুবিধায় পড়ব। সাধু তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে চলে গেলেন। তখনও সূর্যোদয় হয় নি। সকলে প্রাতঃকৃত্য সেরে সকাল ৭টার সময় মা নর্মদাকে প্রণাম করে আমরা যাত্রা করলাম। পূর্বাকাশে তখন সবে মাত্র সূর্যোদয় হচ্ছে। প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর আমরা সায়া নামক একটি গ্রামে এসে পৌঁছালাম, সকালের মিষ্টি রোদ এই শীতকালে সকলেরই খুব ভালই লাগছে। মোহান্তজী একটি ঘাট দেখিয়ে বললেন — এইটি সাগরেশ্বর তীর্থ। একবার তীর্থ নিন্দা করেছিলেন সমুদ্র। সমস্ত পুণ্যা নদী ও তীর্থের চেয়ে তাঁর মহিমা যে বেশী, তা বড়াই করে তিনি নিজ মুখে ঘোষণা করেছিলেন। সেই অপরাধ স্খালনের জন্য সমুদ্র মনুষ্য মূর্তি গ্রহণ করে এখানে এসে শিবের আরাধনা করেছিলেন।

সাগরেশ্বর তীর্থকে প্রণাম জানিয়ে প্রায় দু'মাইল হেঁটে যাওয়ার পর আমরা কোরাল বা কোরল (Coral) গ্রামে এসে পৌঁছালাম। নর্মদাতট থেকে কিছু দূরেই অজস্র লোকজনের বসতি দেখা যাচ্ছে। নর্মদা ঘাটের কাছে বহু ছোট ডিঙ্গিতে করে জেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুরীর সমুদ্রে যেমন নুলিয়ারা ঘুরে বেড়ায়। একটি বিশেষ স্থানে ডিঙ্গি নৌকাতে করে জেলেরা কি যেন বয়ে নিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। কিছু ব্যবসায়ীকে তটে বসে দুর্বোধ্য দেহাতি গুজরাটি ভাষায় জেলেদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে দেখা গেল। 'ওখানে ওরা কি করেছে' জিজ্ঞাসা করতেই লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — তাকিয়ে দেখ, যেখানটায় নর্মদার বুক উঁচু হয়ে উঠেছে, জল যেখানে সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ছে, ঢেউ এসে ভাঙ্গছে, ঐখানে জলের তলায় মোতি কোরাল আছে। অর্থাৎ ঐখানে এমন একটা স্তর (layer) জলের তলায় আছে, সমুদ্র ফেণা জমে উঠার মত ঢেউ-এ ঢেউ-এ যে ফেনা গজিয়ে উঠছে তা মাটি ও জলের গুণে জমে এখানটাতে একটা শিলীভূত স্তর সৃষ্টি করেছে। ঐখানে অল্প মোতিশঙ্খ এবং প্রচুর শ্বেত প্রবাল উৎপন্ন হয়। মোতিশঙ্খ কখনও দেখেছ কি ? উত্তরে আমি 'না' বলতে মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতীজীকে মন্দির সংলগ্ন স্থান দেখিয়ে বললেন — 'ম্যায় উধর বৈঠতা হুঁ, আপ্ লছমন ভেইয়া, আপ্ ইনকো সাথমেঁ মোতি কোরাল দেখা কর্ আইয়ে।' যেখানে কয়েকটি ছোট বড় মন্দির আছে, তিনি অধিকাংশ নাগাকে নিয়ে সেখানে গেলেন। মতীন্দ্রজী আমাদের সাথী দুজন পণ্ডিতজী এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণভারতীজী ডিঙি নৌকাগুলির কাছাকাছি স্থানে তটের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। দু তিনটি ডিঙি নৌকায় লালচে রং এর কতকগুলি বস্তু দেখিয়ে বললেন — এগুলি হতে মোতিশঙ্খ ও শ্বেত প্রবাল দুই-ই পাওয়া যায়। লাল রং-এর উপর এখন যেমন কালচে শেওলা জমে আছে বলে মনে হচ্ছে, ভাল করে মাজা ঘষা এবং কাটাই-এর পর ঐগুলি

শুভ্র স্ফটিকের মত উজ্জ্বল রূপ নিবে, তাতে যেমন শ্বেত প্রবালও পাওয়া যায় তেমনি মোতিশঙ্খও কখনও কখনও পাওয়া যাবে। বাজালে সেই শঙ্খ থেকে অতি সুন্দর ধ্বনি উঠে। সেদিন রাত্রে ব্যাসের বেটে গভীর রাত্রিতে যে অত্যাশ্চর্য উর্ধোত্থিত শ্বেত বাষ্পের কুণ্ডলী দেখে আমরা যখন বিহ্বল ও মোহিত হয়ে উঠেছিলাম, তখন বেটের যেদিকে নাগা সন্ন্যাসীদের বাস, সেদিক থেকে যে বিচিত্র শঙ্খধ্বনি ভেসে এসেছিল তা এইসব মোতিশঙ্খেরই আওয়াজ।

যেখানটাতে নর্মদার জল উঁচু হয়ে ঢেউ-এর মত ভেঙে পড়ছে, সেখানকার দৃশ্য একমনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ মারামারির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। দুজন গুজরাটি ভদ্রলোক একজন জেলেকে চড়াৎ চড়াৎ শব্দে চড় মারছেন। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — ওরা ব্যাপারী লোক। জেলেটির ডিঙিতে যত মোতিশঙ্খ ও শ্বেতপ্রবাল আছে, ঐ ব্যাপারী দুজন তা কিনে নিতে চায়। জেলেরা কত কষ্ট করে যে ভীমবেগে প্রবাহিতা নর্মদার জলের তলা থেকে ঐসব বস্তু সংগ্রহ করে এবং তার জন্য কী যে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে, তা সংসারে যারা সুখী এবং স্বচ্ছল মানুষ তাদের পক্ষে তা বোধগম্য হবে না। দর কষাকষি করতে করতে বাবুদের মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে, তাই গরীবের উপর জুলুম চলছে। অতি সস্তায় কিনে নিয়ে ঘষাই মাজাই এর পর তারা বড় বড় শহরের বাজারে বিক্রী করে বেশী মুনাফা লুটতে চায়। ব্যাপারী লোকদের জাত আলাদা, প্রকৃতি আলাদা। এদের কাছে ধর্মকর্ম গৌণ ব্যাপার। নাফা, জ্যাদা নাফাটাই এদের ইষ্ট। চল একটু ভীড় কাটিয়ে ডানদিকে এগিয়ে যাই। সেখানে মোতিশঙ্খ ও শ্বেতপ্রবালের দোকান আছে। মোতিশঙ্খের আসল রূপ ও রং দেখতে পাবে। মাদ্রাজে আরব সাগরের মধ্যে তুতিকোরিন্ নামক জায়গায় দুর্লভ দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ মোতিশঙ্খ ইত্যাদি সব রকমের শঙ্খ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলি সাধারণতঃ সমুদ্রেই জন্মে। নদীতে জন্মায় না। কিন্তু মা নর্মদার কি বিচিত্র মহিমা। তিনি এখানে সাগরগামিনী হলেও এখন ত সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হন নি; নদীর স্বরূপেই আছেন, তবুও দেখ, এখানে অল্প পরিমাণে হলেও মোতিশঙ্খ উৎপন্ন হচ্ছে। আমরা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পাশাপাশি দুটি দোকান। মোতিশঙ্খ এবং শ্বেত-প্রবাল ঝকঝকে সাদা, থরে থরে সাজানো রয়েছে। পরিষ্কার গুজরাটিতে লক্ষ্মণভারতীজী তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই দুজন দোকানদারই আমাদেরকে দণ্ডবৎ জানিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি করে মতিশঙ্খ নেড়েচড়ে দেখতে দিলেন। তাঁরা মোতিশঙ্খ বাজিয়েও দেখালেন। চমৎকার আওয়াজ, অন্যান্য শঙ্খের নাদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লক্ষ্মণভারতীজী ঠিকই বলেছেন, এই রকম আওয়াজই সেদিন ব্যাসের বেটে ভেসে এসেছিল বটে ! মোতিশঙ্খগুলি ফেরৎ দিয়ে আমরা ফিরে এলাম মোহান্তজীর কাছে। মোহান্তজী মোতিশঙ্খ দেখে এসেছি শুনে খুব খুশী হলেন, বললেন — এইবার এখানকার তীর্থগুলির বিবরণ শোন। পর পর চারটি ছোট ছোট মন্দির দেখিয়ে বললেন — এইটির নাম কুবের তীর্থ, ঐটির নাম বরুণেশ্বর তীর্থ ঐদিকে বাঁ দিকেরটি বায়বেশ্বর তীর্থ, তার পাশেরটি যাম্যেশ্বর তীর্থ। কুবের, বরুণ, বায়ু আর যম, এই চারজন এখানে নর্মদাতটে তপস্যা করে লোকপালত্ব অর্জন করেছিলেন। তপস্যার বলে কুবের দেবতাদের ধনাধ্যক্ষ এবং যক্ষদের অধিপতি হন, বরুণ জলাধিপতি হন, বায়ু সর্বত্রগামিত্ব অর্জন করেন এবং যম দণ্ডাধিকারী হন। সিদ্ধিলাভের পর তাঁরা একত্রে ঘোষণা করেন —

রাজা বৃক্ষো ব্রাহ্মণস্তস্য মূলং পর্ণাভৃত্যা মন্ত্রিণস্তস্য শাখা।
তস্মাৎ মূলং যত্নতো রক্ষণীয়ং মূলে গুপ্তে অস্তি বৃক্ষস্য নাশঃ॥

অর্থাৎ এই সংসাররূপে বৃক্ষের রাজা হলেন বৃক্ষ স্বরূপ। ব্রাহ্মণ সেই বৃক্ষের মূল, রাজার সেবক ভৃত্যরা হলেন সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ, রাজার মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রীরা হলেন শাখা স্বরূপ। এইজন্য মূল স্বরূপ ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে রক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ, মূল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বৃক্ষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমরা লোকপালদের প্রণাম করে এগিয়ে যাই চল। লোকপাল শব্দের অর্থ, এই মর্ত্যভূমির অধ্যক্ষ বা রক্ষক।

শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা আবার নর্মদার কিনার দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর মোহান্তজী বললেন — এই কোরাল গ্রাম বেশ বড়। আরও প্রায় এক মাইল নর্মদার তট ধরে এগিয়ে যেতে পারলে তবে কোরাল গ্রামের সীমা অতিক্রম করতে পারব। যে চারজন লোকপালের মন্দির দেখে এলে যাকে এক ডাকে কুবের তীর্থ বলে অভিহিত করা হয়। ঐটি ছাড়াও এখানে তট ছেড়ে কোনটি একটু দূরে, কোনটি বা নর্মদার গর্ভেই এরকম আশাপুরী দেবী, আদি বরাহ, ব্রহ্মপ্রসাদজ তীর্থ, মার্কণ্ডেয় তীর্থ, ভৃগ্বীশ্বর তীর্থ, পিঙ্গলেশ্বর, যৌরাদিত্য প্রভৃতি তীর্থ আছে। আমরা যতই হরিধামের নিকটবর্তী হব ততই ঘন ঘন তীর্থের দর্শন পাব। তীর্থময়ী নর্মদা। কোটি তীর্থের স্থান। কোন মানুষের পক্ষেই সব তীর্থের পূজা এবং পরিক্রমা সম্ভব নয়। আমরা কেবল হর নর্মদে ধ্বনি অবিরাম দিতে দিতে, মায়ের জয়ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে যাই চল।

মোহান্তজীর কথা শেষ হতেই বিপুল উৎসাহে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা এগিয়ে চললাম। আমরা যে তটরেখা ধরে চলেছি, সেই পথে এতদঞ্চলের বহু লোকও যাতায়াত করছেন, নানা কাজে নানা ব্যাপারে সাধু সন্ন্যাসীদের এইরকম দলবেঁধে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে যাতায়াত তাঁদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। তবুও তাঁরা আমাদেরকে দেখে সশ্রদ্ধভাবে যুক্তকরে রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। যাঁরা সাইকেল আরোহী, তাঁরা তাঁদের দ্বিচক্রযান থামিয়ে রাস্তার একধারে সরে গিয়ে আমাদের যাওয়ার পথকে বাধাবন্ধহীন সুগম করে দিচ্ছেন। পরিক্রমাবাসীদের প্রতি তাঁদের এই স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করেছে সন্দেহ নাই, আমরা মা নর্মদাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণে রেখে শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে এগিয়ে চলেছি।

কোরাল অতিক্রম করে আমরা ওজ্ নামক গ্রামে এসে পৌঁছালাম তখন বেলা ১০টা বেজে গেছে। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — এই ওজ মহল্লার অপর নাম অযোধ্যাজী। এখানে অহল্যা তীর্থ, শক্র তীর্থ এবং কর্কটেশ্বর তীর্থ আছে। অহল্যা তীর্থে অহল্যা তপস্যা করেছিলেন। নরোত্তম রামচন্দ্রেরও পদার্পণ ঘটেছিল এখানে। নর্মদা তটের এই স্থানে বিশেষতঃ নর্মদার দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করে। তাঁর মনে সংকল্প জেগেছিল, 'নর্মদা কিনারে ভী হমারী অযোধ্যা হোনী চাহিয়ে।' তাঁর সেই শুভ সংকল্প থেকেই এই ওজ্ গ্রামে অযোধ্যার মত এক পরম রমণীয় নগর গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে তা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু অযোধ্যার স্মৃতি বহন করে ওজগ্রাম নর্মদাতটে এখনও টিকে আছে। আমরা ওজ্ তীর্থকে প্রণাম করে শক্র তীর্থ এবং কোটেশ্বর

তীর্থকে প্রণাম করলাম। কাশীরাজ জয়ন্ত ঘোর পাপী ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি কুলীর পক্ষীতে পরিণত হন। গরুড়ের মনে ইচ্ছা জেগেছিল নর্মদার পাপনাশিনী শক্তিকে একবার পরখ করতে। কুলীর পাখীর মৃতদেহ নর্মদার জল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে এক শিবলিঙ্গ প্রকটিত হয়। বিস্ময় বিমূঢ় পক্ষীরাজ ভক্তিসহকারে সেই শিবলিঙ্গ প্রকটিত হয়। বিস্ময় বিমূঢ় পক্ষীরাজ ভক্তিসহকারে সেই শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন। পরে বালখিল্য ঋষিরাও এখানে পূজা করেন। একটি মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে মোহান্তজী বললেন — এই সেই কর্কটেশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমরা সকলেই ভক্তিভরে প্রণাম করে প্রায় দু' মাইল হেঁটে দিলবাড়া গ্রামে এসে পৌঁছালাম।

দিলবাড়া মহল্লায় সোমতীর্থ! চন্দ্রের তপস্যাস্থল। চাঁদোদের সন্নিকটে কর্ণালী গ্রামেও চন্দ্রের তপস্যাস্থল দেখে এসেছি। তাঁর সেখানে নাম সোমেশ্বর তীর্থ। উভয় তীর্থের কাহিনী এবং মহিমা একই।

দিলবাড়া অতিক্রম করে পৌঁছালাম নাদগ্রামে। এখানে একটি বাঁধানো ঘাটে দেখলাম একটি বিশাল লৌহদণ্ডের উপর লাল পতাকা উড্ডীন। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — ঘাট থেকে কিছুটা উপরে উঠে গেলেই নন্দাদেবী, ভৈরব, কেদার এবং রুদ্রামহালয় নামক একটি রুদ্র মন্দির আছে। সব মিলিয়ে নাদগ্রামের এই তীর্থকে বলা হয় নন্দতীর্থ। চাঁদোদের নিকটে নন্দাহ্রদের যে বর্ণনা দিয়েছিলাম, এখানকার কাহিনীও সেই একইরকম। মা পার্বতী নন্দাদেবীর রূপ ধারণ করে মহিষাসুরকে বধ করার পর এখানে এসেও মহাদেবের অর্চনা করেছিলেন। পূজার পর পার্বতীর স্বরূপে মিলিয়ে যান। আমরা ঘাট থেকে উঠে গিয়ে প্রণাম করে এলাম।

নাদগ্রাম থেকে আরও দু মাইল হেঁটে গিয়ে রুক্মিণী তীর্থে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী বললেন — এখানে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শ্রবণ করে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অনুরক্তা হন, কিন্তু তাঁর এই সংকল্পের চরম বিরোধী ছিলেন তারই আপন সহোদর ভ্রাতা রুক্মী। রুক্মী নিজে ত কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেনই, তার উপর অপর কৃষ্ণবিদ্বেষী জরাসন্ধ ও শিশুপালের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা ছিল। রুক্মী এবং জরাসন্ধের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ভীষ্মক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। পিতার এই মনোগত অভিলাষ জানতে পেরে রুক্মিণী তাঁদের কুলপুরোহিতের শরণাপন্ন হন। তিনি বলেন — 'মা, শ্রীকৃষ্ণের মত গুণনিধান পরমযোগী পুরুষকে পতিরূপে লাভ করতে হলে তপস্যার প্রয়োজন। বিনা তপস্যায় শ্রীকৃষ্ণের মত স্বামী লাভ দুষ্কর কার্য। তুমি পূর্ণা তপোশক্তি নর্মদাতীরে গিয়ে তপস্যা কর।' কুলপুরোহিতের পরামর্শক্রমে রুক্মিণী মায়ের গোপন সমর্থনে, এখানে এসে তপস্যা করেন এবং কিয়ৎকালর মধ্যে মা নর্মদার আশীর্বাদ পেয়ে ফিরে যান বিদর্ভ দেশে। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রুক্মিণী পিতা শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ দিবার আয়োজন করলে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ সভা থেকে রুক্মিণীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে দ্বারকায় তাঁকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করেছিলেন।

এই রুক্মিণী তীর্থে রামকেশব তীর্থ, শিবতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং জয়বারাহ তীর্থ আছে। তার মধ্যে জয়বারাহতীর্থ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। রুক্মিণী তীর্থের ঘাট থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরেই আমরা জয়বারাহের মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। ঘাটের উপরেই মন্দির। মন্দিরে একটি প্রায়

এক ফুট পরিমিত শ্বেত শিবলিঙ্গ ছাড়াও একটি নারায়ণ শিলাও আছেন। মন্দিরের মধ্যে পুরোহিত মশাই আরতি করছিলেন। তাঁর পূজার কাজ শেষ হয়েছে। আরতি শেষ করে বেরিয়ে এসে তিনি জানালেন — জয়বারাহ মাহাত্ম্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্। মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলেছেন — উদ্ধৃতা জগতী যেন সর্বদেব নমস্কৃতা। লোকানুগ্রহবুদ্ধ্যা চ সংস্থিতো নর্মদাতটে। অর্থাৎ এই পরমশোভন জয়বারাহতীর্থ সর্বপাপপ্রণাশন। যিনি ত্রিলোকের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিতে সর্বদেবনমস্কৃতা পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন সেই বরাহদেব এখানে অবস্থান করছেন।

পুরোহিতজী শিবলিঙ্গের পার্শ্বস্থিত গরুড়াসনে শায়িত একটি প্রায় পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘাকৃতি নারায়ণ শিলা হাতে নিয়ে বললেন — এই নারায়ণ শিলার নাম জয়বারাহ। এই জয়বারাহ ছাড়া আরও তিনরকম বরাহশিলা হয় যথা — ভূবরাহ, ধরণীধর বরাহ এবং লক্ষ্মী-বারাহ। প্রত্যেক স্ব স্ব নামাঙ্কিত শিলার চক্র ও চিহ্ন আলাদা আলাদা। এই জয়বারাহ শিলার শাস্ত্র বর্ণিত লক্ষ্মণ হল — ঊর্ধ্বং মুখং বিজানীয়াৎ বারাহং হরিরূপিণম্। কামদং মোক্ষদং চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ। বারাহং শক্তিলিঙ্গন্ত চক্রে চ বিষমে স্থিতে। ইন্দ্রনীলনিভং স্থূলং ত্রিরেখা লাঞ্ছিতং শুভং। আপনারা পরিক্রমাবাসী বলে আপনাদেরকে হাতে করে দেখাচ্ছি; ভগবানের শিলামূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখুন, শিলার উপরিভাগে মুখ, উপরে ও নীচে দুটি চক্র এবং তিনটি ইন্দ্রনীল বর্ণের লম্বা লম্বা রেখা টানা আছে। বরাহদেব যখন জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করে এখানে এসে বিশ্রাম করেন, তখন নর্মদা হতে এই শিলা এবং শিবলিঙ্গ একই সঙ্গেই প্রকটীভূত হয়েছিলেন। শিবলিঙ্গের দিকে ভাল করে দৃষ্টিপাত করে দেখুন; শিবলিঙ্গের মধ্যেও তিনটি ইন্দ্রনীল বর্ণের রেখা বর্তমান।

আমরা সকলে প্রণাম করে শিঙা ডম্বরু বাজাতে জয়বারাহের মন্দির পরিক্রমা করতে লাগলাম। তিনবার পরিক্রমা করে আবার নর্মদাতটের রাস্তা ধরে পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের বাম দিকে রয়েছেন নমর্দার জলপ্রবাহ, ডানদিকে রয়েছে বহু সম্ভ্রান্ত পল্লী। নর্মদা যেন উপরদিক থেকে সোজা ঢালু হয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে নর্মদার প্রবাহকে এই রকমই মনে হচ্ছে। প্রায় তিনমাইল হেঁটে যাওয়ার পর আমরা ধর্মশালা নামক এক মহল্লাতে এসে পৌঁছালাম। এখানে এই ঘাটের উপরেই এক শিবমন্দির। ঘাটে পল্লীর অনেক লোকজন স্নান তর্পণাদি করছেন, বেলা ১২ টা বেজে গেছে।

লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — এইখানে আমরা স্নান করে নিব। এই ঘাট হল বিখ্যাত অস্মাহক তীর্থ, সুপ্রসিদ্ধ পিতৃতীর্থ হিসাবে এই স্থানের বিশেষ মর্যাদা। আজ ১৩৬১ সালের ৮ই কার্তিক। আপনারা স্নানাদি সারতে থাকুন। আমি জনা চারেককে সঙ্গে নিয়ে কিছু আটা সংগ্রহের জন্য পল্লীর ভিতরে কিছুটা ঘুরে আসছি।এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ঘাটে স্নানরত একজন লোককে মোহান্তজী জিজ্ঞাসা করলেন — ঘাটমেঁ এতনা কাফি ভীড় কেঁও?

— অমাবস্যা কী খাতিমেঁ। অমাহকমেঁ লোগোঁনে স্নান তর্পণাদিকে লিয়ে আয়ে। আশ্বিন মাহিনাকে ১০ তারিখমেঁ ইধর পঞ্চাশ হাজার আদমী আয়ে থে, সমুচা আদমী মহালয়কী পার্বন শ্রাদ্ধ কিয়ে থে। ইয়ে অমাহক তীর্থ গয়াজীসে ভি প্রসিদ্ধ হৈ।

আমাদের দলের নাগারা ইতিমধ্যে জলে নেমে স্নান করতে আরম্ভ করেছেন। অনেকে স্নান করে উঠে হাত-পা মুছছেন। মোহান্তজী আমাকে বললেন — এই অস্মাহক তীর্থ শ্রেষ্ঠ

পিতৃতীর্থ সন্দেহ নাই। তুমি স্নান করতে জলে নেমে পড়, অতি অবশ্যই তর্পণ করবে, পিতা ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে। আমাদের যাত্রা করতে দেরী হয়ে যাচ্ছে কিনা, তা তোমার বিচারের প্রয়োজন নাই। চলতি ভাষায় অস্মাহক তীর্থকে এখানকার লোক অমাহক বলে। পথে যেতে যেতে তোমাদের কাছে এই তীর্থের মহিমা বর্ণনা করব। আমি জলে নেমে স্নান করেই তর্পণ করলাম প্রাণভরে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করলাম — তর্পণের কোন উপচার আমার কাছে নাই। আমার চোখের জল এবং এই নর্মদার এক অঞ্জলি পুণ্যবারি ছাড়া আর কিছু নিবেদন করার নাই।

কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলাম ঘাট থেকে। মন্দিরে এসে দেখি, মোহান্তজী সহ সকলেরই স্নান হয়ে গেছে। লক্ষ্মণভারতীজী কোথা থেকে দশ বার কিলো আটা সংগ্রহ করে এনেছেন। প্রত্যেকের ঝোলাতে তা অল্প অল্প করে ভরে ফেলেছেন। আমারই তর্পণাদি সেরে আসতে দেরী হয়েছে। মন্দিরে প্রণাম করে আবার শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে যাত্রা সুরু হয়ে গেল। পথে হাঁটতে হাঁটতে শিঙ্গা ডম্বরুর নাদ থামিয়ে মোহান্তজী বলতে লাগলেন — স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে ১৪৬ তম অধ্যায়ে অস্মাহক তীর্থের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন — প্রেতত্বাদ যত্র মুচ্যন্তে পিণ্ডেনৈকেন পূর্বজাঃ, অর্থাৎ এই সর্বশ্রেষ্ঠ পিতৃতীর্থে একবার মাত্র পিণ্ডদান করলে পিতৃগণ প্রেতত্ব হতে মুক্ত হন। সপ্তসাগর ও সপ্রয়াগ পুষ্করতীর্থ একত্রিত হলেও অস্মাহকের তুল্যতা প্রাপ্ত হয় না। সোম যে বিখ্যাত সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে চন্দ্রগ্রহণে যে ফললাভ হয়, অস্মারক তীর্থেও মানুষ তার তুল্য ফললাভ করে।

মাসান্তে পিতরো নৃণাং বীক্ষন্তে সন্ততিং স্বকাম্।<br>কশ্চিদস্মৎকুলেহস্মাকং পিণ্ডমত্র প্রদাস্যতি॥

মাসান্তে পিতৃপুরুষগণ স্ব স্ব সন্ততির মুখপানে দৃষ্টিপাত করে মনে মনে ভাবেন, আমাদের কুলের কোন লোক এই তীর্থে এসে পিণ্ডদান করবে।

যুগে যুগে মহারাজ অস্মাহকে পিতামহাঃ।<br>সর্বদা হ্যবলোকন্ত আগচ্ছন্তং স্বগোত্রজং॥<br>ভবিষ্যতি কিমস্মাকমমাবাস্যপ্যমাহকে।<br>স্নানং দানঞ্চ যে কুর্যুঃ পিতৃণাং তিলতর্পণম্॥

অর্থাৎ মহামুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন — হে মহারাজ! যুগে যুগে পিতৃগণ অস্মাহক তীর্থে আগমন করেন আর সততই স্ব স্ব সন্ততির মুখাপেক্ষী হয়ে মনে মনে বলেন যে ঐ অমাবস্যা সমাগত হচ্ছে, পুত্রগণ আগমন করেছে, অবশ্যই অস্মাহকে আমাদেরকে পিণ্ডোদক দান করবে। যারা অস্মাহক তীর্থে স্নান দান ও পিতৃগণের তিল তর্পণ করে তারা সর্বপাপবিমুক্ত হয়ে সর্বান্ কামান্ লভন্তি বৈ, সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করে থাকে।

মোহান্তজী আরও জানালেন — অস্মাহক তীর্থে নর্মদা জলের মধ্যেই বহ্নিতীর্থ এবং ব্রহ্মশিলা বিরাজিত আছেন।

পুণ্যকথা শুনতে শুনতেই আমরা অঙ্গারেশ্বর গ্রামে এসে পৌঁছলাম। নর্মদার ঘাটে দাঁড়িয়ে পড়েই নর্মদা স্পর্শ করে মোহান্তজী বললেন — এই তীর্থের নাম অঙ্গারেশ্বর। মঙ্গল গ্রহ তপস্যা করে এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমি মন্ত্র বলছি , তোমরা আমার সঙ্গে কণ্ঠ

মিলিয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করে অঙ্গারেশ্বরকে প্রণাম কর —

ওঁ কুজায় ভূমিপুত্রায় রক্তাঙ্গায় সুবাসসে।
হরকোপোদ্ভবায়েতি স্বেদজায়াতিবাহবে॥

অর্থাৎ হে ভূমি তনয়! ভূমি মহাবীর্যসম্পন্ন ক্রোধকালে পিনাকীর স্বেদ হতে তুমি উদ্ভূত হয়েছ, হে অঙ্গারক! তুমি মহাতেজা, হে লোহিতাঙ্গ! তোমাকে নমস্কার!

মন্ত্রোচ্চারণ করে আমরা যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে নর্মদার ঘাটে ঘাটে ক্রমে ক্রমে অংকোল গ্রামে লিংকেশ্বর মহাদেব, নিকারা গ্রামে শ্বেতবরাহ তীর্থ, কশ্যপমুনির পুত্র ভার্গল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভার্গলেশ্বর মহাদেব, রবিতীর্থ প্রভৃতি পুণ্যস্থানকে পরপর প্রণাম করে, হুঙ্কারেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী বললেন — হুঙ্কারেশ্বরের মহিমা শুনবার আগে তোমরা একবার নর্মদার বিচিত্র গতিপথটিকে ভাল করে লক্ষ্য কর। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, মা ভীম বেগে প্রবাহিত হয়ে আসতে আসতে এখানে এসে দেখ, সরল তটরেখা সহসা গতিপথ বদলে মূল তটভূমি হতে দূরে সরে গিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন। আর পশ্চিম দিকে দেখ, সরল তটরেখা সহসা গতিপথ বদলে মূল তটভূমি হতে দূরে গিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন। মূল নর্মদার ধারা কল্লোড়ীনাথ বা গঙ্গোনাথের সন্নিকটে ব্যাসের বেটে যেমন দেখেছিলে, সেইরকম ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে এখানেও দ্বীপের দুধার দিয়ে বয়ে চলেছেন। সমুদ্রে মিলিত হবার জন্য বেটির যেন আর তর সইছে না! ঐ দ্বীপটিই মূলতঃ শুক্লতীর্থ, আর মাইল খানিক গেলেই আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। গিয়ে পৌঁছে মা নর্মদার যেমন দয়া হবে তেমনি দেখব।

এই গতিপথের আকস্মিক বৈচিত্র্য স্মরণে রেখে এবার এই হুঙ্কারেশ্বর তীর্থের কথা শোন। প্রাচীনকালে কিছু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এইখানে থেকে বেদ পাঠ এবং তপস্যা করতেন। একদিন প্রাতঃ সূর্যের উদয়কালে সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা যখন ভর্গস্তব পাঠ করে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, তখন মা নর্মদার ইচ্ছা হল, এই বেদজ্ঞ ক্রোধ জয় করেছেন কিনা, তা একবার পরীক্ষা করে দেখতে। হঠাৎ নর্মদার জল বাড়তে লাগল, জল বাড়তে বাড়তে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞপাত্র কমণ্ডলু আদি সব কিছু ভেসে গেল। বেদগ্রন্থগুলি যে যার হাতে নিয়ে তাঁরা বেদোক্ত মন্ত্রসকল আর্তস্বরে পাঠ করতে লাগলেন। তাঁদের হাঁটু পর্যন্ত ধীরে ধীরে জলে ডুবে গেল। সহসা দৈববাণীর মত মহাদেব নেপথ্যে হুঙ্কার দিলেন। ভয়ংঙ্কর হুঙ্কার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নর্মদা এক ক্রোশ দূরে সরে গেলেন। সেই থেকে এই স্থান পবিত্র হুঙ্কারস্বামী বিষ্ণুতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। আমরা হুঙ্কারতীর্থে প্রণাম করে ১২ মিনিট হেঁটে শুক্লতীর্থে এসে পৌঁছে গেলাম। পৌঁছেই মোহান্তজী নিজেও ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন, আমাদেরকেও প্রণাম করতে বললেন। সামনেই নর্মদার বেট, হুঙ্কারেশ্বর তীর্থে দাঁড়িয়ে দ্বীপের মত যে স্থানটিকে শুক্লতীর্থ বলে অনুমান করেছিলাম, এখানে পৌঁছে দেখলাম তটের উপরেই শুক্লতীর্থ। নর্মদার বেটে অর্থাৎ মধ্যভাগে ভারত প্রসিদ্ধ কবীর বট বর্তমান, ঐ গাছ ছাড়াও আরও কতকগুলি বড় বড় বটগাছ আছে। এই গাছগুলি কলিকাতার সন্নিহিত শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনের বটগাছের মত বড়, এইগুলির প্রত্যেকটির ছায়ায় ১৫/২০ হাজারের বেশী লোক বসতে পারে। ঐ গাছগুলির অবস্থানের জন্য নর্মদা সেগুলিকে ঘিরে দুভাগে প্রবাহিত হয়ে

গেছেন। দূর থেকে দ্বীপের মত দেখাচ্ছে। একেই সাধারণতঃ নর্মদার বেট বলা হয়। আমরা বেলা ২টায় এসে পৌঁছেছি। পৌঁছেই লক্ষ্মণভারতীজী আমাদেরকে নিয়ে গেলেন একটি সংস্কৃত টোল বাড়ীতে। চারপাশে ব্রাহ্মণ পল্লী। মোহান্তজী বললেন — এই ব্রাহ্মণ পল্লীতে অনেক বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাস, সংস্কৃত চর্চার প্রাধান্য এখানে বেশী। আমাদের ভাগ্য ভাল, আর দুদিন পরে পূজার ছুটি শেষ হলে আমাদের থাকতে অসুবিধা হত।

পরিক্রমাবাসীদের শিঙ্গা, ডম্বরু এবং হর নর্মদে ধ্বনি শুনেই অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা মোহান্তজীকে আহ্বান জানিয়ে তাঁর কিছু বলার আগেই সংস্কৃত টোলগৃহ খুলে দিলেন; পর পর ১০ খানা ঘর নিয়ে এই টোল। টোলগৃহটির চতুর্দিকে ফুলের গাছ, বিল্ব, দাড়িম্ব, যজ্ঞডুম্বুর, শমীবৃক্ষ এই পল্লীর চারদিকে অপর্ব শোভা বৃদ্ধি করছে। চার পাঁচটা নারকেল গাছও এখানে দেখলাম। এক বৃদ্ধ পণ্ডিত এসে মোহান্তজীর হাতে একটি সশীষ্ ডাবসহ কিছু ফল ভেট দিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পরিক্রমাবাসীদের আহ্বান জানালেন এবং বললেন — এই শুক্লতীর্থের পল্লীতে দুধের অভাব নেই। এখানে প্রত্যেক গৃহেই ৩০/৪০ টা করে দুগ্ধবতী গাভী আছে; শুনে সুখী হবেন, এখানে দুটি কামধেনুও আছে। তাঁদের নিত্য সেবা পূজা শাস্ত্র বিধি অনুসারে হয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণে দুধ এবং মোণ্ডাতে যদি আপনাদের অসুবিধা না হয়, তাহলে দয়া করে আমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করতে অনুমতি হয়। মোহান্তজী সম্মতি দিতেই তিনি হর্ষধ্বনি করে চলে গেলেন।

টোলগৃহের মধ্যে ঢুকে দেখি, ইতিমধ্যেই লক্ষ্মণভারতীজীর ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকটি প্রশস্ত ঘরে কে কোথায় থাকবেন তার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। মোহান্তজী সর্বপ্রথম আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদা স্পর্শ করিয়ে এনে মন্দির সন্নিহিত একটি কূপের কাছে এনে দাঁড় করালেন। কূপটির পাশেই তামার একটি প্রকাণ্ড ওঁ চিহ্ন মোটা লোহার দণ্ডে সুপ্রোথিত আছে। গোটা দণ্ডটিই সিন্দুর লিপ্ত। আমাদেরকে দেখে একজন পঞ্চাশ যাট বৎসর বয়স্ক শিখাউপবীতধারী ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে কালো, লাল এবং হরিদ্রাবর্ণের তিনটি সূতার লাটাই। তিনি আমাদেরকে শোনাতে লাগলেন — প্রাচীনকালমেঁ ইক্ষাকু কুলোৎপন্ন অবন্তীনরেশ রাজর্ষি চাণক্য বড়ে হি বুদ্ধিমান তথা পরাক্রমী থে, উন্‌হোনে প্রতিজ্ঞা করী থী কি জিস্ সময় কোঈ মুঝে ধোখা দে দেগা, উসী সময়মেঁ আপনে প্রাণোঁ কা পরিত্যাগ কর দুঙ্গা। ইস্‌পর অনেক দেবতায়োঁ নে উন্‌হে ধোখা দেনে কী চেষ্টা কী, কিন্তু উহ্ সফল ন হো সকে। সুন্দ্ উপসুন্দ নাম কে দো ভাই দৈত্যকো বারেমেঁ আপলোগ পড়ে হোঙ্গে। উন্ দৈত্যকো কিসী প্রকার মহারাজ চাণক্যকো ধোখা দিয়া। অব মহারাজকো প্রাণত্যাগ নাহি থা। কিন্তু ইয়ে এ্যায়সে তীর্থমেঁ প্রাণ ত্যাগনা চাহতে থে, জহাঁ প্রাণ ত্যাগনেসে মুক্তি হো। উনহোনে ধর্মরাজ সে ইস্ বাত কী জিজ্ঞাসা কী। ধর্মরাজ নে বাতায়া — জিস তীর্থমেঁ কালো সূত শুক্লবর্ণ কা হো জায়, উহী মরণেসে মুক্তি হোগী।' ইয়ে শুনকর মহারাজ ভেলামেঁ চড়কর অনেক তীর্থমেঁ গয়ে, কিন্তু ভেলাকী কৃষ্ণরজ্জু শুক্লা নেহি হুয়া। চলতে চলতে মহারাজ যব রেবা কিনারে — ইস্ তীর্থমেঁ আয়ে উহ্ কালা রজ্জু শুক্লবর্ণ হো গয়ে —

নীলং রক্তং তদভবন্মেচকং যদ্ধি সূত্রকম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং দৃষ্টা রজ্জুং মহামতিঃ।
আপ্লুত্য বিমলে তোয়ে গতোহসো বৈষ্ণবং পদং॥

আভী সে য়হ শুক্লতীর্থ কে নাম সে বিখ্যাত হুয়া।'

এই বলে সেই ব্রাহ্মণ তাঁর হাতের লাটাই হতে পর পর কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং হরিদ্রাবর্ণের সূতা কূপের মধ্যে নামিয়ে দিলেন। প্রত্যেক সূতার অগ্রভাগে একটি করে গুটকা বাঁধা আছে। সূতাগুলি যখন টেনে তুললেন তখন অবাক হয়ে দেখলাম সব বর্ণের সূতাই সাদা হয়ে গেছে।

আমরা সেখানে ফিরে এসে দেখি, সেই সংস্কৃত টোলগৃহে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসে প্রচুর পরিমাণে দুধ ও মোণ্ডা আমাদের ভোজনের জন্য এনেছেন। যথানিয়মে 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' করা হোল।

ভিক্ষাপ্রাপ্তির পর আমরা যে যার আসন পেতে বিশ্রাম করতে লাগলাম। বেলা প্রায় ৪টা নাগাদ যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদেরকে আবাহন করেছিলেন, তিনি এলেন মোহান্তজীর সঙ্গে আলাপ করতে। কথায় কথায় কূপের জলে কালো সূতা সাদা হবার প্রসঙ্গ উঠল। তিনি বললেন — সামনে যে নর্মদার বেট তার চতুপার্শ্বস্থ জলে নীল কালো প্রভৃতি যে কোন বর্ণের সূতা ডুবালেই তা সাদা হয়ে যায়; সাদা সূতা সাদাই থাকে। আর এই গ্রামে ৫খানা কূপ আছে, তার প্রত্যেকটার জলে ডুবালেই কালা সূতা সাদা হয়ে যায়।

এই সময় মতীন্দ্রজী বলে উঠলেন — এখানকার জলে বোধহয় বিশেষ রাসায়নিক গুণ আছে, সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া বশেই হয়ত কালা সূতা সাদা হয়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি মতীন্দ্রজীকে বললেন — আপনি পরিক্রমাবাসী, আপনার পরিধানে দেখছি গৈরিক আলখাল্লা আপনার মুখে একথা শুনতে পাব আশা করিনি। ব্রিটিশ আমলে সাহেবরা এই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন, বছর তিনেক আগেও এ দেশীয় ইংরাজীনবীশ কয়েকজন সাহেব গবেষণার অজুহাতে নর্মদার বেটে এবং এখানকার কিনারাতে অনেক রকম যন্ত্রপাতি বসিয়ে, এখানে ওখানে মাটি খুঁড়ে প্রায় ছমাস ধরে তাঁদের মূল্যবান মস্তিস্তকোষকে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত এবং বিজৃম্ভিত করেছেন, কিন্তু কালো সূতো এখানকার জলে ডুবোলে কেন সাদা হয়ে যায়, তার কার্যকারণ কিছুতেই নির্ণয় করতে পারেন নি। এ হল এই নর্মদা তীর্থের মহিমা।

গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদিবারণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা॥

তথাপি, এই শুক্লতীর্থে মা নর্মদার পুণ্যবারির প্রভাব সবচেয়ে বেশী। তপস্যা দ্বারা স্বয়ং অনুভব করে নর্মদার মানসপুত্র সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় মহামুনি স্বয়ং ঘোষণা করে গেছেন —

সর্বৌষধীনামাশনং প্রধানং সর্বেষু পেয়েষু জলং প্রধানং।
নিদ্রাসুখানাং প্রমদা রতীনাং সর্বেষু গাত্রেষু শিরঃ প্রধানং।
স্নাতস্যাপি যথাপুণ্যং ললাটং নৃপসত্তম।
শুক্লতীর্থং তথাপুণ্যং নর্মদায়াং ব্যবস্থিতম্॥

অর্থাৎ যেমন ভোজ্যবস্তুর মধ্যে ঔষধি প্রধান, পানীয় মধ্যে জল প্রধান, সুখসমূহের মধ্যে

নিদ্রাসুখ শ্রেষ্ঠ, রতির মধ্যে প্রমদা রতি উত্তম, দেহাবয়ব মধ্যে মস্তক সর্বোত্তম এবং যেমন স্নাত ব্যক্তির ললাট অতি পবিত্র তেমনি এই নর্মদাস্থিত শুক্লতীর্থ পুণ্যতম।

মোহান্তজী যতীন্দ্রজীকে দেখিয়ে তাঁকে জানালেন — আমার এই নাগা শিষ্য মা নর্মদার পুণ্য মহিমায় গভীর আস্থা রাখে, উনি কেবল কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন কথাটা। আপনি কিছু মনে করবেন না। ব্রাহ্মণ শান্ত হলেন। উঠে যাবার আগে বলে গেলেন — আমাদের এই পল্লীর শেষ প্রান্তে একটি বেদ বিদ্যালয় এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রম আছে। সাধারণ বা অসাধারণ কারও সেখানে প্রবেশ নিষেধ। চারিদিক সুউচ্চ ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই গ্রামেরই একজন বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যতিধর্ম গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ বালকদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা, নিত্য হবনাদি ক্রিয়া এবং বেদপাঠের শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রায় ২১ জন ব্রাহ্মণ বালক সেখানে অহোরাত্র বাস করে। এই পল্লীরও কয়েকজন বালক সেখানে থাকে। গুজরাট সরকার ঐ বিদ্যালয়ের সমূহ ভার বহন করে থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই টোলগৃহে বসেই তাদেরকে দেখতে পাবেন। তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে নর্মদাতে স্নান করতে আসবে। সে সময় এই পল্লীর মায়েরাও তাদেরকে দর্শন করার জন্য গৃহদ্বারে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যাঁদের সন্তানেরা ঐ স্থানে বাস করছে, তাঁরা প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে তাঁদের স্নেহের দুলালদের ঐ দুটি সময়েই কেবল নিজের চোখে দেখতে পান।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। আমরা সেইসব বেদপাঠী বাল ব্রহ্মচারীদেরকে দর্শন করার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় বেদধ্বনি শুনে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। একজন প্রবীণ যতির পেছনে পেছনে মুণ্ডিত মস্তক বা শিখা যজ্ঞোপবীত এবং মেখলা ধারী বাসন্তী রং এর পট্টবস্ত্র পরিহিত একদল বালক হাতে অলাবুর কমণ্ডলু নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে আসছেন —

> ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাকপ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।
> সর্বং ব্রহ্মোপনিষদম্। মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্মনিরাকরোৎ,
> অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেহস্তু।
> তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু
> ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ হর নর্মদে॥

অর্থাৎ আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সমস্তই উপনিষদ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখান (নিরাকৃত) না করেন।

তাঁর ও আমার মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকুক। উপনিষদে যে সকল ধর্মের কথা বলা হয়েছে, আত্মনিষ্ঠ আমাতে সেই ধর্মসমূহ প্রকাশ লাভ করুক। শিব এবং নর্মদার জয় হউক।

বালকদের বয়স কারও দশ থেকে বার বৎসরের বেশী হবে না। তাদের মুখে বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ এবং তাদের ঐরকম বেশবাস দেখে আমরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্থান, কাল ভুলে গেলাম। মনে হল, আমরা যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন বৈদিক ঋষির তপোবনের এসে পৌঁছেছি। ঋষি-কবির সেই আকুতির কথা মনে পড়ছে —

'আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্তে, সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরমঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।'

কবিগুরু এখানে এলে দেখতে পেতেন, তাঁর স্বপ্নের (স্বল্প পরিমাণে হলেও) সার্থক রূপায়ন ঘটেছে নর্মদা তটের এই শুক্লতীর্থে।

আজ শ্যামা পূজা বলে কিনা জানিনা, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্ব থেকেই পল্লীর প্রতিটি গৃহে মাটির প্রদীপে ঘৃত সিক্ত দীপ জ্বালা হয়েছে। এই টোল গৃহের বারান্দাতেও দীপ জ্বলছে। সেই দীপাবলীতে আলোকিত পথ দিয়েই প্রায় আধ ঘন্টা পরেই আমরা সেই বাল ব্রহ্মচারীদের কলধ্বনি শুনতে পেলাম। তাঁরা স্নানান্তে নর্মদা তট থেকে কলকণ্ঠে গাইতে গাইতে আসছেন —

নাস্তি লোকেষু তত্তীর্থং পৃথিব্যাং যন্নরেশ্বর।
শুক্লতীর্থেন সদৃশমুপমানেন গীয়তে।
শুক্লতীর্থং মহাতীর্থং নর্মদায়াং ব্যবস্থিতম্।
প্রাগুদকপ্রবণে দেশে মুনিসঙ্ঘ নিষেবিতম্॥
বৈশাখে চ তথা মাসি কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্দশী
কৈলাসাদুময়া সার্ধং স্বয়মায়াতি শংকরঃ॥
মধ্যাহ্ন সময়ে স্নাত্বা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
ব্রহ্ম বিষ্ণিন্দ্র সহিত শুক্লতীর্থে সমাহিতঃ॥

তাঁরা টোল গৃহের সীমানা অতিক্রম করে যেতেই মোহান্তজী বললেন — এই শ্লোক রেবাখণ্ডের ১৫৬ তম অধ্যায়ে আছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের কাছে শুক্লতীর্থের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন — পৃথিবীতে এমন কি ত্রিলোকে এমন কোন তীর্থ নাই , যা শুক্লতীর্থের সমান সাদৃশ্য লাভ করতে পারে। শুক্লতীর্থ মহাতীর্থ, এ তীর্থ নর্মদাতীরে অবস্থিত এবং প্রাগুদকপ্লব অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব হতে বর্তমান; ঋষিসঙ্ঘ সতত এই তীর্থের সেবা করে থাকেন। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী দিনে মহাদেব কৈলাস হতে উমার সঙ্গে এখানে এসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সমাহিত চিত্তে মধ্যাহ্নকালে স্নান করে থাকেন।

সন্ধ্যা হয়েছে। এখন সন্ধ্যা ৬টা ১৫মিনিট। শুক্লতীর্থের প্রতিগৃহেই শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। মোহান্তজী বললেন — আমার সঙ্গে যার এখন স্নান করেত ইচ্ছা হয়, আসতে পার। আমি নর্মদাতে স্নান করব। তাঁর সঙ্গে আমরা ১০জন স্নান করতে গেলাম। শুক্লতীর্থে সান্ধ্য স্নান সেরে এসে আমরা সন্ধ্যা করতে বসলাম। সান্ধ্য জপাদি যখন শেষ হল, তখন রাত্রি দশটা বেজেছে। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন — কাল সকালে স্নান সেরেই আমরা হরিধামের দিকে রওনা হব। এখান থেকে মাত্র ৬মাইল এগিয়ে গেলেই রেবা-সমুদ্র সংগম। শৈলেন্দ্রনারায়ণ, মতীন্দ্র, রতনভারতী প্রভৃতি যারা এই জীবনে প্রথম রেবা-সমুদ্র সংগম দর্শন করবে, তোমরা সেখানকার গভীর ও গম্ভীর দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে যাবে। দেখবে, যে নর্মদাকে অমরকন্টকের উদ্‌গম মন্দির হতে এতকাল এত বিচিত্রভাবে বিচিত্র গতিতে দেখতে দেখতে এলে, তিনি

সমুদ্রের সঙ্গে কি বিশাল বিস্তার নিয়ে সুন্দর ভয়ঙ্করী কেমন কল্লোলময়ী রূপ নিয়ে মিলিত হয়েছেন। আগামীকাল প্রাতঃকালে প্রভাত সূর্য তোমাদের জীবনে এক নূতন তাৎপর্য বহন করে উদিত হবেন। কাজেই আজ আর অধিক রাত্রি করে লাভ নাই। মা নর্মদাকে প্রণাম করে শুয়ে পড়া যাক্।

কথাগুলি বলতে বলতেই তিনি শুয়ে পড়লেন। একে একে আমরাও সকলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মতীন্দ্রজী আমার পাশেই শুয়ে আছেন। তাঁর হাতের ঘড়ি এবং টর্চ তাঁর মাথার শিয়রে রাখা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙায় অন্ধকারের মধ্যেই তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবলাম। উঠে বসলাম। সাবধানে হাত বাড়াতেই মতীন্দ্রজীর টর্চটা হাতে ঠেকল। আলতো করে হাত ঢাকা দিয়ে টর্চ টিপে ঘড়িটার দিকে নজর দিতেই দিতেই দেখতে পেলাম, রাত্রি এখন ১টা বেজে কুড়ি মিনিট নিশিতে পাওয়া লোকের মত কতকটা বিহ্বল ভাবেই বাইরে বেরিয়ে আমি টোল গৃহের বারান্দায় দু এক মিনিট চুপ করে দাঁড়ালাম। অমাবস্যার রাত্রির নীরন্ধ্র জমাট অন্ধকার ঢেকে রেখেছে চারদিক। টুপ টুপ করে শিশির পড়ছে। টর্চের আলোতে দেখলাম, এই টোল গৃহের চারদিকে যে সব ফুল গাছ তা শিশিরে ভিজে গেছে, মেঝেতেও কেউ যেন এইমাত্র জল ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। মাথাতে ভাল করে কম্বল জড়িয়ে ভূতগ্রস্তের মত ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে ঘাটে এসে একেবারে নর্মদার সামনে এসে দাঁড়ালাম। হিমেল বাতাস নদী ধারে হু হু করে বইছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেই অন্ধকারটা যেন একটুখানি পাতলা বা স্বচ্ছ হয়ে আসছে বলে মনে হল। ঐ ত নর্মদার জল চক্‌চক্ করছে। ঐ ত দেখা যাচ্ছে বেটের মধ্যে কবীর বটের চূড়া। নর্মদার কলকল ধ্বনি এবং কদাচিৎ দু একটা নৈশ পাখীর কূজন দ্বারা বিখণ্ডিত যে গভীর নৈঃশব্দ, তা যেন আমার আত্মসত্তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে। আমি মা নর্মদার ষড়ক্ষরী মহাবীজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জপ করতে লাগলাম। বেশ খানিকটা সময় গত হলে আমি বেটের বৃহৎ বৃহৎ সুউচ্চ বটগাছগুলিকে লক্ষ্য করে টর্চ টিপলাম। টর্চের আলোতে দেখতে পেলাম সেই সব সুবৃহৎ বনস্পতির পাতাগুলি শিশির ভিজে চক্‌চক্ করছে। নর্মদার যে দুটি ধারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে ঐ দ্বীপটির সৃষ্টি করেছে, ঐ দুটি ধারাকে মনে হচ্ছে ভূজগাকারা কুণ্ডলিনী যেন হঠাৎ দুটি ফণা বিস্তার করে বেটটিকে ঘিরে বয়ে চলেছেন সমুদ্রের দিকে, অনন্তের পথে!

মহাকাল এই পটভূমিতে অচঞ্চল, স্তব্ধমৌন বনস্পতি শ্রেণীর মত ধ্যান সমাহিত। ঐ আকাশ, এই নিশীথ রাত্রির ঘোর নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা, বেটের ঐ গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলছে — সেই শব্দহীন বাণী নর্মদা নদীর কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠেছে প্রতিক্ষণে। সেই ভয়ংকর মুণ্ডমহারণ্য, ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি, শূলপাণির ঝাড়ি সে সব রাত্রিতেও এইরকম কোন অমাবস্যার ঘোর রাত্রিতে এইরকম বাইরে একা একা দাঁড়িয়ে সামনের ঐ নির্জন বেটের মতই অরণ্যের ভাষা শুনতে পেয়েছিলাম কিনা কে জানে! যদি শুনে থাকি, সেইসব গভীর অরণ্যও নিশ্চয়ই আজও বেটের নিঃশব্দতার সুরে সুরে মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্ছে। এই বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে কিন্তু অমরতার বার্তা বহন করে আনছে। এইসব অরণ্য ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েছে এই আরণ্য-

শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েছে এইরকম অরণ্যের স্তব্ধতার মধ্যে — নগরের কলকোলাহলের মধ্যে নয়। আরেকবার টর্চ টিপে দেখে নিলাম কবীর বটের চূড়া। আমার প্রপিতামহ যখন জম্মান নি, বৃদ্ধ প্রপিতামহ যখন বালক তখন হয়ত ঐ বটগাছ ছিল ক্ষুদ্র দু তিন ইঞ্চি পরিমিত চারা! কি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত ছিল এর মধ্যে যে, তা আজ বাড়তে বাড়তে ঐ বিশাল বনস্পতির রূপ নিয়েছে! একেই বলে ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তি রয়েছে বিশ্বের সব কিছুতে। এইসব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু' আওড়ালে কি হবে? উপলব্ধি করা চাই।

বাবার কথা মনে পড়ল। আমি মাথা নত করে ভক্তিভরে প্রণাম জানালাম ঋষি পিতাকে। এ সংসারে কয় জনের পিতাই বা নিজের প্রাণপ্রিয় বাছনিকে তরুণ বয়সেই পাঠিয়ে দেন একা একা এই হিংস্র শ্বাপদ অধ্যুষিত এই ঘনঘোর ভয়ংকর ঝাড়ি পথে যেখানে প্রতি পদে মৃত্যু ওৎ পেতে থাকে। তিনি পাঠিয়েছিলেন, নর্মদা পরিক্রমার অজুহাতে ভগবানের এই বিচিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য দু-চোখ ভরে দেখত, তার থেকে শিক্ষা নিতে, রস গ্রহণ করতে। আমি পরমানন্দে ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াব, ঋষিকুল সেবিত 'ভারতাজির' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ বলে চিরবন্দিতা ভারতের পর্বত ও অরণ্য পথে ঘুরে ঘুরে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করব। তারপর আমার মুক্তি হোক বা না হোক, দিব্যানুভূতির স্পর্শ আমার কপালে জুটুক না জুটুক, সে সব তত্ত্ব ভাবনা করার কথা আমার নয়। আমি না থাকলেই বা কি ? সেই অপূর্ব শিল্পী যিনি এই অপরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করেছেন — যুগে যুগে শুধু তিনিই থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনই সুন্দরভাবে কল্প হতে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোক লোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল চপল, আনন্দোজ্জ্বল নৃত্যছন্দে হেসে গেয়ে; জগতের সকল বস্তুর মধ্যে তাঁরই আনন্দরূপ লীলায়িত হয়ে উঠুক, আমরা তা উপলব্ধি করে যেন বলতে পারি — ওহো! আনন্দম্! আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি।

ক্রমাগত শিশির পড়ে গায়ের কম্বলটা স্যাঁতস্যাঁৎ করছে। শিবপুত্রী নর্মদা এবং বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমি ফিরে এলাম টোল গৃহে। কম্বলের মধ্যে টর্চ রেখে টিপলাম। সেই মৃদু আলোতে পা টিপে টিপে নিজের আসনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকলেই অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নানা ছন্দে তাঁদের নাসিকাধ্বনি হচ্ছে। টর্চটা মতীন্দ্রজীর মাথার কাছে রাখতে ঘড়িটা দেখে নিলাম রাত্রি এখন আড়াইটা। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, ১টা ২০ মিনিটের সময় বাইরে গেছলাম, ৭০মিনিটকাল আমি এই ঘনঘোর অমাবস্যার তিথিতে একা একা ঐ জনহীন নদীতটে তাহলে দাঁড়িয়ে ছিলাম — এই ৭০ মিনিটে যেন ৭০ বছরের জ্ঞান সঞ্চয় হল, চোখ যেন খুলে গেল। তাঁর জয় হোক। জয় হোক সেই মহাদেবতার।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্মণভারতীজীর সাড়া পেয়ে জেগে উঠলাম। তিনি তাড়া দিচ্ছেন — 'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! উঠো ভেইয়া জাগো! বাল ব্রহ্মচারীনে আ রহা হৈ। সবাই জেগে গেছেন। ধড়মড় করে উঠে পড়েই বারান্দায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে দাঁড়ালাম। ব্রাহ্মণ পল্লীর অধিকাংশ নরনারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বাল ব্রহ্মচারীরা বেদধ্বনি করতে করতে আসছেন নর্মদাতে প্রাতঃস্নান করতে। এখনও কুয়াশা সম্পূর্ণভাবে

অপসৃত হয় নি। ঘড়িতে সাড়ে ছটা বেজেছে। ফাঁকা হয়েছে বটে তবে সূর্যোদয় হয় নি। বাল ব্রহ্মচারীরা সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন —

স্থানুরয়ং ভারহরেঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোহর্থম্।
যোহর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞান বিধূত পাপ্‌মা।।

তাঁরা আমাদের অতিক্রম করে যেতেই কালকের সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের কাছে এসে বললেন —বাল ব্রহ্মচারীরা যে মন্ত্রপাঠ করতে করতে যাচ্ছেন, ঐটি যাস্কাচার্য প্রণীত নিরুক্তে (১/১৮) আছে। ঐ মন্ত্রে বলা হয়েছে ; যিনি বেদের স্বর ও পাঠ মাত্র সমাপ্ত করেছেন অথচ অর্থ জানেন না, তিনি শাখা পত্র এবং ফল ভারবহনকারী বৃক্ষ এবং ধ্যানাদির ভারবহনকারী পশুর ন্যায় ভারবাহ্ অর্থাৎ ভারবহনকারী মাত্র! আর যিনি যথা বিহিত স্বর জেনে বেদপাঠ করেন এবং বেদার্থ সম্যকরূপে জানেন, তিনিই পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞান বলে পাপ সমূহ বর্জন করে পবিত্র ধর্মাচরণ প্রভাবে দেহান্তের পর সর্বানন্দ লাভ করে থাকেন।

তাঁর মন্ত্র ব্যাখ্যা শেষ হলে মোহান্তজী তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন। বললেন — আতিথেয়তার জন্য এই তীর্থ মহাতীর্থের সকল অধিবাসীদেরকেই আমি আশীর্বাদ করছি। স্নানাদির পর আমরা এখান থেকে হরিধামের দিকে যাত্রা করব। মা নর্মদা আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। তিনি 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করে চলে গেলেন। হঠাৎ কম্বলটির উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। 'এতো আমার কম্বল নয়! এ কম্বল ত মোহান্তজীর!' তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে বললেন — তোমার গায়ের কম্বলটা ত ভিজা দেখছি। ভিজল কি করে? তুমি শীতে কুঁকড়ে শুয়েছিলে বলে আমার কম্বলটা তোমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছি। তুমি তখন ঘুমে অচেতন ছিলে! হরিধামে পৌঁছেই এই স্নেহময় মানুষটাকে হয়ত সারা জীবনের জন্য আমাকে ছেড়ে যেতে হবে! আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

আমাদের দলের অধিকাংশ নাগা প্রাতঃকৃত্য সারতে গেছেন। আমরা কয়েকজন মাত্র দাঁড়িয়ে আছি। এবার আমরাও যাব বলে উদ্যোগ করছি, এমন সময় আবার বেদধ্বনি উঠল। বাল ব্রহ্মচারীরা স্নানান্তে ফিরে আসছেন। তাঁরা গাইতে গাইতে আসছেন —

ওঁ ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃতা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।

এই মন্ত্র ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৬৪ সূক্তের ৩৯ নম্বর মন্ত্র। মন্ত্রের দেবতা বিশ্বদেবগণ। দ্রষ্টা মহর্ষি উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। এই মন্ত্রের অর্থ হল — যে ব্যাপক অবিনাশী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর সত্তায় জগতের সমস্ত বিদ্বান্ পুরুষ এবং পৃথিবী সূর্যাদি সব লোক অবস্থিত, ঋকের পরমব্যোম সদৃশ অক্ষরে যিনি সমূহ দেবগণ সহ স্থিত আছেন, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না, তিনি কি ঋগ্বেদাদি হতে কোন আনন্দ পেতে পারেন? না, না। যাঁরা বেদাধ্যায়ন পূর্বক ধর্মাত্মা ও যোগী হয়ে সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব অধিগত করতে পেরেছেন, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বরে স্থিতিলাভ করে মুক্তি রূপী পরমানন্দ লাভ করতে পারেন। তাৎপর্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞান সহকারেই বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হওয়া আবশ্যক। কেবল ঋক মুখস্থ করে কোন লাভ নাই।

বাল ব্রহ্মচারীরা তাঁদের বেদ বিদ্যালয়ে চলে যাবার পর আমরা যে ক'জন বাকী ছিলাম, মোহান্তজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে গেলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণাদি সেরে আসতে আসতে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। টোলগৃহে ফিরে এসেই হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আবার আমাদের যাত্রা হল সুরু।

নর্মদার বুক উঁচু হয়ে উঠেছে। বিস্তার ক্রমশঃ এত বেশী হয়ে উঠেছে যে এপার ওপার দুই তট যেন এক হয়ে গেছে। ওপারের দক্ষিণতট এবং এপারের উত্তরতট, দুই-এর মধ্যস্থলে জল ছাড়া আর কিছু নাই। আমরা খুব সন্তর্পণে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে এগোতে লাগলাম। সকাল ৮টা নাগাদ আমরা শুক্লতীর্থ হতে যাত্রা করেছিলাম, আমাদের ডান পাশে তটের নিচেই অজস্র গাছপালার ভিড়, বড় বড় অশ্বত্থ, বট, অর্জুন, শিমুল, পাকুড় ছাড়াও বহেড়া ও আমলকী যেন নর্মদার ঐ উচ্ছল ও উদ্দাম বেগ দেখে সমান তালে মাথা উঁচু করে সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে নর্মদা ও সমুদ্রের মিলনস্থল দেখবার জন্য। গাছপালার সারির ওধারে কিছুটা দূরে দূরে অনেক বসতিও দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন — ঐ সব গ্রামে গাঁড়েরিয়াদের বাস, গাঁড়েরিয়ারা সাধারণতঃ ভেড়ার লোমের ব্যবসা করে। ঐ সব লোম তারা ভড়ৌচের (ভারোচ বা ব্রোচ) বাজারে পাঠায়, সেখান থেকে অন্যান্য স্থানে বড় বড় ব্যাপারীরা রপ্তানী করে। প্রায় তিন মাইল হাঁটার পর সকাল ৯টা ২০ মিনিটের সময় আমরা কোটেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছলাম। এখানে একটা বিরাট শিব মন্দির। মোহান্তজী বললেন — কোটেশ্বর মন্দির, বাণাসুর নির্মিত। ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে ধাবড়ীকুণ্ড যেমন বাণাসুরের যজ্ঞস্থল, সেখানে তিনি নিত্য অজস্র মৃন্ময় শিবলিঙ্গ তৈরী করে নিজহাতে পূজা করতেন, পরে মহাদেব কৃপাবিষ্ট হয়ে নিজেই সেখানে নিত্য শিবলিঙ্গ রূপে ক্ষণে ক্ষণে প্রকটীভূত হওয়ার বর দেন, এখানেও তেমনি বাণাসুর এসে উগ্র শিব তপস্যায় মগ্ন হলে এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আবির্ভূত হন। এখানেও বাণাসুর নর্মদার জলে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ প্রকটীভূত হওয়ার বর প্রাপ্ত হন। নর্মদার তট ঘেঁসে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াই চল, দেখবে কিছুক্ষণ বাদেই এখানে শত শত শিবলিঙ্গ জল থেকে উত্থিত হয়ে তটে আছড়ে পড়ছে। এই কোটেশ্বরের স্থানে পূর্ব পূর্ব যুগ হতে আজ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ঋষি এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

আমাদেরকে নিয়ে তিনি নর্মদার কিনারা ঘেঁসে দাঁড়ালেন। এই সময় দেখলাম, লক্ষ্মণভারতীজীর চোখে ভ্রূকুটি বা রোষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তিনি অবশেষে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, এভাবে প্রত্যেক স্থলে বিলম্ব করলে হরিধামে পৌঁছাব কখন? কখন কবে কতদিনে ভারোচে পৌঁছানো সম্ভব হবে? মোহান্তজী তাঁর কথার কোন উত্তর দিলেন না। আমরা রেবামন্ত্র জপ করতে করতে মিনিট পনের অপেক্ষা করার পরেই অনেকগুলি নানা বর্ণের শিবলিঙ্গ জল হতে ঠিকরে এসে পড়লে, পাঁচটি শিবলিঙ্গ আমার কাছে এসে পড়ল। আমি সেগুলি ভক্তিভরে কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। অন্যান্যরাও কয়েকটি শিবলিঙ্গ কুড়িয়ে নিলেন। বাকীগুলি মোহান্তজী কুড়িয়ে পুনরায় জলে ফেলে দিলেন। কোটেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম করে আবার আমরা হাঁটতে লাগলাম হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে। এবারে রাস্তা একটু বদলাল। এতদূর পর্যন্ত নর্মদার গতিপথ একভাবেই ছিল। কিন্তু এখন দেখছি শুক্লতীর্থ হতে তিন মাইল পথ একইভাবে আসার পর নর্মদা হঠাৎ আধমাইল সরে গিয়ে

প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছেন। আমরা কোটেশ্বর মন্দির হতে নিচে নেমে হাঁটতে লাগলাম। আধ মাইলটাক এইভাবে যাবার পর নর্মদার কিনারে পৌঁছলাম। সেই কিনারা ধরেই সোজা পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলাম।

শুক্লতীর্থে প্রবেশ করার সময় লক্ষ্য করেছিলাম নর্মদা যেন তাঁর বিশাল জলপ্রবাহ নিয়ে জলপ্রপাতের আকারে উপর থেকে নিচে যেন গড়িয়ে পড়ছিলেন নিঃশব্দে, শুক্লতীর্থের পর দেখলাম নর্মদা প্রশস্তরা হয়ে কোটেশ্বর পর্যন্ত সমানে বুক উঁচু করে প্রবাহিত হয়ে এলেন, এখানে দেখছি হঠাৎ তট ছেড়ে সরে গিয়ে একটি সরলরেখার মত বয়ে চলেছেন, বিস্তৃতি গতিবেগ একই রয়েছে। আরও প্রায় মাইল খানিক হেঁটে যাবার পর এক বিরাট বেলগাছের বাগান চোখে পড়ল। বেলগাছের ধারে ধারে অজস্র নানা জাতীয় ফুল ফুটে আছে। তিনি সকলকে সমুদ্র ও নর্মদার পূজার জন্য ফুল তুলতে বললেন। নিজেও কিছু পুষ্প চয়ন করলেন। পুষ্প চয়ন করতে করতেই তিনি হাঁক পাড়লেন, 'বাঙালী বাবা! তুরন্ত্ হমারা পাশ আ যাইয়ে! আমি তাঁর কাছে হেঁটে যেতেই একটি মাঝারি সাইজের বেলগাছ দেখিয়ে বললেন — 'এখন বেল হবার সময় নয়। কিন্তু দেখ, একটি বেল হয়ে আছে। তুমি এটি যেভাবে হোক পেড়ে নাও, এটি তোমার প্রতি মা নর্মদার দান। আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলের কাছে পয়সা আছে। আমার কাছে, লক্ষ্মণভারতীজী এবং মতীন্দ্রের কাছে শুধু টাকাই নাই , সোনার গিনিও আছে। কেবল তুমিই নিঃস্ব, কপর্দক শূন্য অবস্থায় পরিক্রমা করছ। একটু পরেই হরিধামে গিয়ে সমুদ্রের পূজা করতে হবে। সেখানে সমুদ্রে দর্ভস্পর্শ করা নিষেধ। নারকেল ও ফুল সমর্পণ করে পূজা এবং আরতি করতে হয়। আমরা সেখানে নারকেল কিনে নিয়ে ভেট দিব। তুমি ভেট দিবে শ্রীফল।'

এই সময় লক্ষ্মণভারতীজী বলে উঠলেন — 'এখানে সমুদ্র নিকটবর্তী স্থানে কখনও কখনও আশ্বিন কার্তিক মাসেও বেল পাওয়া যায়।' যেকোন কারণেই হোক মোহান্তজী আজ তাঁর সুপ্রিয় লছমন ভেইয়ার উপর কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। লক্ষ্মণভারতীজীর ঐ কথা শুনে তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন — 'আমরা এখানে বসছি, তুমি এই বেল বাগানে ঢুকে দেখে এস ছোট বড় কোন বেল পাও কিনা! লক্ষ্মণভারতীজী একটি লাঠি হাতে বেলগাছের বাগানে প্রবেশ করলেন। আমি ইতিমধ্যে সেই বেলটি পেড়ে নিয়ে ঝোলায় রেখেছি। কিছুক্ষণ পরে বন থেকে ফিরে এলেন লক্ষ্মণভারতীজী। তিনি কোন বেল দেখতে পান নি। বিনা মন্তব্যে মোহান্তজী আবার হাঁটা সুরু করলেন।

মোহান্তজী গল্প করতে লাগলেন — মা নর্মদার বিশেষ কৃপা, পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ এবং গুরুকৃপা না থাকলে হরিধাম দর্শন কারও ভাগ্যে ঘটে না। হরিধামই রেবা সংগম। রেবাজী ত উঁহাসে দূর খাড়ি মেঁ হি সমুদ্র সে মিল গয়ী হৈ, কিন্তু রেবা সাগর সংগম উসী কো কহতে হৈঁ। যেখানে খাঁড়ির মধ্যে গিয়ে নর্মদা প্রবেশ করেছেন সমুদ্রে, পশ্চিম সমুদ্রের সেই খাঁড়িকে খাম্বাটের খাঁড়ি বলা হয়। হরিধামে রেবা-সাগর সংগমের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। বহু দেবতা এবং ঋষি ঐখানে তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছেন। নিত্য দেবতাবর্গ এবং সিদ্ধর্ষি মহর্ষি এবং দেবর্ষিগণ রেবা সংগমে এসে স্নান করে যান সূক্ষ্মদেহে। স্বয়ং মহাদেবও হরিধামে তপস্যা করেছেন, তপস্যা করেছেন সূর্যদেব এবং দেবরাজ ইন্দ্র। ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে ইন্দ্র

হত্যা করায় সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইন্দ্র ঐ হরিধামে এসে তপস্যা করে পাপ মুক্ত হন।

এই সময় রতনভারতীজী ত্রিশিরার উপাখ্যান জানতে চাইলেন। মোহান্তজী ত্রিশিরার উপাখ্যান শোনাতে লাগলেন — মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে আছে, ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি কোন কারণে ইন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হয়ে ত্রিশিরা নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। ত্রিশিরার সূর্য চন্দ্র এবং অগ্নির মত তিনটি মুখ ছিল। তিনি একমুখে বেদ অধ্যয়ন, একমুখে সুরাপান আর এক মুখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় সব গ্রাস করতেন। ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যা করলে ইন্দ্র ভয় পেয়ে ত্রিশিরার তপোভঙ্গের জন্য স্বর্গের বহু অলোকসামান্যা অপ্সরীকে পাঠান। কিন্তু তারা অকৃতকার্য হলে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। ত্রিশিরা নিহত হন বটে কিন্তু তাঁর মস্তক জীবিত থাকে। তখন ইন্দ্র এক সূত্রধরকে সেই মস্তক করাত দিয়ে তিন খণ্ডে চিরে ফেলতে বলেন। ত্রিশিরার মস্তক ত্রিখণ্ডিত হলে প্রথম মুণ্ড হতে চাতক পক্ষিদল, দ্বিতীয় মুণ্ড হতে শ্যেন পক্ষিদল এবং তৃতীয় মুণ্ড হতে তিত্তির পক্ষিদল নির্গত হতে থাকে। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করেন। যাক্ সে অন্য কথা। তোমরা বৃত্রাসুরের কাহিনী প্রায় সবাই জান।

লক্ষ্মণভারতীজী মন্তব্য করলেন — পুরাণাদি শাস্ত্রে আরও তিনজন ত্রিশিরার বিবরণ পাওয়া যায় — (১) কুবেরেরও অপর নাম ত্রিশিরা, তারও তিনটি শির বা মাথা আছে (২) দণ্ডকারণ্যে যে খর-দূষণের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই খরের সেনাপতির নাম ছিল ত্রিশিরা। (৩) রাবণেরও এক ত্রিমুণ্ড বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর পুত্র ছিল, তারও নাম ছিল ত্রিশিরা।

এই কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন মোহান্তজী। তিনি কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চঃগ্রামে তুলে বলে উঠলেন — কুবেররূপী ত্রিশিরাকে কি ইন্দ্র বধ করেছিলেন ? খরের সেনাপতি রাক্ষস ত্রিশিরা রামচন্দ্রের হাতে এবং রাবণ পুত্র ত্রিশিরা ত হনুমানের হাতে নিহত হয়েছিল। তাহলে তাদের কথা এক্ষেত্রে উঠে কি করে? গুরু কৃপায় এতবড় পুণ্যতীর্থে হরিধামে আসতে পেরেছি। এইরকম দুর্লভ পুণ্য লগ্নে বেকার বাৎ চিৎ করে লাভটা কি? আমরা ক্রমশঃ সমুদ্রের কল্লোল শুনতে পাচ্ছি। নর্মদাতেও যেন কলরোল জেগেছে! মোহান্তজী স্তোত্র পাঠ করতে আরম্ভ করলেন, আমরাও তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে হাঁটতে লাগলাম বালুচরের উপর দিয়ে,

ওঁ নমো হিরণ্যগর্ভায় সর্বসৃষ্টিবিধায়িনে।
হিরণ্যরেতসে তুভ্যং সুহিরণ্যপ্রদায়িনে॥
নমো হরস্বরূপায় ভূতসংহারকারিণে।
মহাভূতাত্মভূতায়ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
নমস্তে ধর্মরূপায় নমঃ সত্ত্বগুণায় চ।
নমঃ সহস্রশিরসে পুরুষায় পবায় চ॥
ত্বমেব হরধামশ্চ ত্বমেবশ্চ হরির্ধামঃ।
তপোরূপায় তপসাং নমস্তে ফলদায়িনে॥

অর্থাৎ হে প্রভু! তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমি সর্বসৃষ্টিকারী হিরণ্যরেতা, তুমিই উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা প্রদান করে থাক। তোমাকে নমস্কার। তুমিই হররূপে সমস্ত ভূতগণকে সংহার করে থাক। তুমি

মহাভূতসমূহের আত্মাস্বরূপ, তুমিই ভূতগণের অধিপতি। তুমিই ধর্মরূপ, সত্ত্বগুণস্বরূপ, সহস্রশির, তুমি পুরুষ, তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমি হরধাম, তুমিই হরিধাম। তুমি তপস্যার ফলদাতা। তোমাকে নমস্কার।

আমরা আমাদের পরম বাঞ্ছিত পুণ্যস্থান হরিধামে পৌঁছে গেছি। সকলেই হাতের ও কাঁধের ঝোলা ফেলে দিয়ে বালুরাশির উপর সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম। জোয়ারের জল এসে ছলাৎ করে আমাদের মাথা স্পর্শ করল। অনেক সাধু বালির চড়াতে বসে আছেন। তাঁদের একজন হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন — রেবামায়ী তুমলোগোঁকা শিরোচুম্বন কিয়া। ধন্য, ধন্য ধন্য হো। তাঁর এই উচ্ছ্বাস বাক্যে আমাদের এখন দৃষ্টি নাই আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে আছি সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এবং নীলাভ ফেনিল উচ্ছ্বাস এবং তার সঙ্গে নর্মদার শ্বেত জলধারার মিলন — নীলাভ জলরাশিতে শ্বেত জলধারার অপূর্ব সংযোগ এক অত্যদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করেছে অথচ কেউ কারও বৈশিষ্ট্য হারান নি, একাকার হয়েও প্রত্যেকেই স্ব স্বরূপে স্ব মহিমায় প্রতিভাত হচ্ছেন, এই পরমাশ্চর্য দৃষ্টি নন্দন দৃশ্য আমাদের প্রত্যেককে অভিভূত করেছে। আমরা উচ্ছ্বাসে এবং আবেগে কাঁপছি, কাঁদছি। এই পুণ্য দৃশ্য দেখে চরিতার্থ হবার জন্য সহস্র মাইল হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল মহাভয়ংকর অরণ্যপথে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে এসেছি মা, অনুক্ষণ তোমাকে চোখে চোকে রেখে। আমি অধীর আনন্দে হাতজোড় করে গেয়ে উঠলাম — মা, মাগো !

ম্লেচ্ছাঃ পুলিন্দাস্ত্বথ যাতুধানাঃ
পিবন্তি যে পয়স্তব দেবি পুণ্যাম্।
মুক্তা ভবন্তীহ ভয়াত্তু ঘোরা —
ন্নিঃসংশয়ং তেঽপি কিন্ত চিত্রম্।।

ঐয়ি মায়ি নর্মদে! ম্লেচ্ছ, অনাচারী পাপাচারী এমন কি রাক্ষস প্রকৃতির জীবরা তোমার ঐ পবিত্র পয়ঃ পান করে মহাভয়ংকর যমভয়, মৃত্যুভয় হতে বিমুক্ত হয়ে যায় এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তোমার জলের যে এমনই প্রভাব!

আমার কণ্ঠ হতে ঐ স্তোত্র নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালুচরের উপর উপবিষ্ট সাধুরাও হাততালি দিয়ে আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐ স্তোত্র গাইতে আরম্ভ করেছেন। পরিক্রমাবাসী মাত্রেরই এই স্তোত্র মুখস্থ থাকে। মোহান্তজী আমার হাত ধরে শান্ত হতে বললেন। আমাকে বললেন — বাঙালী বাবা! ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম কর তোমার পিতৃপুরুষগণকে, কেননা তাঁদের পুণ্যদৃষ্টি এবং আশীর্বাদ ছাড়া কেউ এখানে আসতে পারেন না। প্রণাম কর মা নর্মদাকে, মহাদেবকে, প্রণাম কর সমুদ্রকে। মনে রাখবে, এখানে কৃতকর্মের ফল চিরস্থায়ী হয়।

তাঁর আদেশে পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — আমাদের সঙ্গীরা কোথায় গেলেন?

— সবাই গেছেন বালির চড়ায় হোগলার ছাউনি করে নারকেল, আগরবাতি, কর্পূর এবং ফুলের যে দোকান বসেছে, সেখান থেকে পূজার উপচার কিনতে। তুমি সমুদ্রে স্নানের জন্য তৈরী হও, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। ঐ যে আমাদের নাগারা আসছেন।

তাঁরা পূজোপচার সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যেতেই মোহান্তজী বললেন — লছমন ভেইয়া তোমরা ত সব প্রক্রিয়া জান। তোমরা সমুদ্র স্নান করে যে যার পূজারতি করতে আরম্ভ কর, আমি বাঙালী বাবাসহ যে সাতজন নূতন পরিক্রমাবাসী দলে আছেন তাঁদেরকে পূজা করাচ্ছি। তাঁর নির্দেশানুযায়ী যে যার জলে নেমে স্নান পূজা করতে লাগলেন। আমরাও স্নানের জন্য সমুদ্রে নামলাম। মোহান্তজী বললেন — হরিধামে সমুদ্রস্নানের বিশেষ মন্ত্র আছে। আমি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছি, তোমরা আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ কর। তাঁর মন্ত্রপাঠ শুনে আমরা সকলেই যুক্তকরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম —

অনশ্চ তেজো হি অপস্য দেহো
রেতো হি বিষ্ণোহমৃতস্য নাভিঃ।
এতদ্ ব্রুবন্ পাণ্ডবং শ্রৌতবাক্যম্
ততোহবগাহেত পতিং নদীনাং।।

অর্থাৎ হে সমুদ্রদেব! তুমি সূর্যের তেজ, জল তোমার দেহ, ভগবান বিষ্ণুর তুমি বীর্যস্বরূপ, তুমি অমৃতের নাভি অর্থাৎ কেন্দ্রস্বরূপ।

মন্ত্রপাঠের পর সমুদ্রে ডুব দিলাম। ঢেউ এর টানে পা স্থির রাখা যায় না। বালিতে পা বসে যাচ্ছে। আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে উপরে উঠে গিয়ে পূজার উপচার হাতে করে আবার জলে নামালাম! মোহান্তজী এক একটি ফুল হাতে নিয়ে পূজা করতে বললেন। বাম বগলে শ্রীফল চেপে ধরে প্রথমেই মহর্ষি ভৃগুর পূজা করালেন। বললেন — ভৃগুক্ষেত্র হতে অপভ্রংশে ভড়োচ > ভারোচ > ব্রোচ্। ভারোচ ভৃগুদেবের মূল স্থান হলেও এই হরিধাম থেকে ভারোচ পর্যন্ত সমস্ত স্থানটাই মহর্ষির তপস্যাক্ষেত্র। পূজা কর —

ওঁ মহর্ষি ভৃগবে নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায়।
ওঁ রেবায়ৈ নমঃ। নমঃ সমুদ্রায়।।

এই সমুদ্র এবং রেবার জলমূর্তি আসলে মহাদেবের অষ্টমূর্তির এক মহামূর্তি, অপমূর্তি বা ভবমূর্তি। এক একটি ফুল ফেলে পূজা করতে থাক — ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। পূজা এবং প্রণাম শেষ হতেই মোহান্তজী মা নর্মদাকে স্মরণ করে কর্পূরদানীতে এক ডেলা কর্পূর জ্বেলে নিজে তিনবার ঘুরিয়ে আমাদের প্রত্যেককে তিনবার করে কর্পূরদানী ঘুরিয়ে আরতি করতে বললেন।

আরতি শেষ হল, এবার ভেট প্রদান। প্রত্যেকে নারকেল সমুদ্রে সমর্পণ করলেন। আমার সম্বল সেই শ্রীফলটি। আমি ভক্তিভরে সমুদ্রে শ্রীফল অর্পণ করে প্রণামান্তে উঠে এলাম বালিয়াড়ীতে। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণভারতীজীসহ আর সকল নাগারই পূজা ও ভেট অর্পণ হয়ে গেছে।

লক্ষ্মণভারতীজী মোহান্তজীকে বললেন — বেলা সাড়ে বারটা বেজে গেছে। এবার কি বিচার! বাঙালী বাবাও এখানেই থাকবেন। শতাধিক সাধু ত আজ দুদিন বসে আছেন এই বালুচরে নৌকার প্রতীক্ষায়। কোন নৌকা আসে নি। বাঙালী বাবা এখানে থাকুন, ওঁকে ত দক্ষিণতটে যেতে হবে। নৌকা যখন আসবে তখন এই মহাত্মাদের সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করবেন। আমাদের ত আর অপেক্ষা করা চলে না। আমাদের যেসব নাগারা দক্ষিণতট

পরিক্রমা করে ভারোচে এসে পৌঁছবেন, তাঁরা আমাদেরকে না দেখতে পেলে বড়ই হতাশ হয়ে পড়বেন। তা ছাড়া নৌকাওয়ালা কিঙ্করলালকে খুঁজে পূর্ব থেকে না রাখলে রাখলে আমাদের ফেরার সময় এতগুলি নৌকার ব্যবস্থা করতে পারবে না।

— বাঙালী বাবাকে এখন যেতে দিব না। ভৃগুক্ষেত্রের অন্যান্য তীর্থ দর্শন করে না গেলে পরিক্রমা পরিপূর্ণ হবে না। তোমার এসব স্থান দেখা আছে, কাজেই তোমার কোন আগ্রহ না থাকতে পারে। কিন্তু যে সাতজন আমার সঙ্গে জীবনে এই প্রথম পরিক্রমা করতে এসেছেন, তাঁদের এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিটি তীর্থে প্রতিটি মন্দিরে প্রণাম করা চাই। তুমি এই সাতজনকে রেখে, আর সকলে যে কোন যানবাহনে আজই ভারোচে চলে যাও। যানবাহন কিছু পেলে আজই এই ৩৮/৪০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে ভারোচে পৌঁছে যেতে পারবে। লরি বাস যা পাবে, তাতেই চেপে চলে যাও। তোমাদের ত আর পরিক্রমার কোন বালাই নাই।

মোহান্তজী খুব গম্ভীর মুখে কথাগুলি বললেন। লক্ষ্মণভারতীজী দু চার মিনিট নাগাদের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করলেন। সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে তা শুনতে পেলাম না। তিনি মোহান্তজীকে প্রণাম করে আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন — ফির ভারোচমেঁ ভেট হোগা। এইবলে তাঁরা চলে গেলেন। মোহান্তজীসহ আমরা আটজন মাত্র থেকে গেলাম। মোহান্তজী আমাদের নিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটি দিবাদাঁড়ি বা আলোকযন্ত্র দেখিয়ে বললেন — এখানে জলের মধ্যে সুবৃহৎ ব্রহ্মশিলা ছাড়াও পাহাড়াদি আছে, সেইজন্য জাহাজাদি রাত্রিকালে ঐ আলো দেখে যাতে সাবধান হতে পারে, সরকার থেকে ঐ রকম আলোকযন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে সমুদ্র প্রায় ১৫ মাইল বিস্তৃত। নৌকায় করে সমুদ্র পার হতে অন্ততঃ ১০/১২ ঘন্টা সময় লাগে তবে বাতাসের ন্যূনাধিক্য বশতঃ সময় কখনও কম বা বেশী লাগে। সমুদ্রের মাঝামাঝি নৌকা আসলে হঠাৎ যদি ভাঁটা এসে পড়ে তাহলে মাঝিরা তাড়াতাড়ি নোঙ্গর ফেলে দেয়, তখন বালির চড়াতে ৩/৪ ঘন্টা বসে থাকতে হয়, তখন মনে হয় যেন মরুভূমির মধ্যে পড়ে আছি! পরে ৩/৪ ঘন্টা বাদের যখন জোয়ার আসে তখন মাঝিরা পাল তুলে আবার যাত্রা করে। জোয়ার এসে পড়লে মাঝিকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, নতুবা নৌকা জোয়ারের ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম মা নর্মদার দয়া ছাড়া সম্ভব নয়। যখন ভারোচ হতে এখানে ফিরে সমুদ্র পথে যাত্রা করবে, তখন নৌকাতে বসে, নর্মদা যে সমুদ্রে সঙ্গে মিলিত হয়েছে ত স্পষ্ট অনুভব করতে পারবে। অনুভব করতে পারবে যে নর্মদার জল শ্বেতবর্ণ এবং সমুদ্রের জল নীলাভ, পাশাপাশি দুটি ধারা। বালির চড়ায় উপবিষ্ট সাধুদেরকে দেখিয়ে বললেন — এঁদের কষ্টটা অনুভব করার চেষ্টা কর। আজ দু দিন এঁরা এইখানেই বসে আছেন, অথচ নৌকার দেখা নাই। হোগলার নিচে দেখ, একটা টেবিল পেতে একজন অফিসার বসে আছেন, আর দুজন কনষ্টেবল। তিন/চার ঘন্টা ছাড়া ওঁদের ডিউটি বদল হয়, ওঁরা আছেন শুধু নৌকার চিঠি পরীক্ষা করতে, আর কোন নৌকাতে ৩০ জন যাত্রীর বেশী না উঠে সেইটুকু লক্ষ্য করতে। নৌকা আসা না আসার উপর এঁদের কোন হাত নাই। সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মা নর্মদার কৃপার উপর। এখন এখানে প্রণাম করে আমরা এগিয়ে যাই

চল। আবার বলছি, শুনে রাখ, এই পরম পাবন ক্ষেত্র হরিধামে দান ধ্যান জপতপাদি পুণ্যকর্ম সকল কিছুর ফল চিরস্থায়ী হয়।

হরিধামে সমুদ্রের দৃশ্য ছাড়াও এই স্থান সব দিক দিয়ে অপরূপ। মন্দির আছে , আরও দু তিনটি মন্দির তৈরীর জন্য ভিত্তি স্থাপনের কাজ চলছে। কারিগর মিস্ত্রীদের কাছে শুনলাম, এখানে শুকদেবের মূর্তি ছাড়াও শুকদেবাশ্রম স্থাপিত হবে, তারও কাজ চলছে।

১। আমরা বালিয়াড়ী অতিক্রম করে সমুদ্রের ধারে ধারে হাঁটতে হাঁটতে রেবা সংগম তথা হরিধাম হতে মাইল খানিক দূরে লোহরচ্যা গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। তখন বেলা ২টা বাজতে মাত্র ১৭ মিনিট বাকী। এইখানে জনৈক গ্রামবাসীর কাছে খোঁজ খবর করে রতনভারতীজী এবং মতীন্দ্রজী সের দশেক দুধ সংগ্রহ করলেন। দুধের মূল্য সের প্রতি চার আনা। আমরা সেই দুধ যে যতটা পারলাম পান করলাম। সেখানে কিন্তু খাবার জল ভাল পাওয়া গেল না। লোনা জল। দুধই আহার ও তৃষ্ণা মিটালো। লোহরচ্যা হতে কিছু দূর হেঁটে গ্রামের বাইরে এসে পেলাম জমদগ্নি তীর্থ। মোহান্তজী জানালেন যে, জমদগ্নি একজন বৈদিক ঋষি। ঋক যজু সাম অথর্ব — চারিবেদেই তাঁর অধিকার ছিল। তাঁর ঔরষে, রেণুকা মাতার গর্ভে ভগবান পরশুরামের জন্ম হয়। জমদগ্নি এবং রেণুকা এখানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন।

এখানে একটি জীর্ণ বহু প্রাচীন মন্দির জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে। মোহান্তজীর নির্দেশে দূর থেকে মন্দিরকে প্রণাম করে ছোটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে হাঁটতে হাঁটতে ছোট পরশুরাম নামক একটি গ্রাম অতিক্রম করে বড় পরশুরাম নামক একটি বড় মহল্লায় এসে উপস্থিত হলাম। মোহান্তজী সাবধান করেছিলেন, রাস্তার মধ্যে যে ঘাসবন দেখছ, এই ঘাসবনে পা দিয়ো না। এদিকে পিশশুয়া জোয়া নামক একরকম বিষাক্ত পোকা আছে। সেই পোকা দংশন করলে অসহ্য যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করতে হবে। সাবধানে হেঁটে হেঁটে আমরা এই বড় পরশুরাম মহল্লার শেষপ্রান্তে একটি মন্দিরে এসে পৌঁছলাম।

২। মোহান্তজী বললেন — এই স্থানের নাম রামতীর্থ। পরশুরামজী পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবার জন্য সহস্রবাহু কার্তবীর্যাজুন সহ সমুহ ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশ সাধন করে এখানে এসে তিনি রক্ত দিয়ে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। এইজন্য এই তীর্থকে নর্মদাতটের কুরুক্ষেত্র বলা হয়। এখানে দান ধর্ম স্নানাদি করলে কুরুক্ষেত্রে দানের সমান ফল হয়।

৩। রামতীর্থে প্রণাম করে আমরা যখন পুনরায় হাঁটতে লাগলাম তখন বিকেল ৪টা বেজেছে। মতীন্দ্রজী এবং রতনভারতীজী বললেন — 'গুরুজী, শীতকালের বেলা পড়ে আসছে। আর ঘন্টা খানিকের মধ্যে কোথাও রাত্রিবাসের জন্য আমাদেরকে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।' মোহান্তজী কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। দূর খাঁড়িতে সমুদ্রে মিলিত হবার জন্য নর্মদা ছুটে চলেছেন প্রবল উচ্ছ্বাসে। আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট সারি সারি গাছের তলায় তলায় সমুদ্রের নিকটবর্তী একটা খাঁড়ির কাছে এলাম। তটের উপরেই একটা পাথরের পোড় বাড়ী। মোহান্তজী বললেন — ঐ পরিত্যক্ত বাড়ীটিকে পরিক্রমাবাসীরা ধর্মশালা রূপে ব্যবহার করে থাকেন। আদি সত্যযুগে নর্মদাকে আসতে দেখে সমুদ্রও আনন্দে গদগদ হয়ে বালিতে লুটাতে লুটাতে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছলেন। যেখানে সমুদ্রে জলধারা এবং নর্মদার ধারা এই উভয়ের মিলন ঘটে সেখানে তদ্দণ্ডেই এক শিবলিঙ্গ প্রকট

হয়। এই পরমাশ্চর্য কাণ্ড দেখে নন্দী আনন্দে ছোটাছুটি এবং নৃত্য করতে আরম্ভ করলে হঠাৎ তাঁর পা সেই সদ্যোত্থিত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের দৈবাৎ স্পৃষ্ট হয়ে যায়। নন্দীর পা শিবলিঙ্গে স্পৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিব্য ঘটনা ঘটে। ঐ শিবলিঙ্গ সহসা গোমুখী আকার ধারণ করে। ইত্যবসরে নর্মদা সমুদ্রের অগোচরে ঐ লিঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্টা হন। তদবধি নর্মদা ঐ স্থানে অবস্থিত আছেন। গোমুখাকার শিবলিঙ্গের জল পান করলে সোমপানের ফল হয়। প্রতিমাসের পূর্ণিমাতে বিশেষতঃ কার্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে স্নান দান এবং ধ্যান জপ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ হয় বলে প্রতি পূর্ণিমাতেই এখানে বহু লোকের ভিড় হয়। এই তীর্থের শাস্ত্রোক্ত নাম লুণ্ঠেশ্বর হলেও 'সমুদ্রজী প্রেম নিমগ্ন হোকর — হর্ষবিহ্বলিত অন্তর মেঁ লুণ্ঠন করতে হুয়ে — লোটতে হুয়ে — মৈয়া কো সমীপ পহুঁচে,' এই জন্য কেউ কেউ এঁকে 'লোটনেশ্বরও' বলে থাকেন। এখানকার মহল্লার নাম 'লছমন', এজন্য লছমনিয়া লোটেশ্বর নামেও অভিহিত।

সূর্যাস্ত হচ্ছে। আমরা সেই গোমুখাকার শিবলিঙ্গকে স্পর্শ ও প্রণাম করে লিঙ্গস্থিত জল অল্প পরিমাণ পান করলাম। এখানকার জল লবণাক্ত হলেও শিবলিঙ্গস্থিত জল মিষ্টি লাগল।

আমরা সেই পোড় বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। তিনখানি ঘর, প্রত্যেক ঘরই পরিক্রমাবাসীদের প্রজ্বলিত ধূনীর দগ্ধাবশিষ্ট পোড়াকাঠ এবং ছাই-এ ভর্তি। রতনভারতীজী এবং গণেশভারতীজী নামে আর একজন নাগা একখানি বড় ঘরকে কোনমতে পরিষ্কার করলেন। কোন পরিক্রমাবাসী হয়ত এখানে একটি বড় মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিলেন। সেই প্রদীপটিকেই পরিষ্কার করে ঘি-এর বাতি জ্বালা হল। ঐ এক ঘরেই আমাদের আট-জনের আসন বিছানো হল। ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা সন্ধ্যা করতে বসলাম। রাত্রি দশটায় সকলের সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হলে মোহান্তজী আমাদেরকে মহর্ষি ভৃগুর কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

"আমি আজ সকালেই তোমাদেরকে শুনিয়েছি, ভারোচ মূল ভৃগুক্ষেত্র হলেও হরিধাম থেকে ভারোচ পর্যন্ত এই সমগ্র অঞ্চলটাই ভৃগুর তপস্যাক্ষেত্র। কাজেই তাঁর পুণ্যজীবন অনুধ্যান করলে তাতে জপেরই কাজ হবে। ভৃগু যজ্ঞ সম্ভব ঋষি। তিনি প্রাচীন একজন শ্রদ্ধাপতি এবং মহর্ষি। ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। প্রাচীন এই বংশে জমদগ্নি এবং পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীনকালে ব্রহ্মা বরুণের এক যজ্ঞানুষ্ঠানে হোতা ছিলেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হতে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম হয়। ভৃগুপত্নী পুলোমার গর্ভে মহর্ষি চ্যবনের জন্ম হয়। ঋচিক মুনিও ভৃগুর পুত্র। ভৃগুর পৌত্র জমদগ্নি এবং প্রপৌত্র হলেন পরশুরাম। ভৃগু বংশজাত বলে পরশুরাম ভার্গব নামে খ্যাত। মহর্ষি ভৃগুর তপোবনকে দেবতারা ত বটেই এমনকি মূল ত্রিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও সমীহ করে চলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে স্বয়ং বেদব্যাস বর্ণনা করেছেন, একবার ক্ষত্রিয় রাজা বীতহব্য যুদ্ধে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনের কাছে পরাজিত হয়ে ভৃগুর শরণাপন্ন হন। ভৃগু শরণাগত বীতহব্যকে রক্ষার জন্য প্রতর্দনকে বললেন, তাঁর আশ্রমে কোন ক্ষত্রিয় নাই। তাঁর আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ। তিনি ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব দান করলেন। মহর্ষির বাক্য প্রভাবে বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে শত্রুর হাত হতে মুক্তিলাভ করেন।

বিষ্ণুপুরাণের মতে, ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র। মনুসংহিতা মতে ইনি দশজন প্রজাপতির অন্যতম। কর্দম কন্যা খ্যাতি তাঁর পত্নী। এই খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীও জন্মলাভ

করেন। ভৃগু সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম। প্রতিদিন তর্পণ করার সময় ভৃগুর উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে হয়। ভৃগুই ধনুর্বেদ বিদ্যার প্রবর্তক।

একবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব — এঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা মীমাংসার জন্য মুনি ঋষিরা ভৃগুকে ব্রহ্মার কাছে প্রেরণ করেন। ব্রহ্মালোকে গিয়ে ভৃগু ইচ্ছাপূর্বক ব্রহ্মাকে কোন সম্মান দেখালেন না। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলে তিনি কোনমতে মিষ্টবচনে তাঁকে আপ্যায়িত করে শিবের কাছে যান। সেখানেও তিনি ইচ্ছাপূর্বক শিবকে সম্মান দেখালেন না। এতে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃগুকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি আশুতোষকে স্তব করে তুষ্ট করলেন। কৈলাস থেকে এবার তিনি গেলেন বৈকুণ্ঠে। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয়কে ধমকে তিনি জোর করে বিষ্ণুর শয়নগৃহে প্রবেশ করেন এবং নিদ্রিত বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেন। জাগ্রত হয়ে বিষ্ণু কোন ক্রোধ প্রকাশ ত করলেনই না বরং তাঁর বক্ষে পদাঘাত করে ভৃগুর পায়ে কোন ব্যথা লেগেছে কিনা, সেজন্য তাঁর কমলহস্ত ভৃগুর চরণে বারবার বুলাতে লাগলেন। ভগবান বিষ্ণুর এই অলৌকিক শমগুণ, সেবা এবং ক্ষমার মনোভাব দেখে মহর্ষি মর্ত্যলোকে ফিরে এসে ঋষি সমাজে বিষ্ণুরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন।

গুরুদেবের মুখে শুনেছি ঋগ্বেদের বহু ঋঙ্মন্ত্রে এই আভাষ পাওয়া যায় যে, অঙ্গিরা, অথর্বাণ, মনু, দধীচি এবং ভৃগু — এই মহর্ষিগণই ভারতবর্ষে যজ্ঞ বিধির প্রবর্তক। ভৃগু দেবতাদের মতই সোমপানের অধিকারী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৪ সূক্তের ৬ নম্বর মন্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা যমঋষি ঘোষণা করেছেন —

ওঁ অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সৌম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥

অর্থাৎ অঙ্গিরা নামক, অর্থবাণ্ নামক এবং ভৃগু নামক আমাদের পিতৃলোকগণের এইমাত্র এখানে যজ্ঞস্থলে আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা সোমরস পাবার অধিকারী। ঐ যজ্ঞভোক্তা পিতৃপুরুষগণ যেন আমাদের শুভানুধ্যান করেন, যেন আমরা তাঁদের প্রসন্নতা লাভ করে কল্যাণভাগী হই।

কথা শেষ করেই মোহান্তজী কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। টর্চ টিপে মতীন্দ্রজীর ঘড়িতে দেখলাম, রাত্রি ১২ টা বেজেছে। আমরাও শুয়ে পড়লাম। আমাদের সকলেরই ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল ৬টায়। এখনও গাছপালায় অন্ধকার আছে কুয়াশার জন্য। আমরা ঘরের মধ্যে বসে বসে জপ করতে লাগলাম। কুয়াশা কেটে যেতেই আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করতে গেলাম। সূর্যোদয় হচ্ছে। মোহান্তজী একটি প্রাচীন নিমগাছ দেখিয়ে বললেন — এই বিশাল নিমগাছের যে শাখাটি শিবমন্দিরের গায়ে স্পর্শ করেছে, ঐ শাখার পত্র মধুর আস্বাদ বিশিষ্ট, অবশ্য অন্যান্য শাখার পত্র স্বাভাবিক ভাবেই তিক্ত। স্নান পূজা সেরে এসে মন্দির সংলগ্ন ডালটির পাতা চিবিয়ে দেখা যাবে।

মোহান্তজী আমাদেরকে দূর খাঁড়ির দিকে যেখানে সেই স্বয়ম্ভু গোমুখাকৃতি শিবলিঙ্গের অবস্থান, সেখানে স্নান করতে নিয়ে গেলেন। স্নান তর্পণাদি সেরে শিবলিঙ্গের মধ্যে যে জল, তাতেই আচমণ করে আমরা সেই শিবলিঙ্গের পূজা করলাম। পূজা করে এসে সেই নিমগাছের পাতা প্রত্যেককে ১/২ টি করে চিবিয়ে খেলাম, সত্যিই মিষ্ট স্বাদ! অথচ সেই একটি ডাল

ছাড়া অন্যান্য সব ডালের পাতা তেতো! মোহান্তজী তাড়া দিতেই আমরা নিজেদের গাঁঠরী কমণ্ডলু নিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে সমুদ্রের কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলাম।

৪। প্রায় তিন মাইল রাস্তা হেঁটে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। কোন দিকে কোন কোন পথের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছি না। কাছাকাছি কোন গ্রামও দেখতে পাচ্ছি না। আমরা একবার এদিকে একবার ওদিকে পথ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে পড়লাম। মোহান্তজী বললেন — তোমরা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কেবলই লক্ষ্য করতে থাক কোন মন্দির দেখতে পাও কিনা। এ অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে রুদ্র পিশাচের অধিষ্ঠান। এজন্য এখানে দিনের আলো থাকতে থাকতে পরিক্রমাবাসীরা সদলে প্রবেশ করে কোন মতে মন্দিরের শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে এই ক্ষুদ্র জঙ্গল অতিক্রম করে যান। এখানে কেউ কোনদিন রাত্রিবাস করে না। রাত্রিবাস করলে এখানে মৃত্যু অনিবার্য! ইতিপূর্বে এখানে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঐ স্থানের নাম ভূতনাথ। এই সময় গণেশভারতীজী বললেন — 'গুরুজী ঐ দিকে আমি একটা পাথরের মন্দির দেখতে পেয়েছি। আমার সঙ্গে এই পথে আসুন।' আমরা গণেশভারতীজীকে অনুসরণ করে জঙ্গলের লতাপাতা কেটে এগোতে লাগলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট হেঁটে আমরা একেবারে সমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম, কোথায় মন্দির? কোথায় কি ? গণেশভারতীজী লজ্জায় মাথা চুলকাতে লাগলেন। সেখান থেকে আবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। যতীন্দ্রজী বললেন — গুরুজী! এত ঘুরপাক খেয়ে খামোখা হয়রাণ হয়ে লাভ কি ? ভূতনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সোজা জঙ্গলটা কোনমতে পেরিয়ে গেলেই ত হয়! মোহান্তজী হেসে বললেন — না, না, তা করলে হবে না। ভূতনাথকে স্বচক্ষে দর্শন করে যেতে হবে। এইটাই পরিক্রমার অঙ্গ। তিনি আওয়াজ তুললেন, 'জয় ভূতনাথ কী জয়।' আমরাও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভূতনাথের জয়ধ্বনি দিতে লাগলাম। অবশেষে একটা অশ্বত্থ, পর পর তিনটি শিমূল গাছ অতিক্রম করতেই একটা বড় বেল ও আমলকী গাছের আড়ালে ভূতনাথের মন্দিরটি চোখে পড়ল। বহু প্রাচীন পাথরের ছোট মন্দির। মন্দিরের গাত্র বর্ণ কালচে। তাই গাছপালার রং এর সঙ্গে বেমালুম মিশে থাকে। মন্দিরের দরজা নাই। মন্দিরের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি শিবলিঙ্গ, উচ্চতা, পরিসর, চিহ্ন এবং বর্ণ একই ধরণের। আমরা 'হর নর্মদে এবং জয় ভূতনাথ কী জয়' বলে প্রণাম করে মন্দিরকে তিনবার পরিক্রমা করে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করতেই জঙ্গল তথা ভূতনাথজীর গোলক ধাঁধা হতে মুক্তি পেলাম। বেলা তখন সাড়ে দশটা বেজেছে।

৫। ভূতনাথের জঙ্গলের আলোছায়ায় এতখানি যে বেলা হয়েছে, আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা সকলেই চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। বহু দূরে দূরে মুক্ত প্রকৃতির কোলে অনেক লোকজনের বাস দেখতে পাচ্ছি। নারকেল গাছের শোভা গ্রামগুলির সৌন্দর্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঠে মাঠে শস্য সম্ভার। এইভাবে প্রায় তিন মাইল হেঁটে যাওয়ার পর আমরা দেজ্ (দেহেজ) নামক একটি জনবসতি পূর্ণ গ্রামে এসে পৌঁছে গেলাম। মোহান্তজী বললেন — ঐ দেখ সামনেই দেখা যাচ্ছে, দধীচি ঋষির আশ্রম। আশ্রমের কাছাকাছি যে দুটি মন্দির দেখা যাচ্ছে, তার একটিতে আছেন দুধনাথজী মহাদেব আর একটিতে আছে দেবী ভগবতী।' দধীচি আশ্রমে পৌঁছে দেখি, সেখানে দধীচি মুনির একটি মূর্তি আছে। চারজন

জটাজূট সন্ন্যাসীও আছেন। মোহান্তজী তাঁদেরকে 'নমো নারায়ণায়' বলতেই তাঁরাও 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করলেন। মোহান্তজী তাঁদেরকে বললেন, আমরা পরিক্রমাবাসী। আমাদেরকে দধীচি মুনির কথা দয়া করে শোনান। একজন সাগ্রহে আমাদেরকে বসবার জন্য মৃগচর্ম পেতে দিয়ে দধীচির পুণ্যজীবন বর্ণনা করতে লাগলেন — মহাভারতে কথিত আছে যে, অথর্ব মুনির ঔরসে এবং কর্দম কন্যা শান্তির গর্ভে দধীচির জন্ম হয়। এঁর জন্ম হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত নৈমিযারণ্য তপোক্ষেত্রের নিকটবর্তী নিমরিখ নামক স্থানে। তাঁর জন্মস্থল বর্তমানে দধীচি কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। দধীচি এখানে এসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এই রেবা সংগমের নিকটে। তিনি উগ্রতম শিব তপস্যায় সকল সময়েই নিমগ্ন থাকতেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁকে প্রবর্গ বিদ্যা এবং মধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন যদি তিনি ঐ বিদ্যা অন্য কাউকে শিক্ষা দেন তবে তাঁর শিরশ্ছেদ অনিবার্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করবেন, সংকল্প করে দধীচির শরণাপন্ন হন। কিন্তু ইন্দ্রের নিষেধ বাক্য স্মরণ করে দধীচি তাঁদেরকে প্রবর্গ বিদ্যা বা মধু বিদ্যা শেখালেন না। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির মস্তক ছেদন করে অশ্ব মুণ্ড যোগ করে দেন এবং সেই অশ্বের মুখ হতে ঐ গুহ্যবিদ্যা আয়ত্ত করেন। ইন্দ্র এই ঘটনা জানতে পেরে দধীচির অশ্বমুণ্ড ছিন্ন করেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় অন্যত্র রক্ষিত দধীচির মস্তক এনে তাঁর দেহের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর দেহকে পূর্ববৎ স্বাভাবিক করে দেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে দ্বাদশ মন্ত্রটিতে মন্ত্রদ্রষ্টা কক্ষীবান্ ঋষি এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন —

ওঁ তদ্বাং নরা সনয়ে দংশ উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্।
দধ্যঙ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ॥

অর্থাৎ কক্ষীবান্ ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সম্বোধন করে বলছেন — হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! যেমন মেঘ গর্জন আসন্ন বৃষ্টির আভাস দেয়, তেমনি আমরা ধনলাভের জন্য তোমাদের সেই উগ্রকর্মটি প্রকট করে দিচ্ছি যে অথর্বা ঋষির পুত্র দধীচির মাথায় অশ্বমুণ্ড সংযুক্ত করে তোমরা মধুবিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলে।

বেদে যখন এই প্রসঙ্গ এসেছে, তা অভ্রান্ত সত্য। দধীচি যে প্রবর্গ বিদ্যা এবং মধু বিদ্যার অলোকসামান্য ঋষি ছিলেন, সে বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নাই। শুধু তাই নয়, বৃত্রাসুরের আক্রমণে উৎপীড়িত হয়ে স্বর্গস্থ দেবতাবৃন্দ যখন স্বর্গচ্যুত হন, তখন ইন্দ্র দধীচির নিকট এসে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করেন; বলেন যে তিনি ব্রহ্মার কাছে জেনেছেন তাঁর অস্থি দিয়ে অস্ত্র নির্মাণ করলে বৃত্রাসুরের মৃত্যু অনিবার্য। উদার হৃদয় ঋষি দেবতাদের কল্যাণ সাধনের জন্য নির্দ্বিধায় প্রাণ বিসর্জন দেন। ইন্দ্র দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে বৃত্রাসুরকে বধ করতে সমর্থ হন। তপস্বীদের জীবন ও সাধনা যে লোকহিতের জন্য দধীচি তাঁর জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন।

আমরা দধীচি আশ্রমের সাধুদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুধনাথ মহাদেবকে প্রণাম করার জন্য মন্দিরে উপস্থিত হলাম। মন্দিরে পুরোহিতজী বসে বসে জপ করছিলেন। দুধনাথজীর লিঙ্গ দুধের মতই সাদা। যে কুণ্ডের মধ্যে তিনি স্থাপিত আছেন, তা দুধে ভর্তি; ভক্তরা বাবার মাথায় ঢেলে গেছেন। সন্ধ্যার পূর্বে কুণ্ড থেকে ঐ দুধ নিষ্কাসিত করা হবে। শুনলাম এইভাবে

দুধনাথজী সারাদিন দুধের মধ্যেই ডুবে থাকেন। আমরা প্রণাম করে প্রায় ৭০ গজ এগিয়ে ভগবতীর মন্দিরে উপস্থিত হলাম। এই মন্দিরে একটি ভাগবতী বিগ্রহ ছাড়াও একটি সিদ্ধ যন্ত্র স্থাপিত আছে। সেখানে প্রণাম করে উঠে দেখি, দধীচি আশ্রমে যিনি আমাদেরকে দধীচির পুণ্য জীবন কথা শুনিয়েছিলেন, তিনি আশ্রমের আর একজন সাধুকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা মোহান্তজীকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে বললেন — এখন মধ্যাহ্নকাল, বেলা ১২টা বেজে গেছে। আপনারা দয়া করে আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করে যাবেন চলুন। মোহান্তজী কিছুক্ষণ বিচার বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আগ্রহাতিশয্যে ভিক্ষা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। তাঁদের আশ্রমে ফিরে গিয়ে পুরী লাড্ডু ও দুধ ভোজন করা হল। ভোজনের শেষে তাঁদেরকে পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করায় একজন আশ্রমিক একটি পথ দেখিয়ে বললেন — ওহি রাস্তামে জানে সে দো মিল আগে নর্মদা কিনারমেঁ আমলেঠা গ্রাম হৈ। উসকে বীচমেঁ নীলকণ্ঠেশ্বর, সোমনাথ ঔর অমিয়নাথকে মন্দির হৈ , ইনকে দর্শন করতে হুয়ে নর্মদা কিনারে কিনারে আগে বাড়তে জায়ঁ।

৬। আমরা আশ্রমের সাধুদেরকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে তাঁদেরই নির্দিষ্ট পথ হাঁটতে লাগলাম। আমি মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — ভূতনাথ পর্যন্ত ত আমরা সমুদ্রের ধারে ধারে এসেছি। এখানে আবার নর্মদা কোথায়? নর্মদা ত হরিধামে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন? তিনি বললেন — সেখানে সংগম হয়েছে সত্য তবে তারপরেই কিছুদূরে এসে সমুদ্র সরে গেছেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, নর্মদা তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বেঁকে সরে এসেছেন উত্তর-পশ্চিম দিকে। যাইহোক প্রায় ঘন্টাখানিক হেঁটে যাবার পর আমরা আমলেঠা গ্রামে এসে পৌঁছালাম। সেখানে নীলকণ্ঠেশ্বর সোমনাথ এবং অমিয়নাথকে দর্শন ও প্রণাম করে আবার এগোতে লাগলাম পশ্চিমদিকে। এঁদের মধ্যে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের নীলাভ দ্যুতি আমাকে খুবই মুগ্ধ করল।

৭। প্রত্যেকটি শিবমন্দিরে প্রণাম করে আমলেঠা গ্রাম থেকে এগিয়ে মাইলখানিক যাওয়ার পর আমরা চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবমন্দিরে এসে পৌঁছালাম। চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শনে আমরা চমকে উঠলাম। পিঙ্গল বর্ণের শিবলিঙ্গের শীর্ষদেশে দুগ্ধফেননিভ এক গোলাকৃতি শুভ্রবিন্দু বিরাজ করছে। মোহান্তজী জানালেন — প্রবাদ আছে যে, প্রাচীনযুগে এখানে চন্দ্রসেন নামে একজন শিবভক্ত রাজা এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আমরা সেখানে প্রণাম করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। বেলা তখন ২টা বেজেছে।

৮। নর্মদাকে চোখে চোখে রেখেই হাঁটছি। প্রায় ঘন্টাখানিক হাঁটার পর একজন নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। পরস্পরকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে মোহান্তজী তাঁকে পরবর্তী গ্রামের নাম কি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন — ঔর করীব দেড় দো মিল জানেসে আগে মুবা গ্রাম হৈ যহাঁ সোমেশ্বর শিবজীকা মন্দর হৈ। ইনকে দর্শন করতে হুয়ে নর্মদাকে উত্তর কিনারে আগে বাড়তে জায়ঁ। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। মোহান্তজী আমাকে বলতে লাগলেন — ঐ সন্ন্যাসীর কথা থেকে বুঝতে পারছ, এখন আমরা নর্মদার উত্তরতট ধরেই হাঁটছি। তুমি মনে করেছিলে হরিধামে পৌঁছে নৌকার চিঠি দেখিয়ে সমুদ্র পার হয়ে দক্ষিণ তটের বিমলেশ্বরে পৌঁছে যেতে পারলেই উত্তর তট পরিক্রমা তোমার শেষ

হয়ে গেল! এই জন্য লক্ষ্মণভারতীজী তোমাকে সেখানেই বিদায় জানাতে উন্মুখ হলেও আমি তোমাকে ছেড়ে দিই নি। ভৃগুক্ষেত্র অর্থাৎ ভারোচ পর্যন্ত না গেলে পরিক্রমা সার্থক হয় না। দ্রুতগতিতে হেঁটে আমরা মুবা গ্রামে এসে পৌঁছালাম। তখান বেলা ৪টা বেজে গেছে। নর্মদার তটেই সোমেশ্বর মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করে আমরা একই পথ ধরে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে হাঁটতে লাগলাম।

৯। বেলা গড়িয়ে পড়ছে। সূর্য পশ্চিমাচলে ঢলে পড়েছেন। সোমেশ্বর মন্দির হতে প্রায় তিনমাইল হেঁটে আমরা পাঁচটা দশ মিনিটের সময় কোল্যাদ নামক একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী বললেন — ভাল করে মনে রাখবে এই গ্রামের নাম কোল্যাদ। শুক্লতীর্থ থেকে তিন মাইল এগিয়ে বাণাসুর নির্মিত কোটেশ্বর তীর্থ যেখানে দর্শন করেছিলাম সেই গ্রামেরই নাম ছিল কলোদ। দুটি নামের কিছু ধ্বনি সাদৃশ্য দেখে যেন দুটি পৃথক গ্রামকে এক ভেবে যেন গুলিয়ে না ফেল। এখানে আছে কপিলেশ্বর তীর্থ। কপিলেশ্বর শিব মন্দিরের কাছেই সাধু সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য একটি ছোট অতিথিশালা আছে। ভূতনাথের জঙ্গলে ঘুরপাক খাওয়ার ফলে আমাদের সময় কিছুটা নষ্ট হয়েছে। তবুও সারাদিনে আজ আমরা ১৭ মাইল হেঁটেছি। এখন রাত্রিবাসের জন্য অতিথিশালার সন্ধান করিগে চল। সন্ধ্যা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই কপিলেশ্বর তীর্থের কাহিনী হচ্ছে, মহর্ষি কপিল এই পরম রমণীয় স্থানে পরিব্রাজনকালে এসে এখানকার শান্ত পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। তিনি এখানে তপস্যায় মগ্ন হন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি যাত্রা করেন অমরকন্টকের নর্মদা উদ্‌গম মন্দিরের দিকে।

কথা বলতে বলতে আমরা কপিলেশ্বর মন্দির এবং পার্শ্বস্থ অতিথিশালার প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছে গেছি। অতিথিশালার একটি ঘরে দুজন পরিব্রাজক দণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁরা বেরিয়ে এসে নমো নারায়ণাদি বিনিময়ের পর আমাদোর থাকার জন্য দুটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও এখনও বাইরে ফাঁকা আছে। অন্ধকার এখনও ঘনিয়ে আসেনি। আমরা সাত তাড়াতাড়ি নিজেদের গাঁঠরী ইত্যাদি সেই দুটি ঘরে রেখে নর্মদার ঘাটে গেলাম। হাত-মুখ ধুয়ে, মাথায় জল ছিটিয়ে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন্দিরে আরতি হচ্ছে। আরতি দেখে, প্রণামাদি করে অতিথিশালার ঘরে ঢুকে টর্চের আলোতে যে যার আসন বিছিয়ে নিলাম। আমরা নর্মদার ঘাটেই পেটভরে জল খেয়ে এসেছিলাম। প্রতি ঘরে আমরা চারজন — চারজন করে আসন বিছিয়েছি। দুটি ঘরের মধ্যে একটি দরজা আছে। আমরা হাঁটার ক্লান্তি দূর করার জন্য কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে জিরাতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা পর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে সেই দুজন দণ্ডী সন্ন্যাসী আমাদের ঘরে ঢুকলেন। নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন — যে তাঁরা শৃঙ্গেরী মঠের অন্তর্গত সন্ন্যাসী। নর্মদা পরিক্রমা করছেন চার বছর ধরে। তাঁদের মাদ্রাজী শরীর বলেই মনে হল। আলোচনা প্রসঙ্গে শিবের অষ্টমূর্তির কথা উঠল। তাঁদের মধ্যে যিনি প্রবীণতর তিনি বলতে লাগলেন — শিব পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরই নামান্তর। তিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং। শিবই বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং — তিনি বিশ্বদেব, বিশ্বরূপ, বিশ্বাতিগ, বিশ্বান্তর্যামী। শিবপুরাণে মহাদেবের উক্তি —

অহম্ শিবঃ শিবশ্চাহং ত্বঞ্চাপি শিব এব চ।
সর্বং শিবময়ং ব্রহ্মণ্ শিবাৎ পরং ন কিঞ্চন॥

অর্থাৎ আমি শিব, তুমিও শিব, সমস্তই শিবময়। শিব ভিন্ন অপর কিছুই নাই।

সেই দেবাদিদেব অষ্টমূর্তিময়। তিনিই এই নিখিল জগৎ অষ্টমূর্তিসূত্রে মণিগণের ন্যায় নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছেন। মহাদেবের অষ্টমূর্তির নাম — সর্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান।

অষ্টমূর্তাত্মনা বিশ্বং অধিষ্ঠায় স্থিতং শিবং।
ভজস্ব সর্বভাবেন রুদ্রং পরম কারণং॥

শাস্ত্রের নির্দেশ, ঐ অষ্টমূর্তির দ্বারা বিশ্বে অধিষ্ঠিত সেই পরম কারণ ভগবানকে সর্বতোভাবে ভজনা কর।

আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অষ্টমূর্তির স্বতন্ত্র তীর্থ বিরাজিত রয়েছে। সেগুলি কোথায়? আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত নিবেদন করছি আপনারা শুনুন —

(ক) সূর্যমূর্তি — সূর্য প্রত্যক্ষ দেবতা। উদয়াস্ত আমরা আকাশপথে যাঁর দ্যুতির প্রকাশ দেখি, তিনি স্বরূপতঃ শিব ছাড়া আর কেউ নন।

আদিত্যঞ্চ শিবং বিদ্যাৎ শিবমাদিত্য রূপিনং।
উভয়োরন্তরং নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ॥

অর্থাৎ শিবে এবং সূর্যে কোন ভেদ নাই। কাজেই সূর্যমন্দির মাত্রেই শিবমন্দির আর শিবমন্দির মাত্রেই সূর্যমন্দির।

(খ) চন্দ্র — চন্দ্রও শিবের এক মূর্তি। এই গুজরাটের সোমনাথ এবং বাংলার চন্দ্রনাথ, মহাদেবের সোমমূর্তির তীর্থ। আমরা নর্মদাতে আসার আগে সোমনাথ এবং চন্দ্রনাথ দর্শন করে এসেছি।

(গ) নেপালের পঞ্চমুখ পশুপতিনাথ মহাদেবের যজমান-মূর্তির তীর্থ।

(ঘ) শিবকাঞ্চিতে একাম্রেশ্বর ক্ষিতিমূর্তির তীর্থ।

(ঙ) মাদ্রাজের ত্রিচিনপল্লী জেলায় শ্রীরঙ্গম তীর্থের সন্নিকটে কম্বুকেশ্বর অপ্ মূর্তির তীর্থ। এখানে লিঙ্গমূলে একটি জলের উৎস আছে। মন্দিরে সর্বদাই জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

(চ) দক্ষিণে আর্কট জেলায় তিরুবন্নমলয় বা অরুণাচল তীর্থে মহাদেবের তেজোমূর্তির তীর্থ।

(ছ) উত্তর আর্কট জেলায় কলহস্তীশ্বর মহাদেব বায়ুমূর্তির তীর্থ।

(জ) চিদম্বরম্ — আকাশ মূর্তির তীর্থ। সেখানকার মূল মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। আকাশেই পূজা হয়। পৃথক একটি গৌন মন্দিরে তাণ্ডব নৃত্যকারী চিদম্বরমেশ্বরের মনোরম নটরাজ মূর্তি বিরাজমান আছেন।

শেষোক্ত পাঁচটি তীর্থই মাদ্রাজ অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলি অতি প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থ। এই মন্দিরগুলির কারুকার্যময় বিশাল বিশাল স্তম্ভ মণ্ডপ, বিমল সলিলপূর্ণ সরোবর প্রভৃতি দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। দাক্ষিণাত্যে ৬৩ জন শিবভক্ত (যাঁদেরকে আদিয়ার বলা হয়) আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের রচিত তামিল প্রবন্ধম্ দ্রাবিড়দের নামে প্রসিদ্ধ। ঐসব শিব ভক্তগণের লীলাক্ষেত্র ঐসব তীর্থ।

দণ্ডীস্বামীর আলোচনা শেষ হলে মোহান্তজী বললেন — শিবের অষ্টমূর্তি সম্বন্ধে আপনার মনোজ্ঞ আলোচনা শুনে খুবই তৃপ্তি পেলাম। তবে আপনার শরীর মাদ্রাজে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল

বলে এবং হয়ত আপনার বাল্য-কৈশোর-যৌবন সেখানেই অতিবাহিত হয়েছিল বলে আপনার সংস্কারে আপনাকে দাক্ষিণাত্যের আবেষ্টনীর মধ্যেই শিবের অষ্টমূর্তি আবিষ্কারে প্রচোদিত করেছে কিন্তু আমাদের জীবন কেটেছে এই শিবময়ী নর্মদার কোলে। আমরা নর্মদার তটে তটেই মহাদেবের অষ্টমূর্তির লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। ক্ষণে ক্ষণে নর্মদার যত্রতত্র মহাদেবের অষ্টমূর্তির বহু বিচিত্র নয়নাভিরাম প্রকাশ আমাদের হৃদয় ও মনকে তদ্‌গতচিত্ত করে রেখেছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শিক্ষায় আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আমাদের আত্মা সর্বদাই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকারের ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে ভুলে আছে। সেই আত্মাকে স্বস্থানে গুটিয়ে এনে নিজের আত্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই মহাদেবের অষ্টমূর্তির বহু বিচিত্র প্রকাশ উপলব্ধি করা যাবে। আপনি একটু আগে শিবপুরাণের উদ্ধৃতি শুনিয়েছিলেন। আমি গুরুদেবের মুখে মহাদেবের অষ্টমূর্তির এক অভিনব ব্যাপকতর অর্থ শুনেছি। তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন —

আত্মনশ্চাষ্টমী মূর্তি শিবস্য পরমাত্মনঃ।
ব্যাপিতং ত্বেতর মূর্তিনা বিশ্বং তস্মাৎ শিবাত্মকম্।
বৃক্ষমূলস্য সেকেন শাখা পুষ্যন্তি বৈ যথা।
শিবস্য পূজয়া তদ্বৎ পুষ্যত্যস্য বপুর্জগৎ।।

অর্থাৎ পরমাত্মা শিবের এই অষ্টমূর্তি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করে রয়েছেন বলে এই বিশ্ব শিবাত্মক। যে রকম বৃক্ষমূলে জল সেচন করলে শাখার পুষ্টি হয়, সেই রকম শিবপূজায় তাঁর জগদ্‌রূপ দেহ পুষ্টিলাভ করে।

সর্বাভয় প্রদানঞ্চ সর্বানুগ্রহণং তথা।
সর্বোপকারণং চৈব শিবস্যারাধনং বিদুঃ।।
যথেহ পুত্র পৌত্রাদেঃ প্রীত্যা প্রীতো ভবেৎ পিতা।
তথা সর্বস্য সম্প্রীত্যা প্রীতো ভবতি শংকরঃ।।

সকল জীবকে অভয় প্রদান, সকলের প্রতি অনুগ্রহ, সকলেরই উপকার সাধন — এই হল শিবের প্রকৃত পূজা। পিতা যেমন পুত্র পৌত্রাদির আনন্দে আনন্দিত হন, সেইরকম সকল প্রাণীর প্রীতিতে শংকর প্রীত হয়ে থাকেন।

শুধু তাই নয় —

দেহিনো যস্য কস্যাপি ক্রিয়তে যদি নিগ্রহঃ।
অনিষ্টম্ অষ্টমুর্তেস্তৎ কৃতমেব ন সংশয়ঃ।।
অষ্টমূর্ত্যাত্মনা বিশ্বমধিষ্ঠায় স্থিতং শিবম্।
ভজস্ব সর্বভাবেন রুদ্রং পরমকারণং।।

— কোন দেহধারীকে যদি কেউ নিগ্রহ করে, তাহলে সেই অষ্টমূর্তিধর মহাদেবের নিগ্রহ করা হয়। যিনি এইভাবে অষ্টমূর্তিতে অখিল বিশ্বে অধিষ্ঠান করেছেন, সেই পরম কারণ মহাদেবকে সর্বতোভাবে ভজনা কর।

গুরুদেবের এই উপদেশ মান্য করার চেষ্টা করি, মনন করি, সেইভাবে আচরণ করতে চেষ্টা করি। বলা বাহুল্য, তাতেই শান্তি পাচ্ছি।

আলোচনা শেষ করেই হঠাৎ মোহান্তজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা এই মোমবাতি কোথা হতে সংগ্রহ করেছেন? এখানে কোন দোকান আছে?

— হ্যাঁ, এখানে একটি দোকান আছে। সেখানে শুধু ডজন ডজন মোমবাতিই বিক্রয় হয়। আমরা প্রায় এক ডজন মোমবাতি আজই কিনে এনেছি। এখানে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে দীপদানই প্রথা। রেবাখণ্ডের ১৭৫-তম অধ্যায়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই তীর্থের মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন — উত্তরে নর্মদাকূলে ভৃগুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ। কপিলেশ্বরস্তু বিখ্যাতং বিশেষাৎ পাপনাশম্। যোহসৌ সনাতনো দেবঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে। বাসুদেবো জগন্নাথঃ কপিলত্বং উপাগতঃ।

অর্থাৎ নর্মদা তীরের উত্তরে ভৃগুক্ষেত্রের মধ্যে বিখ্যাত কপিলেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থ পাপনাশন বলে বিশেষরূপে বিখ্যাত। পুরাণে যিনি সনাতন বাসুদেব বলে পঠিত হন, সেই দেব জগৎপতিই কপিলবপু প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই স্থান তাঁরই তপস্যা স্থল। তত্রতীর্থে তু'যো ভক্ত্যা দদ্যাৎ দীপং সুশোভনং। জায়তে তস্য রাজেন্দ্র মহাদীপ্তিঃ শরীরজা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এখানে সুশোভন দীপ করে, হে মহারাজ! তার শরীরে মহাদীপ্তি জন্মে থাকে। এই ঋষি বাক্যানুসারে এখানে নবমী ও চতুর্থী যুক্ত মঙ্গলবারে বিশেষতঃ জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে দলে দলে ভক্তরা এসে দীপ দান করে থাকেন।

তাঁর কথা শেষ হতেই মোহান্তজী তাঁর ঝোলা থেকে দুটি টাকা বের করে দণ্ডী সন্ন্যাসীকে বললেন — আমরা ভোরে উঠে স্নান পূজা এবং দীপ দান করে এখান থেকে যাত্রা করতে চাই। আপনারা যদি এই দুটি টাকা নিয়ে আমাদেরকে ৮টি মোমবাতি দেন, তাহলে আমাদের তীর্থকৃত্যে বিশেষ সাহায্য করা হয়। অত সকালে ত দোকান খুলবে না। পরে আপনারা দোকান হতে কিনে নেবেন। মোহান্তজীর পীড়াপীড়িতে দণ্ডী সন্ন্যাসী ৮টি মোমবাতি এনে দিলেন। মূল্য হিসাবে দুটি টাকা নিতেও বাধ্য হলেন। এর পরেই আমরা শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল প্রায় সকাল ছটায়।

মোহান্তজী আমাদেরকে নিয়ে নর্মদার ঘাটে গেলেন। জলে নেমে দেখি জল ভীষণ ঠাণ্ডা। যাইহোক, আমরা স্নান তর্পণাদি সেরে কপিলেশ্বর মন্দিরে ঢুকলাম। দরজায় কোন তালা নেই। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল, প্রত্যেকেই মহাদেবের কাপিল লিঙ্গের মাথায় নর্মদার জল ঢেলে স্নান করালাম, প্রণাম করলাম। তারপর, প্রত্যেকে এক একটি দীপ জ্বেলে মহাদেবের চারপাশে বসিয়ে রেখে পুনরায় প্রণাম করে অতিথিশালায় নিজেদের ঝুলি কম্বল গুছিয়ে নিলাম। পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম, দণ্ডী সন্ন্যাসীরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করছেন। তাঁদেরকে আর বিরক্ত না করে আমরা যাত্রা আরম্ভ করলাম। নর্মদার তট ধরে।

১০। সূর্যোদয় হয়ে গেছে। প্রাতঃস্নানের পর রোদ বড় মিষ্টি লাগছে। এই অঞ্চলে দেখছি তাল এবং খেজুর গাছের প্রাদুর্ভাব বেশী। গ্রামাঞ্চলের জমি বেশ উর্বরা বলে মনে হচ্ছে। এ অঞ্চলে যে এত ধান চাষ হয়, তা নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। বাংলাদেশকে 'শস্যশ্যামলা' বলা হয়। কিন্তু গুজরাটের এ অঞ্চলও কম শস্যশ্যামলা নয়। আজ কার্তিক মাসের ১১ তারিখ বৃহস্পতিবার (ইংরাজী ২৮/১০/১৯৫৪)। মনে পড়ছে,

এই সময় আমাদের বাড়ীর সামনের মাঠও নিশ্চয়ই ধান গাছে ভরে গেছে, বাতাসের কাঁপন জেগেছে সেথায় সবুজ ধান গাছের শীষে শীষে।

প্রায় মাইল খানিক হাঁটার পরেই দেখলাম একটা নদী এসে নর্মদাতে মিশেছে নর্মদার ধারার সঙ্গে। মোহান্তজী বললেন — এরণ্ডী নামক একজন মুনি ছিলেন। নিঃসন্তান। সন্তান লাভের জন্য তিনি এখানে ভগবতী জগদম্বার আরাধনা করেন। জগদম্বার কৃপায় তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কন্যার নাম রাখেন এরণ্ডী। সুলক্ষণা কন্যার রূপলাবণ্য দেখে মুনি ভাবতেন স্বয়ং জগদম্বাই তাঁর কন্যা হয়ে জন্মেছেন। কৈশোর অতিক্রান্ত হলে মুনি কন্যার বিবাহ দিবার জন্য উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু এরণ্ডী কিছুতেই বিবাহ করতে চাইলেন না। তিনি সমুদ্রে কিনারে গিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন। সমুদ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে তব উহ্ নদীরূপ হোকর সমুদ্রমেঁ মিল গয়ী। নর্মদাজী ত পহেলে হি হরিধামমেঁ সমুদ্রেসে মিল চুকী থীঁ। এরণ্ডী কী সাথ নর্মদা মৈয়াঁ কী য়হী সংগম হুয়া। বড়া পাবন তীর্থ হ্যায়।

এই সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — ওঁকারেশ্বরে এরণ্ডী সংগম দেখে এসেছি। মাতা অনুসূয়ার স্থান অতিক্রম করে এসেও এরণ্ডী সংগম দেখছি। এখানেও কি সেই একই এরণ্ডী সংগম।

— হতে পারে সেই একই এরণ্ডী নদী এখানে এসেও মিলিত হয়েছেন। আবার নাও হতে পারে। এখানে হয়ত দুসরা নদী তপস্বীনি এরণ্ডী নামে খ্যাত হয়েছেন। আমরা পরিক্রমাবাসী, সঠিক ভৌগলিক তথ্য নিয়ে মাথা ঘামিযে লাভ নাই। আমাদের কাজ তীর্থের রেণুতে এবং তীর্থের জলে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা। আমরা ঘাটে নেমে মাথায় জল ছিটিয়ে প্রণাম করি চল।

১১। বেলা ৮টা বেজেছে মাত্র। আমরা ঘাটে নেমে নর্মদা-এরণ্ডীর জল স্পর্শ করে আবার কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় মাইলখানিক হেঁটে যাবার পর বৈঁগনী নামক একটা গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানকার মন্দিরে বৈজনাথজীর মন্দির। মন্দিরে পৌঁছে দেখলাম পুরোহিত মশাই পূজা করছেন। গ্রামের অনেক ভক্তিমতী মহিলা মন্দিরে পূজা দিতে এসেছেন। আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরটি পরিক্রমা করে প্রণাম করলাম।

১২। বৈজনাথ মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করে মোহান্তজী আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। বৈঁগনী গ্রাম অতিক্রম করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে। বৈঁগনী গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। প্রায় দু মাইল হেঁটে যাওয়ার পর বেলা সওয়া নটার সময় কপালেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছলাম। নর্মদার কিনারেই এই মন্দির। বহু লোকের ভিড়। বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে খুব ঘটা করে এই মন্দিরের পুরোহিতজী পূজা করছেন। মন্দির হতে কিছুদূরে একটি প্রকাণ্ড বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে মোহান্তজী বলতে লাগলেন — শিবজী জব্ কপালকো লেকর সব নর্মদা তীর্থমেঁ ঘুমে তো য়হাঁ আকর উন্‌হোনে আপ্‌না কপাল রাখ দিয়া থা। ইয়ে পরমপুণ্যপ্রদ তীর্থ হৈ। য়হাঁ কা শিবলিঙ্গ উসী কপালমেঁ সে প্রকট হো গয়া। কপালেশ্বরকে স্মরণ মাত্রসে অন্নকষ্ট নহীঁ হোতা। আমরা সেখানেই ভূ-লুণ্ঠিত প্রণাম করলাম কপালেশ্বর মহাদেবকে। মন্দির থেকে একজন এসে আমাদেরকে মন্দিরে গিয়ে কপালেশ্বরকে দর্শন করতে বললেন। মন্দিরের ভক্তরা একটু সরে সরে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে

জায়গা করে দিলেন। অপূর্ব স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। শিবলিঙ্গের অর্ধাংশ ঘন সবুজ এবং অর্ধাংশ গাঢ় লাল। আমরা প্রণাম করে মন্দির পরিক্রমা করে আবার নর্মদাতট ধরে হাঁটতে লাগলাম পশ্চিম মুখে।

১৩। কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। মোহান্তজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — 'মার্কণ্ডেয়শ্বর ক্যাতনা দূর বা?' তিনি উত্তর দিলেন — 'উহ্ ত কুজাগ্রামমেঁ হৈ। আভি ঔর আধা ক্রোশ যানে পড়েগা। উধর মার্কণ্ডেয়শ্বরজী ত হ্যায়ই হ্যায়। ঔর ভি তিন্ মন্দর হ্যায় — (১) আষাঢ়ীশ্বর (২) শৃঙ্গীশ্বর ঔর (৩) বল্কলেশ্বর। ইয়ে সব হি কুজাগ্রাম কা অন্দরমেঁই হ্যায়। লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ আমরা কুজাগ্রামে এসে পৌঁছালাম। প্রথমেই পেলাম মার্কণ্ডেয়শ্বর মন্দির। মোহান্তজী জানালেন দেবর্ষি নারদের কাছে নর্মদা ও শংকর মহিমা শুনে মার্কণ্ডেয়জী সর্বপ্রথম এই স্থানে পৌঁছেন। ধ্যান দৃষ্টিতে এই স্থানের মহিমা বুঝে মার্কণ্ডেয় মহামুনি এখানে স্বয়ং এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমরা সেখানে প্রণাম করে প্রায় মিনিট দশেক হেঁটে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পর পর তিনটি শিবমন্দির দেখতে পেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসে জপ করছিলেন। তিনি এই পাশাপাশি তিনটি মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে জানালেন — 'এই মহাদেবের নাম আষাঢ়ীশ্বর। সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্মদা মহাদেবের শ্রীঅঙ্গের স্বেদ হতে উৎপন্না হবার পর মহাদেব নিজ পুত্রীর মহিমা এবং প্রভাব প্রচার করার জন্য নিজেই নর্মদার তটে তটে পরিক্রমা করতে থাকেন পরিব্রাজকের বেশে। এখানে তিনি কোন আষাঢ় মাসে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেখানে তাঁর দণ্ডটি রেখেছিলেন সেখানেই এই আষাঢ়েশ্বর মহাদেব প্রকট হন। ' দ্বিতীয় মন্দিরে আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন — এখানে মহাদেব রেখেছিলেন, তাঁর হাতের শিঙ্গা। শিঙ্গাটি রাখা মাত্রই এখানে এই শৃঙ্গীশ্বর মহাদেব লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটে।

তৃতীয় মন্দিরটিতে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন — এখানে মহাদেব তাঁর পরিধেয় বল্কল রেখে দিগম্বর বেশে বসেছিলেন। বল্কলটি রাখা মাত্র সেখানে এই শিবলিঙ্গ প্রকট হয়। ঐ সময় একজন বল্কল বস্ত্র ব্যবসায়ী সেখানে এসে উপস্থিত। দিগম্বর কপর্দী কৌতুকভরে বস্ত্র ব্যবসায়ীকে বলেন — 'শিবলিঙ্গকো তু বল্কল সে ঢক দে' উসকে পাশ জিতনে ভী বস্ত্র থে সভী উড়া দিয়ে কিন্তু শিবলিঙ্গ ইত্না বড় গয়া কি উহ ঢকা হী নহীঁ গয়া। উস্‌কী ভক্তিসে শিবজী ইতনে প্রসন্ন হুয়ে কি উসে মালামাল কর দিয়া। অতঃ শিবজী ইধর্ বল্কলেশ্বর কে নাম মে প্রসিদ্ধ হুয়ে।

তিনি আমাদেরকে গর্ভগৃহে প্রবেশ করে শিবলিঙ্গ দর্শন করতে বললেন। বিশাল বিরাট শিবলিঙ্গ দেখে আমরা চমকে উঠলাম। মেদিনীপুর জেলার ধলহারা গ্রামে বটেশ্বর নামক এক বিশাল শিবলিঙ্গের কথা আমার মনে পড়ল। বল্কলেশ্বরকে আমার বটেশ্বরের মত বলেই মনে হল। নর্মদাতটে আমি এতবড় শিবলিঙ্গ আর একটিও দেখিনি। আটফুট দীর্ঘ ত হবেনই, প্রস্থেও দুজন লোক হস্ত প্রসারিত করলেও এই শিবলিঙ্গের বেড় পাবেন না। পুরোহিত জানালেন — দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশিয়ে আধমন পঞ্চামৃতে ঐ শিবলিঙ্গকে স্নান করানো হয়, বেলা ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যদি কোন পরিক্রমাবাসীর আগমন না ঘটে, তাহলে ঐ পঞ্চামৃত কুজা গ্রামের অধিবাসীদেরকে বিলিয়ে দিতে হয়। আজ আপনারা

এসেছেন, আপনারা সকলে পেটভরে যে যতটা পারেন, এই পঞ্চামৃত পান করুন। বল্কলেশ্বর মন্দিরের এই বিধি।

ব্রাহ্মণের অনুরোধে আমরা কেউ এক লোটা কেউ দু'লোটা করে পঞ্চামৃত পান করে বল্কলেশ্বরকে প্রণামান্তে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

১৪। পথে হাঁটিতে হাঁটিতে মোহান্তজী বললেন, 'নর্মদা তীর্থের মহিমা দেখ, স্বয়ং মহাদেব নর্মদার তটে তটে পরিক্রমা করে নিজেকে প্রকট করেছেন যত্র তত্র। তারফলে এখানে অজস্র তীর্থে গড়ে উঠেছে। মহাদেব নিজে পরিক্রমা করে পরিক্রমার মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। তাই পরিক্রমাবাসীরা যুগ যুগ ধরে তাঁরই পদাঙ্ক অনুকরণ করে চলেছেন। সরিদ্বরা নর্মদা আদ্যন্ত শিবতীর্থ। তিনি শিবময়ী।'

দ্রুততালে হেঁটে বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় কাসবা নামক গ্রামে এসে পৌঁছালাম। কুজা গ্রাম থেকে এই কাসবার দূরত্ব দেড়মাইল। তট থেকে নেমে ডান দিকে প্রায় একশ গজ দূরে একটি মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হতে দেখলাম শিখাসূত্রধারী একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আমাদেরকে দেখে মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। তিনি বললেন — পুরোহিতজী পূজা করকে আপনা কোঠি মে চলা গিয়া। নর্মদা তীরকা কণ-কণ কৈলাসপতি কপর্দী কপালী কী ক্রীড়াস্থলী হৈ। কিসী সময় কাপালিক বেস মেঁ শিবজী আপনে ভূত পিশাচ ডাকিনী সাংকিনী যোগিনিয়োঁ কে সাথ ক্রীড়া করতে হুয়ে ইস্ স্থান পর আ পঁহুচে। য়হা উনহোনে অপনী কন্থা রখ দী থী। তুরন্ত ইধর শিবলিঙ্গ প্রকট হো গয়া। ইয়ে কন্থেশ্বর নাম সে বিখ্যাত হো গয়ে।

আমরা কন্থেশ্বরজীকে দু চোখ ভরে দর্শন করলাম। প্রায় ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ শিবলিঙ্গের গাত্র বর্ণ পাঁশুটে। তাঁর স্বাভাবিক যোনিপীঠটির রঙও পাঁশুটে। মন্দিরের বাইরে একটি পাথরের ষাঁড় আছে, সেটিও পাঁশুটে বর্ণের। এই সকলের সঙ্গে তাল রেখে মন্দিরের গাত্র বর্ণও পাঁশুটে রং এর করা হয়েছে।

আমরা প্রণাম করে আবার তটে এসে উঠলাম।

১৫। আরও প্রায় দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে যাবার পর আমরা এমন একস্থানে এসে পৌঁছালাম যেখানে নর্মদা একটা খাঁড়িতে প্রবেশ করেছেন। প্রায় আধমাইল দূরে সমুদ্রের নীলাভ জলোচ্ছ্বাস এবং গর্জন অতি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। সমুদ্র সেখানে যে খাঁড়ি সৃষ্টি করেছে, নর্মদা সেই খাঁড়িতে ঢুকে পুনরায় পাশ কাটিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছেন। মোহান্তজী বললেন — দূরে খাঁড়িটি দেখা যাচ্ছে, তার নাম মেগাবের খাঁড়ি। ঐখানে গণিতা তীর্থ। নর্মদার বুকে যে নৌকা দু একটা দেখা যাচ্ছে, তীর্থযাত্রীরা ঐ নৌকাতে করে খাঁড়ি দেখতে যান। ভাল করে তাকিয়ে দেখ, একটা যাত্রী বোঝাই নৌকা চলেছে খাঁড়ির দিকে। আমাদের যাওয়ার উপায় নাই, কেননা তাহলে নর্মদাকে লঙ্ঘন করতে হবে। তট থেকে একটু নিচে যে বিশাল মন্দির এবং মণ্ডপ দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গেলেই আমাদের কার্য সিদ্ধ হবে। নর্মদা ক্ষেত্র এবং ভৃগুক্ষেত্রের মধ্যে ঐ স্থানটি ভগবতী পরাশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ পীঠ হিসাবে পূজিত হয়ে আসছেন।'

আমরা বাঁধ থেকে নেমে অনেকখানি হেঁটে যাওয়ার পরেই মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরে পরিক্রমা করে মণ্ডপে প্রবেশ করতেই দেখলাম প্রায়

ত্রিশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খাতাতে অঙ্ক করছেন, আবার কেউ কেউ বা সংস্কৃত পুঁথি সামনে রেখে নানারকম তত্ত্বালোচনা করছেন। পরিক্রমাবাসীদেরকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন। তাঁদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে ভগবতী পরাশক্তির সিদ্ধ যন্ত্র, পাশেই রয়েছেন গণিতেশ্বর মহাদেব। গর্ভগৃহে পাঁচটি ঘিএর প্রদীপ জ্বলছে। পুরোহিতজী গর্ভগৃহের পাশে বসে জপ করছিলেন। আমাদেরকে এই মন্দিরের মহিমা বর্ণনা করলেন — ইয়ে গণিতা তীর্থ বড়ী মহিমাবালী শক্তি পীঠ হৈ। য়হাঁ সত্যযুগমেঁ শিবজী ঔর উনকী শক্তি ভগবতী সৃষ্টিকে গণিত করনে কে কর্ম মেঁ এক দফে তল্লীন হো গয়ে থে! দোনোঁ আপনী-আপনী মহিমা দেখানো কী কৌশিস্ কি। অন্ত মেঁ ভগবতীজী গণিত শাস্ত্রে মেঁ ঔর সাঁখ্যদর্শন মেঁ আপনা জ্যাদা ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কিয়ে। যিন্‌কো গণিতমেঁ ঔর সাংখ্যশাস্ত্রমেঁ জড়ত্ব হৈ, উহ্‌লোগ ইধর আকর জপ পূজা করনেসে উনকী তুরন্ত দৈবী কৃপাসে মেধাস্ফূরণ হো জাতা হৈ। দেখিয়ে মণ্ডপমেঁ য্যাতনা আদমী বৈঠা, সব নে বিশ্ববিদ্যালয়কো বড়া বড়া অধ্যাপক হৈ , কোঈ কোঈ 'ডক্টরেট' ভি কর চুকা।

আমরা পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। পুনরায় বাঁধে উঠবার জন্য হাঁটিতে হাঁটিতে মোহান্তজী বলতে লাগলেন — বর্ষাকালে ঐ মন্দির ও মণ্ডপ জলে ডুবে যায়, সমুদ্রের খাঁড়ি এবং মূল নর্মদা তখন জলে একাকার হয়ে যায়। তখন পুরোহিতজী তটের কিনারাতে বসে নর্মদার জলেই পূজোপচার সমর্পণ করেন। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্ররা এখানে এসে প্রত্যক্ষ দেবীকৃপা লাভ করে বলে গুজরাটের বড় বড় বিদ্যাপীঠ থেকে সারা বৎসর ধরে অগণিত ছাত্র এই শক্তিপীঠে এসে থাকেন। সারা ভারতবর্ষে এই রকম জাগ্রত শক্তিপীঠ আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নাই।

তটস্থ বাঁধের উপর উঠে আবার আমরা হাঁটিতে লাগলাম নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে। এই সময় মোহান্তজী কোন কথা বলে উত্তরের জন্য আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি তাঁর কথা শুনতে পাই নি। তিনি বললেন — বাঙালী বাবা! তোমাকে অন্যমনস্ক দেখছি। কি ভাবছ?

আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললাম — গণিতা তীর্থের বৃত্তান্ত শুনে বাংলাদেশের এক ধুরন্ধর পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে গেল। বাবার কাছে তাঁর গল্প শুনেছিলাম। সেই মহাপণ্ডিতের নাম মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন। আমাদের বাংলাদেশে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে রামনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামকুমার ভট্টাচার্য। কথিত আছে, বাল্যকালে সিদ্ধান্ত পঞ্চানন অত্যন্ত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি পাঠশালায় প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের বানান পর্বটুকুও আয়ত্ত করতে পারেন নি। পুত্রের এই দুর্গতি দেখে শঙ্কিতচিত্ত পিতা পুত্রের বুদ্ধিমান্দ্যরূপ দুর্দৈব প্রশমনের জন্য কাশীধামে কাশীশ্বর বিশ্বনাথকে লক্ষ বিল্বপত্র অর্পণ করেন। তারপরেই দৈবানুগ্রহে রামনাথের প্রতিভার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। লেখাপড়ায় তাঁর এমনই উৎসাহ দেখা যায় যে, দারিদ্র্যের জন্য কেরোসিন কিনতে না পারলে রাত্রিতে শুকনো বেলপাতা সংগ্রহ করে তাতে আগুন জ্বেলে তিনি গোটারাত্রি অধ্যয়ন

করতেন। মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ব্যাকরণ কাব্য অলংকার এবং নব্যন্যায়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের কাছ হতে সিদ্ধান্ত পঞ্চানন উপাধি লাভ করেন। অধিকাংশ শাস্ত্র তাঁর মুখস্থ ছিল বলে পণ্ডিতবর্গ এবং ছাত্রবর্গ তাঁকে জীবন্ত পুঁথি (Living Encyclopadia) বলে ডাকতেন। আজ থেকে ৫৭ বছর আগে ১৩০৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর কথা স্মরণ করেই আমি ভাবছিলাম, গণিতা তীর্থ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধপীঠ হতে পারে, এখানে এসে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্ররা দৈবীকৃপা লাভ করতে পারে নতমস্তকে তা মেনে নিয়েও সমগ্র ভারতেরর মধ্যে এটি একমেবাদ্বিতীয়ম্; একথা আমি মানি কেমন করে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে কত যে সিদ্ধ দৈবপীঠ আছে তার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি। কাশীর আনন্দক্ষেত্রে তা গণিতা তীর্থ না হলেও সেখানে রামনাথের মত জড়বুদ্ধি লোকও শিবকৃপায় 'সিদ্ধান্ত পঞ্চানন' হতে পেরেছেন।

মোহান্তজী হাসতে হাসতে বললেন — বড়ই তৃপ্তি পেলাম ঐ পণ্ডিজীর জীবনে প্রত্যক্ষ দৈবকৃপার ঘটনা শুনে। ওহো! গণিতা তীর্থে ভগবতীর অধিকতর মহিমা শুনে তোমার শিবনিষ্ঠ অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই তুমি ঐ পণ্ডিতজীর পুণ্যজীবনের স্মৃতিচারণ করে বলতে চাইছ , শুধু মহাশক্তির কৃপাতেই নয়, মহাদেবের অনুগ্রহেও জড়বুদ্ধি লোকের মধ্যেও অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে। বাঙালী বাবা! তুমি ত জান, শিব ও শিবানী কদাপি পৃথক নন। দুয়ে এক দুই-ই এক। যেখানেই শিব সেখানেই শক্তি, যেখানে শক্তি সেখানেই শিব নিত্য বিরাজমান। শিবকৃপা বললে শক্তিকৃপা বুঝতে হবে, শক্তিকৃপা বললেও শিবকৃপা বুঝতে হবে। আমি মহাদেবের অষ্টমূর্তির কথা তোমাদেরকে শুনিয়েছিলাম। শিব ছাড়া শক্তি নাই , শক্তি ছাড়া শিব নাই। উভয়ে মিলে সারা বিশ্বে অঙ্গাঙ্গীভাবে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। স্মরণ কর, মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের' প্রথম শ্লোকটি, যেখানে ক্রান্তদর্শী কবির দৃষ্টিতেও কী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই তত্ত্ব—

> যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী,
> যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতি বিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।।
> যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ।
> প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্থাভিরষ্টাভিরীশঃ।।

অর্থাৎ যা সৃষ্টিকর্তার আদি সৃষ্টি, যা দ্বারা যথাবিধি হুত ঘৃত ও হব্য উদ্দিষ্ট দেবতার নিকট উপস্থিত হয়, যা যজমানরূপা, যে মূর্তিদ্বয় দিবাযামিনীরূপ কালদয় সৃষ্টি করেন, শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ যার গুণ, যা জগৎ-সংসার ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। মনীষিগণ যাকে শস্য প্রভৃতির উৎপত্তি স্থল বলে কীর্তন করেন, যার দ্বারা জীবকুল প্রাণ বিশিষ্ট হয়ে অবস্থিতি করে, এই প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত সেই ক্ষিতিময়ী, জলময়ী, অগ্নিময়ী, যজমানরূপা, চন্দ্রসূর্যময়ী, শূন্যময়ী ও বায়ুময়ী অষ্টমূর্তি দ্বারা সর্বেশ্বর তোমাদেরকে প্রসাদ বিতরণ করুন এবং রক্ষা করুন।

মহাকবির এই বাক্যের নির্যাস বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায়, বাহ্য ও আন্তর জগৎ পরিব্যাপ্তরে শিবের যে অষ্টমূর্তি, ভগবতীরও তাই। উভয়ের চিদ্গুহাস্থিত যে তপঃশক্তি তা হলেন তাঁদের নবমী মূর্তি নর্মদা। হর নর্মদে।

১৬। গণিতা তীর্থ হতে দেড় মাইল হেঁটে গিয়ে মার্কণ্ডেয়শ্বর তীর্থে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মোহান্তজী বললেন — তোমরা সকলেই জান, মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্পান্তজীবী। প্রতিকল্পে মহাপ্রলয়কালে তিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে রক্ষা করে আসছেন। সমগ্র নর্মদা তটই তাঁর তপোক্ষেত্র। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেখানেই তিনি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পূজা করেছেন। অমরকন্টকে নর্মদা-উদ্‌গম ক্ষেত্রের দক্ষিণপূর্ব কোণেও তিনি যেমন শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি নর্মদার উত্তর ও দক্ষিণ তটেও তিনি বহু স্থানে তাঁর পরিক্রমাকালে শিব স্থাপন করেছিলেন। রেবা সংগম পেরিয়ে একবার তিনি বহু ঋষিমুনি সহ এইস্থানে শিবপূজা করে শিবের দর্শন পান। শিব দর্শনের পর সমাধি হতে ব্যুত্থান ঘটলে তিনি তাঁর সঙ্গী তপস্যা নিরত ঋষিমুনিদের কাছে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন — যে সকল দ্বিজপুঙ্গব নর্মদাতীর আশ্রয় করে অসন্দিগ্ধচিত্তে বেদমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁদের পরমগতি লাভ হয়।

কালেন মহতা সিদ্ধির্জায়তেহন্যত্র দেহিনাম্।
নর্মদায়াঃ পুনস্তীরে ক্ষিপ্রং সিদ্ধিবাপ্যতে॥

যাঁরা নিয়ত নর্মদা তীর আশ্রয়পূর্ব্বক একাগ্রমনে মঙ্গলময় শিবের অর্চনা করেন, তাঁদের সিদ্ধিলাভ সত্ত্বর সাধিত হয় । অন্যত্র দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যার পর কেউ কেউ ভাগ্যক্রমে সিদ্ধিলাভ করলেও করতে পারেন, অন্যত্র শরীরিগণের দীর্ঘকাল যে সিদ্ধিলাভ হয়, নর্মদাতীরে সেই সিদ্ধি দ্রুত লাভ হয়ে থাকে।

শিবমর্চ্য রেবাকুলে জায়ন্তে তে ন যোনিষু।

অর্থাৎ যাঁরা রেবাতীরে শিবপূজা করেন, তাঁরা আর যোনি জন্ম লাভ করেন না।

মার্কণ্ডেয় মহামুনির উপলব্ধ এই পরম ঘোষণার স্মারকচিহ্ন হিসাবে এখানে এই মার্কণ্ডেয়শ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আমরা মন্দিরে প্রণাম করে আবার হাঁটতে লাগলাম।

১৭। মার্কণ্ডেয়শ্বর হতে মাইলখানিক হেঁটে আমরা মুনাড নামক একটি সুন্দর পল্লীতে এসে উপস্থিত হলাম। সবুজ গাছপালায় ঘেরা অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় মণ্ডিত এই গ্রামখানিকে দেখে আমার মনে হল, আমরা বোধহয় কোন ঋষির তপোবনে এসে উপস্থিত হয়েছি। অশ্বত্থ যজ্ঞডুম্বুর হরীতকী, আম ও আমলকী গাছসহ বেলগাছে ভর্তি এই গ্রামখানি, অথচ গাছগুলি কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে জটলার সৃষ্টি করে নি! আম ও অশ্বত্থ গাছের কোটর হতে তিন চারটি পাখী বেরিয়ে অন্য গাছে গিয়ে উড়ে বসল। তারা উড়ে যেতেই কোটর হতে কাঁচা পাকা ধান ও গমের কিছু গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল। তারা যে গাছগুলিতে গিয়ে বসল, রতনভারতীজী জানাল সেইগুলির নাম ইঙ্গুদী বৃক্ষ, পাখীগুলি শুকপাখী। আমি জীবনে এই প্রথম ইঙ্গুদী গাছ দেখলাম। নর্মদার কিনার ঘেঁষে অনেক ইঙ্গুদী এবং পাকুড় গাছের সারি। নর্মদার জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে শুধু সেই গাছগুলিকে নয়, তটস্থিত একটি পাথরের মন্দিরকেও স্পর্শ করে বয়ে চলেছে। আমি মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম — দু তিনটি হরিণকে দেখছি হরিণ শিশুসহ গাছের গোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের হর নর্মদে ধ্বনি শুনেও দৌড়ে পালাল না। আমরা যেন কোন তপোবনে প্রবেশ করেছি! মোহান্তজী আমার কথা শুনে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের ১ম অঙ্কের একটি শ্লোক

উদ্ধৃত করে জবাব দিলেন —

কিংন পশ্যতি ভবান? ইহ হি —
নীবারাঃ শুকগর্ভকোটর মুখভ্রষ্টাস্তরুণামধঃ।
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাকোপগমাদ ভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা —
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কল শিখা নিষ্যন্দ রেখাঙ্কিতাঃ॥

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, এখানে কোটরস্থ শুকশাবকের মুখ হতে নীবার কণা বৃক্ষমূলে পড়ে রয়েছে এবং আশ্রমের তাপসরা যে সকল প্রস্তরখণ্ড দিয়ে ইঙ্গুদীফল ভগ্ন করেছিলেন, প্রস্তরখণ্ডে সেই সমস্ত ফলের নির্যাস সংলগ্ন থাকাতে তপোবনের সূচনা করে দিচ্ছে? আরও দেখ, রথের শব্দ শুনেও (এখানে আমাদের হর নর্মদে ধ্বনি) মৃগগণ বিশ্বাস ভরে তা সহ্য করছে, দৌড়ে পালাচ্ছে না, নদীর ধারে বৃক্ষের বল্কলাগ্রদেশ হতে বারিধারা নিপতিত হয়েছে, এই অখণ্ড শান্তিপূর্ণ বাতাবরণও ত তপোবনেরই সূচনা করছে!

একটু থেমে তিনি বলতে লাগলেন — কাব্যের কথা থাক, এই মুনাড গ্রাম প্রকৃত পক্ষেই তপোবন। প্রাচীনকালে কোন একসময় সমস্ত ঋষিমুনিরা একত্রিত হয়ে নর্মদাতটের এইখানে থেকে তপস্যা করেছিলেন। সেই থেকে এই মুনাড গ্রাম মুনিদের আলয় বা মুন্যালয়তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। সেইসব মুনিদের তপস্যার রেণু, তার চিন্ময় প্রভাব এখনও এখানে বর্তমান। ঐ হরিণগুলি হয়ত এখানকার কোন স্থানীয় অধিবাসীর গৃহপালিত জন্তু। কিন্তু স্থানের প্রভাবে তাদের সেই সদা সন্ত্রস্ত ভাব আর নাই। নিঃশঙ্ক চিত্তে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে এখনও সত্যকে আশ্রয় করে কেউ তপস্যা করলে তার মুনিজন বাঞ্ছিত সত্যলোকে গমন সম্ভব হয়।

আমরা সেখানে মুনীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আবার এগোতে লাগলাম। মতীন্দ্রজী জানালেন তাঁর ঘড়িতে তিনটা বেজে গেছে।

১৮। মুনাড গ্রাম অতিক্রম করে মাইল দেড়েক হেঁটে গিয়ে আমরা অপ্সরেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। সেখানে মধুপিঙ্গল বর্ণের অতি সুন্দর একটি শিবলিঙ্গ দর্শন করতে পেলাম নর্মদার কিনারেই অবস্থিত একটি মন্দিরে। পাথরের মন্দিরের স্থানে স্থানে ভেঙে পড়েছে। বহু প্রাচীন মন্দির। মোহান্তজী মন্দিরের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন — এই মন্দিরের ঐ অপরূপ সুন্দর মধুপিঙ্গল মহাদেবের নাম অপ্সরেশ্বর। একবার স্বর্গের অপ্সরাগণ সরিদ্‌শ্রেষ্ঠা নর্মদার মহিমা শুনে এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা মা নর্মদার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়ে স্ব স্ব ধামে ফিরে যান। এখানে দান ধর্মের বড়ই মহিমা।

১৯। অপ্সরেশ্বর তীর্থ হতে আরও একমাইল হেঁটে গিয়ে আমরা বিখ্যাত ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। মন্দিরের দরজা খুলে আমরা অবাক হলাম। সেখানে বিশাল প্রদীপে অখণ্ড দীপ দেদীপ্যমান। প্রদীপটিকে ঢেকে রেখেছে একটি শতছিদ্র বিশিষ্ট তামার কলস। কলসের গায়ে লেখা আছে — (গুজরাটি ও হিন্দী হরফে) অখণ্ড জ্যোত। ছিদ্রপথে দীপশিখা নির্গত হয়ে শিবলিঙ্গকে আলোকিত করে রেখেছে। আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম, একটি প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ অগ্নিবর্ণ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। অখণ্ড জ্যোতের আলো

পড়ায় মনে হচ্ছে শিবলিঙ্গটি যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। আমরা প্রণাম করে উঠেই দেখি মন্দিরের পুরোহিত মশাই 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরে এসে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাদেরকে পরিক্রমাবাসী জেনে ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন — এক সময় উঘড়দানী আশুতোষ ভগবান শংকর অপনী ডিণ্ডী ডমরু বাজাতে হুয়ে ভিক্ষুক কা রূপমেঁ ইস্ গ্রামমেঁ আয়ে। উন্‌হোনে ইস্ গ্রামকে লোগোঁকা প্রাণীয়োঁকে প্রতি দয়াকে ভাব হৈ ইয়ে নহি, ইহ্ দেখনে কে লিয়ে, ঘর-ঘর ভিক্ষা মাঁগনে লগী লেকিন্ কিসী নে ভী ইনকো ভিক্ষা নহী দী। জিস্ ঘরমেঁ জাতে উহাঁ ভিক্ষা ন পাতে তো উহ্ ঘর জ্বলনে লগতা। ইস্ প্রকার গ্রামকে বহুৎ ঘর জ্বল গয়ে। অব লোগোঁ কো চৈতন্যোদয় হুয়া, ইহ্ অঘোরী সাধুকা কোপ কা প্রতিফল হৈ। অতঃ সব মিলকর অঘোরী কী শরণ লিয়ে ঔর প্রার্থনা কী। আশুতোষ ভগবান উন্‌পর প্রসন্ন হুয়ে ঔর উনহে আপনা ডমরু দিয়া ঔর কহা, ইসে বাজাতে যাও। জিস্ ঘরকা সম্মুখ বজাতে উহ্ জৈসা কা তৈসা বন্‌জাতা। ইস্ প্রকার পুরা-কা-পুরা গাঁও পূর্ববৎ বন গয়া। তভী সে য়হ্ তীর্থ প্রসিদ্ধ হুয়া। ইয়ে ডিণ্ডীশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হৈ। শিবজীকো অষ্টমূর্তিকা অগ্নিময় রূপ ইয়া তেজোমূর্তি হৈ। ডিণ্ডীশ্বর ইয়া ডিণ্ডিমেশ্বর মহাদেবজী রুদ্র হৈ। ইনোনে ভক্তোঁ কী মনস্কামনা পূর্ণ করতে হৈ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ — ইস্ মন্ত্রমেঁ ইন্‌কা পূজা ঔর হবনাদি ক্রিয়া হোতা হৈ।

এই পর্যন্ত বলে তিনি বললেন — সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এমন সময় আর কোথায় যাবেন? আজ রাত্রিতে মন্দিরের মণ্ডপ গৃহেই আপনারা অবস্থান করুন। এই রুদ্র মন্দিরে রাত্রিবাস পরম কল্যাণপ্রদ। আপনারা মণ্ডপে গিয়ে আপনাদের ঝোলাঝুলি রেখে বিশ্রাম করুন। আমি আরতি সেরে আপনাদের রাত্রিবাসের সুব্যবস্থা করে দিব।

তিনি আরতির আয়োজন করতে লাগলেন। আমরা মণ্ডপগৃহে গিয়ে ঝোলা গাঁঠরী রেখে নর্মদার ঘাটে গেলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেল। ঘাট থেকে এসে দেখি গ্রামের বহুলোক এসেছেন আরতি দেখতে। আমরাও আরতি দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। মন্দিরে সমাগত ভক্তরা শিঙ্গা ডম্বরু এবং ঢোলক বাজাতে লাগলেন। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধে চারদিক সুরভিত হয়ে উঠেছে। মণ্ডলেশ্বরে মহাদেব মন্দিরে সেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজী যেমন বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে আরতি করতেন, এখানেও এই পুরোহিতজীকে দেখলাম নাচতে নাচতে ভাবাবেশে আরতি করেছেন। মণ্ডলেশ্বরের সেই পুরোহিতজীকে দেখেছিলাম শিবপ্রদোষাষ্টকম্ পাঠ করতে করতে আরতি করতে। কিন্তু এই পুরোহিতজীকে দেখছি এক বিচিত্র এবং অভিনব মন্ত্র পাঠ করতে করতে আরতি করছেন —

ওঁ পবনমন্দ সুগন্ধ শীতল হেমমন্দির শোভিতং।
নিকট নর্মদা বহত নির্মল ডিণ্ডীশ্বর বিশ্বম্ভরং।।
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন ধরত ধ্যান ভৃগুবর।
শ্রীবেদব্রহ্মা করত অস্তুতি ডিণ্ডীশ্বর বিশ্বম্ভরং।।

এখানে 'শেষ সুমিরণ' শব্দের অর্থ শেষ নাগ অর্থাৎ শ্রী অনন্তদেব শরণ করছেন বা ধ্যান করছেন। 'ধরত ধ্যান ভৃগুবর' শব্দের অর্থ মহর্ষি ভৃগুও প্রদোষে সন্ধ্যারতিকালে মহাদেবের ধ্যান এবং 'অস্তুতি' অর্থাৎ স্তব করছেন। পঞ্চপ্রদীপের আরতি শেষ করেই তিনি কর্পূরদানিতে

জ্বলন্ত কর্পূর নিয়ে আরতি আরম্ভ করলেন। কর্পূরের ডেলা যতই দাউ দাউ করে জ্বলছে, ভগবান ডিণ্ডীশ্বরের অগ্নিরূপ ততই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত হয়ে উঠল। আমাদের চোখে তখন শিবলিঙ্গ নাই, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঠিক যেন প্রজ্বলিত হুতাশনই যেন প্রকট হয়ে উঠেছেন। হবনকালে যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠে, তেমনি অগ্নি সেখানে প্রকট হয়েছেন, সেখানে অগ্নিই দেদীপ্যমান আর কিছু নেই। আমাদের মনে হল, আমরা যেন আগুনের তাপও অনুভব করছি। পুরোহিতজী ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে নৃত্যের তালে তালে পাথরের মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে আর একটি বিচিত্র স্তব পাঠ করে চলেছেন —

শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদ মুনি উচ্চারণং
যোগধ্যানে অপার লীলা রুদ্রতেজা ডিণ্ডীশ্বরং
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধুনিকর, ধূপদীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয় শ্রীডিণ্ডীশ্বর বিশ্বম্ভরং।

আরতি শেষ হল। সকলে রুদ্রতেজা রুদ্রমূর্তি ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠে দেখি, শিবলিঙ্গ এখন স্বাভাবিক হয়েছেন, অখণ্ড জ্যোতির আলোকে তাঁর শান্ত অগ্নিবর্ণ রূপ পূর্ববৎ জ্বল-জ্বল্ করছে। এখন আর যজ্ঞাগ্নির মত উগ্ররূপ নাই। মন্দিরের ভাব গম্ভীর পরিবেশ আরও স্তব্ধ ও গম্ভীরতর রূপ ধারণ করেছে। পুরোহিতজী মন্দিরের দরজা টেনে দিয়ে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপ গৃহে এলেন। ইতিমধ্যেই কেউ প্রদীপ জ্বেলে রেখে গেছেন। তাঁর নির্দেশে দুজন ভক্ত মন্দিরের পার্শ্বস্থিত একটি ঘর থেকে দুটি করে বড় বড় কম্বল এনে মণ্ডপের দ্বারদেশে ঝুলিয়ে দিলেন। এতে শীতের দাপট কম হবে।

আমরা যে যার আসন বিছিয়ে বসলাম। পুরোহিতজীও আমাদের কাছে বসলেন; মোহান্তজী আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন — তোমাদের মনে আছে ত, গতকাল রাত্রিতে কোল্যাদ গ্রামে কপিলেশ্বর তীর্থে মাদ্রাজী আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতে আর্কট জেলায় তিরুবন্নমলয় বা অরুণাচল তীর্থে নাকি মহাদেবের অগ্নিমূর্তি বা তেজোমূর্তির তীর্থ আছে। তোমরা নিজের চোখেই দেখলে ত, এই ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবজীর মূর্তিও মহাদেবের তেজোমূর্তি। নর্মদাক্ষেত্রে কি নাই? এই প্রত্যক্ষ শিবভূমিতে যদি মহাদেবের অষ্টমূর্তির প্রকাশ না থাকে তাহলে তা কোথায় আর থাকবে?

তাঁর কথা শুনে পুরোহিতজী বললেন — আমরা পুরুষানুক্রমে ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের সেবা করে আসছি। আপনারা পরিক্রমাবাসী বলে আপনাদেরকে পূর্বেই জানিয়েছি যে, এই মহাদেবের পূজার মন্ত্র — ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। ইনি শুধু অগ্নিবর্ণ এবং অগ্নিমূর্তিই নন। ইনি রুদ্র। ঋগ্বেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের ৯২ সূক্তে ৯ নম্বর মন্ত্রে ঋষি শম্পতি দৃষ্ট মন্ত্রে আছে —

স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন।
যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ।।

অদ্য সেই কর্মক্ষম সমর্থ পুরুষ রুদ্রকে নমস্কার এবং অনেক স্তব অর্পণ কর। তিনি শত্রুদের ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারূঢ় অত্যুৎসাহী মরুৎগণকে আপনার সহায় পেয়ে আকাশ

হতে জল সেচন করে মঙ্গলকর শিব হন এবং আপন যশ বিস্তার করেন। এই মন্ত্র হতে বুঝা যাচ্ছে যে রুদ্রই শিব। রুদ্ ধাতুর অর্থ রোদন করা বা গর্জন করা। রুদ্রকে সেইজন্য গর্জনকারী মরুৎগণের পিতা বলেও বন্দনা করা হয়। বেদে রুদ্রের আরও বিবিধ নামের ও গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। রুদ্র বললেই মনে হয় তিনি রুক্ষস্বভাব সম্পন্ন। কিন্তু তাঁকে ত ত্র্যম্বকও বলা হয়েছে। 'ত্রুম্বকং যজামহে' এই বেদ মন্ত্রের অর্থ রুদ্র ত্রিভুবনে অম্বা অর্থাৎ মায়ের হৃদয় নিয়ে বিরাজমান। রুদ্রের এইরকম রূপ কল্পনা এবং গুণ ধর্মের বর্ণনা করা হয়েছে যে, রুদ্রের হাত আছে, তাঁর ওষ্ঠ সুন্দর, তিনি কপর্দী অর্থাৎ জটাকেশ। তাঁর বর্ণ পিঙ্গল, মধ্যাহ্ন সূর্যের মত তিনি দ্যুতিমান্। তিনি রথারূঢ় হয়ে বিচরণ করেন। তাঁর হাতে আছে বজ্র, আকাশ হতে তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাঁর হাতে ধর্নুবাণও থাকে। মানুষ এবং সকল জীব-জন্তুকেও তিনি প্রচুর মঙ্গল এবং প্রাচুর্য দান করেন। দুরারোগ্য রোগের ওষধি দান করে রুদ্র দেবতা সকলকে নীরোগ করেন। যোগে রোগে তপস্যায় তিনিই একমাত্র 'পুষ্টিবর্ধনং।' বেদে তাকে বৃষবাহন এবং আকাশের লোহিত বরাহ বলা হয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে মুক্তিদাতা এবং প্রথম দেবভেষজ। তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ, দেহের বর্ণ লাল; ইনি সহস্রাক্ষ; ঋগ্বেদ তাঁকে বদান্য, করুণাময়, সহজে তুষ্ট আশুতোষ এবং কল্যাণময় শিব বা মঙ্গল স্বরূপ বলে বন্দনা করেছেন। রুদ্র ক্রুদ্ধ হলে ধ্বংসাত্মক মূর্তি ধারণ করেন আবার প্রসন্ন হলে আর্ত মানুষকে বিপদ থেকে ত্রাণ করেন, রোগ দূর করেন, এমনকি তাঁর কৃপাকটাক্ষে মৃত্যুর গতিও স্তব্ধীভূত হয়, তিনিই একমাত্র 'মৃত্যোর্মূক্ষীয়'দেবতা।

উপনিষদে রুদ্রের চরিত্রের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে রুদ্র নিজেকে বলেছেন — আমিই সর্বপ্রথম আগত, আমার পূর্বে কিংবা উপরে কেউ নাই। আমি চিরন্তন অথচ চিরন্তন নই; আমি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা নই। আমার ইচ্ছাতেই ঋত এবং সত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে; পৃথিবীর শাসনকর্তা আমি, জীব-জগত আমার কথাতেই পরিচালিত হয়। কারণ আমি সর্ব নিয়ন্তা। প্রলয়কালে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আমি ধ্বংস করি। আমার আদি মধ্যম ও অন্ত কিছুই নাই। আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই ইন্দ্র এবং অগ্নি, আমিই শিব।

পুরাণে রুদ্রকে গণদেবতা বলা হয়েছে। মৎস্য পুরাণে রুদ্রের সংখ্যা ১১জন — অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী, অজৈকপাদ ও সুরেশ্বর। বিষ্ণু পুরাণে রুদ্রের জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে — ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করছিলেন, তখন তাঁর শরীর হতে রোদন করতে করতে একটি পুত্র উৎপন্ন হল। সেই পুত্র ব্রহ্মার কাছে নিজের জন্য নাম প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা তাঁর নাম দিলেন রুদ্র। নাম প্রাপ্তির পর সেই দিব্য শিশু পুনরায় ক্রন্দন করতে করতে সাতবার চোখের জল ফেললেন। এই সাতবারে তাঁর সাতটি নাম হল — ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, কপালী। মহাদেব বা রুদ্র বা শিব একজনেরই নাম। বেদের মতে রুদ্র সঙ্গীত এবং যজ্ঞের দেবতা। তিনিই যজ্ঞেশ্বর বা যজ্ঞপতি।

পদ্মপুরাণে রুদ্রের জন্ম সম্বন্ধে আমরা অন্য বৃত্তান্ত পাই। সেখানে বলা হয়েছে একবার ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলে তাঁর ভ্রূমধ্য হতে রুদ্রের আবির্ভাব হয়। আবির্ভূত হয়েই তিনি কাঁদতে থাকলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, — তুমি কাঁদছ কেন? উত্তরে রুদ্র বললেন — আমার নাম, স্থান ও স্ত্রী পুত্রাদির বিষয় নির্দেশ করে দিন, তাহলে আমি ক্রন্দন হতে

নিবৃত্ত হব। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন — তুমি জন্মেই রোদন করেছ, এজন্য তোমার নাম হল রুদ্র। এছাড়া ঋতধ্বজ, মনু, মন্যু উগ্ররেতা, শিব ভব কাল মহিনস, বামদেব ও ধৃতব্রত তোমার নামকরণ করা হল। সকল ইন্দ্রিয়, অনুহৃদ (হৃদয়ের নিচে), ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, তপস্যা, সূর্য ও চন্দ্র, এই সকল স্থানে তুমি বাস করবে। ধৃতি, ধী, অসিলোমা, নিযুৎ, সর্পি, বিলম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা এবং দীক্ষা তোমার স্ত্রী হবে। এই সকল স্ত্রীর সহিত প্রজা সৃষ্টি করে তুমি জগৎ পূর্ণ করতে থাক। ব্রহ্মা এই সকল কথা বলার পর রুদ্র ভূত প্রেত ও ভৈরবাদি সৃষ্টি করতে লাগলেন। এইরূপ জগৎ ধ্বংসকারীর সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মা রুদ্রের নিকট প্রার্থনা জানালেন — প্রভু ! তোমার মহিমা আমার অগম্য, তুমি শিবরূপে মঙ্গলময় দেবতারূপে প্রকট হও। তোমার ইচ্ছামত বিশ্ব সৃষ্টি করে তোমা সৃষ্ট জগতের মঙ্গল বিধান কর। ব্রহ্মার কথায় রুদ্র হাসতে হাসতে সমাধিমগ্ন হলেন।

এইভাবে বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে এবং বিভিন্ন পুরাণে রুদ্র সম্বন্ধে যাই বর্ণনা থাকুক না কেন, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে রুদ্র সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে, আমার মতে তাই রুদ্র সম্বন্ধে শেষ কথা —

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু<br>
র্য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।<br>
প্রত্যঙ জনাস্তিষ্ঠতি সংচুকোচান্তকালে<br>
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ।।

অর্থাৎ যাঁরা এই সকল লোককে স্বীয় ঐশ্বর্যের দ্বারা ব্যাপ্ত করে থাকেন, তাঁরা রুদ্রাতিরিক্ত দ্বিতীয় কারো মুখাপেক্ষী হন না, কেন না রুদ্র অদ্বিতীয়; হে জনগণ, রুদ্রই অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন, নিখিলভুবন সৃষ্টি করে পালন করেন এবং প্রলয়কালে তাকে সঙ্কুচিত করেন, সংচুকোচ অর্থাৎ সংহার করেন।

আমাদের এই ডিণ্ডীশ্বর মহাদেব মন্দিরে হোমকালে এবং কোন আপাৎকালে, আচমকা কোন দিব্যলীলা প্রকট হলে ঐ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের রুদ্র স্তুতিহিতে দুটি মন্ত্র পাঠ করা হয়। তদ্‌যথা,

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিকো রুদ্র মহর্ষিঃ<br>
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং স নো বুদ্ধ্যাশুভয়া সংযুনক্ত।।

— দেবগণের উৎপত্তিস্থল, ঐশ্বর্যবিধাতা এবং বিশ্বাধীশ যে মহাঋষি হিরণ্যগর্ভকে জগৎ-উৎপত্তির পূর্বে জন্ম দিয়েছিলেন, সেই রুদ্র আমাদেরকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন।

যা তে রুদ্র শিবা তনূঘোরাহপাপকাশিনী।<br>
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।।

— হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত (যিনি পর্বত শীর্ষে অবস্থিত থেকেঅর্থাৎ শিবলিঙ্গের শীর্ষদেশে, জীবের মস্তিস্ক প্রদেশে অবস্থিত থেকে সুখ বিধান করেন), তোমার যা মঙ্গলময় প্রসন্ন ও পাপবিনাশক তনু, সেই সুখতম তনু নিয়ে আমাদের নিকট প্রকাশিত হও।

মোহান্তজীর নির্দেশে আমি এবং মতীন্দ্রজী তাঁর কাছ হত মন্ত্র দুটি টুকে নিলাম টর্চ জ্বেলে। মন্ত্র দুটি টোকা হয়ে গেলেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন — আজ শীতের প্রকোপ

বেশী। মণ্ডপ গৃহের দরজা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও আশা করছি আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। কারণ আপনারা আপনাদের সুকৃতি বলে আজ ভগবান ডিণ্ডীশ্বরের অতিথি, তিনিই আপনাদেরকে শীতে তপ দিবেন।

এই বলেই তিনি আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলেন না। দ্রুতপদে মণ্ডপ গৃহের বাইরে বেরিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। রাত্রি তখন ১০টা বেজে গেছে। মোহান্তজী সকলকে শুয়ে পড়তে বললেন; নিজের গায়ে কম্বল মুড়ি দিতে দিতে বললেন — পুরোহিতজীর শেষের দু একটি কথা রহস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে!

শুয়ে পড়ার পরেই আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। তখন কত রাত্রি জানি না হঠাৎ মন্দিরের মধ্যে ঢং করে একটা শব্দ হল। সেই শব্দে জেগে উঠলাম। ভাবলাম, ডিণ্ডীশ্বরের মন্দিরের মধ্যে বোধহয় কোন বড় দেওয়াল ঘড়ি আছে। রাত্রি হয়ত ১টা বেজেছে , তাই ঘড়িতে টং করে একটা শব্দ হল। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলতর শব্দে আবার তিনবার টং-টং-টং করে অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে আওয়াজ উঠল। এই শব্দে মোহান্তজী সহ সকলেই ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলাম। হোমের সৌরভ ভেসে আসছে। মোহান্তজী গায়ের কম্বল ফেলে দিয়ে বললেন — কী আশ্চর্য, মণ্ডপের তিনদিকের দরজায় কোন কপাটি নাই, পর্দাদি ঝুলাবারও ব্যবস্থা নাই, আমরা কোন ধূনীও জ্বালি নি, তবে বেশ উত্তাপ বোধ হচ্ছে কি করে?

মতীন্দ্রজীকে তিনি ঘড়ি দেখতে বললেন । মতীন্দ্রজী জানালেন যে রাত্রি দেড়টা বেজেছে।

মন্দির হতে আর এক বিচিত্র শব্দ ভেসে এল, উদাত্তকণ্ঠে কেউ যেন তাঁর মন্ত্রপাঠ শেষ করলেন, সেই মন্ত্রের শেষে আছে ওঁ। আমার ত তাই মনে হল। কিন্তু মোহান্তজী বললেন — মন্দিরের মধ্যে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে কেউ বলছেন — বম্-বম্-ববম্-বম্। সেই শব্দ শুনে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। মোহান্তজী আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপ গৃহ থেকে নেমে মন্দিরের দিকে তাকাতে বললেন। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম — বিশাল মন্দির গাত্রের জাফরি-কাটা ঘুলঘুলি দিয়ে অগ্নিশিখার লাল আভা ফুটে বেরোচ্ছে। এখন আর কোন মন্ত্রের মন্ত্রধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে মন্দিরের গর্ভগৃহে যেন কোন অগ্নিচুল্লী স্থাপন করা হয়েছে! আমি মোহান্তজীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম — আপনার মনে পড়েছে কি, পুরোহিতমশাই সন্ধ্যাকালে ডিণ্ডীশ্বরের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে রহস্যভরা কণ্ঠে বলেছিলেন — 'কোন আপাৎকালে, আচমকা কোন দিব্যলীলা প্রকট হলে' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ থেকে রুদ্রস্তুতি পাঠ করতে হবে নতুবা রুদ্রবীজ জপ......। আমি মুখে কথা বলছি কিন্তু আমার চোখ রয়েছে মন্দিরের অভ্যন্তর হতে ঘুলঘুলি পথে নির্গত সেই গনগনে আগুনের আভার দিকে ! আমার কথা শেষ হতে না হতেই মোহান্তজী মৃদুকণ্ঠে জপ করতে লাগলেন — ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। আমরাও সেই মন্ত্র জপেই মন দিলাম।......

কাক, কোকিল এবং মোরগের ডাকে আমাদের চেতনা যখন ফিরে এল, তখন দেখি, আমরা মণ্ডপের বাইরে চত্বরে বসে আছি, দুটো বিশাল কুকুর আমাদের দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে মণ্ডপ গৃহের মধ্যে ঢুকে

যে যার আসনে শুয়ে পড়লাম। মতীন্দ্রজী জানালেন যে সকাল হয়ে আসছে, সাড়ে চারটা বেজেছে। এবার আমাদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সূর্যোকরোজ্জ্বল সুপ্রভাতে আমরা ডিণ্ডীশ্বর এবং নর্মদাকে প্রণাম করে যে যার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে আবার চলার পথ ধরলাম।

২০। নর্মদার তীরে তীরে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মাইল খানিক এগিয়ে যাওয়ার পরেই আমরা সমনী নামক একটি গ্রামে এসে পৌঁছালাম। এখানে নর্মদার ঘাট খুব সুন্দর ও মজবুত করে বাধাঁনো। ঘাটের কাছেই গাছ পালায় ঘেরা একটি উদ্যানের মধ্যে একটি শিবমন্দির চোখে পড়ল। আমরা ঘাটে সকলে ঝোলা গাঁঠরী রেখে নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। ঘাটে আরও তিন চারজন স্নান করছিলেন। আমরা গত রাত্রিতে ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে যেমন অস্বাভাবিক তাপ অনুভব করছিলাম, সেই তাপ যেন এখনও শরীরে লেগে আছে! এখনও আমাদের শীত অনুভব হচ্ছে না। আমরা স্নান করতে নামলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে, আমাদের ঝোলা গাঁঠরী ঘাটেই পড়ে থাকল, আমরা কমণ্ডলুতে জল ভরে পূর্বদৃষ্ট সেই উদ্যানে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের চতুস্পার্শ্বস্থ উদ্যানটিকে মনে হল, একটি সুন্দর বনবীথি যেন। আমরা বাগানের ফুল দু'একটি করে হাতে নিয়ে মন্দিরের দরজায় উপস্থিত হলাম। আমরা দরজার সামনে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করছি, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে আসতে দেখলাম। এঁকে আমরা একটু আগেই ঘাটে স্নান করতে দেখেছিলাম। তিনি এসেই বম্ বম্ হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরের দরজা খুললেন। প্রায় ছয় বা নয় ইঞ্চি পরিমিত একটি সুন্দর শ্বেত শিবলিঙ্গ মন্দিরের মধ্যে শোভা পাচ্ছেন। শিবলিঙ্গ হতে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে একটি বড় তামার ঝারি। 'আপনারা পরিক্রমাবাসী, আপনাদের আগেই পূজা করার অধিকার। এই ঝারিতে জল ঢেলে পূজা করুন। আমি চন্দন ঘযে দিচ্ছি। পরপর আমাদের আট জনের জল ঢালতে ঢালতে তিনি রক্ত চন্দন কতকটা ঘযে ফেললেন। আমরা সেই চন্দন ও ফুল বাবার মাথায় অর্ঘ্য দিলাম। পুরোহিত মশাই শোনাতে লাগলেন — এই মহাদেবের নাম শুণ্ডীশ্বর। এই স্থান পূর্বকালে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন এই অঞ্চল সমনী মহল্লা নামে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সমনী গ্রামের বাইরে এই মন্দির। একবার সমনীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণের আগমন ঘটেছিল। সেই সময় লীলাধর পরম কৌতুকী মহাদেব গলিত কুষ্টরোগী এক শুঁড়ির বেশ ধারণ করে সেই শ্রাদ্ধবাসরে এসে উপস্থিত হয়ে খাদ্য ভিক্ষা করেন। দ্বিজান সুকৃপণানূদেব কুষ্ঠীভূত্বা যথাচ হ। সেই সময় তাঁর রক্তগন্ধানুলিপ্ত দেহ হতে বুদবুদাকারে স্রাব ক্ষরণ হচ্ছিল, মক্ষিকা ও কৃমিকূলে দেহ আকুল হয়েছিল, তাঁর দুশ্চর্মা দুর্নখ ও দুর্গন্ধময় দেহ পদে পদে টলে পড়ছিল। স্রবৎ বুদ্‌বুদগাত্রস্তু মক্ষিকাকৃমিসংবৃতঃ। দুর্শ্চমা দুর্নুখো গন্ধী প্রস্খলংশ্চ পদে পদে। তাঁর এই জঘন্য রোগ দেখে সমবেত অভ্যাগতরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে তাঁকে দূর দূর করতে থাকেন। স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্তাও তাঁকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন। সেই ক্ষুধার্ত গলিত কুষ্ঠী তখন ক্ষুণ্ণ হয়ে এখানে এই বনে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় এসে বসলেন। ওদিকে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধান্তে ভোজন করতে বসে দেখেন তাঁদের খাদ্যবস্তু থক্-থকে দুর্গন্ধযুক্ত কৃমিতে ভরে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব খাদ্য ফেলে দিয়ে রন্ধনশালা হতে তাজা খাদ্য আনিয়ে ব্রাহ্মণরা আচমন

করে খেতে আরম্ভ করতেই সেই সব স্বাদিষ্ট গরম গরম আহার্যবস্তুও দলা পাকানো 'কীড়ে-হি কীড়ে ভরে পড়ে হৈ।' তখন ব্রাহ্মণরা বুঝলেন, গলিত কুষ্ঠী শুঁড়ি বেশে যে অতিথি এসেছিলেন, তাঁর অপমান করাতেই প্রতিফল ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁরা সকলে মিলে সেই অতিথিকে খুঁজতে বের হলেন। পূর্বেই বলেছি, তখন এখানে বন ছিল। বনের অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে তাঁকে বসে থাকতে দেখে, সকলে মিলে তাঁকে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে ভোজন করিয়ে আপ্যায়িত করলেন। ভোজনান্তে সেই গলিত কুষ্ঠরোগী তাঁদেরকে বললেন — দেখো! জো ভূখা অভ্যাগত অ্যাপ্নে যহাঁ আজায় উসে ভোজন দেনেমেঁ বিলম্ব নহীঁ করনা চাহিয়ে। য়হী সারাতিসার উপদেশ হ্যায়। আর একটি ঘটনা শুনুন।

একবার গ্রামে সকলে মিলে বনভোজনের আয়োজন করেছিলেন! সেখানে ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে নিজেরা খেতে বসে গেলেন। সেখান থেকে বেশ কিছুদূরে অশ্বত্থ গাছের তলায় সেই গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শুঁড়িকে বসে থাকতে দেখেও তাঁকে কিছু খাদ্য দেওয়ার কথা, তাঁদের মনে এল না। পরিপাটি খাদ্য মুখে তুলতে গিয়ে তাঁরা দেখল, তাঁদের খাদ্য বড় বড় দুর্গন্ধময় পোকাতে ভরে গেছে। তাঁদের চৈতন্যোদয় হল। গ্রামের শ্রাদ্ধবাসরের সেই পূর্বোক্ত ঘটনা তাঁদের স্মরণে আসতেই কিছু খাদ্য নিয়ে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় শশব্যাস্তে গিয়ে দেখল, সেখানে সেই কুষ্ঠী শুণ্ডী নাই। পরিবর্তে তাঁরা অবাক হয়ে দেখল মাটি ভেদ করে এক অপূর্ব সুন্দর শুভ্র শিবলিঙ্গ উদ্‌গত হচ্ছেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমনী গ্রাম হতে ভক্ত নর-নারীরা সকলে ছুটে এসে খুব ঘটা করে এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। ইনি শুণ্ডীশ্বর মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ হলেন। শুণ্ডী শব্দের অর্থ সুঁড়ী, যারা মদ্য বিক্রয় করে। কিন্তু শুণ্ডী শব্দের যৌগিক অর্থ গজ বা হস্তী। গজ লক্ষ্মীর বাহন, খুবই শুভকরী। ইনি অবির্ভূত হওয়ার পর সমনী গ্রাম ধনৈশ্বর্যে ফুলে ফেঁপে উঠল। সমনী গ্রামকে গুজরাটবাসীরা লক্ষপতির গ্রাম বলে। এখানে কেউ গরীব নাই। শুণ্ডীশ্বর মহাদেবকে শুণ্ডিকেশ্বর নামেও অভিহিত করা হয়। শুণ্ডিক + ঈশ্বর। শুণ্ড শব্দের উত্তর সাদৃশ্যার্থে ক প্রত্যায় করে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ করলে শুণ্ডিক্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শুণ্ডিক্ শব্দের অর্থ আলজিভ বা আলজিহ্বা। শুণ্ডিক্ শব্দের দ্বারা এখানে একটি গুহ্য যোগক্রিয়া খেচরী মুদ্রার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। খেচরী মুদ্রার আন্তর ক্রিয়ায় জিহ্বাকে আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্তে প্রবষ্টি করিয়ে সহস্রার মণ্ডলে গিয়ে জিহ্বাকে দিয়ে ঠোক্কর মারতে হয়। যোগী সমাজে তাই খেচরী মুদ্রা 'ঠোক্কারের ক্রিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই শুণ্ডিশ্বর বা শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খেচরী ক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে মহাদেবের স্নান ও পূজা কারার বিধি প্রচলিত।

যাঁরা বারাবার চেষ্টা করেও বহুদিনে খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত করতে পারেন না, তাঁরা এখানে এসে তিনদিন চেষ্টা করলেই তাঁদের জিহ্বা অল্পায়াসেই আলজিভের ঊর্ধ্বস্থিত গর্তপথে সহস্রার মণ্ডলে প্রবেশ করে। এইজন্য প্রতিবৎসরই কিছু না কিছু যোগী এখানে খেচরীসিদ্ধ হতে আসেন। খেচরীসিদ্ধ বলতে 'খ-তত্ত্বে অর্থাৎ আকাশতত্ত্বে বা শিবতত্ত্বে বিচরণ করা। এই দেখুন আমার খেচরী ক্রিয়া। এই বলে তিনি হাঁ করে জিহ্বাকে প্রলম্বিত করে ধীরে ধীরে আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্তে প্রবেশ করিয়ে আমাদেরকে খেচরী মুদ্রা দেখালেন। তিনি পরে আমাদেরকে খেচরী মুদ্রা বিশদভাবে বুঝাতে গিয়ে বলনেল —

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লম্বিকোর্ধ্বেষু গর্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহাম॥

অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি রসনাকে বিপরীতগামিন করে লম্বিকা অর্থাৎ আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্ত তালুকুহরে প্রবেশ করিয়ে জিহ্বাকে স্থিরতর রেখে ধ্যান করতে থাকবেন, তাতে যমভয় বিদূরিত হয় —

সাধনাৎ খেচরীমুদ্রা রসনোর্ধ্বগতা যদা।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাৎ হিত্বা সাধারণ ক্রিয়াম্॥

অর্থাৎ খেচরী মুদ্রা সাধনার দ্বারা জিহ্বাকে বিপরীতগামী করতঃ তালুমধ্যে প্রবেশ করিয়ে কপালকুহরে ঊর্ধ্বগত করে রাখতে হয়। এই গুহ্য যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান যখন ভালভাবে আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন অন্যান্য সাধারণ ক্রিয়া এবং পূজানুষ্ঠান ত্যাগ করে জিহ্বাকে কপালকুহরে স্থির রাখতে হয়। তাতেই সাধকের শিবদর্শন ঘটে। চাই কি — সাধক নিজেই শিবস্বরূপ হয়ে যান।

মোহান্তজী তাঁর কথা শুনে বললেন — প্রাচীন যোগী সমাজে এই গুহ্যাতিগুহ্য খেচরী মুদ্রার নাম বহু প্রচলিত। আমি শুনেছি, খেচরী অভ্যাস করতে হলে জিহ্বাকে নাকি দোহন ও ছেদন করতে হয়? পুরোহিতজী বললেন — হ্যাঁ, হ্যাঁ যোগশাস্ত্রে আছে —

জিহ্বাধো নাড়ীং সংচ্ছিন্নাং রসনাং চালযেৎ সদা।
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ॥
এবং নিত্যং সমাভ্যাসাৎ লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ।
যাবদ্‌গচ্ছেৎ ভ্রুবোর্মধ্যে তদা গচ্ছতি খেচরী॥

জিহ্বার নিম্নভাগে যে সব শিরা সংলগ্ন আছে, তা ছেদন করে সর্বদা রসনার নিচে রসনার অগ্রভাগকে চালনা করবে এবং জিহ্বাকে নিত্য নবনীত দ্বারা দোহনপূর্বক লৌহ নির্মিত একপ্রকার সূক্ষ্মযন্ত্র অভাবে জিব্‌ছোলা দ্বারা তাকে কর্ষণ করতে হবে। প্রতিদিন এই প্রকার করতে করতে জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘ হয়ে পড়বে। যখন দেখা যাবে ঐ জিহ্বা ভ্রূমধ্যস্থান স্পর্শ করতে পারে, তখন ঐ জিহ্বাকে তালুর মাঝখান দিয়ে ঊর্ধদিকে কপালকুহরে প্রবেশ করিয়ে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করতে রাখতে হবে। যখন অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে, তখন বুঝতে হবে, খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত হয়ে গেল। যোগশাস্ত্রে এসব বর্ণনা থাকলেও এই শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত করার জন্য বেচারা জিহ্বাকে টেনে হিঁচড়ে কোন ছেদন দোহন কর্ষণ মার্জনাদির বিড়ম্বনা বা অত্যাচার সহ্য করতে হয় না। শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের কৃপায় জিহ্বাকে কেবল সাধ্যমত বিপরীতগামী করে জপ করতে করতেই খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। তাই শুণ্ডিকেশ্বর খেচরী পীঠ নামে প্রসিদ্ধ। শুণ্ডিকেশ্বর নামটির মধ্যে সেই তাৎপর্যই নিহিত। আর তাঁর শুণ্ডীশ্বর নামটির মধ্যে, মহাদেব কর্তৃক গলিত কুষ্ঠী শুঁড়িবেশ ধারণের তাৎপর্য এই যে মহাদেব আশুতোষ, সর্বজীবের উপর তাঁর সমান দয়া। তাঁর কাছে সুচি অশুচি, শুঁড়ি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি কোন জাতি বিচার নাই। তিনি হীন পতিতের ভগবান। শুধু পুণ্যবানের উপরেই তাঁর দয়া নাই, পাপীর দুঃখ ও অনুশোচনাতেও তাঁর প্রাণ কাঁদে। যত্র জীব তত্র শিব। ঘটে ঘটে তিনি বিরাজ করছেন। শুঁড়ি বেশেও তিনি,

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ রূপেও তিনি। জঘন্য দূষিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বা যাঁর কন্দর্পকান্তি শরীর, সবরূপে সকল বেশের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিরাজ করছেন।

ব্রাহ্মণ নীরব হলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার মহাদেব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা এবং করুণানিধান শুণ্ডীশ্বরের স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমাদের বাংলাদেশের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন কিনা জানি না; আপনার কথা শুনতে শুনতে তাঁর একটি কবিতার কতকাংশ আমার মনে পড়ছে। মতীন্দ্রজীকে দেখিয়ে বললাম ইনি আপনাকে সেই কবিতার অনুবাদ এবং তাৎপর্য আপনার বোধগম্য ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন, বিশ্বকবির ঐ কবিতার তাৎপর্যময় নাম 'দীনের সঙ্গী।' সেখানে তিনি বলেছেন —

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে —
সবার পিছে, সবার নীচে ; সবহারাদের মাঝে।
অহংকার ত পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্ত ভূষণ দীন-দরিদ্র সাজে —
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে —

মতীন্দ্রজী কবিতাটির ভাবানুবাদ শুনিয়ে দিতেই পুরোহিতজী উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন — উহ্ বাঙালী কবি নে জরুর অনুভবী ঋষি থে।

মন্দিরে ক্রমশঃ পূজার্থীরা আসতে আরম্ভ করেছেন। আমরা শুণ্ডীশ্বর তথা শণ্ডিকেশ্বর মহাদেবকে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে পুরোহিতজীকে ধন্যবাদ দিয়ে নর্মদাতটে উঠে পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলাম। তখন বেলা ন'টা।

২১। আমরা নর্মদার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে গুজরাটের সমতল ভূমির সৌন্দর্য এবং শস্যশ্যামলা ক্ষেত্র ও ভূমির ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে চলেছি। মনোরম পরিবেশ, গ্রামঘরের সমৃদ্ধি দেখে মন স্বতঃই হর্যোৎফুল্ল। নানাজাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ দেখে নর্মদাতট সত্যসত্যই যে তপোভূমি তা উপলব্ধি হচ্ছে। বড়ই শান্ত বাতাবরণ। আমরা যে পথে হাঁটছি , সেই পথে অনেক লোকের যাতায়াত আছে। পরিক্রমাবাসী বলে, দেখামাত্রই পথিকরা শ্রদ্ধাভরে আমাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। আমারও প্রত্যাভিবাদন জানাতে জানাতে এগিয়ে চলেছি। প্রায় মাইল দুই এইভাবে হাঁটার পর আমরা একদল সাধুর সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁরা খোল, করতাল এবং খঞ্জনী নিয়ে বাজাতে বাজাতে কীর্তন করতে করতে চলেছেন। নিকটস্থ গ্রামবাসীরা তাঁদের কীর্তন শোনামাত্রই তটের উপর উঠে এসে তাঁদেরকে ভিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁরাসুর করে গাইছেন —

জমদগ্নেশ্বর তীর্থ ফেরি লুণ্ঠেশ্বর জাও।
ভূতনাথ দধীচি চন্দ্রমৌলীশ্বর আও॥
সোমেশ্বর কপিলেশ কপালেশ্বর কহ্নেশ্বর ভগবান।
গণিতাতীর্থ ডিণ্ডীশ্বর রুদ্র শুণ্ডীশ্বর যোগনিধান॥
ঋণমুক্তেশ্বর বিন্দেশ্বর দশকন্যাকো তীর্থবর।
আও পুনি ভৃগুক্ষেত্রমেঁ পুর ভারোচ আনন্দ কর॥

তাঁদের মুখে পুণ্যতীর্থগুলির নাম শুনতে শুনতে তাঁদের সঙ্গে প্রায় আরও চার মাইল হেঁটে আমরা আমলেশ্বর মহল্লায় এসে পৌঁছলাম। বেলা সাড়ে ১১টায় শুণ্ডীশ্বরী হতে প্রায় ৬ মাইল হাঁটার পর আমলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। তটের উপরেই মন্দির। মন্দিরের চারদিকেই শুধু আমলকীর বন। সেই মন্দিরে তখন পুরোহিতজী পূজা করছিলেন। আমরা নয়নাভিরাম শিবলিঙ্গটিকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই পুরোহিতজী বললেন — শিবলিঙ্গের চারপাশেই দেখুন কাঁচা-পাকা আমলকীর স্তূপ সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই আমলকী ছিঁড়ে এনে শিবলিঙ্গের কাছে সমর্পণ করে পূজা করুন। এই তীর্থে সারা বৎসরই আমলকী ফলে। এটি দৈবী মহিমা। হিন্দী এবং গুজরাটিতে আমলকীকে বলা হয় আঁবলা বা আমলা। আঁবলেশ্বর হতে মহাদেবের নাম আমলেশ্বরে পরিণত হয়েছে। এই মন্দিরের কাহিনী হচ্ছে — একবার গ্রামের কয়েকজন বালক আমলকী গাছের বনে এসে নানারকম ক্রীড়াকৌতুক করছিল। সেই সময় পরম কৌতুকী মহেশ্বর এক বালকের বেশ ধারণ করেন, তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেন। আমলকী গাছে উঠে আমলকী পেড়ে পেড়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিতে থাকেন। আর মুখে কেবলই ছড়া কাটতে থাকেন — কুপথ্যং বদরী ফলং আমলকী রসায়নং। শিবম্ শিবম্ মহানামং সর্বসিদ্ধি প্রদায়কং। বালকরাও আমলকী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমলকী কুড়াতে কুড়াতে মজা করে ছড়াটি বালকবেশী মহাদেবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে থাকেন। কতক্ষণ পরে তিনি বালকদেরকে বলেন — তোমরা বেলগাছের তলায় গিয়ে একটুখানি দাঁড়াও, আমি এই গাছ থেকে নেমে গিয়ে বেলগাছে উঠে তোমাদেরকে বেল পেড়ে দিব। বালকরা বেলগাছের তলায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। তখনও তারা মনের আনন্দে ছড়া কেটে চলেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন তারা তাদের সেই নূতন বন্ধু খেলার সাথীকে বেল-তলায় আসতে দেখল না, তখন তারা সেই আমলকী তলায় ফিরে গেল তার খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখে কাকস্য পরিবেদনা! আমলকী গাছের উপরে বা নীচে কেউ নাই। পরিবর্তে আমলকী গাছের তলায় মাটি ভেদ করে আমলকী বর্ণের এক শিবলিঙ্গের উদ্ভব ঘটেছে। চারদিক সুগন্ধে ভরে আছে। সেই থেকে এই শিবলিঙ্গ আমলেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিদিনই এক বালককে ধরে এনে সর্বপ্রথম পূজা করাতে হয়। তারপর পুরোহিত হিসেবে আমি বা গ্রামবাসী ভক্তগণ পূজা করেন। শিশুপ্রেমিক দেবাদিদেবের লীলাস্থলী এই তীর্থ।

তাঁর বর্ণিত মহিমা শোনার পর গাছ থেকে এক একটি আমলকী ছিঁড়ে এনে মহাদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে প্রণামান্তে আমরা আবার নর্মদার কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলাম।

২২। মোহান্তজীকে মতীন্দ্রজী জিজ্ঞাসা করলেন — গুরুজী বেলা ১২টা বেজে গেছে। এবার আমরা কোন্ তীর্থের দিকে এগোচ্ছি? — আমরা এবার ভৃগুক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ ভারভূতির দিকে যাচ্ছি। প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটে গেলেই আমরা মহাজাগ্রত শৈবপীঠ ভারভূতেশ্বর মহাদেবের দর্শন লাভ করতে পারব। তত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ সাক্ষাৎ রুদ্রো মহেশ্বরঃ। সাক্ষাৎ মহেশ্বর দেবাদিদেব রুদ্র সেখানে বাস করেন। ভারেণ মহতা জাতো ভারভূতিরিতি স্মৃতঃ। কোন এক মহাভার বা বড় গাঁঠরী হতেই এই রকম বিচিত্র নামের সৃষ্টি হয়েছে। আমি ভারভূতেশ্বরের গল্প বলছি, তোমরা শুনতে শুনতে হাঁটতে থাক, তাহলে এই

মধ্যাহ্নকলে হাঁটিতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। সত্যযুগে রৈবত মন্বন্তরে বিষ্ণুশর্মা নামে জনৈক বেদবিৎ ব্রাহ্মণসহ ভারোচের সন্নিকটে নর্মদাতীরে 'গুরুকুল' স্থাপন করে বহুশত ছাত্রকে বেদবেদাঙ্গের শিক্ষা দান করতেন। তিনি নিজে শিলোঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাঁর ছাত্ররাও ভিক্ষা করে এনে নিজেরা পালাক্রমে স্বহস্তে রান্না করে আহারাদি করতেন। বিষ্ণুশর্মার বিদ্যাদান এবং পবিত্র জীবনচর্যায় কৃপাবিষ্ট হয়ে স্বয়ং মহাদেব ব্রাহ্মণ বটুর বেশ ধারণ করে বিদ্যার্থীরূপে বিষ্ণুশর্মার দ্বারস্থ হন। তিনি বলেন — আমি বিদ্যালাভের জন্য আপনার গৃহে বাস করতে চাই। যথান্যে বালকাঃ স্নাতাঃ শুশ্রূষন্তি হ্যহর্নিশম্। তথাহং বটুভিঃ সার্ধং শুশ্রূষামি ন সংশয়ঃ। অন্যান্য স্নাতক বালকগণ যেমন দিবারাত্র আপনার সেবা করে, আমিও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনার সেবা করব। তাঁর কথা শুনে বিষ্ণুশর্মা তাঁকে বিদ্যার্থী হিসাবে নিজের কাছে রাখতে সম্মত হলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন — বৎস! সব সময় মনে রাখবে — শুধু গুরুকে দর্শন করলে বা গুরুগৃহে বাস করলেই বিদ্যালাভ করা যায় না। ঐহিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন বিদ্যালাভ করতে হলে, গুরু শুশ্রূষা, বিপুল ধন দান কিংবা বিদ্যা দ্বারাই বিদ্যালাভ হয় এবং এই সকলের যে কোন উপায়ে লব্ধ বিদ্যাই ফলপ্রদা হয়ে থাকে —

> গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
> অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা ভবতীহ ফলপ্রদা।।

যাইহোক, সেই ব্রাহ্মণ বটুরূপী মহাদেবকে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা ছাত্র হিসাবে পড়াতে আরম্ভ করলেন। পূর্বেই বলেছি পণ্ডিতের গুরুকুলে বা বিদ্যাশ্রমে শিষ্য ছাত্রগণই পর্যায়ক্রমে রন্ধনাদি কার্য সম্পন্ন করতেন। একদিন রন্ধন কার্যের জন্য বটুর পালা পড়ল। তাঁকে আশ্রমে রেখে ছাত্রগণ গুরুকে সঙ্গে নিয়ে স্নান তর্পণাদির জন্য নর্মদাতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বটুরূপী মহাদেবের সংকল্প মাত্রেই ভোজনগৃহে সমস্ত খাদ্যবস্তু থরে থরে সাজানো হয়ে গেল। তিনিও নর্মদাতীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখেই সহপাঠীগণ বিরক্ত হয়ে বললেন — আমাদের এতগুলি লোকের জন্য রান্না করতে বেলা গড়িয়ে যায়। আর তুমি অল্পক্ষণের মধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হলে! তাহলে তুমি কি রান্না কর নি? আমরা ক্ষুধার্ত, আশ্রমে গিয়ে যদি ভোজন করতে না পাই , তাহলে আমার হাত পা বেঁধে নর্মদাতে ফেলে দিব। বটু বললেন — আমারও প্রতিজ্ঞা কঠোর, যদি গুরুগৃহে গিয়ে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন পরমান্নাদি যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত দেখ তাহলে আমিও তোমাদের সকলকে একসঙ্গে গাঁঠরীর মত করে ভরে বেঁধে নর্মদার জলে নিক্ষেপ করব — যূয়ং বদ্ধ ময়া সর্বে ক্ষেপ্তব্যো নর্মদাম্ভসি। স্নানান্তে সকলে গিয়ে ভোজ্যবস্তু যথাবিধি প্রস্তুত দেখে বিস্ময়াপন্ন হলেন। পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন পর্ব সমাধা করে তাঁরা পরমানন্দে সেই দিনটি লেখাপড়া করে কাটালেন। পরদিন সকালে স্নান করতে গিয়ে বটুকে রজ্জু হস্তে আসতে দেখে তাঁদের পূর্বদিনের কথা স্মরণে এল। তাঁরা প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। বটু ক্ষিপ্রবেগে পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদেরকে একে একে ধরে এনে সকলকেই ভারবদ্ধ করে — ভারং বদ্ধাতু সর্বেষাং — নর্মদাজলে নিক্ষেপ করলেন। এই ভয়ংকর কাণ্ড দেখে বিষ্ণুশর্মা হায় হায় করে উঠলেন। শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে বললেন — এইসব বালকগণের মাতা-পিতাকে আমি কি জবাব দিব? আমার

আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন নাই। এই বলে তিনি নর্মদায় ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই দেবাদিদেব পণ্ডিতজীকে নিরস্ত করে হাসতে হাসতে নর্মদা গর্ভ হতে সেই ভার উদ্ধার করে আনলেন। পাঁচজন বাদে সকলেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। পঞ্চত্বপ্রাপ্ত সেই পাঁচজনকে ঢেকে রেখে সেই গাঁঠরী বা ভারের উপর ভারতবিশ্রুত এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। পরে সেই পাঁচজনকে পুনর্জীবিত করে দিলেন। এই অলৌকিক লীলা দেখিয়েই ব্রাহ্মণ বটু অন্তর্হিত হলেন। মহাদেব প্রতিষ্ঠিত সেই মহাজাগ্রত লিঙ্গই ভারভূতি বা ভারভূতেশ্বর লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। সেখানে স্নান ও পূজা করলে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপই বিনষ্ট হয়; মন্ত্র সিদ্ধি হয়। ভারভূতেশ্বর তীর্থে স্নান করার পৃথক মন্ত্র আছে; স্নানের পূর্বে জলে নেমে নর্মদা গর্ভ হতে কিঞ্চিত মাটি তুলে উত্তরতটে নিক্ষেপ করতে হয়।সেই অনুষ্ঠানেরও পৃথক মন্ত্র আছে।

আজ আমরা ভারভূতেশ্বর পৌঁছে পুনরায় স্নান করব। সেই সময় আমি তোমাদেরকে মন্ত্রগুলি পাঠ করাব।

মোহান্তজীর বর্ণনা শেষ হল। তিনি দূর হতেই নর্মদা তটে একটি বিশেষ ঘাট দেখিয়ে বললেন — যে ঘাটে বহু লোকের ভিড় দেখছ, ঐটিই ভারভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এস আমরা এখান থেকেই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

প্রণামান্তে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরেই আমরা ভারভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। গুজরাটের এই অঞ্চলের নাম ভূতগ্রাম। নামে গ্রাম, কিন্তু জাঁকজমক, অজস্র দোকান পসরা এবং ভিড় ভাড়েক্কায় ভূতগ্রাম শহরকেও হার মানাবে। চারদিকে ছোটবড় অট্টালিকাও প্রচুর। মন্দিরের বিশাল যজ্ঞমণ্ডপে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহী বসে জপ করছেন। বেলা ২টা বেজেছে। সরাসরি মন্দিরে প্রবেশ না করে মোহান্তজী আমাদেরকে নিয়ে বাঁধানো ঘাটের উপরে গিয়ে বসলেন। ঘাটের পৈঠাতে ঝোলা গাঁঠরী রেখে আমরা নর্মদার জলে নামলাম একটু পরেই। ঘাটে আরও অনেক লোক স্নান তর্পণএবং জলন্ত ঘৃত প্রদীপ উৎসর্গ করে নানারকম মন্ত্রপাঠ করছেন। একজন ব্রাহ্মণকে দেখলাম রুদ্রাধ্যায় পাঠ করছেন; কেউ কেউ বা 'মৃত্যুঞ্জয়' স্তোত্র পাঠে রত। মোহান্তজী বললেন —নর্মদা গর্ভ হতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা হাতে করে তোল; আমি মন্ত্রপাঠ করছি, আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রপাঠ করতে করতে ঐ মাটি কিনারার উপরে ঘাট ছেড়ে যেখানে পার ছুঁড়ে ফেল। তিনি নিজেও একটু মাটি তুলে নিয়েছেন। মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন —

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং জন্মকোটি শতার্জিতং।।

হে বসুন্ধরে! তুমি অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা এবং বিষ্ণুক্রান্তা। হে মৃত্তিকে ! আমার শতকোটি জন্মার্জিত পাপ তুমি হরণ কর।

মন্ত্রপাঠ করে আমরা সকলেই মাটি ছুঁড়ে দিলাম কিনারার উপর। তার পরেই তিনি হাতজোড় করে স্নানমন্ত্র পাঠ করালেন —

ত্বং নর্মদে পুণ্যজলে তবাম্ভঃ শঙ্করাঙ্গভবম্।
স্নানং প্রকুর্বতো মেহদ্য পাপং হরতু চার্জিতম্।।

— মা নর্মদে! তুমি পুণ্যজলা, মহাদেবের শরীর হতে তোমার জল উদ্ভূত হয়েছে; আমি আজ তোমার সেই জলে স্নান করছি, আমার সমূহ সঞ্চিত পাপ হরণ কর।

মন্ত্র পাঠের পর তর্পণ ও জপ সেরে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে যখন পৌঁছালাম, তখন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মোহান্তজী তাঁর পূর্ব পরিচিত বলে কাছে এসে বললেন — ভোগারতির পর গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ আছে, এখনই খুলে যাবে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। কিন্তু অপেক্ষা করতে হল না। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই গর্ভগৃহের দরজা খুলে গেল। মণ্ডপ গৃহ হতে নর-নারীরা ছুটে আসছিলেন, মহাদেবকে দর্শন করতে। কিন্তু প্রধান পুরোহিত তাঁদেরকে হাত তুলে বললেন — ইন্ লোগোনেঁ পরিক্রমাবাসী সাধু হৈ। আপলোগ কৃপয়া দো মিনিট কে লিয়ে ঠার যাইয়ে। এই বলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা ঠেলে দিলেন। ঘি এর বড় প্রদীপ জ্বলছে চারকোণে চারটি। সেই আলোতে ভারভূতেশ্বর রুদ্রের অপরূপ লিঙ্গস্বরূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। সমগ্র শিবলিঙ্গ রৌপ্যমণ্ডিত। লিঙ্গ শীর্ষকে ঢেকে রেখেছে এক প্রকাণ্ড রূপার সাপ ফণা বিস্তার করে। পাশেই একটি বড় রূপার ত্রিশূল। যাঁরা কাশীতে তিলভাণ্ডেশ্বর মহাদেবের বিগ্রহ দেখেছেন, তাঁরা অনুমান করতে পারবেন এই শিবলিঙ্গের বহিরাবয়ব। প্রধান পুরোহিত মোহান্তজীকে বললেন — শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দুটি মন্ত্রে এখানে ভগবানের পূজা বিধি। আমি মন্ত্র পড়ছি, আপনারা একসঙ্গে পবিত্র তীর্থবারি ঢেলে পূজা করুন —

ওঁ যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষি অস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসী পুরুষং জগৎ॥

হে গিরিশন্ত, হে গিরিত্র, নিক্ষেপ করার জন্য যে বাণ তুমি হস্তে ধারণ কর, তাকে মঙ্গলময় কর; বিরাট পুরুষের এই জগদাকার রূপকে তুমি হিংসা করো না। এখানে গিরিশন্ত শব্দের অর্থ — গিরীন্ অস্থিপুঞ্জান্ দেহান্ ইত্যর্থ অর্থাৎ যাঁর কোপদৃষ্টিতে অস্থিপুঞ্জের সমষ্টি এই দেহের বিলয় ঘটে। যার কৃপাদৃষ্টিতে বিদেহ অবস্থা বা দিব্য বিদেহ স্থিতি লাভ হয়, তাঁকেই গিরিশন্ত বলা হয়। আর গিরিত্র শব্দের অর্থ পর্বত পালক বা স্বভক্ত রক্ষক।

ওঁ যদাহতমস্তদ্ ন দিবা ন রাত্রি ন সৎ ন অসৎ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥

অর্থাৎ যখন অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন দিবা রাত্রি থাকে না, কার্য বা কারণও থাকে না। হে মহাদেব! তখন তুমিই একমাত্র নির্বিকাররূপে অবস্থান কর। তুমি নিত্য তুমি সূর্যেরও বরণীয় পুরুষ, তোমা হতেই অনাদিসিদ্ধা আত্মবিদ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

মন্ত্রপাঠ করতে করতে ভারভূতেশ্বর মহাদেবের মাথায় জল ঢেলে আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ভক্তদের ভিড় ঠেলে আমরা কোনমতে মন্দির হতে বেরিয়ে এসে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। পরিক্রমা করতে করতেই মন্দিরের পিছনেই তিনতলা বিশিষ্ট ধর্মশালা চোখে পড়ল। ভক্তদের 'ভারভূতেশ্বর মহাদেওকী জয়' ধ্বনিতে মন্দির মুখর হয়ে উঠেছে। আমরা মন্দিরের ফাটক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছি , এমন সময় প্রধান পুরোহিতজীর পুত্র এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। তিনি মোহান্তজীকে প্রণাম করে হাতজোড় করে বললেন — পিতাজী আপ্‌কো লিয়ে প্রসাদ ভেজা। আপ্ কৃপা করকে গ্রহণ করিয়ে। ইয়ে ভারভূতেশ্বরজীকে খাস পরসাদী হ্যায়! মহাদেবের প্রসাদ বলায়

মোহান্তজী আর না বলতে পারলেন না। শ্রীমানজী আমাদেরকে ভোগশালায় নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি করে নারকেল এবং এক ফেনা করে কলা অত্যন্ত ভক্তিভরে আমাদের হাতে সমর্পণ করলেন। আমরা সেগুলি মাথায় ঠেকিয়ে মন্দিরের বাইরে এসে নর্মদা কিনারে দাঁড়ালাম। মতীন্দ্রজী জানালেন বেলা সাড়ে তিনটা বেজেছে। মোহান্তজী বললেন — আর মাইল খানিক হাঁটিলেই আমরা বরুয়া গ্রামে ঋণমোচন তীর্থে গিয়ে পৌঁছে যাব। এখন এগিয়ে যাই চল। ভারভূতেশ্বরে যেরকম ক্রমাগত লোক সমাগম দেখছি, এখানে রাত্রিযাপন সুখপ্রদ হবে না। তাঁর কথামত নর্মদা তট ধরে হাঁটতে হাঁটতেই প্রায় দশ মিনিট পরেই আমরা কারও কণ্ঠে সুমিষ্ট ভজন গানের সুর শুনতে পেলাম। কিছুটা এগোতেই দেখলাম — একজন কঙ্কালসার বৃদ্ধ সাধু একটি ছোট বটগাছের তলায় বসে খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইছেন —

মেরে আখন কে দৌ তারে,
রেবা শিবম্, শিবম্ রেবা
ইয়হ দৌ, রূপ উজারে।
পিতা-পুত্রী অভিরাম মনোহর
কৈলাস-কন্টক মেঁ বাঢ়ে
শুক শারদ নারদ বলিহারী
মহিমা বর্ণত হারে।

— আমার চোখের দুই তারা শিব এবং রেবা মায়ের রূপ সর্বদাই দেখুক। কৈলাস এবং অমরকন্টকে ওদের ধাম। পিতা-পুত্রীর নয়নাভিরাম কী সুন্দর দিব্য দ্যুতি! শুকদেব, সরস্বতী, নারদও এঁদের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে হেরে যান।

কী সুন্দর সুরেলা কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠের যাদুতে আমরা মোহিত হয়ে গেলাম। আমাদের চলার গতি স্বাভাবিক ভাবেই শ্লথ হয়ে গেছে। ধীরে পদক্ষেপে গান শুনতে শুনতে আমরা তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালাম। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ হতে যে এত মধুর কণ্ঠস্বর নির্গত হতে পারে, তা নিজের চোখ না দেখলে এবং নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করাই কঠিন। যাইহোক, আমরা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ানো মাত্রই গায়ের শতছিন্ন কাঁথা এবং খঞ্জনী ফেলে দিয়ে নিজের পেট চাপড়াতে চাপড়াতে বিরাট 'হাঁ' দেখিয়ে বললেন — 'ম্যায় ভূখা হুঁ'। মোহান্তজী নীরবে তাঁর ঝোলা হতে নারকেল ও কলা বের করে দিলেন। কলাগুলি সঙ্গে সঙ্গে টপাটপ করে গিলতে গিলতে ঝোলা থেকে একটি বড় ছুরি বের করে নারকেলটিকে পাথরে ঠুকে মুহূর্তে ভেঙ্গে অতি দ্রুত চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন। তারপর পুনরায় পেট চাপড়ে হাঁ দেখিয়ে বললেন — 'ম্যায় ভূখা হুঁ'। আমি তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে আমার ভাগের নারকেল ও কলাগুলি তাঁর হাতে দিলাম। পূর্বের মতই তিনি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে কলাগুলি এবং নারকেল ভেঙ্গে খেয়ে ফেললেন। খেয়ে আবার একই ভঙ্গীতে বললেন — ঔর কুছ হ্যায়? ম্যয় ভূখা হুঁ। এইবার রতনভারতীজী তাঁর ঝোলা হতে নারকেল এবং কলা বের করে দিলেন। তিন চার মিনিটের মধ্যে তাও খাওয়া হয়ে গেল। এইবার ভ্রূকুঞ্চিত করে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন — হম পহলে দফেই বোল চুকা, মুঝে বহুৎ বহুৎ ভুখ লাগা। যিস্‌কা পাশ যো কুছ হ্যায় মুঝে দে দেও। এইবার একে একে মতীন্দ্রজী, গণেশভারতী ইত্যাদি বাকী

পাঁচজনও তাঁদের প্রসাদরূপে প্রাপ্ত নারকেল ও কলা তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। তিনি সমান ব্যগ্রতার সঙ্গে সেই সব কলা ও নারকেল খেয়ে নিয়ে গাছতলায় রাখা একটি মাটির ভাঁড় হতে জল নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বললেন — প্রীতোহস্মি, প্রীতোহস্মি। 'সুবেসে ক্যাত্না আদমী ইধারসে ভারভূতিজীকো পূজা ও ভেট চড়নে কো লিয়ে যা রহে। উনকা বেশবাস, ঠাট্-ঠ্যামককো জৌলুষ কোঈ কমতি নেহি হ্যায়। লেকিন্ মুঝে কোঈ কুছ তনিক ভর ভি নেহি দিয়া।

ইসীওয়াস্তে কহা যাতা হৈ —

বড় বড়ে যো কহতে হেঁয়
বড়ে মে তাল খজুর।
বরঠাগে ছায়া নহি
ফল পাওন কা দূর।'
বড় হলে বড় হবে ভেবো না এমন।
তাল খেজুরের দশা কর দরশন॥
আকাশ ছেয়েছে উচ্চ শাখা প্রশাখায়।
ফল ফুল ছায়া তবু পান্থ নাহি পায়॥

এই স্বগতোক্তি করেই তিনি খঞ্জনী হাতে নিয়েই গান করতে লাগলেন —

মেরে আখন কে দৌ তারে
রেবা শিবম্, শিবম্ রেবা
ইয়হ দৌ, রূপ উজারে।

বেলা ৪টা বেজে গেছে। আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। তাঁকে সকলে 'হর নর্মদে' বলে অভিবাদন জানিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। তিনি প্রত্যাভিবাদন ত করলেনই না, তাঁর হাবভাব দেখে মনে হল, তিনি বোধহয় আমাদেরকে চেনেনই না! যেতে যেতে তাঁর কথাই আমরা আলোচনা করতে লাগলাম। মতীন্দরজী বললেন — গুরুজী? ঐ কঙ্কালসার শরীরে লোকটা আট আটটা নারকেল এবং আট ডজন বড় বড় কলা কেমন অবলীলাক্রমে গোগ্রাসে গিলে ফেলল দেখলেন! আমার মনে হয়, লোকটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দেবতা! মতীন্দ্রজীর কথা শুনে মোহান্তজী বললেন — 'নর্মদাতটের কোন সাধু সম্বন্ধে এভাবে অভব্য কথা তুমি বলতে পার না, বলা উচিতও নয়।' পর পর দুবার ঢেঁকুর তুলে তিনি বললেন — 'তোমাদের কি মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদী কর্তৃক দুর্বাসার পারণ পর্ব মনে পড়ে ? বনবাসকালে পাণ্ডবরা যখন দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে কাম্যক বনে বাস করছিলেন, সেইসময় একদিন মহামুনি দুর্বাশা সশিষ্যে পাণ্ডবদের আতিথ্য প্রার্থনা করেন। সেইসময় পাণ্ডবদের ভোজনপর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। সূর্যদত্ত তাম্রস্থালীতে কোন খাদ্য দ্রব্যই অবশিষ্ট ছিল না। দ্রৌপদী নিজেকে বিপন্নবোধ করে অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্মরণ মাত্রই সেখানে আবির্ভূত হয়েই তাম্রস্থালীর কণ্ঠসংলগ্ন কিঞ্চিৎ অন্নকণা মুখে দিয়েই বলে উঠেন — এতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হোন। ওদিকে দুর্বাশা তখন সশিষ্যে জলে নেমে স্নানের পর অঘমর্ষণ করছিলেন। জল হতে উঠে তাঁরা পরস্পর সান্নরস

উদ্গার করতে করতে বলাবলি করতে লাগলেন — আমরা এমন পরিতৃপ্ত বোধ করছি যে, কিছুতেই আর আহার করা সম্ভব নয়। নিজেদের লজ্জা ঢাকবার জন্য তখন তাঁরা সেখান থেকে অন্যত্র পালিয়ে গেছলেন। ভীম তাঁদেরকে ডাকতে গিয়ে আর খুঁজে পাননি। জানি না, আমার কথা শুনে তোমরা হাসছ কিনা, আমি এইমাত্র যে অত্যাশ্চর্য কাণ্ড দেখে এলাম তাতে বিভ্রান্ত এবং হতচকিত হয়ে আমার মন হয়ত এক কাকতালীয়বৎ ঘটনাকে ভুলভাবে অন্য ঘটনায় আরোপ করে ফেলছে, তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই ঐ ক্ষুধার্ত সাধু খাওয়ার পর 'প্রীতোহস্মি' বলার পরেই মনে হচ্ছে আমি যেন আকণ্ঠ ভোজন করেছি। বিন্দুমাত্র আর ক্ষুধা নাই। তোমাদেরও ত আজ ভোজন হয়নি। তোমরা কি এখন নিজেদেরকে ক্ষুধার্ত বোধ করছ?

মোহান্তজীর কথায় আমাদের টনক নড়ল। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, নিজেদের পেটের অবস্থা অনুভব করে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, সত্যই আমরা কিছু না খেয়েই নিজেদেরকে ভোজনে পরিতৃপ্ত বলে মনে করছি। মনে হচ্ছে, আমাদের সকলেরই পেট ভরতি ! আমি আফশোষ করে বললাম — তাহলে ত আমরা সত্যই কোন ছদ্মবেশী উচ্চকোটির মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে ছলনা করে ফাঁকি দিলেন! আমরা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলে আমাদের অনেক উপকার হত।

মোহান্তজী বললেন — আফশোষ করে লাভ নাই। নর্মদাতটে কোন মহত্মাকে প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলা দুষ্কর ব্যাপার। তাঁরা নিজে ধরা না দিলে, তাঁদেরকে ধরা এবং চেনা কখনই সম্ভব নয়। আর উপকারের কথা বলছ! উপকার একমাত্র মা নর্মদা ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। তিনি তাঁর পরিক্রমাবাসী সন্তানদের যখন যা ভাল বুঝবেন, তখন তাই করবেন।

২৩। কথা বলতে বলতে আমরা বরুয়া গ্রামে এসে পৌঁছে গেছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মন্দিরে আরতির বাজনা শুনে আমরা সেদিকে কান রেখে মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। পুরোহিত ছাড়াও আর ৪জন মাত্র লোক শিঙ্গা ডম্বরু বাজাচ্ছেন। আমরা মন্দিরে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দেখতে লাগলাম। আরতির শেষে মোহান্তজী বেরিয়ে এসে আমাদেরকে পরিক্রমাবাসী বলে জানতে পেরে সদ্য নির্মিত একটি বড় ঘর আমাদের রাত্রিবাসের জন্য খুলে দিলেন। ঘরটি ইষ্টক নির্মিত হলেও টিনের ছাউনী। পুরোহিতজী নিজেই আমাদেরকে হারিকেনের আলো দেখালেন। আমরা সেই ঘরে ঝোলা, গাঁঠরী রেখে নিজেদের টর্চ টিপে নর্মদার ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। তারপর যে যার আসন বিছিয়ে বসতেই পুরোহিতজী আমাদেরকে বলতে লাগলেন — আপনারা ঋণমোচনেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁচেছেন। মন্দিরে আছেন ঋণমোচনেশ্বর মহাদেব। জন্মগ্রহণ মাত্রই মানুষকে তিনটি ঋণে বদ্ধ হতে হয় — দেবঋণ, পিতৃঋণ আর ঋষিঋণ। যজ্ঞ ও তপস্যানুষ্ঠানের দ্বারা দেবঋণ, সন্তান দ্বারা পিতৃঋণ এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রচর্চা এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়। প্রাচীনকালে দুশ্রবণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। সেইজন্য পিতৃঋণ হতে তিনি কিভাবে মুক্তি হবেন, এই চিন্তায় কাতর হয়ে তিনি এখানে অনাহারে থেকে শিবের আরাধানা করতে থাকেন। তিনি দিনান্তে কেবল নর্মদার জল কয়েক গণ্ডুষ পান

করতেন। মাত্র সাত মাস এইভাবে তপস্যা করায় মহাদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে সন্তান লাভের বর দেন। সন্তান লাভ করায় রাজা পিতৃঋণ হতে মুক্ত হন। সেই থেকে এই তীর্থ ঋণমোচনেশ্বর তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

পুরোহিতজী কিছুক্ষণ পরে চলে যেতেই আমরা সন্ধ্যা করতে বসলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। টিনের ছাউনী বলে কিনা জানি না, আমরা শীতে বড়ই জড়সড় হয়ে পড়েছি। লক্ষ্মণভারতীজী থাকলে তিনি যেখান থেকে হোক কাঠ সংগ্রহ করে ধুনী জ্বালাতেন। যাই হোক, রাত্রি ১০ টা নাগাদ আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল ৬টার সময় আমার ঘুম ভাঙল। বিছানার উপর উঠে বসে দেখি, মোহান্তজীসহ সকলেই কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। আমি মতীন্দ্রজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — কি ব্যাপার আপনাদের কি প্রাতঃকৃত্য সারা হয়ে গেছে? মতীন্দ্রজী বললেন — বাব্বা! আপনার ঘুম বটে! আমরা কেউ ভাল করে ঘুমাতে পারি নি।রাত্রি ১২টা নাগাদ গুরুজী ঘুমের মধ্যে শুনলেন সেই 'ম্যাঁয় ভুখা হুঁ' সাধুর কণ্ঠস্বর — মেরে আখন কে দৌ তারে! গুরুজীর মনে হল, এই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই খঞ্জনী বাজিয়ে তিনি গান গাইছেন। গুরুজী উঠে দরজার বাইরে বেরিয়ে গেলেন। দরজা খোলার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি টর্চ নিয়ে গিয়ে চারদিকে আলো ফেলে দেখলাম। কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। বাইরের প্রচণ্ড হিমেল বাতাসে আমাদের হাড়ে কাঁপুনী ধরে গেল। গুরুজীকে ঘরে টেনে এনে শুইয়ে দিলাম। ঘন্টা দুই পরেই গুরুজীর আবার ঘুম ভেঙে গেল। আমাকে জাগিয়ে তিনি বললেন মতীন্দ্র! ঐ শোন তাঁর কণ্ঠস্বর! আমি এবং গুরুজী স্পষ্ট শুনলাম — সেই সাধুর কণ্ঠস্বর! তিনি গাইছেন

রেবা শিবম্, শিবম্ রেবা
ইয়হ্ দৌ, রূপ উজারে।

অগত্যা আবার দরজা খুলে দুজনে টর্চ টিপে চারদিক দেখে এলাম। তাঁর কোন চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না। কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না। দুজনে আবার এসে শুয়ে পড়লাম। আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম, হঠাৎ প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে শেষরাত্রি সাড়ে চারটার সময় গণেশভারতী সোরগোল ফেলে দিলেন — গুরুজী! উহ্ ভক্ষণসুর সাধুনে আকর্ গীত গাতা হৈ। কি বলিহারী ঘুম তোমার, একমাত্র তুমি ছাড়া আমরা সবাই জেগে বসে শুনতে লাগলাম সাধুর খঞ্জনী বাজিয়ে গান। মনে হল, তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই গাইছেন —

মেরে আখনকে দৌতারে।
পিতাপুত্রী অভিরাম মনোহর
কৈলাস-কন্টক মেঁ বাঢ়ে।

আমরা সাত সাতটা প্রাণী স্তব্ধ হয়ে সেই গান শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে সাতজনেই টর্চ টিপে টিপে এই ঘরের চারদিক, মন্দিরের আগল-বাগল, এমনকি তট ও তটের কাছাকাছি সব জায়গা দেখে এসে এই মিনিট দশেক হল বসেছি। বাইরে ভীষণ কুয়াশা। কুয়াশা কাটলে তবে আমরা বেরোতে পারব। এখন তুমি বল, একি আমাদের সকলেরই ভ্রম না hallucination? Illusion না delusion? মোহান্তজী বললেন — হ্যাঁ বাবা! আমরা সকলেই স্বকর্ণে শুনেছি তাঁর কণ্ঠস্বর এবং গান! তুমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে বলে তোমাকে

আর জাগাই নি। একবার আধবার নয়, তিন তিনবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলাম, একই রাত্রির মধ্যে, রাত্রি ১২টা হতে সাড়ে ৪টার মধ্যে। আমি সবিনয়ে জানালাম — এ রহস্য আমার বুদ্ধির অগম্য। এর কার্যকারণ ব্যাখ্যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

২৪। সকাল সাতটা নাগাদ সূর্যোদয় হতেই আমরা যে যার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে ঋণমোচনেশ্বর ঘাটে নর্মদা স্পর্শ করে প্রায় ১০ মিনিট হাঁটার পরেই টিম্বি নামক একটি গ্রামে এসে পৌঁছালাম। মোহান্তজী নর্মদার একটি বিশেষ ঘাট দেখিয়ে বললেন — এই হল স্বর্ণবিন্দুতীর্থ। বহু প্রাচীনকালে এক বণিক এখানে কোটি কোটি স্বর্ণ রেণু ব্রাহ্মণদেরকে দান করেছিলেন। সেই বণিক স্বপ্নে মহাদেবের দর্শন পান। সামনে যে শিবমন্দিরটি দেখা যাচ্ছে — ঐটি প্রতিষ্ঠা করছিলেন, সেই বণিক। মহাদেবের নাম — সুবর্ণবিন্দেশ্বর। এখানে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদানের বিশেষ মাহাত্ম্য। মার্কণ্ডেয় মহামুনি যুধিষ্ঠিরকে এই তীর্থের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন — মানসং বাচিকং পাপং কর্মণা যৎ পুরাকৃতম্। তৎসর্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং স্বর্ণদানেন ভারত অর্থাৎ হে ভারত ! স্বর্ণদানে পুরাকৃত মানস, বাচিক ও কর্মজ সর্ববিধ পাপই বিনষ্ট হয়। আমরা তীর্থবারি স্পর্শ করে সুবর্ণবিন্দেশ্বরকে প্রণাম করে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আবার হাঁটিতে লাগলাম।

২৫। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। আর আধমাইলটাক মাত্র হেঁটে যাওয়ার পর দশকন্যা মহল্লায় দশকন্যা তীর্থে এসে পৌঁছলাম। নর্মদার তট হতে প্রায় একশ গজ দূরে গ্রামের মধ্যে এই মন্দির। মন্দিরের দরজা খোলাই ছিল। মন্দিরে পুরোহিত পূজার জন্য ফুল তুলছিলেন। মন্দিরের চারপাশে যুঁই, জাতি, নীল, অপরাজিতা, গাঁদা ও করবীফুল ফুটে থাকলেও জবাফুলেরই গাছ বেশী, তাই রাঙা জবার শোভায় মন্দিরের এক অপরূপ শোভা ফুটে উঠেছে। মন্দিরের মধ্যে একটি মধুপিঙ্গল বর্ণের শিবলিঙ্গকে ঘিরে ১০ টি কন্যকা মূর্তি স্থাপিত। সবই পাষাণ বিগ্রহ। ফুল তুলে এসে পুরোহিতজী আমাদেরকে বললেন — সর্বপাপহরং পুণ্যং দশকন্যেতি বিশ্রুত্ম। মহাদেব কৃতং পুণ্যং সর্বকর্মফল প্রদম্ অর্থাৎ এই সর্বকামফলপ্রদ দশকন্যা তীর্থের নির্মাতা স্বয়ং মহাদেব। তিনি ব্রহ্মার গুণান্বিতা দশকন্যাকে বিবাহ করে তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদাতটে ভ্রমণ করতে করতে এখানে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় এখানে ১০ জন সাংখ্যশাস্ত্রের সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁরা প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের আলোচনায় সময়ক্ষেপ করতেন এবং মনে মনে নিজেদেরকে সাংখ্যযোগী বলে ভাবতেন। মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ব্রহ্মার কন্যাদেরকে রূপলাবণ্যবতী যুবতীর বেশ ধারণ করিয়ে সেই ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বলেন — হে ব্রাহ্মণো! মৈঁ বুঢ়া হো চুকা হুঁ। ইয়ে দশ কন্যায়োঁ হৈ। পুত্র কোঈ নহী হৈঁ , আপ তপস্বী হৈঁ , বৈরাগ্যবান্ হৈঁ , আপ ইন্ কন্যায়োঁ কো স্বীকার করলে তো বড়ী কৃপা হো। কন্যাদের অসাধারণ রূপলাবণ্য এবং সৌন্দর্য দেখে পণ্ডিতরা সাগ্রহে সম্মতি জানালেন। তদনুযায়ী একই দিনে একই লগ্নে ১০ কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য সেই বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী মহাদেব গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে একটি বড় বিবাহ মণ্ডপ সাজালেন। কিন্তু গোল বাধল পাত্রী নির্বাচন নিয়ে। রূপমুগ্ধ পণ্ডিতরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে বিবাহ করতে চান। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাদেরকে সবিনয়ে জানালেন — প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব মনন করতে করতে আপনাদের আন্তর সংযমন হয়ে গেছে বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু

আর বাক্য নিঃসরণ হয় না। তিন চারটি পাশাপাশি খাঁড়ির মত হয়েছে একস্থানে। সমুদ্র ও নর্মদার জল একত্রে প্রবেশ করেছে সেই সব খাঁড়িতে। সমুদ্রের প্রবল গর্জনে, জাহাজের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। সমুদ্রতীরে বহু মন্দির চোখে পড়ছে। বৃষখাতের কাছে নিয়ে গিয়ে মোহান্তজী আমাদেরকে স্নান তর্পণ করতে বললেন। নিজেও স্নান করে সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তারপর লোকের ভিড় কাটিয়ে তিনি ধীরে ধীরে আমাদেরকে এক বিশাল মন্দিরে এনে উপস্থিত করলেন। মন্দিরের মধ্যে মহাদেব লিঙ্গকে স্নান ও পূজা করিয়ে তিনি মন্দির সংলগ্ন আর একটি মন্দিরে প্রণাম করালেন। বললেন — এটি লক্ষ্মীমায়ের মন্দির। ভৃগুক্ষেত্ররূপে পরিচিত হওয়ার পূর্বে এই স্থান লক্ষ্মী বা কমলার ক্ষেত্ররূপে পরিচিত ছিল। মূল মন্দিরে শুধু ভৃগু পূজিত ভৃগ্বীশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গই নাই , মন্দিরের বারান্দার একদিকে মহর্ষি ভৃগু এবং মা নর্মদার অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহও আছে। এই দুই বিগ্রহের সামনে আছে এক বিরাট কচ্ছপ, অষ্টধাতু নির্মিত। একটা একান্ত স্থান খুঁজে সেখানে বসি চল। আমরা আটজন বসলে ভক্তদের আগমন নির্গমনের যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

একটি একান্ত স্থান বেছে বসতেই মোহান্তজী পুনরায় আরম্ভ করলেন — এই ভৃগুক্ষেত্রের বৃষখাতে বসে মহর্ষি ভৃগু যখন কঠোর তপস্যা করেন, তখন তাঁর আহার ছিল না, আনন্দানুভূতি ছিল না, তিনি একখণ্ড কাঠ বা পাথরের মত নিশ্চলভাবে তপস্যা করতেন। একবার উমা ও মহেশ্বর গগন পথে যেতে যেতে মহর্ষি ভৃগুর উগ্র তপস্যামূর্তি দেখে জিজ্ঞাসা করেন ঐ তপোধন কে? মহাদেব বলেন —

ভৃগুর্ণাম মহাদেবি তপস্তাপ্ত্বা সুদারুণম্।
দিব্যবর্ষ সহস্রং তু মম ধ্যানপরায়ণঃ ॥

মহাদেবি! ইনি মহাভাগ ভৃগু। ইনি দিব্য সহস্র বৎসর আমাতে ধ্যান নিবিষ্ট রয়েছেন। ইনি মাসে মাসে কুশাগ্রে করে বারি বিন্দু মাত্র পান করেন। এই কথা শুনেই মহাদেবী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন — হে বৃষভধ্বজ! সত্যসত্যই আপনি উগ্রকর্মা। আপনার কারুণ্য নাই। আপনি দুরারাধ্য এবং সর্বভূতভয়ঙ্কর। ঐ ব্রাহ্মণ দিব্য সহস্র বৎসর আপনাতে ধ্যান নিবিষ্ট থাকলেও এখনও পর্যন্ত আপনি তুষ্ট হতে পারলেন না। শিব সুন্দর ঈষৎ হাস্যবদনে উত্তর দিলেন — দেবি! স্ত্রী বিনশ্যতি গর্বেন তপঃ ক্রোধেন নশ্যতি — নারী গর্বে বিনষ্ট হয়, ক্রোধে তপস্যা নষ্ট হয়। ঐ ব্রাহ্মণ ভয়ানক ক্রোধী। এইজন্য এখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারছেন না। মহাদেব তাঁর কথার যথার্থতা প্রমাণের জন্য বৃষকে স্মরণ করলেন। স্মরণ মাত্রই বৃষ মুহুর্মুহু গর্জন করতে করতে ভৃগুর আশ্রমে প্রবেশ করে শৃঙ্গ দ্বারা ভৃগুকে নর্মদার জলে নিক্ষেপ করলেন এবং ইতঃস্ততঃ চারিদিকে ছোটাছুটি করতে করতে খুর দিয়ে আশ্রমে গর্ত করে দিলেন। সেই গর্তই বৃষখাত নামে পরিচিত হয়েছে। বৃষের এই অত্যাচার দেখে মহর্ষি ভৃগু তাঁর ব্রহ্মদণ্ড হাতে নিয়ে বৃষকে তাড়া করতে লাগলেন। শিব তখন পার্বতীকে বললেন — পশ্য দেবি মহাভাগে শমং বিপ্রস্য সুন্দরি! দেবি! বিপ্রের শমগুণ দর্শন কর। তবুও মহাদেবী ভৃগুকে বর দিতে অনুরোধ করলে চন্দ্রার্ধমৌলী, উমার্ধদেহী ভগবান শম্ভু ভৃগুকে দর্শন দিয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। ভৃগু তখন প্রার্থনা করলেন — হে দেবাদিদেব শশিভূষণ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমার নামে এই সকল স্থান সিদ্ধি

ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হোক আর আপনি উমার সঙ্গে চিরকাল বিরাজমান থাকুন। এই দেব ক্ষেত্রের সকল স্থানই পুণ্যময় হয়ে উঠুক — সিদ্ধিক্ষেত্রমিদং পুণ্যং যেন সর্বং ভবিষ্যতি। আমি এই স্থানকে তপোবলে মহাস্থানে পরিণত করবো। হে শশিভূষণ! আপনার প্রসাদে আমার আশা পূর্ণ হোক — অত্র স্থানে মহাস্থানং করোমি শশিভূষণ। তব প্রসাদাদ্দেবেশ পূর্যন্তাং মে মনোরথাঃ। উত্তরে মহাদেব বললেন, আপনি যা যা প্রার্থনা করলেন, তা পূর্ণ করতে আমার আপত্তি নাই। তবে এই স্থান লক্ষ্মীর ক্ষেত্র, আপনি কমলার অনুমতি নিয়ে যা করবার করুন, আমার আশীর্বাদ রইল। মা লক্ষ্মী দর্শন দিলে মহর্ষি যথোচিত আকুলতা সহকারে তাঁকে বললেন — মাগো! এই মহাক্ষেত্র সর্বদাই আপনার অধিষ্ঠান, আমি এথানে কিঞ্চিৎ স্থান আমার নিজস্ব করতে অভিলাষী করি। আপনি অনুমতি দিলে এই স্থানের অণু পরমাণুকেও আমি তপস্যা ও সিদ্ধি লাভের অনুকূল করে গড়ে তুলব। ভৃগুর কাতরতা এবং স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মীদেবী বললেন — আপনার নামে এই স্থান সমধিক শোভিত হোক, তাতে আমার আপত্তি নাই তবে আপনি ত জানেন এই স্থান কচ্ছপের পৃষ্ঠে অবস্থিত। তাই এখানকার ভূপ্রকৃতিও কচ্ছপাকৃতি, তাঁর সঙ্গে একবার মন্ত্রণা করা প্রয়োজন। চলুন সেই ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক কূর্মদেবের সঙ্গেও একবার আলোচনা করে নিই। উভয়ে স্মরণ মাত্র কচ্ছপের রূপে ভগবান বিষ্ণু দর্শন দিলে তাঁরা উভয়েই তাঁর কাছে সমস্ত বার্তা জ্ঞাপন করলেন। কচ্ছপরূপী ভগবান লক্ষ্মীকে বললেন — 'সুলোচনে! তুমি এ বিষয়ে কোন ভয় করো না। আমার নামাঙ্কিত এই পুরীতে তোমার সাহায্যে ভৃগু চাতুর্বিদ্য সংস্থান করতে পারবেন। এই ব্রাহ্মণ তপোবলে মহাবলীয়ান। আমার পৃষ্ঠে এই তপোভূমি সুচিরকাল পর্যন্ত সুসংস্থিত থাকবে।'

মোহান্তজী আমাদেরকে মন্দিরের অষ্টধাতু নির্মিত কচ্ছপ মূর্তিটি দেখিয়ে বললেন — ঐ কচ্ছপ সেই কূর্ম ভগবানের প্রতীক। যাইহোক, কূর্মের কথায় হৃষ্টচিত্ত ভৃগু তখন মহা উৎসাহে নন্দন বৎসরে প্রশস্ত উত্তরায়ণে মাঘ পঞ্চমীতে রেবার উত্তরতটে তাঁর এই অভীষ্ট ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন শশিমণ্ডল কুম্ভরাশিতে অবস্থিত ছিল। এই পুণ্যক্ষেত্রের পরিমাণ এক ক্রোশ। এই এক ক্রোশ মাত্র ক্ষেত্র অগণিত তীর্থ সমন্বিত এবং প্রাসাদময়ী। সেই থেকে এই স্থান ভৃগুকচ্ছ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। মহাদেব ভৃগুকে বরদানকালে বলেছিলেন — অহং চৈব বসিষ্যামি অম্বিকা চ মম প্রিয়া। সর্বদুঃখাপহা দেবী নাম্না সৌভাগ্যসুন্দরী। বসিষ্যামি তয়া দেব্যা সহিতো ভৃগুকচ্ছকে। অর্থাৎ আমি স্বয়ং অম্বিকাসহ চিরকাল এই ভৃগুকচ্ছে বাস করব, অম্বিকা এখানে সৌভাগ্যসুন্দরী নামে পরিচিতা হবেন। ভৃগু এবং ঋক যজু ও সামময় ব্রহ্মঘোষ নিনাদিত এই স্থানে তপস্যা করলে সাধকরা শিব সাযুজ্য লাভ করবেন।

ভৃগুকচ্ছ মহাতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর মোহান্তজী হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দির পরিক্রমা করে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শিষ্য জগন্নাথ সাজোত্রীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। গৃহের প্রবেশ দ্বার কলাগাছ ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হয়েছে। সশীষ ডাবসহ একটি মাটির ঘট এবং ঘৃত প্রদীপও জ্বালা হয়েছে। আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই সস্ত্রীক জগন্নাথজী ভক্তি ভরে মোহান্তজীকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে গৃহাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠল। কর্পূর জ্বেলে তাঁরা মোহান্তজীকে আরতি

করলেন। গুরুকে কিভাবে স্বাগত জানিয়ে কিভাবে পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন করে অভ্যর্থনা জানাতে হয়, তা দেখবার ও শিখবার মত। বেলা তখন একটা। দোতলার তিনখানা ঘর আমাদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমস্ত ঘরই পুরু কার্পেটে মোড়া। গৃহের আসাবাবপত্র গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য এবং সুরুচির পরিচয় বহন করেছে সন্দেহ নাই। পুরী ও পরমান্ন ভোজনের পর আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে শয়নের উদ্যোগ করতেই মোহান্তজী জগন্নাথজীকে ডেকে একটি খাম কাগজ ও কলম আনিয়ে দেশে মায়ের কাছে পরিক্রমার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানিয়ে পত্র দিতে বললেন — বললেন — ভারোচ বর্তমানে একটি পরিপূর্ণ শহরের রূপ নিয়েছে। এখানে বড় ডাকঘর সহ অলিগলিতে অজস্র ডাক বাক্স, কোর্ট কাছারি, রেজেষ্ট্রি অফিস সবই আছে। এখন যদি না লিখতে পার রাত্রে বসে অবশ্যই লিখবে। এই বাড়ীতে বিজলীর ব্যবস্থা আছে। শহরের রাস্তাতেও আছে গ্যাসের বাতি।

আমি রাত্রিতে বসে পত্র লিখব বলায় তিনি বললেন, তবে আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি চল। এই সিদ্ধিক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষণ তীর্থ দর্শন, দেবমহিমা বর্ণন ও মনন এবং ধ্যান জপে অতিবাহিত করাই শ্রেয়।

এইবলে তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভারোচের প্রধান ৪৬টি তীর্থ একে একে পরিক্রমা করানোর জন্য বের হলেন। পথে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি বললেন এই ৪৬টি তীর্থই শহরের মধ্যে নাই। কতকগুলি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। আমি প্রত্যেকটি তীর্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিব। তোমরা একে দর্শন করে মনের মধ্যে গেঁথে নাও। ইচ্ছা করলে কিছু নোটও নিতে পার। বৃষখাতের এলাকা হতে কিছু দূরে তিনি প্রথমেই নিয়ে এলেন ঢোড়েশ্বর বা ক্ষেত্রপাল তীর্থে।

১। **ঢোঁড়েশ্বর বা ক্ষেত্রপাল তীর্থ** — শিবই এখানে ভড়োঁচ বা ভারোচ নাম ক্ষেত্রের প্রধান ক্ষেত্রপাল। প্রবাদ আছে, প্রাচীনকালে ঢুঁড়া নাম্নী এক রাক্ষসীর উপদ্রবে এই অঞ্চলের শিশুদের খুব মৃত্যু হয়। একবার ঢুঁড়া রাক্ষসী একটি শিশুকে লক্ষ্য করে তাকে গ্রাস করতে আসছিল, এই সময় সংযোগবশতঃ এক দেবদূত উপস্থিত হন। তিনি ঢুঁড়াকে দেখতে পেয়ে শাসন করেন। বলেন, এখানে কখনও এসো না। অতঃপর এ গ্রামে প্রবেশ করলে তোমাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে। সেই দণ্ডে ঢুঁড়া সেই গ্রাম থেকে চলে যায়। এখানে ঢোঁড়েশ্বর দর্শন করলে ভূত প্রেত পিশাচের কুদৃষ্টি হতে শিশুরা রক্ষা পায়।

২। **কুররী তীর্থ** — তারপরে এলাম কুররী তীর্থে। একবার এক কুরর আর কুররী আকাশ পথে উড্ডীয়মান অবস্থায় নর্মদার জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারা নর্মদা স্পর্শে মুক্ত হয়েছিল। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তা দেখেন। মোহান্তজী জানালেন এই ক্ষেত্রকে রক্ষা করেন ঢৌণ্ডেশ নামক গণপতি। ঢৌণ্ডেশের বন্দনায় দৌর্ভাগ্যং নাশমাপ্নুয়াৎ অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বিনষ্ট হয়। অপুত্রো লভতে পুত্রং — যারা অপুত্রক তারা ঢৌণ্ডেশের কৃপায় পুত্রবান হয়।

৩। **ব্রহ্মেশ্বর তীর্থ** — কুররী তীর্থের পাশেই ব্রহ্মেশ্বর তীর্থ। মোহান্তজীর কাছে শুনলাম, একবার ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা তিলোত্তমার রূপে ক্ষণকালের জন্য মোহিত ও চঞ্চল হওয়ায় তাঁকে শংকর ভর্ৎসনা করেন এবং শাপ দেন। ব্রহ্মা তখন এই তীর্থে এসে গায়ত্রী জপ করেন। ব্রহ্মার গায়ত্রী সাধনায় মহাদেব তুষ্ট হন। এখানে গায়ত্রী জপ করলে ভর্গদেবতার দর্শন ঘটে।

৪। **কোটিতীর্থ** — ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির হতে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মোহান্তজী আমাদেরকে নিয়ে এলেন একটি পঞ্চায়তন বিশিষ্ট মন্দিরে। আমাদেরকে সেখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে

প্রণাম করতে বলে বললেন, তোমরা মহাভারতে নিশ্চয়ই পড়েছ যে, কৃষ্ণার্জুন তাঁদের পূর্বজন্মে নারায়ণ এবং নর নামক দুজন ঋষি এই তীর্থে ধ্যান সমাহিত চিত্তে কঠোরতম তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পরে কোটি সংখ্যক ঋষি এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। মন্দিরের গর্ভগৃহস্থিত শিবলিঙ্গ এবং প্রস্তরময়ী মহিষমর্দ্দিনী চামুণ্ডা বিগ্রহ তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত। এই তীর্থ কোটিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। তোমরা এখানে অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্য হলেও ইষ্টমন্ত্র জপ কর।

৫। **শিখিতীর্থ** — জপ প্রণাম শেষ হলেই তিনি আমাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন শিখিতীর্থে। এখানে মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ দেখছ, মোহান্তজী বললেন, এঁর নাম শিখৈশ্বর। এঁকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং অগ্নিদেব। শিবলিঙ্গ তাই ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের মতই অগ্নিবর্ণ। মহারাজ বসু হাতির শুঁড় দিয়ে যেমন অজস্রধারে জল ঝরে পড়ে তেমনি ভাবে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘি ঢেলে একশ বছর ধরে একটানা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই হব্য নিরন্তর পান করার ফলে অগ্নির মন্দাগ্নি রোগ জন্মে। তিনি এখানে তপস্যা করে অগ্নিমান্দ্য রোগ হতে নিরাময় হন, এবং পূর্ববৎ শিখার দীপ্তি এবং দাহিকা শক্তি ফিরে পান। এখানে মহাদেবের মাথায় পঞ্চামৃতে ঢেলে পূজা করে সেই পঞ্চামৃত মাসখানিক ধরে পান করলে পেটের যাবতীয় রোগ হতে — জণ্ডিস, বদহজম, প্রভৃতি হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ঐ সময় ঐ পঞ্চামৃতের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু খাওয়া চলবে না।

৬। **দেবতীর্থ** — ভৃগুর ঔরষে খ্যাতি দেবীর গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। তিনি নরনারায়ণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, নারায়ণকে স্বামীরূপে লাভ করার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন — কেনোপায়েন স স্যাত্থে ভর্ত্তা নারায়ণ প্রভুঃ — এখন কি উপায়ে আমি নারায়ণকে স্বামীরূপে লাভ করতে পারব? তাঁর এই হৃদগত অভিলাষ জানতে পেরে মহাসতী ভবানী কন্যারূপিনী লক্ষ্মীকে বললেন — প্রাহ প্রাপ্তো ময়া ভর্ত্তা শঙ্করস্তপসা কিল। প্রজাপতিশ্চ গায়ত্র্যা হ্যন্যাভিরভি বাঞ্ছিতাঃ — আমি তপস্যা দ্বারাই শংকরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েছি। হে সুব্রতে! গায়ত্রী তপস্যা দ্বারাই প্রজাপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন। নারায়ণকে স্বামীরূপে পেতে হলে তপস্যা কর। তপসৈব হি তে প্রাপ্তস্তস্মাত্তচ্চর সুব্রতে। তপস্তং হি মহচ্চোগ্রং সর্ববাঞ্ছিতদায়কম্ — তুমিও তপস্যা কর। তপস্যা দ্বারাই তুমি নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হতে পার। তীব্র তপস্যা সর্ববিধ অভীষ্ট দান করে, অতএব তুমিও উগ্র তপস্যা কর। ভগবতীর নির্দেশে লক্ষ্মী এইখানে তপস্যা দ্বারা নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করেন। তাঁদের বিবাহকালে ইন্দ্র সূর্য প্রভৃতি সমস্ত দেবতাবৃন্দ এখানে সর্বতীর্থের জল এনে সমুদ্রে স্থাপন করেন। পরে সমস্ত দেবতাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে এইখানে বসেই তপস্যা করেন। সেইজন্য এখানকার নাম দেবতীর্থ।

মোহান্তজী বললেন — মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলে গেছেন, পৃথিবী মধ্যে দেবতা এবং ঋষিবৃন্দ সেবিত যে সকল পবিত্র তীর্থ বর্তমান, বিষ্ণু কর্তৃক চিন্ত্যমান হয়ে সেইসকল তীর্থই এখানে একত্রিত হয়েছে। সেইজন্যই এই তীর্থ পুণ্য বৈষ্ণব তীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে — তত্তীর্থং বৈষ্ণবং পুণ্যং দেবতীর্থমিতি শ্রুতম্। (রেবাখণ্ড ১৯৫ অধ্যায়)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দেবতীর্থের মন্দিরে আরতি দেখে আমরা ফিরে এলাম জগন্নাথ সাজোত্রীর বাড়ীতে। সেখানে পৌঁছেই, আমরা হাত পা ধুয়ে সন্ধ্যা করতে বসলাম। সান্ধ্যক্রিয়ার

পরেই আমি চিঠি লিখতে বসলাম মাকে। আজ ১৩ ই কার্তিক, শনিবার ১৩৬১ সাল (৩০/১০/১৯৫৪)। মাকে পত্র লিখে শুয়ে পড়লাম। পাশের ঘরে মোহান্তজীর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর শিষ্য দম্পতি বোধহয় তাঁর শয়নের জন্য পরিপাটি শয্যার ব্যবস্থা করেছেন। শুনতে পেলাম মোহান্তজী তাঁদেরকে বলছেন — আমার পরিক্রমাবাসী সন্তানের দল যেমনভাবে শুয়েছেন, আমিও তেমনভাবেই নিজের কম্বল বিছিয়ে শোব। আমিও এখন তাঁদের সঙ্গে পরিক্রমাবাসী। এখানকার সকল তীর্থ দর্শন করিয়ে বাঙালী বাবা ছাড়া বাকী কয়জন পরিক্রমাবাসী যখন বৃষখাতে গিয়ে পরিক্রমা সমর্পণ করবেন, তখন তোমাদের ইচ্ছামত সেবা গ্রহণ করতে আর বাধা থাকবে না।

এই মহৎ ও উদার চরিত্র মহাত্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রবিবার সকালে উঠেই সূর্যোদয়ের পর মোহান্তজী আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই বৃষখাতে নিয়ে গেলেন, সেখানে স্নান তর্পণাদির পর কর্পূর জ্বেলে প্রত্যেকেই আরতি করলাম। মোহান্তজী আমাদেরকে প্রায় মাইলখানিক হেঁটে নিয়ে গেলেন মৎস্যেশ্বর তীর্থে।

৭। **মৎস্যেশ্বর তীর্থ** — এখানে কোন মন্দির নাই। সমুদ্র ও নর্মদার জল একত্রে বয়ে চলেছেন এখানে। সেই জল স্পর্শ করিয়ে মোহান্তজী বললেন — শঙ্খাসুর নামক ভয়ঙ্কর এক দেবদৈত্যজয়ী দৈত্যকে নিধন করার জন্য ভগবান বিষ্ণু এখানে তপস্যা করে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। তারপর একে একে নিম্নলিখিত তীর্থগুলিতে নিয়ে গেলেন।

৮। **মাতৃ তীর্থ** — লক্ষ্মীমাতা এবং ভগবান বিষ্ণুর বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্রহ্মাণী, শিবানী, গায়ত্রী, সাবিত্রী, ইন্দ্রানী, সূর্যপত্নী সংজ্ঞা, চন্দ্রের প্রথমা পত্নী অশ্বিনী প্রভৃতি সকল দেবীরা মিলিত হয়ে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই দিনে, একই উৎসব যাপনের উদ্দেশ্যে দেবতারা যেমন স্থাপন করেছিলেন দেবতীর্থ, তেমনি দেবীরা স্থাপন করেছিলেন মাতৃ তীর্থ।

৯। **নর্মদেশ্বর তীর্থ** — মহর্ষি ভৃগু তপস্যা করে এখানে মা নর্মদার স্বরূপ দর্শন করেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি নর্মদেশ্বর শিবমন্দিরে নিজে জপ করতে বসে আমাদেরকেও জপ করতে বললেন।

১০। **বালখিল্য তীর্থ** — জপের শেষে তিনি পাশের একটি তীর্থতে নিয়ে গেলেন। বললেন — এখানে বালখিল্য ঋষিরা দীর্ঘকাল ধরে নর্মদা-তপস্যা করেছিলেন। তাই এই তীর্থের নাম বালখিল্য তীর্থ। এখানে কোন মন্দির নাই।

১১। **সাবিত্রী তীর্থ** — বেদমাতা স্বয়ং সাবিত্রী এখানে তপস্যা করেছিলেন। এখানে অনেক ঋষিই ভর্গদেবের উপাসনা করে পদ্মাসনে উপবিষ্ঠা যোগনিরতা সাবিত্রী মাতার দর্শনলাভ করে ধন্য হয়েছেন। সাবিত্রী মাতার তেজ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্যসদৃশ, সেইজন্য তাঁর নাম সাবিত্রী। প্রাতঃকালে ইনি বালা, বালেন্দুকিরণা, রক্তাম্বর পরিধানা অনুলিপ্তাঙ্গী; মধ্যাহ্নে সর্বাভরণ সম্পন্না, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতযজ্ঞোপবীতধারিণী; প্রদোষকালে ইনি শ্বেতবর্ণ পাণ্ডুর রূপ ধারণ করেন। সাবিত্রীমাতা তাঁর সাধক-সন্তানকে দুর্গকান্তারে মাতার ন্যায় রক্ষা করেন — স্মৃত্বা তু দুর্গকান্তারে মাতৃবৎ পরিরক্ষতি।

১২। **গোণাগোনী তীর্থ** — শিব ও গৌরীর বিবাহস্থল। এখানে দাঁড়িয়ে নর্মদার বিস্তার ও কল্লোল দেখে মন আপনা হতেই স্তব্ধ হয়ে যায়। মোহান্তজী বললেন — ইহাঁ বিবাহ

করনেসে আয়ুষ্মান সন্ততি হোংগী। এইজন্য গুজরাটের অনেক ধনবান শ্রেষ্ঠীরাও তাঁদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে এসে এই তীর্থে বিবাহ দিয়ে থাকেন।

**১৩। অশ্বিনী তীর্থ** — মোহান্তজী আমাদেরকে এই তীর্থে এনে বললেন — স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূর্বে যজ্ঞভাগে কোন অধিকার ছিল না। এখানে তপস্যা করে তাঁরা অন্যান্য প্রধান দেবতাদের মত যজ্ঞভাগের অধিকার লাভ করেছিলেন — তপঃ কৃত্বা সুবিপুলং সঞ্জাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ। বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে 'নাসত্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এঁদের জন্ম বৃত্তান্ত বিচিত্র। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হয়েছিল। সংজ্ঞা সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে নিজের শরীর থেকে নিজের অনুরূপা ছায়া নাম্নী এক সুন্দরী নারীমূর্তিকে স্বামীর কাছে রেখে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে উত্তর-কুরুবর্ষে গিয়ে ভ্রমণ করতে থাকেন। সূর্যদেব তা জানতে পেরে অশ্বরূপে উত্তর-কুরুবর্ষে গিয়ে অশ্বিনীরূপিনী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। সেইসময় সূর্যের উত্তম তেজ সংজ্ঞার নাসাবিবরে প্রবেশ করে। সেই নাসাগত বীজ হতেই সংজ্ঞার গর্ভ সঞ্চার হয় এবং অশ্বিনী ও রেবন্ত নামে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাসাগত বীজ হতে জন্মেছিলেন বলে ঐ যমজ সন্তান নাসত্য নামে প্রসিদ্ধ। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দর্শনলাভ করে বলে গেছেন — অশ্বিনৌ সর্বদেবানাং রূপৈশ্বর্যসমন্বিতৌ, রূপৈশ্চর্যে তাঁরা সুরসমাজে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা শুধু পরম সৌন্দর্যের অধিকারী নন, তাঁরা চিকিৎসাবিদ্যাতেও অদ্বিতীয় পারদর্শী। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসা প্রণালীর কিছু কিছু প্রাচীন মহাযোগীদের কেউ কেউ ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারই সার সংকলন আছে 'চিকিৎসা সারতন্ত্র' নামক একটি গ্রন্থে। বহুদর্শী প্রাচীন কবিরাজগণ ঐ গ্রন্থের মূল চিকিৎসা প্রণালী জানতেন। বৈদ্যরাজ চরক এবং সুশ্রুত ধ্যানযোগে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে চিকিৎসা বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নর্মদাতটমাশ্রিত্য ভৃগুকচ্ছে গতাবুভৌ। পরাংসিদ্ধিমনুপ্রাপ্তৌ তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্।। এই কুমারদ্বয় নর্মদা তীরের এই ভৃগুকচ্ছে আগমন করে সুদুশ্চর তপস্যার দ্বারা পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

এইভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মহিমা বর্ণনা করে মোহান্তজী আমাকে লক্ষ্য করে বললেন — বাঙালী বাবা! তোমার বাবার কাছে বেদধ্যয়নকালে নিশ্চয়ই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিবরণ বেদে পেয়েছ। তাঁদের সম্বন্ধে দু'একটি বেদমন্ত্র আমরা এখানে উচ্চারণ করতে পারলে ভাল হত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্বন্ধে কোন মন্ত্র তোমার মনে আছে কি ? আমারই ভুল হয়েছে, আসার সময় তোমাকে ঋগ্বেদে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বললেই হত। আমার পরম গুরুদেব পূজনীয় মহাত্মা কমলভারতীজী এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতে পেরেছিলেন। তাই এই তীর্থ আমার কাছে বিশেষভাবে আদরনীয়।

আমি তাঁকে বললাম — বেদে বহুবার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত তৃতীয় সূক্তের বারটি মন্ত্র অশ্বিন সূক্ত নামেই অভিহিত। তার মধ্যে প্রথম তিনটি মন্ত্রে সরাসরি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম আছে, তাঁরা যে তপস্যা করে যজ্ঞভাগী হয়েছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। ঐ মন্ত্র তিনটিতে তাঁদেরকে যজ্ঞভাগী দেবতারূপেই আবাহন করা হয়েছে। ঐ সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্রই কেবল আমার মুখস্থ আছে। সেই তিনটি একে একে শোনাচ্ছি। তদ্‌যথা —

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী। পুরুভুজা চনস্যতম্।। ১
অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া। ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ।। ২
দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ। আয়াতং রুদ্রবর্তনী।। ৩

এই মন্ত্রগুলির দেবতা অশ্বিদ্বয়। দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র পুত্র ঋষি মধুচ্ছন্দা। প্রথম মন্ত্রটির অর্থ — হে ক্ষিপ্রপাণি, শুভকর্মপালক, বিস্তীর্ণভুজবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আপানারা এই যজ্ঞ নিস্পাদক হবিঃস্বরূপ অন্ন গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ — হে আশ্চর্য কর্মশীল নেতৃস্থানীয় বীর অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের অপ্রতিহত গতি, আপনারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ — হে রিপুনাশকারী, সত্যস্বরূপ, শত্রুদলনকারী, বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয়! কুশের উপর সুস্বাদু সোম সুসংস্কৃত করে স্থাপন করা হয়েছে। আপনারা আগমন করুন।

এইভাবে বেদমুখে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ মনন করে আমরা সকলেই তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে উঠে পড়বার উপক্রম করছি, এমন সময় দূর থেকে গান ভেসে এল —

মেরে আখনকে দৌতারে
রেবা শিবম্, শিবম্ রেবা
ইয়হ দৌ, রূপ উজারে।

কণ্ঠস্বর শুনেই রতনভারতীজী বলে উঠলেন, ইয়ে ত উহ্ 'ভক্ষণসুর' সাধুকা গানা হৈ। উহ্ ক্যায়সে ইধর চালা আয়া! আমরা সবাই এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম, কাউকে দেখতে পেলাম না। একটু পরেই দেখলাম, একটি বাড়ীর আড়াল থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। গান গাইতে গাইতেই তিনি আসছেন। তাঁর পেছনে পেছনে একটি লোক একটি ঝুড়িতে কতকগুলি নারকেল মাথায় করে বয়ে আনছেন। আমাদের কাছে পৌঁছেই তিনি পূর্ববৎ হড়বড় করে বলতে লাগলেন — 'আপ্‌কো ভিক্ষাকে লিয়ে যোলাঠো নড়াইল লে আয়া। হর আদমী দো দো করকে পা লিজিয়ে। আপ্ লোগোনে উস্ রোজ ভারভূতি মেঁ মুঝে বহুৎ খিলায়া। শ' সালমে হম্ এক দফে পা লেতে হৈ। আভি শ' সাল ইসীমে বীত জায়েগা। ঔর খানেকে কোঈ জরুরত নেহি হ্যায়। হম্‌নে আপলোগোঁকা উপর বহোৎ বহোৎ খুঁশ হুঁ।' এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলেই তিনিই তাঁর সঙ্গী লোকটিকে ইঙ্গিত করলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাঁটারী দিয়ে নারকেল ভাঙতে সুরু করলেন। সেই কঙ্কালসার রুগ্ন সাধু আমাদেরকে বললেন — আপ্‌লোগ কৃপা করকে বৈঠ যাইয়ে। দোনো হাতমেঁ স্বাদিষ্ট নড়াইল পা লিজিয়ে।

লোকটি নারকেল কেটে আমাদের প্রত্যেকের হাতে দিতে লাগলেন, আমরা চিবোতে লাগলাম। সাধু আমাদেরকে শোনাতে লাগলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মহিমা। তিনি বলতে লাগলেন — অশ্বিদ্বয় বৈদিক দেবতা। তোমরা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের তৃতীয় ঋকের তিনটি মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করেছ। সেই চিন্ময় বেদমন্ত্রের স্পন্দন বায়ুমণ্ডলে এখনও স্পন্দিত হচ্ছে , আমি তা শুনতে পাচ্ছি। ঐগুলি ছাড়াও ঋগ্বেদের ১১৬ ও ১১৭ তম সূক্তেও শল্যশাস্ত্রবিদ্ অশ্বিনীকুমারদের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১১৬ সূক্তের ১৫ নম্বর মন্ত্রে সায়নাচার্যকৃত ব্যাখ্যায় প্রকাশ — রাজা খেলের স্ত্রী বিশপ্‌লার

একটি পা কোন কারণে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছল। রাজা খেলের পুরোহিত ছিলেন অগস্ত্য। তিনি খেলের হয়ে অশ্বিদ্বয়কে আবাহন করতেই, যে রাত্রিতে বিশ্‌পলার কাটা পায়ে লৌহজঙ্ঘা পরিয়ে রাণীর পায়ের অভাব মোচন করে দিয়েছিলেন। ঐ সূক্তেই পাওয়া যায়, রাজা ঋজ্রাশ্বের পিতা কর্মফলে অন্ধ হয়েছিলেন; অশ্বিনীকুমাররা তাঁর অন্ধতা দূর করে পুনরায় তাঁকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

১১৭ তম সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে পাবে, কক্ষিবানের দুহিতা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠ রোগাক্রান্তা হয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর বিবাহ হচ্ছিল না। অশ্বিদ্বয় তাঁকে রোগমুক্ত করায় তবেই তাঁর বিবাহ সম্ভব হয়েছিল।

১১৮ সূক্তে জানতে পারি যে, অশ্বিদ্বয় কণ্বমুনির অন্ধত্ব দূর করেন (৬ষ্ঠ ঋক); নিষাদ-পুত্র বধির হয়েছিলেন, অশ্বিদ্বয়ের আনুকূল্যেই তিনি শ্রবনশক্তি ফিরে পান। বধ্রিমতীর স্বামী নপুংসক ছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁকে রোগমুক্ত করেন। ঐ ১ম মণ্ডলেরই ১১৬ তম সূক্ত হতে ১২০ তম সূক্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যে স্তব আছে, তা থেকেই তাঁরা যে লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন শারীরবিজ্ঞানবিৎ, তা সহজেই বুঝা যায়। কেবল চিকিৎসা বিদ্যাবিশারদ বলে নয়, সকল রকমের আধিব্যাধি ছাড়াও সাংসারিক অন্যান্য বিপদ-আপদেও তাঁরা আর্ত মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ১ম মণ্ডলের সপ্তদশ অনুবাকে পাই , তাঁরা তুগ্র রাজার পুত্র ভুজ্যকে পোতমগ্ন অবস্থায় সমুদ্রে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। চ্যবণ ঋষির স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে জরামুক্ত করে পুর্ণযৌবন দান করেছিলেন; জাহুষ রাজা সকল দিক দিয়ে শত্রুবেষ্টিত হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করে কাঁদতে থাকলে তাঁরা আবির্ভূত হয়ে রাত্রিযোগে রাজাকে সুগম্য পথ দিয়ে বার করে নিয়ে গেছলেন; ঋচৎকের পুত্র শর নামক স্তোতার পানের জন্য কূপের নিম্নদেশ হতে জল উঁচুতে উৎসারিত করে দিয়েছিলেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩৪সূক্ত পড়ে দেখবে, সেখানে শুধু দেব-বৈদ্য হিসাবে নয়, তাঁদের অন্যান্য অনেক গুণেরেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রার্থনা করা হয়েছে 'হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করুন, পাপরাশি ধৌত করুন, আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন, সবরকম বিপদে সহায় হয়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করুন।' অশ্বিদ্বয় পরম কারুণিক দেবতা জেনেই ঋষিরা ঐসব প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন।

এই পর্যন্ত বলেই রহস্যময় সাধু দু তিন মিনিট চুপ করে বসে রইলেন। ইতিমধ্যে আমাদের নারকেল-ভোজন শেষ হয়ে গেছল। আমরা হাত ধুয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। সহসা তিনি চোখে খুলেই তাঁর সঙ্গী লোকটিকে বললেন — 'কিরে ব্যাটা! তোর দু তিন সের ওজনের কোষবৃদ্ধি (হাইড্রোসিল) ছিল, তা এখন কমেছে কি না? তোর মহাভাগ্য যে, তুই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মহিমা শুনতে পেলি এই তীর্থে বসে। এখন ভাগ্‌ এখান থেকে। রোজ এই তীর্থে এসে প্রণাম করে যাবি।' তাঁর ধমক খেয়ে লোকটি চলে গেল। আমাদের প্রত্যেকেরই তখন মনে পড়ল, লোকটি এখানে যখন আসছিল, তখন তার লিঙ্গদেশের কাছে বড় একটা পুঁটলীর মত কি যেন দেখছিলাম বটে ? কিন্তু তখন অপ্রত্যাশিতভাবে এই সাধুকে এখানে দেখতে পেয়ে আমরা অবাক হয়ে তাঁকেই দেখছিলাম, লোকটির দিকে আমাদের তেমন দৃষ্টি ছিল না। যখন কাছে বসে নারকেল ভাঙছিল তখনই তার দেহের ঐ অস্বাভাবিক বিকার এবং

কোষের বৃদ্ধি আমাদের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। এখন কিন্তু লোকটির দেহে সেই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আমাদের চোখে পড়ল না।

লোকটি চলে যেতেই সাধু আমাদেরকে বললেন — তোমাদের কারও শরীরে যদি কোন মারাত্মক স্থায়ী ব্যাধি থেকে থাকে, তবে এখানে এসে একবেলা অশ্বিন সূক্ত পাঠ করলেই অশ্বিদ্বয়ের সদ্য ফলপ্রদ করুণা বুঝতে পারবে। সূর্যদেবের অশ্বরূপ ধারণ কালে এঁদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে এঁরা অশ্বিদ্বয় নামে পরিচিত। দস্র, নাসত্য বিশ্বেদেবা প্রভৃতি এঁদের অপর নাম। নিরুক্তকার যাস্কের মতে, অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলোক ও অন্ধকার বিজড়িত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়।

তাঁর কথা শেষ করেই তিনি চোখ বন্ধ করলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম — ঊষার পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি ঐ ভাবে যমজদেব বলে উপাসিত হলেন, তবে তাঁদের অশ্বি নাম দেওয়া হল কেন?

উত্তরে সাধু তাঁর চোখ দুটিকে ঈষৎ উন্মীলিত করে বললেন — ওটি একটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, ঊষার আলোকও আকাশে ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোকে বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সূর্য ও ঊষাকে অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কালক্রমে লোকে সেই বৈদিক উপমা ও তার অন্তর্হিত অর্থ ভুলে গেল এবং একটি উপাখ্যান সৃষ্টি হল যে, সূর্য ও ঊষা অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করেছিলেন এবং অশ্বিদ্বয় তাঁদেরই পুত্র। এইভাবে বেদের অশ্বিদ্বয় (অর্থাৎ আলোক ও ছায়াযুক্ত ঊষার পূর্বসময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হয়ে গেলেন।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে, মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে 'দস্রা' এবং 'নাসত্যা', এই দুটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি, দস্রা শব্দের অর্থ শত্রুক্ষয়কারকৌ, রোগনাশকৌ বা অর্থাৎ শব্দটি দ্বিবচনান্ত। নাসত্যা শব্দের অর্থ অসত্যরহিতৌ, সৎস্বরূপৌ বা। এটিও দ্বিবচনান্ত। এইসকল দ্বিবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ দেখে মনে সংশয় জাগে, পরমেশ্বর যদি এক এবং অভিন্নই হলেন, তবে (অশ্বিদ্বয়)'দ্বয়' বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা হল কেন? আর যমজ রূপেই বা তাঁকে কল্পনা করার সার্থকতা কি ? এতে একমেবাদ্বিতীয়ম্, এই মন্ত্রের সার্থকতা ক্ষুন্ন হয় না কি ?

— আপ্‌নে আচ্ছা হি প্রশ্ন কিয়া। লেকিন্, তোমার প্রশ্নের উত্তরে, আমার বলতে ইচ্ছা হয় — ভগবানের যে বিভূতি ব্যক্ত করবার জন্য যে নাম সংজ্ঞার প্রয়োজন, 'দ্বয়' শব্দের প্রয়োগে একেশ্বরবাদ ক্ষুন্ন হচ্ছে না, বরং তার সার্থকতাই সংসাধিত হচ্ছে। ঋকের ভাষ্যে এবং পুরাণের কাহিনীতে অশ্বিদ্বয়কে বৈদ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'বৈদ্য' বললে দুটি ভাব মনে আসে। যিনি দেহে চিকিৎসা করেন, যিনি রোগের চিকিৎসা করেন অর্থাৎ যিনি দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক তিনি একপ্রকারের বৈদ্য; আর যিনি মানসিক ব্যাধির নিরাশ করেন, পাপ কলুষ চিন্তা দূর করে দেন, তিনি আর এক প্রকারের বৈদ্য। কেবল দেহের ব্যাধি দূর হলেই প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ হয়েছে বলে মনে করা যায় না। পরন্তু যাঁর দেহের ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ব্যাধিও দূর হয়েছে, তাঁকেই প্রকৃত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যায়। 'অশ্বিদ্বয়' এই

নামটিতে সেই দুইভাবের — সেই দ্বিবিধ ব্যাধির শান্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি দেহের ব্যাধি নাশ করেন; আবার তিনি সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করে অন্তরে শান্তিদান করেন। এই দুই ভাবে দুই দিকেই তাঁর দুই শক্তি ক্রিয়াশীল। সেই জন্যই 'দ্বয়' বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা হয়েছে। দ্বিবচনান্ত শব্দের প্রয়োগের সার্থকতাও দুই ব্যাধির সম্বন্ধ-সূত্রে উপলব্ধ হয়। দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি — 'এই দুই এর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একের বিনাশে অন্যটি দূর হয় না। অতএব তোমার উল্লেখিত সূক্তে বলা হয়েছে — আমার দেহ জরা, ব্যাধি মৃত্যুর অধীন হয়ে জর্জরিত। আবার অন্তরও পাপ রিপুগণের জ্বালায় বিষম ব্যাধিগ্রস্ত। একই বেদনা দুইভাবে প্রকাশমান। একই তুমি দুভাবে দুদিক দিয়ে দু'রকম ব্যাধির শান্তি বিধান কর।' অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির এটাই মূল তাৎপর্য।

কথা শেষ করে সাধু পুনরায় আমাদেরকে বললেন — "আবার বলছি, তোমাদের কারও যদি কোন গুপ্ত বা প্রকাশ্য ব্যাধি থাকে, তাহলে আগামীকাল সকালে বৃষখাতে স্নান তর্পণ করে এসে এখানে অশ্বিদ্বয়কে যে কোন একটি ঋক্ মন্ত্রে প্রার্থনা জানাবে। আমার সঙ্গী লোকটির কোষবৃদ্ধি (হাইড্রোসিল) যেমনভাবে সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য হল, সেইভাবেই সেই রোগ তৎক্ষণাৎ নির্মূল হয়ে যাবে।'

তিনি এইকথা বার বার বলতে থাকায় আর সবাইকে নিরুত্তর দেখে শেষ পর্যন্ত আমিই তাঁকে হাতজোড় করে বললাম — আমরা পরিক্রমাবাসী। আমাদের আধি-ব্যাধি জীবন মরণ মা নর্মদার হাতে। যা করার তিনিই করবেন। তাঁকেই আমরা সতত স্মরণ মনন করে চলেছি। আমাদের রোগমুক্তি কামনায় আর কোন পৃথক অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা নাই।

— জিতা রহো বেটা, জিতা রহো। আভি হম্ চল পড়ে। এই বলে তিনি পূর্ববৎ 'মেরে আখন কে দৌতারে' গানটি গাইতে গাইতে দ্রুত অন্তর্হিত হলেন।

আমরা স্তব্ধ হয়ে দুতিন মিনিট তাঁর চলার পথের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। মোহান্তজী বললেন — মহাত্মাকে দণ্ডবৎ করারও সময় পেলাম না। মতীন্দ্রজী মন্তব্য করলেন — রহস্যময় মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। কথা বলার সময় চোখ দুটোকে অর্ধনিমীলিত করে মিজ্‌মিজ্ করতে করতে কেমন অদ্ভুত উপায়ে কথা বলেন, লক্ষ্য করেছেন কি? কঙ্কালসার মানুষটা যখন কথা বলেন তখন তাঁর তেজোপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হতে হয়। মতীন্দ্রজীর কথা শুনে আমার মনে পড়ল, ওঁকারেশ্বরের মহাত্মা আমার বরেণ্য প্রিয়-পরম প্রলয়দাসজীর স্মৃতি। চকিতের জন্য তাঁর সেই অর্ধনিমীলিত চোখ দুটি মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে উঠল। কিন্তু নিজেই বিচার করলাম — তা কি করে সম্ভব? তাঁর সঙ্গে কেবল চোখ দুটি ছাড়া দেহের আর কোন অংশেরই ত সাদৃশ্য নাই!

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই আমার অশ্বিনী তীর্থ হতে কিছু দূরেই দারুকেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছলাম। মতীন্দ্রজীর ঘড়িতে তখন বেলা ৩টা বেজেছে।

**১৪। দারুকেশ্বর তীর্থ** — এখানে একটি ছোট মন্দিরে একটি ছোট কাঠের তৈরী রথে একটি মনুষ্যমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। পাশেই একটি শিবলিঙ্গ। মোহান্তজী জানালেন — শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক যদুবংশ ধ্বংস হলে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানের পর এখানে এসে তপস্যা করে মুক্তিলাভ করেছিলেন। তিনি ছাড়াও আরও অনেক মহাত্মার তপস্যাস্থল এটি।

মন্দিরের সামনেই একটি বিশাল বটগাছ। বর্ষার সময় নর্মদাতে প্লাবন এলে বটগ্র মূলে এসে সেই জল যে ধাক্কা মারে তার চিহ্ন রয়েছে বটগাছের মোটা মোটা ঝুরিতে

**১৫। সরস্বতী তীর্থ** — এখানে একটি শ্বেতবর্ণের সুন্দর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিআছেন। মোহান্তজী বললেন — আমি যখন গুরুদেবের সঙ্গে জীবনে সর্বপ্রথম পরিত্র করতে আসি, তখন তিনি এখানে বসেই আমাকে দুটি বেদমন্ত্র মুখস্থ করিয়েছিলেন। সেইট মন্ত্রেই এখানে মা সরস্বতীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছি। তোমরাও আমার সঙ্গে মন্ত্রপাঠর —

১। পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।

(ঋ/৩/১০)

২। চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং। যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥

(ঋ/৩/১১)

এই বেদমন্ত্র দুটির তাৎপর্য হল — সরস্বতী দেবী মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নি করেন, তিনি যজ্ঞশালিনী এবং অন্নদাত্রী। এই জ্যোতির্ময়ী দেবী মানুষের হৃদয়ে বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জ্যোতি সঞ্চারিত করে থাকেন। ইনি সুন্দর ও সত্য বাক্যের প্রেরণকর্ত্রী, সুবুদ্ধির উদ্বোধকারিণী; সরস্বতী দেবীই যজ্ঞকে ধারণ করেন।

ব্রহ্মা হতে আরম্ভ করে সমস্ত দেবদেবীই এই প্রাচীনতম সরস্বতী তীর্থের ঘাভগবান শংকরের তপস্যা করে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য এই তীর্থকে াক্ষেত্রও বলা হয়। মা সরস্বতী শুধু লৌকিক বিদ্যারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন, তিনিই সাক্ষাৎ্মবিদ্যা।

সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে আমরা শূলেশ্বর ও শূলেশ্বরী তীর্থে এসে ছোলাম।

**১৬। শূলেশ্বর ও শূলেশ্বরী তীর্থ** — মাণ্ডব্য ঋষি নর্মদার দক্ষিণতটে তাঁর অমে বসে যখন যোগমগ্ন ছিলেন, সেই সময় সেখানকার রাজকন্যার রত্নালঙ্কার অপহৃতয়েছিল। চোরেরা ঋষির কুটীরে রত্নালঙ্কার রেখে পালিয়ে যায়। রাজকর্মচারীরা নিরপরঋষিকে চোর সাব্যস্থ করে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেলে রাজা তাঁকে শূলদণ্ড দেন।ন্তু বার বৎসরের অধিককাল শূলে থেকেও তাঁর মৃত্যু যখন হল না, তখন রাজা তাঁমুক্তিদান করেন। শূলদণ্ড ভোগকালে মাণ্ডব্য ঋষি যোগদৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন যে শূলহস্তূলপাণি তাঁকে অহরহ রক্ষা করছেন এবং তিনি যেন শূলের অগ্রভাগে ছিলেন না। মহাদেবী লশ্বরীর কোলেই বসে ছিলেন। এইজন্য মুক্তিলাভের পরই তিনি উত্তরতটে এসে হৃদয়ের ক্ত এবং কৃতজ্ঞতাবশে এখানে শূলেশ্বর ও শূলেশ্বরী স্থাপন করেছিলেন। এখানকার মনি একটি কৃষ্ণবর্ণ অত্যুজ্বল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে দেখলাম। শিবলিঙ্গের গায়েই একটি ত্রিশূল পোঁতা আছে। তার একটি ত্রিশূলের গোড়ায় একটি সিন্দুর লিপ্ত তামার যন্ত্রাখলাম। আমরা মন্দিরে প্রণাম করে উঠতেই মন্দিরের পুরোহিতজী বললেন — 'মৃত্যুদণ্ডা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র এসে এখানে রাত্রিকালে জপ করলে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে গেছোইরকম অনেক ঘটনা আমরা জানি।'

**১৭। ভৃগেশ্বর তীর্থ** — মহর্ষি ভৃগুর তপস্যা ক্ষেত্র। তিনি যেমন বৃষখাতে স দিব্য সহস্র বৎসর গায়ত্রী সাধনা করেছিলেন, তেমন এখানেও তিনি দীর্ঘকাল ধরে ানুষ্ঠান করেছিলেন। এখানে বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করলে সিদ্ধিপ্রদ হয়।

**১৮। অট্টহাসেশ্বর তীর্থ** — ভৃগেশ্বর মন্দিরে প্রণাম করে মোহান্তজী আমাদেরকে অট্টহাসেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে উপস্থিত করলেন। আমাদেরকে প্রণাম করতে বলে বললেন — একজন ঋষি এখানে তপস্যা করতে করতে পর পর অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত করে খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন। তাঁর গর্ব দেখে মহাদেব অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়েন। ঋষির আত্ম অংহকার লোপ হয়। তাঁর চৈতন্যের উদয় হয়। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে দেবতারা এখানে এই অট্টহাসেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সাধনার পথে অহংকার সবচেয়ে বড় বাধা । অহংকার শূন্য হলে তবেই প্রকৃত সিদ্ধি আসে। এই তীর্থ তারই স্মারক।

**১৯। কণ্ঠেশ্বর তীর্থ** — ব্রহ্মার পুত্র কণ্ঠ এখানে বসে সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হন। সমস্ত শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। মনীষীরা বলেন — আবৃত্তি সর্ববিদ্যানাং বোধাদপি গরীয়সী। বোধের চেয়ে শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করার কৃতিত্ব বা উপকারিতা কিছু কম নয়। যারা কিছুতেই মুখস্থ করতে পারে না, তারা এখানে এসে, পাঠ করলে অধীতব্য বিদ্যা সহজেই মুখস্থ হয়ে যায়। এখানে প্রতিদিনই ছাত্রদের ভীড় হয়। আমরা নিজেরাই দেখতে পেলাম একজন ছাত্র এখানে বসে ব্যাকরণ মুখস্থ করছেন।

**২০। ভাস্কর তীর্থ** — কণ্ঠেশ্বর তীর্থ হতে কিছুটা গিয়েই আমরা ভাস্কর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। এখানকার মন্দিরে ভাস্করেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। মন্দিরে তিনজন সাধু বসে রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করছেন। মোহান্তজী বললেন — 'মহর্ষি ভৃগু এখানে ভাস্কর অর্থাৎ সূর্যের আরাধনা করে সর্বসিদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি নিজের অনুভূত সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে তৎকালীন ঋষি সমাজে ঘোষণা করেছিলেন — যে সূর্য আকাশে দৃশ্যমান, তিনি জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নন, ইনি সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী দেবতা। আলোকোদ্ভাসিত আকাশ এঁর মুখ, সূর্যমণ্ডল এঁর চক্ষু, ইনি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী, বিশ্বভূবনের চর, মর্ত্যজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী। সপ্তাশ্ব যোজিত একচক্র রথে ইনি বিশ্ব পর্যটন করেন। ভাস্কর মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত বা জাগ্রত করে থাকেন। স্থাবর ও জঙ্গম, সমস্ত পদার্থেরই ইনি প্রাণস্বরূপ।'এখানে মোহান্তজী আমাকে হুকুম করলেন — যে কোন একটি বেদমন্ত্রে সূর্যের বন্দনা করতে। আমি নতজানু হয়ে ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত ২২ সূক্তের পাঁচ নম্বর মন্ত্রটি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করলাম। আমার সঙ্গে সকলেই কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন — ওঁ হিরণ্যপাণিমূর্তয়ে সবিতারম্ উপহ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ওঁ।। অর্থাৎ হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমরা রক্ষনার্থে আবাহন জানাচ্ছি। তিনি যজমানকে প্রাপ্য পদ জানিয়ে দিয়ে থাকেন।

মন্ত্রোচ্চারণের পর আমরা সকলে প্রণাম করলাম। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম কিরণজালের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে উঠতেই সেই তিনজন সাধুর মধ্যে একজন মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলেন — আপনারা কাকে প্রণাম করলেন? সবিতাকে না ভাস্করকে ? মোহান্তজী হাসিমুখে তাঁকে জবাব দিলেন — ভাস্কর এবং ভাস্করেশ্বর উভয়কেই প্রণাম করলাম। 'সবিতাকে না ভাস্করকে?' আপনার এই বিচিত্র প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি ? ভাস্কর এবং সবিতার মধ্যে তফাৎ আছে নাকি ? যিনিই ভাস্কর, তিনিই ত সবিতা।

— মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। তবে নিরুক্তাকার যাস্কের মতে, আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেইটি সবিতার কাল। সায়নাচার্যও বলেছেন — সূর্যের

উদয়ের পূর্বে যে মূর্তিই তাই সবিতা আর উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি তিনিই সূর্য বা জ্যোতির্ময় ভাস্কর দেবতা। কাজেই আপনাদের উচ্চারিত বেদমন্ত্রে যে 'সবিতারম্ উপহ্বয়ে' বললেন, তাতে সবিতাকে আবাহন জানানো হল না, আবার ভাস্কর মূর্তিও হল না। যদি যাস্ক ও সায়ন এই দুই বরেণ্য আচার্যকে মানতে হয়, তাহলে এই ভাস্কর তীর্থে যে মন্ত্রে পূজা ও আবাহন করার রীতি, আমি তা শোনাচ্ছি। এই বলে তিনি আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন — ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিস্কৃদসি সূর্য! বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ওঁ॥ এই মন্ত্রের অর্থ — হে সূর্য! তুমি মহৎ পথে ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ, তুমি সমস্ত দীপ্যমান অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করছ। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা কণ্বের পুত্র প্রষ্কণ্ব ঋষি। দেবতা সূর্য। (ঋ ১ম/সূ ৫০)।

আমরা সেই সাধুকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে মিনিট তিনেক হাঁটার পরেই প্রভাতীর্থে এসে পৌঁছালাম।

২১। **প্রভাতীর্থ** — প্রভাতীর্থে যে পুরোহিতজী ছিলেন, তিনি আমাদেরকে জানালেন — য়হাঁ সূর্য কী প্রভা নে তপস্যা কী। য়হা স্নানদান ধর্মাচারণ সে চক্ষুরোগ নষ্ট হোতে হৈঁ। বহুৎ চক্ষুরোগী ইধর আকর জপ করতা হৈ, ফল ভি পাতেঁ হৈ।

আমরা এখানে তীর্থজল মাথায় ছিটিয়ে প্রণামান্তে হংসতীর্থের পথে হাঁটতে লাগলাম।

২২। **হংসতীর্থ** — সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাহন হংস। সেই হংস এই ভৃগুতীর্থে তপস্যা করে ব্রহ্মার বাহন হওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন — যত্র হংসস্তপস্তপ্তা ব্রহ্মাঃ বাহনতাং গতঃ॥ পুরাণে হংসকে ব্রহ্মার বাহনরূপে চিত্রিত করা হলেও হংস শব্দের যৌগিক অর্থ পরমজ্ঞান। পরমজ্ঞানকেই আশ্রয় করেই স্রষ্টা এই বিশাল ও জটিল সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করেছিলেন।

২৩। **দেবতীর্থ** — আমরা যখন দেবতীর্থে এসে পৌঁছালাম, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেছে। এই পথে লোক চলাচলের অভাব নাই। পথও ভাল। দেবতীর্থে একটি গ্যাসের বাতি জ্বলছে। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে মোহান্তজী বললেন — পূর্বেও আমি তোমাদেরকে এক দেবতীর্থের কথা বলেছি। শ্রীমতী লক্ষ্মীর বিবাহকালে সমস্ত দেবতারা একত্রিত হয়ে সেই তীর্থ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এখন যে দেবতীর্থে পৌঁছেছি, এই তীর্থ ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ভগবান বিষ্ণু ধ্যানবলে সমস্ত তীর্থকে আকর্ষণ করে এখানে এনেছিলেন। কাজেই উভয় তীর্থের নাম এক হলেও গুণ ও মাহাত্ম্যের তফাৎ আছে। মন্দিরের পুরোহিতজী সন্ধ্যারতির জন্য পঞ্চপ্রদীপ সাজাচ্ছিলেন, তিনি মোহান্তজীর কথার জের টেনে বললেন — এই তীর্থের মনন যোগ্য উপদেশ হল মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের মতে —

সর্বো বিষ্ণুসমাসো হি ভাবাভাবৌ চ তন্ময়ৌ।
সদসৎ সর্বমীশোহসৌ মহাদেবঃ পরংপদম্॥

(রেবাখণ্ডম্ ১৯৩ অধ্যায়)

অর্থাৎ সকলেই বিষ্ণুসম এবং সকলই বিষ্ণুময়, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন ভাবাভাব নাই ; ইনি সৎ ও অসৎ ভাবাত্মক পরমপদ মহাদেব। এই কথা বলেই পুরোহিতজী আরতি করার জন্য মন্দিরে ঢুকলেন। আমরা মোহান্তজীর নির্দেশে মন্দিরে সন্ধ্যা করতে বসলাম। আমাদের সন্ধ্যা যখন শেষ হল, তখন রাত্রি ৮টা বেজেছে।প্রণাম সেরে মোহান্তজী বললেন — এবারে

আমাদের আস্তানায় ফেরা যাক্। পুরোহিতজীর সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত রাস্তার হদিস্ জেনে নিয়ে মোহান্তজী বড় রাস্তা ধরে গ্যাসের টিমটিমে আলোতে আমাদেরকে জগন্নাথজীর বাড়ীতে এনে উপস্থিত করলেন। ভক্ত দম্পতি অধীর আগ্রহে শীতের মধ্যেও বাড়ীর ফাটকে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের 'হর নর্মদে' ধ্বনি শুনে দুজনেই নতজানু হয়ে আবাহন জানালেন। উভয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মোহান্তজীকে বললেন — গুরুজী আজ সারাদিন নিশ্চয়ই আপনারা আহার করেন নি। জগন্নাথজীর ধর্মপত্নীর চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। মোহান্তজী তাঁকে আদর করে বললেন — মায়ী! তুমি অবুঝের মত এই রকম করো না। তোমার শুক্‌নো মুখ চোখ দেখে বুঝছি তুমি বোধহয় আজ অন্নজল গ্রহণ কর নি। জগন্নাথজী বললেন — গুরুজী! আপনি ঠিকই ধরেছেন। উনি আজ কিছুই খান নি। আপনি জানলেন কি করে?

— গুরু হতে হলে ওসব জানতে হয়। চল চল উপরে বসেআগে খাবে চল!

তাঁদের সঙ্গে আমরাও দোতলায় উঠে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম, মোহান্তজী ভক্ত দম্পতিকে বলছেন — তোমদের প্রস্তাব মত বৃষখাতে স্নান তর্পণাদি সেরে এসে এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করে আমরা বাকী তীর্থগুলি দর্শন করতে পারি, কিন্তু তা তো নিয়ম নয়। আমাদের এই পরিক্রমা সখের ভ্রমণকারীদের মত নিত্যনূতন জায়গা দেখে বেড়ানো নয়, প্রত্যেক তীর্থে গিয়ে ভক্তিসহকারে স্মরণ মনন করতে হয়, তীর্থপতি মহাদেব এবং মা নর্মদার শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়তে হয়।সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে কত দেবতা ও ঋষি এইসব তীর্থে কঠোর তপস্যা করে গেছেন। আমরা কলির জীব। তাদৃশ ভক্তি ও সাধন বল আমাদের নাই ; সম্বল মাত্র প্রণাম। ভুরি ভোজন করে প্রণাম করার সাহস আমার নাই। তাছাড়া আমার সঙ্গে যে কয়জন পরিক্রমাবাসী আছেন, তাঁদের পরিক্রমাকে সার্থক করতে হলে কিছু আচার বিচার, নিয়ম নিষ্ঠা আমাকে মানতেই হবে। উত্তরতটে জনমানবহীন দুস্তর অরণ্যপথে যিনি এতকাল আমাদের মুখে অন্ন জুগিয়ে আসছেন, সেই পরম করুণাময়ী মা নর্মদাই আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। অমাদের খাওয়া নিয়ে বৃথা চিন্তা করো না। আজও ত মা নর্মদা এক সাধুর হাত দিয়ে আমাদেরকে আহার করিয়েছেন। কাল আশা করছি বাকী ২৩টি তীর্থের পরিক্রমা শেষ করতে পারব।

তাঁদের আর কোন কথা শুনতে পেলাম না, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরেই ঘুম ভাঙল। আজ ১৫ই কার্তিক, সোমবার। শুক্লা পঞ্চমী তিথি। সকাল সাতটা নাগাদ মোহান্তজী আমাদেরকে বৃষখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে সকলে স্নান তর্পণাদি সেরে আমরা 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে তটরেখা ধরে প্রায় দু মাইল হেঁটে গিয়ে ভারোচ শহরের উপকণ্ঠে চৌলতীর্থে এসে পৌঁছালাম।

**২৪। চৌলতীর্থ** — মোহান্তজী বললেন — লক্ষ্মীনারায়ণকে বিবাহকে অনন্তর জলক্রীড়া করতে হুয়ে চুল্লী ফেঁকী। দেবো নে ইসে তীর্থ বনায়া। এখানে প্রণাম করিয়েই তিনি মুল শ্রীপতি তীর্থে এনে উপস্থিত করলেন।

**২৫। মূল শ্রীপতি তীর্থ** — এখানে সমুদ্রতটে একটি ছোট পহাড় দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম — এই সুন্দরী বনস্থলী কি বিন্ধ্যপর্বতের অংশ? মোহান্তজী বললেন — এই

পাহাড়ের নাম নারায়ণ গিরি; সামনের মন্দিরটি ও তৎসংলগ্ন স্থানের নাম মূল শ্রীপতি তীর্থ। এখানে মহর্ষি ভৃগুর কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নারায়ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য উগ্র তপস্যা করেছিলেন। তোমরা পূর্বেই শুনেছ এইস্থানের নাম ভৃগুকচ্ছ হবার পূর্বে শ্রীক্ষেত্র বা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মীদেবী যখন তপস্যা করেন, তখন তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এক এক সময়ে পালা করে শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণ পূর্বক বিষ্ণু সেজে লক্ষ্মীদেবীর নিকট গিয়ে আবির্ভূত হতে লাগলেন। লক্ষ্মী অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দাবী করলেন — আপনারা সত্যই যদি নারায়ণ হন, তাহলে আমাকে অবিলম্বে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করুন — বিশ্বরূপং বৈষ্ণবং যত্তদর্শয়ত মা চিরং। বলা বাহুল্য মায়াবী দেবতাগণ কেউ বিশ্বরূপ দর্শন করাতে পারলেন না। লজ্জিত হয়ে হয়ে তাঁরা স্বয়ং নারায়ণের কাছে গিয়ে বললেন — প্রভু, আপনাকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য দেবী ভার্গবী উগ্রতম তপস্যা করেছেন, আমরা বিষ্ণু সেজে তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনে অক্ষম হয়ে লজ্জিত হয়ে ফিরে এসেছি। আপনি ভার্গবী রমার প্রাণরক্ষার জন্য তাঁকে অবিলম্বে দর্শন দিন। দেবতাদের প্রার্থনায় নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর নিকট শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। লক্ষ্মী তাঁকে প্রণাম করে বললেন — প্রভু, সত্য কথা বলতে কি, আমার কোন শ্রদ্ধা হচ্ছে না, কারণ এখানে বহু মায়াচারী যক্ষ রক্ষ দেবতা বিচরণ করে থাকেন। ইতিপূর্বেই কতিপয় চতুর্ভুজ চক্রধারী বিষ্ণুরূপ আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু বিশ্বরূপ প্রদর্শনে অসমর্থ হয়ে তাঁরা লজ্জিত হয়ে ফিরে গেছেন। ভগবান বিষ্ণু তখন লক্ষ্মীদেবীর সামনে তাঁর বিশ্বরূপ প্রকট করলেন এবং বললেন — তুমি বারবার আমাকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেছ, সুতরাং এইস্থানে আমার নাম হবে নারায়ণ গিরি। নারায়ণের স্মরণে কোটি জন্মের দুরিত দূর হয় আর গিরণ অর্থাৎ বহি প্রকটন করে বলে গিরি শব্দ ধ্বনিত হয় — যস্মাৎ গিরতি তস্মাৎ চ গিরিরিত্যেব শব্দিতম্। আমি তোমার তপস্যায় খুবই তুষ্ট হয়েছি, তোমার আরও যদি কিছু অভীষ্ট থাকে নিঃসঙ্কোচে প্রার্থনা কর। আনন্দে গদগদ হয়ে লক্ষ্মী বললেন — হে বাঞ্ছাকল্পতরু! আপনি আমার প্রিয়, এক্ষণে আমি যাতে আপনার প্রিয়া হতে পারি, তাই দয়া করে করুন — প্রিয়োহ্যসি প্রিয়াহং তে যথা স্যাং তৎতথা কুরু। হে দেব। গৃহ ধর্মার্থ কামের হেতু, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। অতএব আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে পবিত্র গৃহাশ্রমে নিয়োগ করুন।

লক্ষ্মী নারায়ণের এই কথোপকথন জানতে পেরে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ বৃযখাতে গিয়ে মহর্ষি ভৃগুকে অনুরোধ করলেন তাঁর কন্যা লক্ষ্মীকে নারায়ণের হাতে সমর্পণ করতে। মহর্ষি ভৃগু দেবতাদের আন্তরিক ইচ্ছা অবগত হয়ে লক্ষ্মীকে নারায়ণের করকমলে সমর্পণ করলেন শাস্ত্রবিধি অনুসারে।

মোহান্তজীর কথা শেষ হতে না হতেই মন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে বেরিয়ে এসেই হাসতে হাসতে তাঁকে বললেন — আপনি লক্ষ্মী-নারায়ণের পুণ্য বিবাহ কথা সুন্দরভাবেই বর্ণনা করেছেন, প্রতি তীর্থেই সেই তীর্থপতির প্রসঙ্গ এইভাবেই স্মরণ মনন করতে হয়। আমি এই তীর্থের পুরোহিত হিসাবে শুধু এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, লক্ষ্মী-নারায়ণের বিবাহে স্বয়ং ধর্ম সমাহিত হয়ে এই বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন, সসাগরা

ধরিত্রী দেবী এই বিবাহ যজ্ঞের বেদী হয়েছিলেন, আর স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণ করে যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সপ্তর্ষিগণ। মহর্ষি ভৃগুর তপোবলের কথা স্মরণে রেখে সাগরেরা সানন্দে ভৃগুর অভীষ্ট রত্নাদি এনে তাঁদেরকে দক্ষিণা প্রদান করেছিলেন।

এই বলেই তিনি আমাদেরকে লক্ষ্মী নারায়ণকে দর্শন করবার জন্য গর্ভগৃহে নিয়ে গেলেন। আমাদেরকে বললেন — সিংহাসনে লক্ষ্মী-নারায়ণজীর শালগ্রাম-লিঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিন। ইনিই মূল শ্রীপতি। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র নামে অভিহিত আরও দু তিন রকমের নারায়ণ চক্র দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে , যেমন, দ্বারমেকং চতুশ্চক্রং ব্রহ্মাদীনাস্তু দুর্লভম্ — একটি দ্বার কিন্তু ভিতরে চারটে চক্র, তিনটি চক্রবিশিষ্ট লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলা, আবার কোন শিলায় দুটি দ্বার, প্রত্যেকটি দ্বারের মধ্যে বামদিকে একটি এবং ডানদিকে একটি করে চক্র মোট চারচক্র বিশিষ্ট, শ্রীবৎস ও শঙ্খচিহ্ন সমন্বিত বর্তুলাকৃতি লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্রও আমি দর্শন করছি কিন্তু এই মন্দিরে যে মূল শ্রীপতি দর্শন করেছেন, এমনটি সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না। এই শালগ্রামের দেখুন, চারটি মুখ কিন্তু একটি মাত্র চক্র শোভা পাচ্ছে। ঘন শ্যামবর্ণ এবং বর্তুলাকৃতি, শালগ্রামের পিঠে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ চিহ্ন বর্তমান, দ্বারের উপরেই বিন্দুযুক্ত বনমালা, পৃষ্ঠভাগ সমুন্নত হয়ে উঠেছে। এই মূল শ্রীপতিকে দর্শন করলে সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। ঋষি বর্ণিত শাস্ত্রের সমস্ত চিহ্ন এই শিলায় কেমন সুন্দরভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে দেখুন —

> একচক্রশ্চর্তুবক্তো বর্তুলঃ শ্যামবর্ণকঃ।
> ধ্বজবজ্রাঙ্কুশোপেতো মালাযুক্তঃ সবিন্দুকঃ।
> পৃষ্ঠে সমুন্নতঃ স্থূলো লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
> তস্য দর্শনমাত্রেণ হ্যভীষ্টফলমাপ্নুয়াৎ॥

আমরা মূল শ্রীপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজী মোহান্তজীর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বললেন — আপনাদের নিশান দেখে বুঝলাম, আপনারা মহাত্মা কমলভারতীজীর মূলগদী মণ্ডলেশ্বর থেকে আসছেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞ পরম পূজনীয় মহাত্মার দর্শন আমি পাই নি, কিন্তু আমার পিতাজী এবং পিতামহ তাঁর শিষ্য ছিলেন। কাজেই আপনারা বড় আদরের ও সম্মানের পাত্র। আপনারা যদি আরও পাঁচ সাতটি তীর্থ দর্শন করে এখানে এসে নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। পূজা এবং ভোগারতি করতে বোধহয় বেলা দেড়টা বা দুটা বেজে যাবে। এখানে আপনাদের পরম গুরুদেব প্রায় এক বৎসর কাল তপস্যা করেছিলেন। সেই সুবাদে আপনাদেরকে এখানে ভোগগ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি।

মোহান্তজী সম্মতি জানিয়ে আমাদেরকে নিয়ে প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে নারায়ণ তীর্থে উপস্থিত হলেন।

**২৬। নারায়ণ তীর্থ** — এই তীর্থটি ঠিক যেন তপোবন! তীর্থের আশেপাশে চার-পাঁচটি বিশাল বনস্পতি, আমলকী গাছ, তরল বাঁশের ঝাড়, অনাবৃত প্রস্তরময় অংশে সরু বালির আস্তরণ, রামদাঁতনের কাঁটালতা, শূন্যে ঝোলা আরও কিছু লতা, লজ্জাবতী ফুলের মত বনফুল, দুটি চাঁপাগাছ, সব মিলিয়ে যেন কোন চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি যেন! মোহান্তজী

বললেন — মহাভারতের বনপর্বে অর্জুন যিনি পূর্ব জন্মে নর নামক ঋষি ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপী নারায়ণ-ঋষিকে তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যে বিভিন্ন জন্মে যত্রসায়ংগৃহ মুনিরূপে গন্ধমাদন পর্বতে, পুষ্কর তীর্থে, বদরিকাশ্রমে, সরস্বতী নদীতটে, এবং প্রভাস তীর্থ প্রভৃতি স্থানে কি রকম অবস্থায় থেকে কত কত বৎসর ধরে তপস্যা করেছিলেন তার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি এই নারায়ণ তীর্থে নারায়ণ ঋষির তপশ্চরণের কথা বলেন নি। কিন্তু সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন যে নারায়ণ ঋষি এখানেও কঠোর তপস্যা করেছিলেন। আমরা এই তীর্থের রেণু মাথায় ছুঁইয়ে মিনিট দশেক হেঁটে বিশ্বরূপ তীর্থে এসে পৌঁছালাম।

২৭। **বিশ্বরূপ তীর্থ** — বিশাল মন্দির, মন্দিরে প্রবেশ পথেই গর্ভগৃহের সামনে শ্বেতমর্মর মণ্ডিত ভৃগুদেবের মূর্তি। গর্ভগৃহের মধ্যে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। মন্দিরের পুরোহিতজী পূজা করে বেরিয়ে আসছেন। আমরা মহাদেবের মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢেলে সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। গর্ভগৃহের বাইরে আসতেই পুরোহিতজী বললেন — লেওজী, ইয়ে পানজেরি হ্যায়, মহাদেবকী খাস পরসাদী। আভি মুহ্‌মে ডাল দিজিয়ে। মুখ দিয়ে বুঝলাম চিনি মিশ্রিত গুঁড়ো। এরই নাম পানজেরি। আমাদের প্রসাদ দিয়েই পুরোহিতজী বললেন — ভগবান নারায়ণনে ভৃগুজীকো বিশ্বরূপ দিখাকর ইধর জ্ঞান দিয়া। য়হা গীতা পাঠকা মাহাত্ম্য হৈ। তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই মন্দিরের পেছন হতে কে যেন একজন — হল না, হল না পণ্ডিত, তোমার ঠিক বলা হল না' বলেই সামনে এসে আবির্ভূত হলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, রতনভারতীজীর ভাষায় সেই 'ভক্ষণাসুর' সাধু এসে আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। পুরোহিত সহ আমাদের সকলকে মেঝেতে বসবার ইঙ্গিত করেই তিনি পণ্ডিতকে বললেন — এঁরা সবাই পরিক্রমাকারী সাধু, এঁদেরকে সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলে তোমার কর্তব্য শেষ করলে চলবে না। ভৃগুজী এখানে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন শুধু এই কথা বললে এঁরা বুঝবেন, গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহে যেমন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগুকেও বুঝি ভগবান সেই রকম কোন ভোজবাজী দেখিয়েছিলেন। তুমি এঁদেরকে বুঝিয়ে বল ক্ষত্রিয় কুমার অর্জুন দৃষ্ট বিশ্বরূপ দর্শন এবং যজ্ঞসম্ভব ঋষিদৃষ্ট বিশ্বরূপ দর্শনের তফাৎটা কোথায়? তুমি এঁদেরকে জানাও যে, গীতোক্ত বিশ্বরূপে আত্মেতর দৃষ্টিতে অর্জুনের দর্শন কার্য সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু মহর্ষি ভৃগুর বিশ্বানুভূতি তথা ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল আত্মদৃষ্টিতে। অর্জুন দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দেহের মধ্যে — 'পশ্যামি দেবান্ তব দেবদেহে।' তাঁর চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণের দেহ, অর্জুন নতজানু হয়ে বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণের দেহ হতে কিঞ্চিত দূরে, উভয়ের শ্রীমূর্তি কুরুক্ষেত্রের মাটিতে, গীতার দ্বাবিংশ শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ অসুর এবং সিদ্ধগণ বিস্মিত হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন। একবিংশ শ্লোকে বলছেন — 'মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ স্বস্তিবাক্য এবং স্তুতিসহ আপনাকে দর্শন করছেন।' সুতরাং অর্জুন বাক্যেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রায় সমগ্র বিশ্বই বিশ্বরূপী ভগবানকে আত্মেতররূপে এবং নিজেকে অর্জুনের মতই বাইরে রেখেই শ্রীকৃষ্ণের দেহের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন! অর্জুন দৃষ্ট বিশ্বরূপ

তাহলে কি রূপ বিশ্বরূপ? তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনে বাইরে রইল তাঁর দেহ, শ্রীকৃষ্ণের বহিরাবয়ব, সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিশ্বরূপ দেখালেন বা দেখলেন, সেই কুরুক্ষেত্রসহ অন্তরীক্ষস্থিত সিদ্ধগণ সাধ্যগণ এবং মহর্ষিগণ পড়ে রইলেন! এ যে গ্রীক্‌দের 'এটলাসের' সবাই বিশ্বরূপের বাইরে পৃথিবী-ধারণের ন্যায় শ্রী ভগবানের একাংশে বিশ্বধারণ পূর্বক অবস্থিতির বিড়ম্বনা মাত্র!

গীতায় তোমরা পড়েছ, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন — 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্' — হে অর্জুন, তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করছি, তুমি আমার যোগৈশ্বর্য অবলোকন কর। এই বিশ্বরূপ তোমার আগে আর কাউকে দেখাই নি। ভগবানের মুখে এ আবার কিরকম কথা? তিনি শিশুকালেই নাকি খেলার ছলে হাঁ করে তাঁর হাঁ এর মধ্যে মা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, এমনকি অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের দৃশ্যটি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসনের পাশে বসে তাঁর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তাহলে কি ভগবান এখানে মিথ্যাভাষণ করছেন না?

'দিব্যচক্ষু' শব্দটির তাৎপর্য কি? শংকরাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে দিব্যচক্ষু শব্দের ব্যাখ্যা করেন নি। শ্রীধরস্বামী বলেছেন — 'দিব্যং অলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুঃ।' মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন — 'দিব্যম্ অপ্রাকৃতং মম দিব্যরূপ দর্শনক্ষমম্' কিন্তু এই অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষুটি কীদৃশ? দ্বৈতভানং ন যত্রাস্তি তদ্ বৈ জ্ঞানম্ উদাহৃতম্, পরমার্থতঃ যা পরম জ্ঞান তা দ্বৈতবোধহীন, তাঁর সঙ্গে দেহেন্দ্রিয়ের কোন সংযোগের প্রশ্নই আসে না; কারণ তা আত্মজ্ঞানের নামান্তর; 'জ্ঞাতৃজ্ঞেয় জ্ঞানভেদঃ পরমাত্মনি ন বিদ্যতে' পরাত্মজ্ঞানকালে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানভেদ থাকে না, দ্রষ্টা-দৃষ্ট-দর্শনরূপ ত্রিপুটী পিণ্ডীকৃত হয়, তখন 'চিদানন্দস্বরূপত্বাৎ দীপ্যতে স্বয়মেব হি।' সুতরাং জ্ঞানাত্মক চক্ষু কুসুমবৎ বাচাড়ম্বর মাত্র! মধুসূদন সরস্বতীকে আমি চিনতাম, তিনি কাশীর চৌষট্টি ঘাটস্থিত যে দণ্ডীস্বামী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট দণ্ড্যাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তাঁরও সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদনের দেহান্ত হলেও তাঁর অদ্বৈতসিদ্ধি আজও অদ্বৈত বেদান্তের অক্ষয়মণি। এইজন্য তাঁকে আমি বিপুল শ্রদ্ধাও করি। তবুও সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য যে, তাঁর কল্পিত অপ্রাকৃত চক্ষুর অবস্থাও তথৈবচ ! কারণ 'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ংভাতি মায়য়া।' 'যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি, তৎ ইতর ইতরং পশ্যতি' — মায়া বা প্রকৃতি বিকাশসহ জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা রূপ ত্রিপুটীর লয় হয়; যখন দ্বৈতবৎ হয়, তখনই আত্মেতর দর্শন করে। সুতরাং জ্ঞাতার দ্বৈতজ্ঞান এবং দ্রষ্টার দর্শনরূপ কর্মের কারণরূপ চক্ষু অপ্রাকৃত নয়। জ্ঞেয় পদার্থ যার দ্বারা দৃষ্ট হয় সেই চক্ষুলোক অর্থাৎ জ্ঞাতাতে এবং দ্রষ্টাতে প্রাকৃতিক বিধানেই অবস্থিত। অতএব বাপু! তা অলৌকিক নয়।

তোমরা বোধহয় জান, দর্শনরূপ কর্মের কারণরূপ চক্ষু পাঁচ রকমের হয়। যথা — চর্মচক্ষু, মানসচক্ষু, ভাবচক্ষু, বিজ্ঞানচক্ষু এবং বিবেকচক্ষু। চর্মচক্ষু জড়পদার্থ এবং মানসচক্ষু স্মৃতিবিষয় দর্শন করে। বৃত্তিবৈষম্যহেতু ভাবচক্ষু জড়নেত্রে প্রতিভাত কুৎসিৎ পদার্থ সুন্দর এবং সুন্দর পদার্থকে কুৎসিৎ হিসাবে দর্শন করে। আর বিজ্ঞানচক্ষু ও চর্মচক্ষু অলক্ষ্য কিংবা দুর্লক্ষ্য পদার্থ দর্শন করে কিন্তু বিবেকচক্ষু চতুর্বিধ দৃশ্য দর্শনের সকল রকম ভ্রান্তি অতিক্রম করে স্বরূপ দর্শন করে থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রান্ত ক্লান্ত অর্জুন হয়ত কৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন ভাবচক্ষু কিংবা বড়জোর বিজ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে। কিন্তু এই বিশ্বরূপ তীর্থে মহর্ষি ভৃগু সমাহিত চিত্তে বিশ্বাত্মাকে অনুভব করেছিলেন স্বরূপ দৃষ্টিতে, সমাধিজাত প্রজ্ঞাবলে।

এই পর্যন্ত বলে সেই হঠাৎ আবির্ভূত রহস্যময় কঙ্কালসার ক্ষীণকায় সাধু দু'তিন মিনিট চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আবার আপনমনে বলতে লাগলেন — কোন তত্ত্ব খণ্ডন মণ্ডনে আমার রুচি নাই। তবে বিশ্বরূপ শব্দটিতেই পাছে তোমরা মহর্ষি ভৃগুর বিশ্বরূপ দর্শনকে গীতোক্ত অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের সমগোত্রীয় ভেবে কোন ভুল ধারণা করে বস, এইজন্যই আমি কিছুটা বিশ্লেষণ করছি। স্বয়ং বিশ্বপতি বিশ্বরূপ প্রদর্শনে প্রতিশ্রুত হলে, অন্ততঃ সম্যকরূপে বিশ্বদর্শনের আশা আমরা করতে পারি। সেক্ষেত্রে অপ্রমিত বিশ্বের পরিমাণ জ্ঞান, অসংখ্য সূর্য সমন্বিত অগণিত সৌরজগতের সংখ্যা এবং তত্রাবস্থিত জীবগণের স্বরূপাবগতি, গ্রহ নক্ষত্রের গতি নিয়ামক আকর্ষণ-শক্তির তত্ত্ববোধ, অর্থাৎ এক কথায় চিরগুহ্য জগৎ রহস্যের ভেদ জানতে পারব এইটুকু প্রত্যাশা কি অন্যায়? কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান-নেত্রে বিশ্বের যতটুকু প্রতিভাত হয়, সেটুকুও কি অর্জুন দর্শন করতে পেরেছিলেন?

অশেষকৈঃ সৌরজগৎপ্রপঞ্চৈঃ পরস্পরাসঞ্জন ঘূর্ণিতৈশ্চ।
প্রভাসকৈ দর্শিত নামরূপাত্মকং সমগ্রং খলু বিশ্বরূপঃ॥

অর্থাৎ পরস্পর আকর্ষণে বিঘূর্ণিত, পরস্পর আলোকে আলোকিত অনন্ত সৌরজগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকটিত সমগ্র নামরূপাত্মক সমন্বিত বিশ্বরূপ, অর্জুন দর্শন করেছিলেন কি? তোমরা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে এর একমাত্র উত্তর হবে — 'না'।

গীতার একাদশ অধ্যায়ের দশম ও একাদশ শ্লোকে সঞ্জয় বিশ্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন — অনেক বক্ত্র অনেক নেত্র, অনেক দিব্য আভরণান্বিত, অনেক দিব্য আয়ুধধারী, দিব্য মালাশোভিত, দিব্য বস্ত্র পরিহিত, দিব্য গন্ধানুলেপিত, বিশ্বতোমুখ, সর্বাশ্চর্যময়, অদ্ভুতদর্শন, অনন্তরূপ দেবকে অর্জুন দর্শন করেছিলেন। অর্জুন নিজেও বলেছেন — 'অনেক বাহুউদর,' 'বক্ত্রনেত্র', শশিসূর্যনেত্র, বহুবাহুউরুপাদ, বহুউদর বহুদ্রংষ্ট্রা করাল, কিরীটগদাচক্রধারী, সর্বতঃ দীপ্তিমান্ তেজোরাশি স্বরূপ দুর্নিরীক্ষ্য রূপ তাঁর নয়নপথের পথিক হয়েছিল।

তোমরা ভালভাবে চিন্তা করে দেখ, বিশ্বরূপ শব্দের তাৎপর্য কি! এই শব্দের লক্ষ্য কি বিশ্বাভিমানী চেতনসত্তার দেহরূপ বিশ্ব? যদি বিশ্বরূপ শব্দের লক্ষ্য বিশ্বাভিমানী চৈতন্য হয়। তবে তার বক্ত্রনেত্র দংষ্ট্রা উদর বাহু উরু পদাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গ কি সম্ভবপর? যা 'প্রকৃতেঃ পরঃ' তা প্রাকৃত আভরণ, কিরীট মাল্য গন্ধদ্রব্য এবং বস্ত্রাদিতে কি রূপে সজ্জিত হয়? কি ভাবেই বা গদাচক্রাদি আয়ুধ ধারণ করে? ভগবদ্ ভক্তগণ বলেন, শ্রীভগবানের অঙ্গ-প্রতঙ্গ 'চিদ্ঘন', তাঁর বসনভূষণ অস্ত্র-শস্ত্র সকলই নাকি চিন্ময়! এইভাবে চেতনসত্তার চোখ মুখ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি রূপে, এমনকি পুষ্পমাল্য বস্ত্র অলংকারাদিরূপে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি স্বীকার করে নিলে জাগতিক অপরাপর পদার্থ কি অপরাধে অপরাধী? সেগুলিও চিন্ময় কারণ সত্তার বিবর্তন জনিত অভিব্যক্তিরূপে স্বীকৃত হয়? ভগবদ্ভক্তগণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে 'পুরুষ এব ইদং সর্বং সদ্ ভূতং যৎ চ ভব্যম্' এবং প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তর্ অজায়মনো বহুধা বিজায়তে', প্রভৃতি বেদমন্ত্র অবলম্বন পূর্বক জড়ে ব্রহ্মে এবং জীবে ব্রহ্মে অভেদ দর্শন করেন না কেন?

এর একমাত্র কারণ কি এই যে, ভক্তিভারবাহী শ্রান্তজীব আপন বিশ্বাস-পরিখা অতিক্রম করে ততদূর অগ্রসর হয়ে স্বরূপ দর্শনে অক্ষম? একথা আমরা সকলেই জানি, স্বরূপ পদার্থ মাত্রই সসীম, অসীমের রূপ হয় না। বস্ত্রাভরণে সজ্জিত, মস্তক উদর হস্তপদ সমন্বিত দেহ চিন্ময়, মনোময় বা জড় যাই হোক না কেন, তা সব সময়েই সসীম হতে বাধ্য। ইত্যাকার সসীম দেহাভিমানি চৈতন্যের বিশ্বাভিমান-জনিত বিশ্বরূপ অ্যাখ্যা অন্ধের পদ্মলোচন নামের মত উপহাসজনক।

অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনকালে বলেছিলেন —

'নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ!'

অর্থাৎ তিনি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না! কোন দৃশ্য পদার্থের আদি অন্ত মধ্য সকলেই যদি অদৃষ্ট থাকে তাহলে বাস্তবিক পক্ষে তা দেখা হয় কি ? অর্জুন কি এখানে সত্যবাক্য প্রয়োগ করলেন? তিনি দিব্য কিরীটি সুশোভিত, বক্ত্রনেত্রদংষ্ট্রা সমন্বিত মস্তক দর্শন করলেন, মালাসহ গলদেশ এবং বক্ষস্থল দর্শন করলেন, গদাচক্রধৃত হস্ত দর্শন করলেন, বস্ত্রশোভিতকটি এবং ঊরুদেশ দর্শন করলেন, পদযুগল দর্শন করলেন, তাহলে তাঁর দেখার কি বাকী থাকল? কিজন্য তিনি বলেছেন — আদি মধ্য অন্তহীন? কেনই বা বলছেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না?

সারকথা, আমি যা বলতে চাচ্ছি, গীতোক্ত বিশ্বরূপ দর্শন যথার্থ বিশ্বরূপ দর্শন নয়। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হয় নি। তাই ভীত সন্ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত অর্জুনের বিশ্বরূপ বর্ণনায় এত শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্‌বিলাস। তোমার মহর্ষি ভৃগু কর্তৃক এই বিশ্বরূপ তীর্থে বিশ্বরূপ দর্শনের কথা শুনে, যাতে তাঁকে কোনমতেই অর্জুনের সমকক্ষ না ভেবে বস কিংবা উভয়ের বিশ্বরূপ দর্শনকে একই পর্যায়ে না ফেল, এজন্যই এত কথা বললাম। আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ যখন ভূমি থেকে ভূমার ক্ষেত্রে উঠেন, তখন দ্বৈতভ্রান্তি দূরে যায়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় জ্ঞান, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন এই ত্রিপুটীর লয় হয়; ব্যুত্থানের পরেও চিত্তবৃত্তি মানুষকে দেশ কাল পাত্র দেহান্ত বুদ্ধির মধ্যে পরিচ্ছিন্ন করে রাখে, সেই চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য স্বরূপোলব্ধি হওয়ায়, সর্বত্রই দেখতে পান, সেই একই আত্মা জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনরূপে সর্বত্র অভিব্যক্ত। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন কালে তাঁর মুখ দিয়ে স্বরূপোলব্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের তারতম্যে, উপলব্ধ ভূমির তারতম্যানুযায়ী সর্বব্যপক ব্রহ্ম চৈতন্যের বিষয় বেদে বা শ্রুতিতে তিন উপায়ে উপদিষ্ট হয়েছে — কোথাও 'তদাদেশ' বাক্যে, কোথাও 'আত্মাদেশ', কোথাও বা 'অহংকারাদেশ' বাক্যে। 'তৎ ত্বম্ অসি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'— এই মহাবাক্যগুলি 'তদাদেশ' বাক্য; 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' — 'আত্মাদেশ' বাক্য ; আর 'অহং ব্রহ্মাহস্মি — এটি 'অহংকারাদেশ বাক্য। অপরোক্ষানুভূতির পরমভূমিতে যিনি উঠতে পারেন তাঁর উপদেশ বাক্য সর্বদাই 'অহংকারাদেশ' রূপেই উপদিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গীতাতে বলেছেন, 'অহং ওষধীষু বনস্পতিষু', বৈদিক ঋষিরাও ঠিক ঐ সুরেই ঐ ভাবেই বলেছেন — অহং ওষধীষু ভুবনেষু, অহং বিশ্বেষু ভুবনেষু অন্তঃ, 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহং (ঋগ্বেদ) অহং অদ্ধি পিতুস্পরি মেধা মৃতস্য জগ্রহ , অহং সূর্য ইবাজানি' (সামবেদ), 'অহং পরস্তাৎ অহং অবস্তাৎ যদন্তরীক্ষঃ য অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ স অসৌ অহম্' (যজুর্বেদ)।

কৃষ্ণবাক্য, 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ ময়ি সর্বং প্রবর্ততে' আর বৈদিক ঋষি বাক্য 'অহং বিশ্বম্ ভুবনম্ অভ্যভবম্', কি ঠিক একই রূপ নয়?

গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনেক 'অহংকারাদেশ' বাক্য পাই, কারণ তিনি আত্মজ্ঞ ছিলেন, মহর্ষি ভৃগু সমশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যে প্রজ্ঞান আনন্দময় বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে আত্মারূপে দর্শন করে ভৃগুর মত যোগিজন ত্রিতাপমুক্ত হন, অভয়পদ প্রাপ্ত হন, অর্জুনের দিব্যনেত্রে তা প্রতিভাত হয় নি, কারণ তা দ্বৈত দৃষ্টির দৃশ্য নয়। সেইরূপ দর্শন করলে কি অর্জুন ভীতিবিহ্বল চিত্তে 'দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস! বলে কি হাহাকার করতেন?

আবার সাধু প্রায় মিনিট খানিকের জন্য চুপ করে রইলেন চোখ বন্ধ করে। তারপর হঠাৎ রোমাঞ্চিত কলেবরে চোখ খুলে বললেন — বেলা বোধহয় সাড়ে এগারটা বাজতে যায়। আজ ত মূল শ্রীপতি তীর্থে তোমাদের প্রসাদ পাওয়ার কথা! আরও দু তিনটি তীর্থ দর্শন করে বেলা দেড়টার মধ্যে সেখানে পৌঁছাবার অবশ্যই চেষ্টা করবে। সেখানকার পুরোহিতজী সাধারণ পুরোহিত নন, উনি লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপাসিদ্ধ মহাত্মা। মোহান্তজীর চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললেন — তুমি বড় দয়ালু ছেলে, তুমি ঐ পুরোহিতজীকে একটি গিনি দক্ষিণা দিও। এই বলে তিনি মুখ চোখ বিকৃত করে দু তিনটি উদ্গার তুলে বললেন, কণ্ঠায় চুঁয়া ঢেঁকুর উঠছে, তোমরা আমাকে পরশু ভারভূতেশ্বরে খুব কলা নারকেল খাইয়েছ, তাই এখনও হজম হয় নি, আগামী একশ বছর ত আর আমার খাওয়ার সুযোগ নাই। তা নাহলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতাম। শিবোহহং তৎসৎ।

তাঁর দেহের নিথর নিস্পন্দ অবস্থা দেখে পুরোহিতজী আমাদেরকে ঈঙ্গিত করলেন চলে যেতে।

আমরা সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানিয়ে বিশ্বরূপ তীর্থ ছাড়িয়ে হাঁটিতে লাগলাম। প্রায় সাত মিনিট হেঁটে আমরা আর একটি তীর্থে এসে পৌঁছলাম।

২৮। **ত্রিবিক্রেশ্বর তীর্থ** — মোহান্তজী বললেন, এই স্থান দৈত্যরাজ বলির তপস্যাক্ষেত্র, নাম ত্রিবিক্রেশ্বর তীর্থ। সেখানে বসে একজন ব্রাহ্মণ জপ করছিলেন। তিনি মোহান্তজীর কথার জের টেনে বললেন — জী হাঁ, বামনরূপী বিষ্ণুনে রাজা বলি কা সর্বস্ব হরণ করকে উসে পাতাল ভেজা, তো ফির উসনে য়হাঁ আকর তপস্যা কিয়ে। আমরা সেখানে প্রণাম করে পরবর্তী তীর্থের উদ্দেশ্যে হাঁটিতে লাগলাম।

২৯। **কপিলেশ্বর তীর্থ** — পাঁচ ছ' মিনিট হাঁটার পরেই নর্মদার তটের উপরেই কপিলেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম। সমুদ্রের সঙ্গম নিকটে বলে এখানে নর্মদা খুবই চওড়া এবং জল ঈষৎ লবণাক্ত হলেও মুখে দেওয়া চলে। কিন্তু এখান থেকে নিচের দিকের জল আর মুখে দেওয়া চলে না। মোহান্তজী বললেন — দেবর্ষি নারদের কাছে ভৃগুক্ষেত্রের প্রশংসা শুনে মহর্ষি কপিল এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন। তোমরা একটা কথা ভেবে দেখেছ কি, অমরকণ্টকে নর্মদা-উদ্গম মন্দির হতে কিছু দূরেই কপিলধারা কপিলের তপস্যা ক্ষেত্র, উত্তরতটেও দেখে এসেছ কপিলের তপস্যা ক্ষেত্র, দক্ষিণতটেও কপিল প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বরের অর্থাৎ কপিলের তপস্যা ক্ষেত্র আছে। তার মানে নর্মদাখণ্ডে কপিলের প্রভাব কম নয়। সগর পুত্রগণ তাঁর

ক্রোধবহ্নিতে ভস্মীভূত হলে তাঁর মনে নির্বেদ জাগে, তিনি এই ভৃগুক্ষেত্রে এসে নর্মদাতীরে তপস্যা করেন এবং অব্যয় রুদ্রের পূজা করে পরম নির্বাণ লাভ করেন —

তপশ্চচার সুমহৎ নর্মদাতটমাস্থিতঃ।
পরং নির্বাণমাপন্নঃ পূজয়ন্ রুদ্রমব্যয়ম্।।

৩০। **সিদ্ধেশ্বর তীর্থ** — কপিলেশ্বর তীর্থে প্রণাম করে হাঁটতে হাঁটতে মোহান্তজী বললেন — আমি পূর্বেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই ভৃগুকচ্ছ বা ভারোচের ভূ-প্রকৃতির গঠন দেখতে একটি কচ্ছপের মত। বৃষখাত যদি কচ্ছপের মুখ হয়, কচ্ছপ পৃষ্ঠের ডানদিক ধরে হাঁটতে হাঁটতে ২৯টি তীর্থ অতিক্রম করে আমরা এখন সেই কচ্ছপের পুচ্ছদেশের মধ্যবিন্দুতে এসে পৌঁছেছি। সামনেই যে মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে , ঐ স্থানের নাম সিদ্ধেশ্বর তীর্থ। ঐ মন্দিরের গর্ভগৃহে এক অমৃতস্রাবী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিদ্যমান। স্বয়ং দেবী সিদ্ধেশ্বরী ঐখানে সতত বিরাজমান থেকে ঐ ক্ষেত্রকে রক্ষা করছেন।

মন্দিরের দরজায় গিয়ে দেখলাম, মন্দিরের দরজা বন্ধ। মণ্ডপের মধ্যে বসে, পাঁচজন জটাজূট সাধু যে যার সামনে লৌহনির্মিত এক একটি যজ্ঞকুণ্ড রেখে চমস্ দিয়ে ঘি ঢেলে ঢেলে হোম করছেন। হোমের সুরভিতে সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গন সুরভিত। মোহান্তজী বললেন — পাশেই দ্বাদশাদিত্যের মন্দির। দ্বাদশাদিত্য এই সিদ্ধেশ্বর ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ সিদ্ধিকামীদের সিদ্ধিদ; এইজন্যই এঁর নাম হয়েছে সিদ্ধেশ্বর — অতঃ সিদ্ধেশ্বরঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিকাঙ্খিণাম্।

এইসময় যতীন্দ্রজী বললেন — গুরুজী! বেলা ১টা বাজতে যায়।

— হাঁ হাঁ, আমার মনে আছে, আমাদের মূল শ্রীপতি তীর্থে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার পুরোহিতজীকে কথা দিয়ে এসেছি। সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে এখন ফিরে যাই চল। সেখান থেকে আবার আমরা এখানেই ফিরে আসব।

এই বলে তিনি মন্দিরের সামনে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। আমরাও ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে কোণাকুণি রাস্তা ধরে দ্রুত হেঁটে বেলা দেড়টা নাগাদ এসে পৌঁছালাম আবার সেই মূল শ্রীপতি মন্দিরে। মন্দিরের প্রাঙ্গনে ঢুকে দেখি, সেখানে দণ্ডি সন্ন্যাসীদের ভীড়। মোহান্তজী মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গর্ভগৃহ হতে পুরোহিতজী হাতের ইশারা করে আমাদেরকে কাছে ডাকলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন — এই মন্দিরে প্রতিদিন সাতজনের উপযোগী অন্নভোগের ব্যবস্থা আছে। মিনিট পাঁচেক আগে এঁরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হওয়ার পূর্বেই লক্ষ্মীনারায়ণজীর বিবাহস্থল এই মূল শ্রীপতি তীর্থই শ্রীক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সারা ভারত জুড়ে এই শ্রীক্ষেত্রের সুখ্যাতি। এখান থেকে দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মত পূজনীয় নারায়ণ স্বরূপ অতিথিদেরকে প্রসাদ না দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারি না। যাঁর মন্দিরে ওঁরা এসেছেন তিনিই ওঁদের ব্যবস্থা করবেন। লজ্জাহারি নারায়ণ নিশ্চয়ই এই ভক্তিহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রক্ষা করবেন। আপনারা শুধু কৃপা করে আমাকে এইটুকু সাহায্য করুন, আপনার শিষ্যদেরকে বলুন, তাঁরা যেন ঐ অতিথিদেরকে প্রসাদ পরিবেশনে সাহায্য করেন। প্রসাদের তিনটি পাত্র নামাবলী দিয়ে ঢাকা আছে। ঢাকা কেউ খুলবেন না, পাত্রে কি আছে , তা কেউ উঁকি মেরেও

দেখবেনও না। আপনি কেবল সাবধানে অল্প করে নামাবলী তুলে সন্ন্যাসীদের করঙ্গা পূর্ণ করে প্রসাদ বিলি করবেন। আমি জপে বসি।

সানন্দে সম্মতি দান করে হাত পা ধুয়ে এসে মোহান্তজী হাতজোড় করে দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরকে মণ্ডলাকারে বসিয়ে দিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের বড় বড় করঙ্গা চেয়ে নিয়ে ভোগপাত্রের আবরণ নামাবলী ঈষৎ উত্তোলন করে প্রত্যেকটি করঙ্গা পূর্ণ করে দিলেন। আমরা সোৎসাহে ৪৩জন দণ্ডী সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে সেই ভোগ পরিবেশন করলাম। তাঁরা 'ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে ভোগ গ্রহণ করছিলেন, তাঁদের ভোজনের শেষের দিকে পুরোহিতজী এসে যুক্তকরে দাঁড়ালেন। প্রত্যেককে হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন—ঔর থোড়াসা? ঔর থোড়াসা দিউঁ? তাঁরা নীরবে মাথা নেড়ে সঙ্কেতে জানালেন যে, তাঁদের আর প্রয়োজন নাই। ভোজনান্তে আচমন করে একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী হাসিমুখে পুরোহিতজীকে জানালেন যে—তৃপ্তোহস্মি। বয়ং সর্বে তৃপ্তাঃ। আপ্ ক্যা নেহি জানতা হৈ, দণ্ডীলোগোনেঁ দো দফে কভি নেহি লেতে হেঁ। হমলোগনে বহোৎ পরিতৃপ্ত হো চুকা। এই বলে তাঁরা তাঁদের উচ্ছিষ্ট করঙ্গা হাতে নিয়ে নর্মদা কিনারার দিকে চলে গেলেন। এইবার আমরা প্রসাদ পেতে বসলাম। পুরোহিতজী আমাদেরকে সেই একইভাবে ভোগপাত্রের আবরণ কিঞ্চিৎ তুলে তুলে পেটভরে খাওয়ালেন, নিজেও আমাদের সঙ্গে বসে পেটভরে খেলেন। খাবার পর নামাবলী উঠিয়ে নিয়ে দেখালেন যে ছোটছোট দুটি পাথরের থালায় এখনও তিনজনের উপযোগী ভোগ পড়ে আছে। তিনি জানালেন যে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূও এই মহাপ্রসাদের প্রত্যাশায় বসে থাকেন।

আমাদেরকে কিছুতেই হাত লাগাতে দিলেন না, পুরোহিতজী নিজ হাতেই চারদিকে বালতি বালতি জল ঢেলে সব পরিষ্কার করে সেই মহাপ্রসাদের থালা দুটি হাতে নিয়ে দরজা বন্ধ করে যাত্রার উদ্যোগ করতেই মোহান্তজী একটি সোনার গিনি তাঁর হাতে দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন সেটি গ্রহণ করতে। তিনি কিছুতেই নিবেন না। মোহান্তজীও কিছুতেই ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত মোহান্তজী যখন বললেন যে, একজন মহাপুরুষের এইরকমই আদেশ আছে, তখন তা নিয়ে তিনি তাঁর নিকটবর্তী গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন।

আমরা মন্দিরের মণ্ডপে কিছুক্ষণ বসলাম। মতীন্দ্রজী চুপি চুপি আমাকে বললেন — ভাই। কেমন সুন্দরভাবে লীলাময় ঠাকুর লোকচক্ষুর অন্তরালে, এক অভিনব দিব্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটালেন দেখলেন ত? এই মন্দিরে সাতজনের উপযোগী ভোগ রান্না করা বিধান। তিনি ভেবেছিলেন, তাতেই আমাদের আটজনের সংকুলান হয়ে যাবে। কিন্তু সহসা ৪৩ জন উপস্থিত হতে তিনি ঘাবড়ে গেছলেন কিন্তু বিশ্বম্ভর মূল শ্রীপতিনাথের কী করুণা ৪৩ + ৮ + সপরিবারে পুরোহিতজীর ৪ জন, এই মোট ৫৫ জন মানুষের ভরপেট খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। অলক্ষ্যে ভোগের পরিমাণও বেড়ে গেল!

রতনভারতীজী স্বগতোক্তি করলেন—'দুধ, ঘি, আঙুর, কমলা, পেস্তা বাদাম ঔর চাউল সব এক সাথমেঁ মিলাকর—এ্যায়সা স্বাদিষ্ট মহাপরসাদ—মুঝে জিন্দেগী ভর কভি নেহি মিলা।' মোহান্তজী বা আমরা কেউ তাঁর কথার জবাব দিলাম না। মনের মধ্যে তখন নানা কথা তোলপাড় করছে। মুখে কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ না ঘটলেও আমরা সবাই যে এই ঘটনায় অভিভূত হয়েছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মূল শ্রীপতি মন্দিরে পরিক্রমা ও প্রণাম করে হাঁটতে লাগলাম সেই কোণাকুণি রাস্তা ধরে। বেলা চারটার সময় আবার আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম সেই সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের মন্দিরে। এখন মন্দিরের দরজা খোলা, পুরোহিতজী এসে গেছেন। গর্ভগৃহ ঘি-এর প্রদীপে আলোকিত। প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ঘন নীলাভ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ হতে অত্যুজ্বল আভা যেন ঠিকরে পড়ছে। লিঙ্গগাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত দেখা যাচ্ছে; তা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। পুরোহিতজী বললেন — এই যে ঘর্মবিন্দু দেখা যাচ্ছে, অহর্নিশ এই রকমই দেখা যায়, এইজন্য এই সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গকে অমৃতস্রাবী লিঙ্গ বলা হয়। যদি কোন মাতাপিতার একমাত্র পুত্র সন্তান কোন নিদারুণ ব্যাধিতে মৃতপ্রায় হয়, ডাক্তাররা যখন তার জীবনের আশা ত্যাগ করেন, তখন সেই মুমূর্ষু বালকের মাতাপিতা বালককে নিয়ে এই মন্দিরে এসে মহাদেবের কৃপাভিক্ষা করলে, আমরা মুমূর্ষুর জিহ্বা টেনে তাতে এই লিঙ্গগাত্রস্থিত ঘর্মবিন্দু সিদ্ধ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে লাগিয়ে দিই —

ওঁ অন্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহতে রমন্তাম্।
ইহায়মস্তু পুরুষঃ সাহসূনা সূর্যস্য ভাগে অমৃতস্য লোকে।

অর্থাৎ হে জীবনান্তকারী মৃত্যু। তোমাকে নমস্কার করি। এই মুমূর্ষুর প্রাণ ও অপাণ বায়ু এখানেই থাকুক, এর আত্মা সূর্যলোকে এবং অমৃতলোকে অবস্থিত করুক।

আমার পৌরহিত্যকালে এইরকম তিনজনকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু হতে সিদ্ধেশ্বরের কৃপায় বেঁচে উঠতে দেখেছি। আমার বাবার আমলে বেঁচেছিলেন পাঁচজন। এইজন্য এই মন্দিরে পৌরহিত্য কার্যে প্রবিষ্ট হতে হলে পূর্বে ঐ সিদ্ধ বেদমন্ত্রটি লক্ষবার জপ এবং ২৫ হাজার আহুতি প্রদান করে নিতে হয়।

একটু পরেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কাজেই চলুন আগেই দ্বাদশাদিত্যের মন্দির দেখিয়ে নিয়ে আসি।

**৩১। দ্বাদশাদিত্য তীর্থ** — দ্বাদশাদিত্যের মন্দির সিদ্ধেশ্বর ক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বরের নিকটেই অবস্থিত। মন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুলে আরতির আয়োজন করছেন। তিনি আমাদের সঙ্গী পুরোহিতজীরই ভাগিনেয়। তাঁকে তাঁর কাজ করে যেতে বলে আমাদের সঙ্গী আমাদেরকে জানালেন — ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু (উরুক্রম) — এই দ্বাদশাদিত্য মহর্ষি কশ্যপের ঔরষে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এঁরা সকলেই ইন্দ্রতুল্য। আদিত্যগণ স্ব স্ব তেজ বিভাগ করে এই সিদ্ধেশ্বর ক্ষেত্রে জগদ্বাতা দেব দিবাকরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন — নর্মদা তটমাশ্রিত্য তপস্যুগ্রে ব্যবস্থিতাঃ। সিদ্ধেশ্বরে মহারাজ কাশ্যপেয়ৈর্মহাত্মভি॥ যুগক্ষয়ে প্রলয়কাল উপস্থিত হলে, যে দ্বাদশাদিত্য উদিত হন, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র পূর্বদিকে, ধাতা আগ্নেয় দিকে, গভস্তিপতি যাম্যে, ত্বষ্টা নৈঋত দিকে, বরুণ পশ্চিমে, মিত্র বায়ু কোণে, অর্যমা সৌম্যদিগ্‌ভাগে, বিবস্বান ঈশান দিকে এবং সবিতা ঊর্ধ্বদিকে তাপ দান করতে থাকেন। আর পূষা অধোদিককে তপ্ত করিতে থাকেন এবং অংশুমান্ বিষ্ণু মুখ নির্গত অগ্নি দ্বারা জগৎকে দগ্ধ করেন। তৈত্তিরীয়ে বারজন আদিত্যের পরিবর্তে আটজন আদিত্যের নাম পাওয়া যায়, যথা —মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশুমান্, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান। পুরাণে আছে —

সূর্যপত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে পিতাকে জানালে বিশ্বকর্মা আদিত্যকে বার খণ্ডে ভাগ করে সূর্যের তেজ হ্রাস করেন। এই বার ভাগে বিভক্ত সূর্য বার নামে বার মাসে উদিত হন। সেই থেকে বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র, পৌষে বিষ্ণু, মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য এবং চৈত্রে বেদজ্ঞ নামে উদিত হন। শতপথ ব্রাহ্মণে বারজন আদিত্য বার মাসের প্রতীক রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

তাঁর কথা শেষ হল, সূর্যাস্তও হয়ে গেল। আমরা মন্দিরে উঁকি মেরে দেখলাম, পাথরের মন্দিরের চার দেওয়ালে দ্বাদশাদিত্যের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মেঝের মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ। আমরা প্রণাম করে পুরোহিতজীর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে পুনরায় ফিরে এলাম। তিনি আরতি করতে আরম্ভ করলেন। আরতি শেষ হয়ে সন্ধ্যা ছটা বেজে গেল। আরতির পর আমরা প্রণাম করে বিদায় নিতে উদ্যত হতেই তিনি বললেন — আপলোগ অভি কাঁহা যায়েঙ্গে? মোহান্তজী তাঁকে জানালেন যে বৃষখাত হতে কিছু দূরেই তাঁর এক ভক্তের বাড়ীতে যাবেন। শুনেই তিনি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বললেন — চলিয়ে, ম্যাঁয় ভি উধার হি জায়েঙ্গে। আজ শুক্লা পঞ্চমী তিথি, সোমবার। পথ মেঁ ঔর ভি দো তিনঠো তীর্থ আপকো দেখা দুঙ্গা।

ভালই হল। তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন চন্দ্রপ্রভাস তীর্থে।

৩২। **চন্দ্রপ্রভাস তীর্থে** — নর্মদাতটের একটি ঘাটে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ বললেন — চন্দ্রমা নে সমস্ত সিদ্ধোকে সহিত পরম প্রসন্নতা কে সাথ ইস্ তীর্থকো স্থাপিত কিয়া। ইধর গ্রহণ স্নান কা মাহাত্ম্য হৈ।

৩৩। **উত্তীর্ণ বরাহ তীর্থ** — চন্দ্রপ্রভাস তীর্থের ঘাট থেকে কতকটা আঁকা বাঁকা পথ হাঁটিয়ে তিনি আর একটি ঘাটে এনে আমাদেরকে জানালেন — ইয়ে হ্যায় উত্তীর্ণ বরাহ তীর্থ। পাঁচবে কল্প মেঁ য়হাঁ বরাহ ভগবাননে পৃথ্বীকা উদ্ধার কিয়া থা। জ্যেষ্ঠ শুক্লা একাদশী কা বিশেষ মাহাত্ম্য হৈ।

৩৪। **সোমেশ্বর তীর্থ** — সেখান থেকে তিনি আমাদেরকে নিয়ে এলেন সোমেশ্বর তীর্থে। এখানেও কোন মন্দির নাই। পুরোহিতজী আমাদেরকে জানালেন — সোমজীকা ক্ষয় রোগ প্রয়াগ সংগম পর নষ্ট হুয়া থা। ফির সোম নে য়হাঁ সাত বর্ষ তপ করকে স্বলোক প্রাপ্ত কিয়া থা। আমরা সকলে ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করলাম। জল ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডা।

এই সময় আমি মোহান্তজীকে বললাম — অন্ধকারে সব কিছু ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। শীতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আজকের মত পরিক্রমা বন্ধ করলে ভাল হয়। মোহান্তজী আমার কথা শুনে পুরোহিতজীর হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন। একটা রাস্তার মোড়ে এসে পুরোহিতজী বাঁদিকে বেঁকে গেলেন, তাঁর বাড়ী সেই রাস্তায়। আমরা ডানদিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে আমরা ভারোচ শহরে প্রবেশ করলাম। রাস্তায় টিম্‌টিম্ আলো জ্বলছে। পথে সাধারণ পথিকের চলাচল বেশী। সাইকেল ও ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে অনেক লোক যাতায়াত করছে। আমরা প্রায় ৯টা ১০ মিনিটে জগন্নাথজীর বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। যথারীতি স্বামী

স্ত্রী সদর দরজার মুখেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদেরকে দেখেই মোহান্তজী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন — তোমরা সকলে খেয়ছ ত ? আজও আমাদের ভৃগুক্ষেত্রের সব তীর্থ দেখা হল না। এখনও বারটি তীর্থ দর্শন আমাদের বাকী থাকল। কাল সকালেও আমাদেরকে বেরোতে হবে। লক্ষ্মণভারতীজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি ? তাঁকে কাল সকালে বলে আসবে, ১৮ ই কার্তিকের আগে আশ্রমে ফিরতে পারব বলে মনে হয় না। কাল যদি পরিক্রমা শেষ করতে পারি, তাহলে পরশু অর্থাৎ বুধবার বাঙালী বাবা ছাড়া আমরা বাকী সাতজন বৃষখাতে পরিক্রমা সমর্পণ করব। তারপর পুরা একদিন তোমাদের এখানে বিশ্রাম করে ১৮ই কার্তিক বিকালে মূল আশ্রমে ফিরব। তাঁকে নিশ্চিন্ত করে আসবে, আমি আশ্রমে না ফেরা পর্যন্ত দক্ষিণতটের পরিক্রমাবাসীরা ফিরছেন না।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে মোহান্তজী দোতলায় উঠতে লাগলেন। দোতলায় উঠতেই ভক্তদম্পতি তাঁর হাত পা ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুইয়ে মুছে দিলেন। আমরাও ঈষদুষ্ণ গরম জলে পা হাত ধুয়ে যে যার নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে আসন-শয্যা পেতে নিলাম। আমরা ঘরে বসেই শুনতে পাচ্ছি জগন্নাথজীর কোন কথার উত্তরে মোহান্তজী বেশ উষ্ণ কণ্ঠেই বলে চলেছেন, তুমি কাল সকালেই লছমন ভেইয়াকে বলে আসবে, আমার কাছে মূল আশ্রম বা গদীর মূল্য অকিঞ্চিৎকর। নর্মদাতটবাসী নাগা সন্ন্যাসী হিসাবে পরিক্রমাবাসীদের পরিচর্যা, এবং তাঁদের পরিক্রমাতে সাধ্যমত সাহায্য করাই আমার বিচারে মুখ্য কর্তব্য। আশ্রম গদী ঠাট বাট ভীড় ভাড়েক্কাতে আমি শান্তি পাই না। আমরা আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। জল খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে মূল শ্রীপতি তীর্থে সাতজনের খাদ্যে কিভাবে ৫৫ জনকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো গেল, সেই দৈবী ঘটনার কথা, যার বুদ্ধিতে কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আমাদেরকে পূর্বদিনের মতই মোহান্তজী বৃষখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে স্নান তর্পণাদি সেরে আমরা আবার হাঁটতে লাগলাম বাকী তীর্থগুলি পরিক্রমার উদ্দেশ্যে। বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ আমরা শালগ্রাম তীর্থে এসে পৌঁছালাম।

৩৫। **শালগ্রাম তীর্থ** — মোহান্তজী একটি পাথরের মন্দিরকে লক্ষ্য করে যেতে যেতেই বলতে লাগলেন — অখিল লোকাত্মা আদিদেব ত্রিবিক্রম ভগবান বাসুদেব লোক হিতার্থ স্বয়ং এস্থানে অধিষ্ঠিত। নারদেন তপস্তপ্ত্বা কৃতা শালা দ্বিজন্মনাম্। সিদ্ধিক্ষেত্রং ভৃগুক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা রেবা তটে স্বয়ং॥ স্বয়ং দেবর্ষি নারদ রেবাতীরস্থিত ভৃগুক্ষেত্রকে সিদ্ধিক্ষেত্র জেনে এখানে বিপুল তপস্যা করেছিলেন এবং তিনিই এখানে ব্রাহ্মণদের বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেন, তাঁদের নিত্য পূজার জন্য শালগ্রাম নামক দেবতাকেও প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে মন্দির পরিক্রমা করে প্রণাম করতেই পুরোহিত আমাদেরকে কাছে ডেকে বললেন — বুঝতে পারছি, আপনারা পরিক্রমাবাসী। যদি সকলেরই ব্রাহ্মণ শরীর হয়, তাহলে কাছে এগিয়ে আসুন, আপনাদেরকে ঠাকুর দর্শন করাই। আপনাদের ভাগ্য ভাল, এইমাত্র ঠাকুরকে স্নান করিয়ে গরুড়াসনের উপর বসিয়েছি। এখনও চন্দন তিলকাদি দিই নি। এই সুযোগে ঠাকুরজীর শ্রী অঙ্গের দিব্যচিহ্নগুলি ভালভাবে প্রত্যক্ষ করে

নিন। যোগিনামুপকারায় যোগিধ্যেয় জনার্দনঃ। শালগ্রামেতি তেনৈব নর্মদাতটমাশ্রিতঃ।। যোগিগণের হিতের জন্য যোগিধ্যেয় জনার্দনই শালগ্রাম নামে এখানে নর্মদাতীরে অধিষ্ঠিত আছেন। জনার্দনের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন — পূর্বভাগেকবদনঃ পশ্চাদেকাস্যসংযুতঃ। জনার্দনশ্চতুশ্চক্রঃ শ্রী পদো রিপুনাশনঃ।। অন্তর্লক্ষং চতুশ্চক্রং শীতলশ্চোৎপলপ্রভম্। জনার্দনং বিজানন্তি বনমালা-বিভূষিতং।। অন্তর্লক্ষমিতি — অন্তর্মধ্যে লক্ষং চিহ্নং যস্য তম্। উৎপলপ্রভমিতি নীলবর্ণমিত্যর্থঃ।। এই ঘন নীলাভ দ্যুতিমণ্ডিত শালগ্রামটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, এঁর সামনে একটি গহ্বর এবং পিছনে একটি গহ্বর, অর্থাৎ এঁর সামনে একটি মুখ, পেছনে একটি মুখ। প্রতিটি মুখের ভিতরে দুটি করে চক্র বিরাজিত। উপরে এই দেখুন বনমালার চিহ্ন। এইগুলি জনার্দন শিলার লক্ষণ। যোগিজনবাঞ্ছিত এই দেবতার কৃপায় তুরীয় পদের প্রাপ্তি ঘটে।

মোহান্তজী আমার হাতে দশটি টাকা দিয়ে পুরোহিতজীকে দক্ষিণা দেওয়ালেন। পুনরায় সকলে প্রণাম করে আমরা প্রায় দশ মিনিট হেঁটে ভারোচের উপকণ্ঠস্থিত গ্রামাঞ্চলে জ্বালেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছালাম।

**৩৬। জ্বালেশ্বর তীর্থ** — এখানে একটি বহু পুরাতন পাথরের মন্দিরের মধ্যে জ্বালেশ্বর বা কালাগ্নি নামক স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বর্তমান। অমরকণ্টকে নর্মদা-উদ্গম মন্দির হতে প্রায় সাত মাইল দূরে ঈশান কোণে যেমন পাহাড়ের ধারে জ্বালেশ্বর মন্দির অযত্ন রক্ষিত অবস্থায় দেখে এসেছি, তেমনি এ মন্দিরের কেউ কোন যত্ন নেন বলে মনে হল না। অমরকণ্টকস্থিত জ্বালেশ্বরের ডান পাশে যেমন একটি কূপ বর্তমান, তেমনই ভৃগুক্ষেত্রস্থিত এই জ্বালেশ্বরের ডান পাশেও একটি কূপ বর্তমান। ত্রিপুরাসুরকে বধ করার সময় অমরকন্টকস্থিত জ্বালেশ্বরের কূপ হতে যেমন কালাগ্নি উদ্ধৃত হয়েছিল, তেমনি প্রাচীনকালে দৈত্য ও রাক্ষসদের অত্যাচারে লুপ্তপ্রায় বৈদিক ক্রিয়া এবং ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভৃগুক্ষেত্রস্থিত এই স্থানে জ্বালেশ্বর পাতাল ভেদ করে সমুদ্ভূত হন এবং তৎ সন্নিহিত কূপের মধ্যে হতে নির্গত জ্বালাগ্নি দৈত্য ও রাক্ষসদেরকে ভস্মীভূত করেছিলেন। একটি কুণ্ড দেখিয়ে মোহান্তজী বললেন — এই কুণ্ডের অসীম মাহাত্ম্য। বাঙালী বাবা, তুমি এই কুণ্ডের জলে পিতৃতর্পণ কর, ততক্ষণ আমরা জ্বালেশ্বরের মাথায় জল ঢালি ও পূজা করি। তর্পণান্তে তুমিও বাবার মাথায় জল ঢেলে পূজা করবে।

আমাদের সকলের পূজা শেষ হতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা বেজে গেল। আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে জ্বালেশ্বরের মন্দির পরিক্রমা করে কনখল তীর্থে এসে পৌঁছালাম।

**৩৭। কনখল তীর্থ** — মোহান্তজী বললেন — এখানকার মন্দিরে দেবী কনকেশ্বরী রূপিনী চামুণ্ডার সিদ্ধযন্ত্র বর্তমান। এই তীর্থে গরুড়ের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বিষ্ণুর বাহনত্ব এবং পক্ষীকুলের মধ্যে ইন্দ্রত্ব লাভের বর দেন। উত্তরতটের ঝাড়িপথ অতিক্রম করে আদিত্যেশ্বর পেরিয়ে আমরা যেমন গরুড়েশ্বর নামক গরুড়ের তপস্থলী দেখে এসেছি, এটিও তেমনি তাঁর তপস্যাক্ষেত্র। এখানে তিনি দেবী চামুণ্ডার তপস্যা করে কনকেশ্বরী দেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মহল্লা বর্তমানে উত্তমপুর নামে পরিচিত। গরুড়ের তপস্যার পূর্বেই লক্ষ্মীদেবী এই উত্তমপুর প্রতিষ্ঠা করে দেবারাধিতা কনকেশ্বরী রূপিনী চামুণ্ডাকে আবাহন

করে অনুরোধ করে বলেছিলেন — রক্ষণায় ময়া দেবি যোগক্ষেমার্থ সিদ্ধয়ে। মাতৃবৎপ্রতিপাল্যং তে সদা দেবি পুরং মম — আমি যোগক্ষেম সিদ্ধির জন্য এই পুর প্রতিষ্ঠা করলাম। দেবি! আপনি মায়ের মত সতত এই পুর রক্ষা করবেন। মাতা লক্ষ্মীকে 'তাই হবে' বলে চামুণ্ডা 'জগামাকাশচমাবিশ্য ভূতসঙ্ঘসমন্বিতা,' ভূতনিবহকে সঙ্গে নিয়ে আকাশের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছলেন। যখন এই ভৃগুকচ্ছ লক্ষ্মীক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল, সেই সুপ্রাচীন যুগ হতে আজ পর্যন্ত এখানে কত মুনি ঋষি যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই।

আমরা কিছুক্ষণ জপ করে প্রণামান্তে এরণ্ডী তীর্থে গিয়ে পৌঁছালাম।

**৩৮। এরণ্ডী তীর্থ** — এই এরণ্ডী সেই এরণ্ডী নন। পূর্ব যুগ হতে এখানে এরণ্ড নামে একজন মুনি বাস করতেন। তাঁর একমাত্র কন্যার নাম ছিল এরণ্ডী। অনুপম রূপলাবণ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্বজন্মের সংস্কারবশে তিনি বাল্যবিধি তপজপেই নিরতা থাকতেন। যৌবনপ্রাপ্তা হলে দেশ দেশান্তর হতে বহু রাজপুত্রও তাঁকে বিবাহ করার জন্য এরণ্ড মুনির দ্বারস্থ হন। তপস্যায় বিঘ্ন হচ্ছে দেখে মুনিকন্যা শেষ পর্যন্ত নদীরূপে পরিবর্তিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেন। শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে এখানে পিতৃ পুরুষদের তর্পণ করা বিধি। সে সময় ভারোচ শহর থেকে বহুলোক এখানে তর্পণ করতে আসেন।

**৩৯। ধূতপাপ তীর্থ** — এরণ্ডী তীর্থের পরেই এই তীর্থ। মোহান্তজী বললেন, ভৃগুক্ষেত্রে পৌঁছে প্রথম দিনেই বৃষখাতে যে মহাদেবের ইঙ্গিতে নন্দীশ্বর ভৃগুদেবের শমতা পরীক্ষার জন্য বারবার তাঁকে শিং দিয়ে ধূত অর্থাৎ কম্পিত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহর্ষি ভৃগুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি ব্রহ্মদণ্ড নিয়ে বৃষকে তাড়া করেন। এইখান পর্যন্ত এসে ভৃগুর মনে হঠাৎ শমতা বা সাম্যভাবের উদয় হয়। তিনি বৃষকে তাড়া করা থেকে নিবৃত্ত হন। সেই থেকেই এখানে ধূতপাপ বা ধৌতপাপ তীর্থের জাগৃতি ঘটেছে। আমার কথাটি লক্ষ্য কর। আমি বলছি, 'জাগৃতি' ঘটেছে। তার মানে তাহলে এই বুঝায় যে ভৃগু-বৃষ দ্বন্দের পূর্বেও এখানে এই তীর্থ ছিল। সত্যই ছিল। সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা পঞ্চানন ছিলেন। তাঁর পঞ্চম মুখটি ছিল অশ্বমুখের মত। কোন সময় স্রষ্টার মধ্যে কিছু বিকার লক্ষ্য করে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মার সেই অশ্বমুখনিভ পঞ্চম মুখটি আঙুলের চাপে ছিন্ন করেন। এইজন্য তাঁকে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করার জন্য ধাবিত হতে থাকে। মহাদেব এই তীর্থে এসে পৌঁছলে রক্তম্বরধরা রক্তমাল্যধারিণী ব্রহ্মহত্যা তাঁকে আর স্পর্শ করার জন্য অগ্রসর হতে পারে নি। এইজন্য নর্মদা তীরবর্তী এই ধৌতপাপ তীর্থ 'ব্রহ্মহত্যানাশন' নামে প্রসিদ্ধ। এই তীর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এখানে এসে স্নান জপ করলে খলের খলতা এবং ক্রোধীর ক্রুদ্ধভাব শমতা বা সাম্যভাব লাভ করে। এখানে ধৌতেশ্বরী দুর্গার একটি প্রস্তরময়ী বিগ্রহ স্থাপিত আছে।

এই তীর্থের জল স্পর্শ করে প্রায় আটমিনিট হেঁটে একটি বহু প্রাচীন শিবমন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল।

**৪০। কেদার তীর্থ** — মোহান্তজী বললেন — এই তীর্থের নাম কেদার তীর্থ। হিমালয়স্থিত কেদারনাথের মতই এইস্থান পরম পবিত্র এবং পুণ্য তপোভূমি। অগ্রবর্তী মন্দিরে স্বয়ং কেদারনাথ বিরাজমান। মন্দিরের দরজা খোলাই ছিল। মন্দিরের পুরোহিতজী বসে বসে জপ

করছিলেন। আমাদের মন্দির পরিক্রমার পর তিনি আমাদেরকে জানালেন — সত্যযুগে কোন এক সময় হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীমাতা মহর্ষি ভৃগুর উপর বিরক্ত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন — ভৃগুক্ষেত্র অপবিত্র এবং সর্বদেবদেবী বর্জিত হোক। এই বলে তিনি ভৃগুক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যান। তারপর ভৃগু বায়ুভোজী ও নিরাহার অবস্থায় সুদুশ্চর শিব তপস্যা আরম্ভ করেন। তপস্যায় তিনি এত কৃশ হয়ে গেছলেন যে সে সময় তাঁর দেহে স্নায়ু শিরাও দেখা যেত। শেষ পর্যন্ত আশুতোষ বিচলিত হয়ে সপ্ত পাতাল ভেদ করে অনাদি লিঙ্গরূপে ভৃগুর সামনে প্রকটিত হন। ভৃগু এই পঞ্চক্রোশী তীর্থ লক্ষ্মীর শাপ হতে বিমুক্ত হোক, এই প্রার্থনা করেন। মহাদেব মহর্ষি ভৃগুর প্রার্থিত বর ত দিলেনই অধিকন্তু বললেন — আমি এখানে অনাদি-কেদার লিঙ্গ নামে সতত বিরাজমান থাকব।

আমরা কেদার লিঙ্গকে হর নর্মদে বলতে বলতে পরিক্রমা করে মন্দিরের পুরোহিতজীর নির্দেশ মত 'ত্র্যম্বকং যজামহে' এই বেদমন্ত্রে কেদারনাথের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করলাম।

**৪১। সৌভাগ্যসুন্দরী দেবী** — কেদারনাথকে দর্শন ও প্রণাম করে মোহান্তজী বললেন — পরিক্রমার বিধি অনুসারে আমাদেরকে পুনরায় বৃষরূপী নন্দীর ক্ষুরে ইতস্ততঃ ছিন্ন বিদীর্ণ বৃষখাতের সন্নিহিত পূর্বদৃষ্ট সৌভাগ্যসুন্দরী দেবীর মন্দিরে যেতে হবে। তাঁর যেমন কথা তেমনই কাজ। তিনি দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগলেন। মতীন্দ্রজী জানালেন বেলা একটা বেজে গেছে। আমরা ভারোচ শহরের সীমান্তে নর্মদাতট ধরে প্রায় ৪০ মিনিট হেঁটে বৃষখাতের নিকটে সৌভাগ্যসুন্দরীর মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। আজ সকালেও আমরা এখানে স্নান তর্পণ করে গেছি। ক্ষণিকের জন্য আমার মনে হল, এই মন্দির ত আমরা গত তিনদিনের মধ্যে যে কোন সময় দেখে নিলে পারতাম। কিন্তু মোহান্তজী বলেছেন — এই নাকি পরিক্রমার বিধি! হবে! এইসব বিধি মানতে গিয়েই ত বারবার একই পথে ঘুরপাক খাচ্ছি! তা নাহলে ভৃগুকচ্ছের ৪৬টি তীর্থ দেখতে দুদিন সময়ই যথেষ্ট। বেশী চিন্তার অবসর পেলাম না! মোহান্তজী বলছেন — এই তীর্থে যে এত লোকের ভীড় দেখছ, তার কারণ, ভাগ্যান্বেষী গৃহীদের এখানে মা সৌভাগ্যসুন্দরীর দয়ায় অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। তিনি একে একে আমাদেরকে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমাতা, অষ্টাদশ দুর্গা, ষোড়শ ক্ষেত্রপাল, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, দ্বাদশ গণেশ, একুশজন বসু এবং অষ্টনাগের ছোট বড় অনেক বিগ্রহ দর্শন করালেন। বিশাল মন্দিরের চাপাশে আরও অনেক ছোট ছোট মন্দিরে, এমন কি মূল মন্দিরের দেওয়াল গাত্রেও ঐসব বিগ্রহের মূর্তি খোদিত আছে। ভক্তদের প্রদত্ত সিঁদুর ও বেলপাতায় সমস্ত বিগ্রহই অল্প বিস্তর ঢাকা পড়েছে। মোহান্তজী সকল বিগ্রহের পরিচয় দিলেন, কেবল অষ্টবসুর নাম বলতে গিয়ে বললেন — আমার ঠিক স্মরণে আসছে না; পরে মনে পড়লে তোমাদের বলব। শুধু এই সার কথা জেনে রাখ, সর্বসিদ্ধিদাত্রী সৌভাগ্যসুন্দরী দেবী এখানে ঐসব দেবতাসহ সর্বদা বিরাজমান।

আমরা মন্দিরে প্রণাম সেরে মন্দিরের এলাকা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, একজন শিখাসূত্রধারী সৌম্যদেহী পণ্ডিতজী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মোহান্তজীকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করে দূরস্থ একটি পরিত্যক্ত মন্দির দেখিয়ে বললেন — অশ্বত্থ গাছের তলায় ঐ যে মন্দিরের অর্ধাংশ জলে ডুবে আছে, সেখানে আপনাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য একজন

মহাত্মা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের পরিচিত। আপনারা গেলেই চিনতে পারবেন। তাঁর কথা শুনেই আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম। তিনি যে কে, তা মোহান্তজী অনুমান করতে পারলেন না। রতনভারতীজী বললেন — গুরুজী! লক্ষ্মণভারতীজী নন ত ? মোহান্তজীকে কোন উত্তর দিতে হল না, মতীন্দ্রজীই রতনভারতীজীকে ঈষৎ ধমকের সুরে বললেন — বলিহারী আপনার বুদ্ধিকে! লক্ষ্মণভারতীজীর কখনও গুরুজীকে লোক মারফৎ ডেকে পাঠানোর সাহস হবে? গুরুজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সৌজন্যবোধ কারও চেয়ে কম নয়। মোহান্তজী গম্ভীর মুখে হেঁটে চলেছেন সেই পণ্ডিতজীর পেছনে পেছনে। সেই পরিত্যক্ত গৃহের পেছনে পৌঁছেই আমাদের সব সংশয় দূর হল। আমরা শুনতে পেলাম গুণগুণ করে কেউ যেন গেয়ে চলেছেন — মেরে আখন কে দৌতারে........।

আমরা সামনে গিয়ে পৌঁছতেই দেখলাম, সেই কঙ্কালসার 'ভক্ষণসুর' সাধু নর্মদার জলে নিমজ্জিত প্রায় একটি পাথরের বারান্দায় বসে আটটি কলাপাতা পেতে গুণগুণ স্বরে গান ভাঁজছেন। মোহান্তজীকে দেখেই বললেন — আইয়ে, করীব দো বাজ গিয়া, কৃপা করকে হমারা পাশ আজ ভিক্ষা লিজিয়ে। বলেই তিনি হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। মোহান্তজী 'নমো নারায়ণায়' বলে তাঁকে অভিবাদন করে তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করে বসলাম। তাঁর ইঙ্গিতে সেই পণ্ডিতজী প্রত্যেকের পাতায় চারটি করে কলা ও চারটি করে মোণ্ডা দিলেন। আমরা যেখানে বসলাম, সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে নর্মদার জল স্পর্শ করা যায়। তিনি বলতে লাগলেন — তোমরা 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি' করতে আরম্ভ কর, আমি গল্প করি। প্রথমেই এই বিচিত্র মন্দিরটির কথা শোন, গুজরাটের কোন শ্রেষ্ঠীনন্দনের ইচ্ছা হয়, নর্মদা তীরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার। ধনাঢ্য ব্যক্তি, কাজেই স্থান সংগ্রহ করে এখানে মন্দির নির্মাণ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হল না। গর্ভগৃহের দিকে তাকিয়ে দেখ, যেখানে পাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন সেখানে এক বিরাট গর্ত। প্রতিষ্ঠা দিবসেই প্রবল জল ঝড় আরম্ভ হয়, মন্দির হেলে পড়ে, গর্ভগৃহের মধ্য হতে শিব তলিয়ে যান অতল গহ্বরে। কারণ সেই শ্রেষ্ঠী মাতাপিতাকে ভক্তি করত না। তাঁদের জীবদ্দশাতেই শ্রেষ্ঠী মাতাপিতার কোন সেবা ত করেই নি, তাঁদের সঙ্গও একেবারে পরিত্যাগ করেন। মাতৃপিতৃদ্রোহীর পূজা আমার আশুতোষ বা মা নর্মদার মত করুণাময়ীও গ্রহণ করেন না।

আমরা কলাগুলি গলাধঃকরণ করে মোণ্ডা খেতে আরম্ভ করেছি, তিনি মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — সৌভাগ্যসুন্দরী দেবীর মন্দিরে তোমরা অষ্টবসুর ছোট ছোট প্রস্তরময় বিগ্রহ দেখে এসেছ। আমি তাঁদের কথা বলছি, খেতে খেতে শোন। ঋগ্বেদে বসুগণকে প্রকৃতির নিয়ামক রূপে, মন্ত্রপাঠরত অবস্থায় দেখা যায়, এঁরা গণদেবতা, সর্বসাধারণের সকল শুভ কার্যের নিয়ন্তা। মহাভারতের এই অষ্টবসুর নাম আছে , যথা — ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস ও দ্যু। এঁরা সকলেই ইন্দ্র বা পরমাত্মার অনুচর হিসাবে কাজ করে থাকেন। বসুগণ একবার বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর যৌগৈশ্বর্য এবং দিব্যবিভূতি দেখে হরণ করলে বশিষ্ঠ তাঁদেরকে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করার অভিসম্পাত দেন। তখন তাঁরা গঙ্গাদেবীকে গিয়ে অনুরোধ করেন — মা তুমি একবার মানুষী তনু পরিগ্রহ কর, আমরা তোমার জলে নিক্ষিপ্ত হই, তাহলে শীঘ্রই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপ

হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারব। গঙ্গা এতে সম্মত হয়ে বলেন — তাঁর একটি পুত্র যেন জীবিত থাকে। শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিবাহের শর্ত ছিল যে, গঙ্গা যে কার্যই করুন না কেন শান্তনু তাঁকে বাধা দিতে পারবেন না। ক্রমে গঙ্গার আটটি দেবকুমার তুল্য পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মমাত্র তাঁদের এক এক করে সাতজনই জলে নিক্ষিপ্ত হন। অষ্টম পুত্রকে নিক্ষেপ কালে শান্তনু পুত্রশোকে কাতর হয়ে গঙ্গাকে বাধা দিলে গঙ্গা আত্মপরিচয় দিয়ে বসুগণের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। বসু ভ্রাতৃগণের অষ্টমজন দ্যু বসু। ইনি নিজ স্ত্রীর প্ররোচনায় অপর সপ্তবসুর সাহায্যে বশিষ্ঠের কামধেনু স্বহস্তে অপহরণ করে নিয়ে গেছলেন। তাই শাপ দেওয়ার পর বসুদেব প্রার্থনায় বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে — তাঁরা সকলেই এক এক করে এক বৎসরের মধ্যেই মুক্ত হবেন কিন্তু দ্যু বসু নিজ কৃতকর্মের জন্য দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করতে বাধ্য হবেন। গঙ্গা শান্তনুকে এইসব বৃত্তান্ত বলে নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্তর্হিতা হন এবং পরে সর্বশাস্ত্রবিশারদ করে তাঁকে শান্তনুর হাতে প্রত্যার্পণ করেন। এই পুত্রই পরে দেবব্রত ভীষ্মরূপে বিখ্যাত হন।

মহাত্মার গল্প শুনতে শুনতেই আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। আমরা নর্মদার জলে হাত মুখ ধুয়ে তাঁকে প্রণাম করে আবার পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লাম।

৪২। **দশাশ্বমেধিক তীর্থ** — আমরা ভারোচের মাঝখান দিয়ে কোণাকুণি রাস্তা ধরে দ্রুত হেঁটে পৌনে চারটার সময় ভারোচের উপকণ্ঠস্থিত একটি গ্রামাঞ্চল অতিক্রম করে দশাশ্বমেধিক তীর্থে এসে পৌঁছালাম। নর্মদার তটেই এই গ্রাম, তবে এখানে, মোহান্তজী জানালেন — সরস্বতী নদীও অন্তঃসলিলা হয়ে নর্মদার মধ্যে বর্তমান আছেন। এখানে দেখছি অনেক দণ্ডী সন্ন্যাসীর ভীড়। সেখানে কোন যজ্ঞ হয়েছিল, যজ্ঞ শেষ হলেও যজ্ঞাগ্নি এখনও নির্বাপিত হয়নি। হোমের সুরভিতে তখনও বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ। একজন মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়া এবং দণ্ডীধারীকে ঘিরে অনেক দণ্ডী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। মোহান্তজী বললেন — এই দশাশ্বমেধিক তীর্থে সন্ন্যাস গ্রহণের খুব মাহাত্ম্য। মনে হয়, ঐ কন্দর্পকান্তি তরুণ সাধু আজই এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, সেইজন্য তাঁকে ঘিরে এই ভীড়। তাছাড়া এইস্থানে সায়ম্ভুব মনুর পুত্র দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেইজন্যও এইস্থানে সাধারণ পরিক্রমাবাসীরাও পরম পুণ্যস্থান জ্ঞানে অনেকদিন ধরে বাস করে জপধ্যানাদি করে থাকেন। এখানকার জলবায়ুও খুব স্বাস্থ্যপ্রদ।

রাজা প্রিয়ব্রত বিবাহ করেছিলেন বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে, প্রিয়ব্রতের কন্যা উর্জস্বতীর সঙ্গে শুক্রাচার্যের বিবাহ হয় এবং তাঁদের কন্যার নামই পুরাণ-খ্যাত দেবযানী। রাজা প্রিয়ব্রত পরিণত বয়সে পুত্র আগ্নীধ্রকে রাজ্যভার দিয়ে এই নর্মদা তটে এসে জপধ্যানে নিরত হয়েছিলেন, সামনের মন্দিরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান। এই তীর্থের কৃতকর্মে দশাশ্বমেধ ফললাভ হয়ে থাকে।

মন্দিরের চারধারেই সাধুরা ধূনী জ্বেলে বসে আছেন। আমরা সাবধানে ডাইনে বাঁয়ে 'নারায়ণ বলতে বলতে সাধুদেরকে নমস্কার জানিয়ে মন্দিরে গিয়ে প্রায় তিনফুট উঁচু শ্বেত শিবলিঙ্গ দর্শন করলাম। মন্দিরে বসে মোহান্তজীর নির্দেশে প্রায় দশ মিনিটকাল সেখানে জপ করলাম।

৪৩। **গৌতমেশ্বর তীর্থ** — দশাশ্বমেধিক তীর্থে জপ ও প্রণাম করে মোহান্তজী আমাদেরকে যে তীর্থে নিয়ে গেলেন, তার নাম গৌতমেশ্বর তীর্থ। রামায়ণ-খ্যাত অহল্যার স্বামী গৌতম ঋষির তপস্যা ক্ষেত্র এটি । মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গৌতমেশ্বর শিবকে দর্শন ও প্রণাম করে আমরা হাঁটতে হাঁটতে নর্মদাতটের প্রসিদ্ধ গঙ্গাবাহ তথা শঙ্খোদ্ধার তীর্থে এসে পৌঁছালাম।

৪৪। **গঙ্গাবাহ তথা শঙ্খোদ্ধার তীর্থ** — সূর্যাস্তের বেশী দেরী নাই। এখানকার শিবমন্দিরের পুরোহিতজী মন্দিরের বাইরে পায়চারী করছিলেন। আমরা গিয়ে পৌঁছতেই বললেন — বড় অসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অবিলম্বে আপনারা জলে নেমে স্নানের জন্য প্রস্তুত হোন। গায়ের আলখাল্লাদি ছেড়ে কৌপীন বা গামছা পরে স্নান করুন, আমি মন্দির হতে শঙ্খ এনে দিচ্ছি, এখানে শঙ্খ স্পর্শ করে স্নান করতে হয়। আমরা তাঁর প্রদত্ত শঙ্খ হস্তে জলে নামতেই তিনি বললেন — শীতকালে অপরাহ্নে জলে নামাটা সুখপ্রদ নয় জানি। কিন্তু আপনারাই এর জন্য দায়ী। এই পরমপুণ্য তীর্থে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা স্বয়ং এসে মা নর্মদার জলে অন্তঃপ্রবিষ্টা হয়েছেন। একসময় গঙ্গা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন — দুনিয়ার যত খল, কৃতঘ্ন, চরিত্রহীন, মাতৃপিতৃদ্রোহী, গুরু নিন্দুক, দানে পরাঙ্মুখ, অগম্যাগামী, নাস্তিক, শঠ, দুরাচারী ব্যক্তি আমার জলে নিত্য স্নান করে তাদের পাপ আমার জলে ক্ষালন করছে, আমি তাদের পাপরূপ ক্ষারে নিত্য দগ্ধীভূত হচ্ছি — তে মাং প্রাপ্য বিমুচ্যন্তে পাপসঙ্ঘৈঃ সুসঞ্চিতৈঃ। তৎপাপক্ষারতপ্তয়া ন শর্ম মম বিদ্যতে।। আমার কোন মতেই মঙ্গল হচ্ছে না। হে জগৎপতে, আমার যাতে মঙ্গল হয়, তার ব্যবস্থা করুন। তার উত্তরে নারায়ণ তাঁকে বলেন — তুমি মূর্তিমতী হয়ে নর্মদা জলে প্রবেশ কর, বর্ষাকালে উভয়তীরকে প্লাবিত করে রেবা যখন আমার সামনে উপস্থিত হবেন, তখন রেবার উত্তরতটে ভৃগুতীর্থের এই স্থলে আমি শঙ্খ হস্তে গঙ্গাধরকে সঙ্গে নিয়ে প্রকট হব, সেই পুণ্যলগ্নে তুমি আমার স্পর্শে সমস্ত পাপতাপের স্পর্শাতীত পুণ্যময়ী দিব্যরূপ প্রাপ্ত হবে।

এইজন্যই এই তীর্থের নাম হয়েছে শঙ্খোদ্ধার বা গঙ্গাবাহ।

তাঁর উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করতে করতে আমরা শঙ্খ হস্তে জলে ডুব দিলাম। তিনি মন্ত্রপাঠ করালেন —

পুণ্যং তু অশেষ পুণ্যানাং মঙ্গলাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিষ্ণুনা বিধৃতো যেন তস্মাৎ শান্তি প্রচক্রমে।।

অর্থাৎ হে শঙ্খ! তুমি পুণ্যনিচয়ের মধ্যে পুণ্য, অশেষ মঙ্গলের মঙ্গল। বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করেছেন, অতএব শান্তিদান কর।

স্নানের পর তাড়াতাড়ি গা মুছে আলখাল্লাদি গায়ে দিয়ে মন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রামরূপী নারায়ণকে প্রণাম করলাম। মোহান্তজী পুরোহিতজীর হাতে দশটি টাকা দক্ষিণা স্বরূপ দিলেন।

দক্ষিণা পেয়ে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন — সন্ধ্যা হয়ে এল। পরিক্রমার নিয়মানুসারে আপনাদেরকে এর পরের তীর্থ মহারুদ্রস্থান সেঁধবা দেবীর মন্দিরে যেতে হবে। এখান থেকে বেশী দূরে নয়, তবে স্থানটি নর্মদাতটের শ্মশান। চলুন আমি আপনাদের সঙ্গে যাই। ফিরে এসে মন্দিরে আরতি করব।

**৪৫। মহারুদ্রস্থান সেঁধবা দেবী** — ব্রাহ্মণের সহৃদয়তায় আমরা খুবই মুগ্ধ হলাম। তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেলেও চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে যায় নি। তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গ্রামের বাইরে এক শ্মশানে উপস্থিত করলেন। শ্মশানে ৫টি চিতা জ্বলছে। মৃত ব্যক্তিদের শ্মশান বন্ধুদের ভীড়ে বিরাট শ্মশান গমগম করছে। ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন — ভারোচ এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হতে এখানে শবদাহ করতে নিয়ে আসা হয়। এই বিরাট শ্মশানে এমন দিন যায় না যেদিন শবদাহ হয় না। এই স্থান মহাশ্মশান। জনশ্রুতি, য়হাঁ যোগিণী ক্রীড়া করতী হৈ। ইয়ে শক্তিপীঠ হ্যায়। এই বলে তিনি একটি কুঁয়ার কাছে দাঁড় করিয়ে বললেন — এই কুঁয়ায় নর্মদার জল এসে অন্তঃসলিলারূপে প্রবেশ করে। এইজন্য কুঁয়ার নাম 'শাক্তকূপ।' সেঁধবা দেবীর মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। দেবী এখানে সূক্ষ্মরূপে বিরাজমানা। আমরা ভূলুণ্ঠিত হয়ে সেঁধবা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। মোহান্তজী তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল পিঙ্গলেশ্বর বা ভূতেশ্বর তীর্থের পথ জানতে চাইলেন। তিনি পথের নিশানা ও নির্দেশ দিয়ে শঙ্খোদ্ধার তীর্থের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমরা হেঁটে চললাম তাঁর নির্দেশিত পথে।

**৪৬। পিঙ্গলেশ্বর বা ভূতেশ্বর তীর্থ** — প্রায় ১০ মিনিট হেঁটে আমরা এক মন্দিরের আরতির বাজনা শুনতে পেলাম। একজন পথচারীকে মোহান্তজী গুজরাটি ভাষায় ভূতেশ্বর মন্দির কোন দিকে জানতে চাইলেন। লোকটি তাঁর মাতৃভাষায় যা বললেন তাতে বুঝলাম যে ভূতেশ্বর মন্দিরেই আরতি হচ্ছে। আমরা শিঙা ডম্বরুর শব্দ অনুসরণ করে একটু পরেই ভূতেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের সামনে গ্যাসের বাতি জ্বলছে। বিরাট পাথরের মন্দির; মন্দিরের সভা মণ্ডপটিও বড়। কয়েকজন গৃহীভক্তকে দেখলাম তাঁরা সাশ্রুনয়নে আরতি দেখছেন এবং হর নর্মদে ধ্বনি দিচ্ছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আরতি দেখলাম। পিঙ্গলবর্ণের সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ হতে যেন জ্যোতিঃ ফুটে বেরোচ্ছে। শিবলিঙ্গের সামনে একটি প্রশস্ত যজ্ঞকুণ্ড। কুণ্ডটি যজ্ঞাবিশিষ্ট ভস্মে পরিপূর্ণ। শিবলিঙ্গের গাত্রেও কিছু ভস্ম লেগে আছে। একটু পরেই আরতি শেষ হতেই গর্ভগৃহ হতে জটাজুট এক সাধু বেরিয়ে এলেন। ইনিই মন্দিরের সেবক বা পুরোহিত। মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দায় এককোণে দেখলাম অনেক ভস্ম স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে পরিক্রমাবসী জেনে তিনি গৃহীভক্তদের বিদায় দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে বসলেন। তিনি আমাদেরকে জানালেন — স্মরণাতীতকাল পূর্বে এখানে একদিন মহাদেব স্বেচ্ছায় নর্মদাতটের ধূলি নিয়ে গাত্র মার্জনা করতে থাকেন। স্বরাট-বিরাট-পুরুষের কেন যে এইরকম ইচ্ছা জেগেছিল তার কোন ব্যাখ্যা কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। যাইহোক তাঁর এব্যবিধ উপায়ে অঙ্গগুণ্ঠন বা উদ্ধূলনের (ধূলি মেখে গাত্র মার্জনার) ফলে তাঁর উদ্ধূষণ অর্থাৎ পুলকোদগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এখানে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গরূপে উদ্ভূত হন। নাম হয় ভূতেশ্বর। পিঙ্গলবর্ণের অঙ্গকান্তির জন্য এঁকে পিঙ্গলেশ্বরও বলা হয়। এখানে পূজার প্রধান অঙ্গ নিত্য হবন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সর্বত্রই গঙ্গাধরকে জল ঢেলে স্নান করানো হলেও এখানে পূজার পূর্বে ভূতেশ্বরকে পূর্বদিনের হোমাবশিষ্ট ভস্ম মাখাতে হয়। এই ভস্ম স্নানই তাঁর স্নান। শাস্ত্রেও আছে — আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং অবগাহ্য চ বারুণম্। আপো হিষ্ঠেতি চ ব্রাহ্মং বায়ব্যং

গোরজঃ স্মৃতম্ অর্থাৎ ভস্ম স্নানের নাম আগ্নেয়, অবগাহন স্নান বারুণ, 'আপো হিষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যে স্নান, তার নাম ব্রাহ্ম স্নান, গোরজ দ্বারা যে স্নান তার নাম বায়ব্য, আর সূর্যকরস্পর্শে যে রৌদ্র স্নান তার নাম দিব্য স্নান; স্নান গণনায় এইটি পঞ্চম স্থান আর ভস্ম স্নান অর্থাৎ আগ্নেয় স্নানই সর্ববিধ স্নানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহামুনি বলেছেন — তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন স্নাত্বা ভূতেশ্বরে তু যঃ। পূজয়েদ্দেবমীশানং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। অতএব যিনি সর্বপ্রযত্নে ভূতেশ্বর তীর্থে ভস্ম স্নান করে দেবাদিদেব ঈশানের পূজা করেন, তাঁর বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচি হয়। আপনারা আলখাল্লা কোর্তাদি গাত্রবস্ত্র খুলে ফেলে সকলেই গায়ের ভস্ম মাখতে থাকুন। দিব্য স্নান হতে বায়ব্য স্নান শ্রেষ্ঠ, বায়ব্য হতে ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্ম হতে বারুণ শ্রেষ্ঠ আর সেই আগ্নে বা ভস্ম স্নান বারুণ হতেও শ্রেষ্ঠতর।

তাঁর নির্দেশমত গায়ে ঘষে ঘষে ভস্ম মাখলাম। আমাদের ভস্ম স্নানের পর তিনি বলতে লাগলেন — আপানার পরিক্রমাবাসী তাই আপনাদেরকে এই পীঠের কিছু গুহ্য কথা বলছি। মন দিয়ে শুনুন। গৃহীদেরকে এই গুহ্যতত্ত্ব বলা হয় না। এই ভূতেশ্বর মহাদেবের স্থান শাম্ভবী পীঠ নামে প্রসিদ্ধ। আপনারা উত্তরতট ধরে পরিক্রমা করতে করতে নিশ্চয়ই সমনী মহল্লায় শুণ্ডীশ্বর বা শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে এসেছেন। সেই স্থান যেমন দ্রুত খেচরী সিদ্ধির স্থান, খেচরী পীঠ নামে প্রসিদ্ধ, তেমনি এই স্থানে শাম্ভবী সাধনা করতে ভূতেশ্বরের কৃপায় আশাতীত রূপে অল্পকালের মধ্যেই শাম্ভবী সিদ্ধি ঘটে। সাধকের তখন সতত জাগ্রত অবস্থাতেও অর্ন্তলক্ষ্য বহিঃদৃষ্টি জন্মে। আমি শাম্ভবী সাধনার ক্রম বলছি, মন দিয়ে শুনুন। এই মহাপীঠের আচার্য হিসাবে কেবল আগ্রহী নর্মদাগতপ্রাণ পরিক্রমাবাসীদের কাছেই এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার বিধান আছে। আমাকে আপনারা অকপটে বলুন আপনাদের খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত আছে কিনা। নিজেদের জিহ্বা নির্গত করে নাসাগ্রমূলে স্থাপন করে দেখালেই আমি বুঝতে পারব। মোহান্তজী বললেন — আপনি দয়া করে ধরে নিন, আমরা গুরু কৃপায় সকলেই খেচরী মুদ্রা দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করেছি। এই সময় মতীন্দ্রজী পুরোহিতমশাইকে মোহান্তজী যে মহাত্মা কমলভারতীজীর বর্তমান গদীনসীন মহাত্মা, তা এক ফাঁকে জানিয়ে দিলেন। তিনি খুব খুশী হয়ে বললেন — খেচরী মুদ্রায় অধিকার না থাকলে শাম্ভবী সাধনা আয়ত্ত করা যায় না, জিজ্ঞাসা করা নিয়ম তাই জিজ্ঞাসা করছি। নতুবা পরিক্রমাবাসী যে নর্মদাতটে বিশেষতঃ একটি পীঠেস্থানে বসে অসত্য উচ্চারণ করেন না, তা আমার জানা আছে। দু' এক মিনিট নীরবে থেকে ভূতেশ্বরের দিকে তিনি তাকিয়ে বলতে লাগলেন — শাম্ভবী সাধনার ধ্যান কৌশল এই যে —

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্ যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্যাৎ বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভঃ॥

অর্থাৎ সাধক যদি শিবনেত্র হয়ে অর্থাৎ নয়নযুগলের তারাদ্বয় নাসামূলের অতি নিকটে এনে ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে ললাট অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত দিব্য জ্যোতির্ময় অন্তরাত্মাকে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ভাবনা করেন, তাহলে জগদ্গুরু মহাদেবের কৃপায় বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ এক দিব্যজ্যোতিঃ সহসা প্রকটিত হয়। ঐ জ্যোতিঃ দর্শনের ফলে অনুভবী সাধকরা প্রত্যক্ষ করেছেন —

এতচ্চিন্তন মাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ।
দুরাচারোহপি পুরুষো লভতে পরমং পদম্॥
অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎকরোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেৎ ধ্রুবম্॥

— ঐ জ্যোতিঃ দর্শনকারীর সকলরকম পাপ নষ্ট হয়, শাম্ভবী সাধনার দ্বারা দুরাচারী ব্যক্তিও পরমপদ লাভ করতে পারে। যে বিচক্ষণ সাধক, এই সাধনাতে দিবারাত্র ডুবে থাকতে পারেন। তাঁর সিদ্ধপুরুষ দর্শন এবং সেই সেই সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে যে কথোপকথনও হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই; এবং তাঁর মুখ হতে যে কথাই উচ্চারিত হবে, তা সত্য হতে বাধ্য।

আমি একটু আগে আপনাদের কাছে খেচরী মুদ্রা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলাম তার কারণ, শাম্ভবী সাধনায় প্রথমেই জিহ্বাগ্রভাগকে লম্বিকা বা আলজিহ্বার উপরদিয়ে তালুকুহরে প্রবেশ করাতে হয়। যখন জিহ্বাগ্র সম্যকভাবে তালুকুহরে প্রবেশ করে যায় তখন, কেবল তখনই দুই চোখের তারাকে নাসামূলের নিকটে এনে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ভ্রূদ্বয়ের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দৃঢ় নিবদ্ধ করতে হয়। ভরা মনের ষোল আনা আকুতি নিয়ে কাতরভাবে সে সময় পরমেশ্বর শিবসুন্দরের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেই প্রাণের ঠাকুর জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকটিত হন। তাঁর সেই দিব্য অঙ্গজ্যোতিঃ স্থিরভাবে দেখতে দেখতে অকস্মাৎ একসময় প্রণব বিজড়িত দীপকলিকাকার অন্তরাত্মায় দর্শন লাভে সমগ্র জগৎ সহ নিজেকে ঐ জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে দেখতে পেয়ে সাধক কৃতকৃতার্থ হয়ে যান। সে সময় সচরাচর সর্বত্রই ঈশ্বরকোটির সিদ্ধ মহাপুরুষদের দর্শন এবং অযাচিতভাবে তাঁদের কৃপালাভ সম্ভব হয়। অলমিতি।

তাঁর কথা শেষ হতেই রাত্রি পৌনে ন'টা বেজে গেল। আমরা ভূতেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে বিভূতি প্রসাদ নিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে ভারোচ শহরের দিকে এগোতে লাগলাম। এপথ ওপথ ঘুরে, রিক্সাওয়ালা এবং অন্যান্য পথচারীকে জিজ্ঞাসা করতে করতে যখন জগন্নাথজীর বাড়ীতে এসে পৌঁছালাম তখন রাত্রি সাড়ে ১০ টা বেজে গেছে। আজও দেখলাম, ভক্তদম্পতি কম্বল মুড়ি দিয়ে সদর দেউড়ীতে আমাদের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। মোহান্তজী হাসতে হাসতে জগন্নাথ-পত্নীকে বললেন — মায়ী! মা নর্মদার দয়ায় আজ কোনমতে এই ভৃগুক্ষেত্রের ৪৬ টি শিবস্থান নিরাপদে পরিক্রমা শেষ করলাম। কাল বৃষখাতে গিয়ে বাঙালী বাবা ছাড়া আমরা সাতজন পরিক্রমা সমর্পণ করব। কয়েক ডেলা কর্পূর সকালে আনিয়ে নেবে। উপরে চল, আমি টাকা দেব। কাল কড়াই প্রসাদ তৈরীর ব্যবস্থাও তুমি করবে। কাল-পরশু দু দিনই তোমাদের কাছে থাকব আর পেটভরে তোমার হাতে খাবো।

মোহান্তজীর কথা শুনে তাঁর মায়ী আনন্দে গদগদ হয়ে হাসতে লাগলেন। দোতলায় উঠতে উঠতে তিনি বলতে লাগলেন — আমাদেরকে আসতে দেখে তোমার মুখে হাসি ফুটেছিল, আমি লক্ষ্য করেছি। দুদিন তোমার কাছে থাকব শুনেও তোমার মুখে হাসি ফুটেছে। মাগো! দেহ বিষয় সব কুছ মায়া, সচ্ হরিভক্ত নকী হাসি — এই দেহ গেহ বিষয়, আশয়, সবই মায়া, একমাত্র সত্য এবং সুন্দর হল হরিভক্তদের মুখের হাসি।

দোতলায় উঠে মোহান্তজী তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেলেন। আমরা বারান্দায় রাখা গরম জলে হাত মুখ পা আদি ধুয়ে যে যার আসন ও বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। আজ মঙ্গলবার ১৬ই কার্তিক, ১৩৬১ সাল, ইংরাজী ২। ১১। ১৯৫৪। আমি পূর্বেই বলেছি, মোহান্তজীর

ঘরটি আমাদের ঘরের পাশেই অবস্থিত। দরজা না বন্ধ করলে পাশের ঘরের কথাবার্তা এ ঘরের বসেই শোনা যায়। আমরা শুনতে পেলাম, জগন্নাথজী বলছেন যে লক্ষ্মণভারতীজী আজ তাঁর খোঁজে এসেছিলেন, এখনও দক্ষিণতটের পরিক্রমাবাসীরা এসে পৌঁছান নি। তিনি আগামীকালও সকালে আপনার কাছে আসবেন। উত্তরে মোহান্তজী কি যে বললেন, তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম না, ইতিমধ্যে তাঁর ঘরের দরজা কেউ ভেজিয়ে দিয়েছেন।

শুয়ে পড়লাম, শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন চব্বিশ অবতারে নর্মদার তটে বসে বসে দেখছি মহাত্মা সোমানন্দজীকে। সেই আলু থালু জটা দুলিয়ে তিনি বলে চলেছেন — 'যেয়েও আছে, থেকেও নাই। তেমনি তুমি আমি রে ভাই! আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি। রেবা মায়ের একী বিষম চাতুরী!

জানলি মা রেবা! তুই যা বলাস্, তাই বলি, তোর সুখেতেই চলি বলি। যা খাওয়াস্ তাই খাই, তুই ছাড়া মা তিলার্ধ নই।'

এই বলে তিনি কিছুক্ষণ নর্মদার জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর হঠাৎ উর্ধ্বদৃষ্টিতে আকাশমার্গে তাকিয়ে বলতে লাগলেন (চোখ দুটি এখন তাঁর অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে) — 'ঐ ভাবের মানুষটি কোথা থেকে এল মা! এর যে দেখছি নাইকো রোষ, সদাই তোষ, কেবল মুখ বলছে — অহম্ ভোঃ। এর সঙ্গে দেখছি কয়েকজন, সবার জন্য যেন একটি বুলি, একটি মন, সবটাই ন্যাংটার প্রেমে করছে চলাচল! ন্যাংটার নাই গুণের শেষ! চন্দন ছেড়ে অঙ্গে মেখেছেন ভস্মাবশেষ! চঞ্চল লোচনে চায়, বুঝতে পারি নে ব্যাটার অভিপ্রায়, কোথা থেকে কোথা যায়, কোথা আছে কোথা নাই, মরি নিয়ে গুণের বালাই!'

আবার কিছুক্ষণ তিনি স্থির হয়ে উর্ধ্বদৃষ্টিতে বসে থাকলেন। আমি দেখছি একটু পরেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নর্মদার তীব্র স্রোত বেয়ে তর্‌তর্ করে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে জানালা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন, আমি তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছি, তিনি যেন কিঞ্চিৎ হাঁপাচ্ছেন! আমার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন — যদি পেতে চাস্ সেই শুদ্ধধন, কস্যে তুই কর সাধন। যারা জোর করে চালাবে কমি তারা ঠেকবে সংকটে, শমন এসে ধরবে জটে ! ফেরে ফারে দিতেই হবে করে, ষোল আনাতে ভুক্তন বটে ! ফড়্যা যারা ডুববে তারা, বাটখারা যাদের কম; ধরে তসিল করবে যম আর গদীয়ান্ জহুরী যারা, বস্যে করছে প্রেমরতন। সাধন বিনা কেউ যেতে পারবে না, কেননা, পথে আছে এক থানা, সোনার বেনে সোনা চিনে, নেবে নিক্তিতে করে ওজন!

উদম ন্যাংটা কড়োয়াধারী, আমার মায়ের বাপ্, অটল প্রেমের অধিকারী। দরদীর মত দরদী বটে, যখন যা চায় তাই ঘটে, তবে মিছি পূজা ঘটে পটে, দেখ সেরূপ নেহার করি।

জেনে রাখ্ তুই বামুন ছ্যানা, চোখ থাকতেও হোস না কানা, আমি স্বরূপের বাজারে থাকি, তাঁর রূপেতে দিয়ে আঁখি, সে-রূপ সতত দেখি, শুনে রাখ তুই সারকথা —

দুটি দল আর হাজার দলে  
দুয়ে মিলে এত তালে গেলে,  
তবে তায় সাধক বলে,  
রেবা মিলে ব্রহ্মনালে!

এই বলে তিনি জটা দুলিয়ে দুলিয়ে কলকণ্ঠে হাসতে লাগলেন, ঠিক যেমনভাবে তিনি হাসতেন, চব্বিশ অবতারের ঘাটে বসে? দু এক মিনিট পরেই দেখলাম, দৃশ্যপট বদলে গেছে! তিনি ঘাটে নেমে দু হাত ভরে অঞ্জলি অঞ্জলি জল নিয়ে, সেই জলের দিকে তাকিয়ে গান গাইতে লাগলেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রামপ্রসাদী সুরে—

এ নয় মা তোমার তেমন ছেলে,
যে তোমায় ছেড়ে এক পা চলে।
হাতে নিয়ে চিটের মোয়া, চাও না যেতে আমায় ফেলে,
(এ যে) আঁচল ধরা ছেলে গো তোর,
ভুলবে না আর কিছুই দিলে।
মা বিনে যে মায়ের ছেলে, ভুলে না মা কিছুই পেলে,
যা কর, তা কর গো মা, আমি আমি মায়ের কোলে।
পাতিয়ে অনন্ত শয্যা, সচ্চিৎ আনন্দজলে
ক্ষেপারে শায়িত করি, যথা ইচ্ছা যাও মা চলে॥

গান গাইতে গাইতে তিনি নর্মদার জলে ঝাঁপ দিলেন! আমি শিউরে উঠলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। সর্বাঙ্গ শিথিল। উঠে বসবারও ক্ষমতা নাই।............

হঠাৎ মতীন্দ্রজী আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঢুকলেন। 'অনেক বেলা হল', সকাল আটটা বেজে গেছে। দেখবেন চলুন, লক্ষ্মণভারতীজী এসে পৌঁছেছেন। দুই বন্ধুর মিলন দৃশ্য দেখবেন আসুন, গুরুজীর পায়ে পড়ে লক্ষ্মণভারতীজী কেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! ..... কি হল আপনার! শুধু জুল জুল করে তাকিয়ে আছেন কেন?

এই বলেই তিনি, এই ঘরে বোধহয় কোন জিনিষ আনতে এসেছিলেন, তা তাঁর থলে থেকে নিয়ে, দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমর মন নানারকম 'কু' গাইছে! তবে কি মহাত্মা সোমানন্দজী চলে গেলেন? নর্মদায় তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়ার' দৃশ্য কি তারই ইঙ্গিত ? তাঁর কণ্ঠে কেন শুনলাম, 'অনন্তশয্যা, সচ্চিৎ-আনন্দজলে শায়িত' ইত্যাদি শব্দ? আমার বুকের ভিতরটা 'হু হু' করে উঠল, আমি মুখে কম্বল চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকলাম।

কেঁদে কেঁদে বুকটা হাল্‌কা হল, আমি ধীরে ধীরে অনেক চেষ্টা করে, কোনমতে উঠে বসলাম। লাঠিটা আমার আসনের পাশেই ছিল। কোনমতে লাঠিটা ধরে উঠে দাঁড়ালাম। নিজেই নিজের হাত পা দলে নিয়ে লাঠি ধরে ধরে বারান্দা দিয়ে ঢুকে গেলাম স্নানের ঘরে। প্রাতঃকৃত্য সেরে যখন বাইরে এলাম, তখন বেলা ৯টা বেজে গেছে। আমার শোবার ঘরের কাছেই মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতীজীকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। 'ক্যা, আপকা তবিয়ৎ থোড়াসা বুরা মালুম হোতা হৈ?' লক্ষ্মণভারতীজী কথা বলতে বলতে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরলেন। মোহান্তজী মন্তব্য করলেন — এই ভৃগুকচ্ছের সমস্ত তীর্থ উদয়াস্ত পর্যটন করতে করতে আমাদের সকলেরই শরীর অল্পবিস্তর খারাপ হয়েছে। এই জন্যই ত আপনাকে বলছি, আজ আমরা বৃষখাতে পরিক্রমা সমর্পণ করে এসে আজ আর কাল দুদিনই এখানে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করছি। কাল সন্ধ্যা নাগাদ আমরা আশ্রমে যাবো। তোমাকে যে সাতটি গিনি

দিয়েছি, তা ভাঙিয়ে মণ্ডলেশ্বরে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সওদা করতে থাক।

কথা বলতে বলতেই বারান্দা থেকে উঁকি মেরে আমরা দেখলাম জগন্নাথজী পরিক্রমা সমর্পণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, ফুল বেলপাতা সুজি চিনি ঘি ধূপকাঠি ইত্যাদি নিয়ে বাড়ীর ভিতরে এসে ঢুকলেন। মোহান্তজীর তাড়ায় আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে পড়লাম বৃষখাতের উদ্দেশ্যে। লক্ষ্মণভারতীজীও আমাদের সঙ্গে চললেন। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে বৃষখাতে পৌঁছেই পাথরের একটি তেউড়ী সাজিয়ে লক্ষ্মণভীরতীজী চিরাভ্যস্ত পদ্ধতিতে আগুন জ্বেলে কড়াই প্রসাদ পাক করতে বসলেন। আমরা স্নান করতে ঘাটে নামলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে আমি কৌপীন ও আলখাল্লাদি পরছি এমন সময় লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন কড়াই প্রসাদ তৈরী হয়ে গেছে। আজ বেশ শীত পড়েছে। আমি তটের উপর বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে পরিক্রমা সমর্পণের পদ্ধতিটি শ্রদ্ধাভরে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম। মোহান্তজী সহ সাতজন কোমর পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে প্রথমেই করলেন মা নর্মদার পূজা এবং আরতি। লক্ষ্মণভারতীজী কতকটা জলে নেমে এক একটি পূজার সামগ্রী তাঁদের হাত হতে পঞ্চপ্রদীপ ও পুষ্পপাত্র নিয়েই সাতজনের হাতে সাতটি কড়াই প্রসাদের পাত্র এগিয়ে দিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাতে লাগলেন। তাঁরা কড়াই প্রসাদের পাত্রের এক কোণে রাখা কর্পূর জ্বেলে নিয়ে দুই হাতে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে গাইতে লাগলেন —

হে মাতা কী মূর্তি মনোহর। সৌম্য সুলোচন সুন্দর সুখকর।
বহতি কল্লোলিনী করি-করি হরহর।
সুধা সম পয়মেঁ নিত ভীজৈ। আরতি রেবা কী কীজৈ॥
শম্ভুকী পুত্রী আপ্ সুকুমারী। জননী গিরিজা কী অতি পিয়ারী।
বিন্ধ্য সুত মেকল শিরধারী।
প্রেম বিনু জীবন য়হ ছীজৈ। আরতি রেবাকী কীজৈ॥
জননী তব নামনিকুঁ গাউঁ। মনোহর মুরতি নিত ধেয়াউঁ।
পাদপদমণিমেঁ শির নোয়াউঁ।
দাসকুঁ আপনো করি লীজৈ। আরতি রেবাকী কীজৈ॥

স্তব পাঠের শেষে সবাই দেখলাম, কড়াই প্রসাদ ঢেলে দিলেন নর্মদার জলে। মহাদেবের বন্দনা ও প্রণাম সেরে সবাই ডাঙায় উঠে এলেন। বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে পাত্রাদি গুছিয়ে নিয়ে আমরা বেলা বারটা নাগাদ্ জগন্নাথজীর কুঠিতে ফিরে এলাম। রুণ্ডা পরিক্রমা সমর্পণের পদ্ধতি আমার দেখা হয়ে গেল। জগন্নাথ-পত্নী আমাদের ভূরিভোজের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা খাওয়া দাওয়ার পর যে যার ঘরে বসে বিশ্রাম করতেই লাগলাম। বেলা চারটা পর্যন্ত আমি বসে বসে ডায়েরী লিখলাম। মনে কিন্তু অস্বস্তি লেগেই আছে , কেবলই মনশ্চক্ষুতে মহাত্মা সোমানন্দজীর স্বপ্নদৃষ্ট মুখখানি ভেসে উঠছে। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে মোহান্তজীকে বললাম — সৌভাগ্যসুন্দরীর মন্দিরের দিকে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। অনুমতি দিন।

মোহান্তজী আমাকে একা যেতে দিলেন না। মতীন্দ্রজীকে আমার সঙ্গে পাঠালেন। আমরা

বেড়াতে বেড়াতে দুজনে গিয়ে সৌভাগ্যসুন্দরীর মন্দিরে গিয়ে পৌঁছালাম। দুদিন আগে এই মন্দিরের বারান্দায় বসিয়ে সেই কঙ্কালসার রহস্যময় সাধু আমাদেরকে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, তাঁর দর্শন পেলে তাঁকে মহাত্মা সোমানন্দের কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করব। যে কোন কারণে হোক, আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছিল সেই রহস্যময় সাধু সর্বান্তর্যামী মহাত্মা। যেমনি পাণ্ডিত্য তেমনই যোগে উন্নত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি তাঁর দর্শন পেলাম না। আমি সৌভাগ্যসুন্দরীর মন্দিরে এসে বসে রইলাম। মন্দিরে ভক্তের ভীড় লেগেই রয়েছে। সন্ধ্যা হতেই আরতি আরম্ভ হল। সজল নয়নে আমি আরতি দেখলাম। মতীন্দ্রজী বসে জপ করলেন। আমার জপ বা সান্ধ্যক্রিয়ায় মন বসল না, যতক্ষণ আরতি হল, ততক্ষণ ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম। মতীন্দ্রজী ভাবলেন — আমি সৌভাগ্যসুন্দরীর আরতি দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেছি। আমি কি যে করব ভেবে পেলাম না। কাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারব সোমানন্দজীর বার্তা! যাই হোক, আরতি শেষে নীরবে মতীন্দ্রজীর সঙ্গে জগন্নাথজীর কুঠীতে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যা তখন ৭টা বেজে গেছে। মোহান্তজীর কাছে আর সবাই বসে আছেন। আমরা দুজন গিয়েও তাঁর ঘরে বসলাম। লক্ষ্মণভারতীজী আশ্রমে ফিরে গেছেন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপ করে শুনতে লাগলাম, মোহান্তজীর কথাবার্তা। তিনি বলে চলেছেন — মহর্ষি ভৃগুজীকা তপস্থলী ইস্ নগরী নে সংসারকে বহুৎ সে উলট্ কর দেখে হৈঁ। পহিলে য়হ সনাতনী আর্য হিন্দু রাজায়োঁ কী রাজধানী রহী। গ্যারহবীঁ (একাদশ) শতাব্দীমেঁ সিন্ধুরাজ জয়সিংহ নে নর্মদা কিনারে বড়া ভারী কিল্লা বনবায়া থা। উসকে ধ্বংসাবশেষ অভী তক্ বিদ্যমান হৈ। ফির মুসলিম শাসন আয়া। বাহাদুর শাহ ঔর ঔরঙ্গজেব নে ইস্ কিল্লে কা জীর্ণোদ্ধার করায়া। সন্ ১৩০০ সে লগভগ সাড়ে চার সৌ বর্ষ ইহ্ মুসলমানো কে অধীন রহা। অঙ্গরেজী কোম্পানী নে উনসে ছিন্ লিয়া, ১১ বর্ষ উসকে অধীন রহা। ফিন উনসে মারাঠীনে ছিন্ লিয়া। ২০ বর্ষ মারাঠীকা অধীন রহা। মারাঠীসে অঙ্গরেজনে ছিন্ লিয়া, লগভগ ১৫০ বর্ষো তক্ অঙ্গরেজ কা অধীন রহা। স্বরাজ হোনে পর য়হ ভারত সরকার কে অধীন হৈ। যঁহা প্রায়ঃ নিত্য হি জোয়ার ভাঁটা আতে হৈ ঔর রামপুর গ্রাম তক্ যাতে হৈ, জো য়হা সে ১৫ মীল হোগা .....

তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার প্রবল জ্বল এল। উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। আমাকে থরথর করে কাঁপতে দেখে মোহান্তজী এসে আমার কপালে হাত দিয়ে আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে বললেন। তিনি নিজেও আমার সঙ্গে এসে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলেন। রাত্রে আমার কোন হুঁশ ছিল না। ঘুম ভাঙল একেবারে সকাল ৯টায়। চোখ মেলে দেখি মোহান্তজী আমার কাছে বসে রয়েছেন। শুনলাম, আর সকলে নর্মদায় স্নান করতে গেছেন। জ্বর এখন নাই বললেই হয়। তবে শরীরে খুব দুর্বলতা অনুভব করছি। লক্ষ্মণভারতীজী মূল আশ্রম হতে এসে পৌঁছেছেন। তিনি কিছু লতার রস আমাকে খাইয়ে দিলেন। আমি কমণ্ডলুতে নর্মদার জল দর্শন ও স্পর্শ করে লাঠি ধরে ধরে প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। বেলা ১২টা নাগাদ জ্বর ছাড়ল। আমার সঙ্গীরা যথাসময়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন, লক্ষ্মণভারতীজীর নির্দেশে জগন্নাথ-পত্নী আমাকে কিঞ্চিৎ পাতলা খিঁচুড়ী করে খাওয়ালেন। খাওয়ার পরেই

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল বিকেল সাড়ে চারটায়। বলিহারী লক্ষ্মণভারতীজীর লতাপাতার গুণ। শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। আমি উঠে বসতেই মোহান্তজী বললেন — তুমি কি আমাদের সঙ্গে আমাদের আশ্রমে যেতে পারবে? না হয়, তুমি এখানেই দু'একদিন থাক। কাল এসে আমি তোমাকে দেখে যাব। আমি উত্তরে বললাম, এখানে থাকতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি আপনাদের সঙ্গেই যেতে চাই।

আমি তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। রতনভারতীজী গণেশভারতী এবং মতীন্দ্রজী ভাগাভাগি করে আমার গাঁঠরী ঝোলা প্রভৃতি সঙ্গে নিলেন। কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। জগন্নাথজী ও তাঁর পত্নী কর্পূর জ্বেলে মোহান্তজীর আরতি করে চোখের জলে পুস্পার্ঘ্য দিয়ে বিদায় দিলেন। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম।

প্রায় মাইলখানিক হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছালাম মূল আশ্রমে। বিরাট আশ্রম, মূল ফাটকে লেখা আছে — মণ্ডলেশ্বরাধিপতি ব্রহ্মলীন মহাত্মা কমলভারতীজী। আশ্রমের বিশাল চত্বরে অনেক ছাউনী সাজানো আছে। লক্ষ্মণভারতীজী এসব সাজিয়ে রেখেছেন দক্ষিণতট হতে পরিক্রমাবাসীদের প্রত্যাবর্তনের আশায়। দোতালা আশ্রমবাড়ীর উপরে নিচে প্রায় চল্লিশখানা ঘর। দোতলায় ঠাকুর ঘর, একটি শিবলিঙ্গ এবং মহাত্মা কমলভারতীজী ও চৈতন্যভারতীজীর বিরাট দুটি তৈলচিত্র টাঙ্গানো আছে। ঠাকুর ঘরের পাশেই মোহান্তজীর সুসজ্জিত ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত গদী।

আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দোতলার উপরেই একটি ছোট ঘরে আমার ও মতীন্দ্রজীর আসন পাতার বন্দোবস্ত হল। মোহান্তজী হাত মুখ ধুয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন, আরতি করতে। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে অনেক বিশিষ্ট লোক এসেছেন আরতি দেখতে। আরতির শেষে মোহান্তজী আশ্রমের বড় হলঘরে বসে সমাগত ভক্তদেরকে গুজরাটি ভাষায় নানারকম উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর সেই গুজরাটি কথ্যভাষা আমার বিন্দুমাত্র বোধগম্য হল না। আমি কিছুক্ষণ বসে প্রণাম করে চলে গেলাম নিজের ঘরে। সান্ধ্যক্রিয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

১৯ শে কার্তিক সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে দেখলাম মতীন্দ্রজী তখনও ঘুমিয়ে আছেন। কতরাত্রে যে তাঁদের সৎসঙ্গ শেষ হয়েছিল আমার জানা নাই। শরীর আজ বেশ স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। লক্ষ্মণভারতীজী কবিরাজ-পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে সকাল সাতটা নাগাদ আমার ঘরে এসে আজও কালকের মত লতাপাতার রস খাওয়ালেন। বেলা ৯টা নাগাদ গেলাম বৃষখাতে স্নান করতে। জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা, জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। স্নান তর্পণ সেরে বেলা ১০ টা নাগাদ এসে দেখি, দক্ষিণতট হতে পরিক্রমাবাসীরা ফিরে এসেছেন। নাগাদের ভীড়ে হর নর্মদে ও শিঙ্গা ডম্বরুর ধ্বনিতে সারা আশ্রম মুখরিত হয়ে উঠেছে। ভীড় ঠেলে কোনমতে দোতলার ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। মতীন্দ্রজী নিচে নেমে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানালেন, প্রায় ৫০ জন নাগা নৌকাতে নর্মদা অতিক্রম করে মণ্ডলেশ্বর ফিরে গেছেন। ১৭৫ জন নাগা এখানে এসেছেন। হরিধাম হতে যে ৪৩ জন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণভারতীজী ভৃগুকচ্ছে এসে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা ত সঙ্গে আছেনই। এই নিয়ে মোট

২২৫ জন নাগার ভীড়ে চারিদিক গমগম করছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মনে ভজন গাইছেন, কেউ স্তব পাঠ করছেন, কেউ বা আগুন জ্বেলে বেদমন্ত্র পাঠ করতে করতে আহুতি অর্পণ করছেন। আমি নিচে নেমে প্রত্যেক ছাউনীতে ছাউনীতে ঢুকে নাগাদেরকে দর্শন করতে লাগলাম। মতীন্দ্রজীও আমার সঙ্গে পুনরায় নিচে নেমে ছউনীতে ছাউনীতে ঘুরে ঘুরে সকলকে দেখাতে লাগলেন। সাত নম্বর ছাউনীতে একজন নাগাকে দেখে চমকে উঠলাম। প্রায় সাড়ে ছ ফুট লম্বা একজন দীর্ঘদেহী মহাত্মা ছাউনীর বাইরে নির্নিমেষ লোচনে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে সেখান থেকে কিছুদূরে মতীন্দ্রজী টেনে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি জানালেন — ইনি ত্রাটক সিদ্ধ মহাপুরুষ, নাম দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ। আমাদের পরমগুরু চৈতন্যভারতীজীর শিষ্য। প্রধানতঃ এঁরই চেষ্টায় গুরুজী গদীতে সমাসীন হতে পেরেছেন। ইনি বহু ভাষাবিদ্। মতীন্দ্রজী আমাকে লঙ্গরখানায় যেখানে লক্ষ্মণভারতীজীর তত্ত্বাবধানে এতগুলি নাগার ভোজ্য প্রস্তুত হচ্ছে, সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু দীর্ঘাঙ্গী মহারাজকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা হল না। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকেই দেখতে লাগলাম। প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ তিনি সূর্যকে প্রণাম করে ছাউনীর মধ্যে ঢুকলেন। মতীন্দ্রজীর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে আমরা দুজনেই প্রণাম করলাম। তিনি মৃদু হেসে একটি একতারা টেনে নিয়ে আপন মনে গান গাইতে লাগলেন —

ফুলের সৌরভেতে জগৎ মেতেছে।
যত ফুল তত মূল সে ফুল কোথা থেকে এসেছে!
যে ফুলে হয় জগৎ গঠন, করলিনে সেই ফুলের যতন,
প্রাণের ধ্বনি যে, তায় মিশেছে ॥
সে ফুল নয় সামান্য কথা, খুঁজলে পাবি প্রাণকে হোথা,
লতায় পাতায় চাঁদ নেমেছে।
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে॥

তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু তিনবার ধরে গানটি গাইলেন। গান শেষ হতেই তিনি আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসলেন। মতীন্দ্রজী বললেন — এই হল আমাদের চলে যাবার ইঙ্গিত। আমি বললাম — দেখে মনে হচ্ছে এঁর পাঞ্জাবী শরীর, এঁর মুখে বাংলা গান শুনতে পাব আশাই করতে পারি নি। ইনি বাংলা জানেন, এ বড় আশ্চর্য ত ?

— উনি কোন্ ভাষা জানেন না? আমরা উভয়েই বাংলা ভাষাভাষী, তাই ওঁর মুখ দিয়ে বাংলা গান উচ্চারিত হল। পাঞ্জাবী হলে গুরুমুখীতে, গুজরাটি হলে গুজরাটিতে, হিন্দীভাষী হলে হিন্দীতে, মাদ্রাজী হলে তামিল বা তেলেগুতে, ইংরাজী হলে ইংরাজী ভাষা এঁর মুখ হতে অনর্গল নির্গত হয়। একবার দেখেছি , একদল ভীলকে ইনি ভীল ভাষায় গান শুনিয়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। আমরা দোতলায় উঠে নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। বেলা দেড়টা বাজতেই ঢং ঢং করে খাওয়ার ঘন্টা পড়ল। আমরা লঙ্গরখানায় গিয়ে খেতে বসলাম। মিনিট পাঁচেক পরেই মোহান্তজী দীর্ঘাঙ্গী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন। আমি খেতে খেতে দীর্ঘাঙ্গী মহারাজের গানের ভাষা সেই 'ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে' গানটির ভাবার্থ বুঝবার চেষ্টা করলাম। বলা বাহুল্য, অনেক চিন্তা করেও গানের নির্গলিতার্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলাম। মতীন্দ্রজীকে বললাম — আপনি ত ধলহারায় গিয়ে পাগলী মাকে দর্শন করেছেন। তাঁর গুরু স্বামী ভূষণানন্দজীও ত্রাটক সিদ্ধ ছিলেন। তাঁকে দেখেছি, পাগলী মার আশ্রমের নিকটেই বড় দীঘির দক্ষিণ পাড়ে শ্মশানে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। সূর্যের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ ও দৃষ্টিও ঘুরত। মতীন্দ্রজী বললেন — দীর্ঘাঙ্গী মহারাজকে আগে দেখেছি, উনিও সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ত্রাটক সাধনা করতেন। গুরুজীর কাছে শুনেছি , উনি ত্রাটকে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

বেলা চারটার সময় হতে দেখলাম, আশ্রমে ক্রমশঃই দলে দলে লোক আসছেন। মন্দিরে আরতির পরেই হলঘরে গিয়ে বসলাম। উপরে নিচে কোথাও তিলধারণের স্থান নাই। তখনকার দিনে মাইকের ব্যবহার ছিল না; একটা বড় চোঙের (পূর্বে হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ নামক গ্রামোফন রেকর্ডে যেমন থাকত) কাছে বসে মোহান্তজী নর্মদার বন্দনা করে তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট দীর্ঘাঙ্গী মহারাজকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন — 'যোগমার্গমেঁ এক অজপা গায়ত্রী জপ হৈ। জিস্‌মে জিহ্বা সে তো জপ্‌না নহীঁ পড়্তা, কিন্তু অখণ্ড আঠোঁ প্রহর — জপ হোতা রহতা হৈ। উহ্ জপ্‌কী গায়ত্রী কৌন সা হৈ। ভিতর জো বায়ু যাতী হৈ উসে 'প্রাণ' কহতে হৈ। শরীরকে ভিতর সে জো বায়ু নিকলতে হৈ উসে 'অপান' কহতে হৈঁ। ভিতর সে জব বায়ু বাহর আবে অর্থাৎ প্রশ্বাস লেঁ, তব 'হং', ইস্ শব্দকো ধ্যানমেঁ রাখে। ভিতরকো জব শ্বাস লেঁ তব 'সঃ' ইস্ শব্দকা ধ্যান বনা রহে। ইস্ প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস পর 'হংসঃ', ইস্ মন্ত্রকা জপ তো স্বাভাবিক হোতা হী হৈ। কেবল ধ্যানকী আবশ্যকতা হৈ। ইসীলিয়ে যোগশাস্ত্রমেঁ কহা হৈ —

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসতে পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা॥

অর্থাৎ হকার সে প্রাণবায়ু বাহার যাতী হৈ, সকার সে প্রাণবায়ু ভিতর আতী হৈ। হংসঃ ইস্ পরম মন্ত্রকো জীব সর্বদা জপতা হী রহতা হৈ। হংস কো উলট্ দে তো উহি 'সোঽহং' বন্ যাতা হৈ। চাহে হংসঃ জপো চাহে সোঽহং। ইয়া ওম্ ইয়া রাম ইয়া 'রে-বা' 'রে-বা' জপো, ভিতর প্রাণ জায়ঁ তো 'রে' কো জপো, বাহর অপান নিকলে তো 'বা' কো জপো। ইস প্রকার 'রেবা' মহামন্ত্র কো সর্বদা জপতে রহো। জপ তো হোতা রহতা হৈ, কেবল শ্বাস প্রশ্বাস পর চিত্তকো বৃত্তিকো স্থির রখনা হৈ। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস পর ধ্যান বনায়ে রাখনা হৈ।

ইহ্ রে-বা, রে-বা ইয়া জো ভী দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হো উসকা সতত কীর্তন করনা হৈ। গীতা মেঁ ভগবান কহতে হৈঁ —

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ (৯ম। ১৪)

অর্থাৎ যো দৃঢ় ব্রতবালে সাধক মেরা সতত-নিরন্তর-কীর্তন করতে রহতে হৈ মেরী প্রাপ্তি কে হেতু প্রযত্ন করতে হুয়ে, মুঝে নমস্কার কর রহে হৈ, নিত্যযুক্ত হোকর মেরী উপাসনা করতে হৈ, উহ্ মুঝে হি প্রাপ্ত হোতে হৈ। সতত কীর্তন ভজন কে লিয়ে উপাসনা করতে হৈ, কি এক মেঁ হী সমস্ত চিত্তকী বৃত্তিয়োঁ লগী রহেঁ। এক খাপমেঁ দো তলবারেঁ নহী রহ সকতীঁ। তুম

চাহে কি 'রেবা রেবা' ভী রটতে রহেঁ ঔর সংসার কী সেবা মেঁ ভী সংলগ্ন রহেঁ তো অসম্ভব হৈ। ইসীলিয়ে গোপিকায়োঁ নে ফিরসে আয়ে হুয়ে ভ্রমর সে কহা থা — ওরে ভোঁওরা! তু হমে মথুরাবালে চতুর্ভুজ বিষ্ণু কে পাশ লে জানা চাহতা হৈঁ? অরে হম্ উঁহা যাকর ক্যা করেঙ্গী? হমেঁ লৌটনা হী পড়েগা, কেঁওকী উনকে বক্ষঃস্থল পর তো সতত লক্ষ্মী বিরাজমান রহতী হৈঁ। উহ্ তো লক্ষ্মীনারায়ণ হৈ, লক্ষ্মীজীকো হৈ। গোপীজনবল্লভ তো নহী। অতঃ রেবা-তীর পর রহকর রেবা কে হী হোকর নিরন্তর রেবা রটতে হুয়ে জীবন কে শেষ সময় কো সার্থক করনা য়হী রেবা সেবন কা, রেবা অর্চন কা, রেবা পরিক্রমা কা তাৎপর্য হৈ।'

দীর্ঘাঙ্গী মহারাজের মর্মগ্রাহী ভাষণ শেষ হল। ভক্তবৃন্দ প্রণামাদি সেরে হর নর্মদে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বসে থেকে আমার নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেলাম। মতীন্দ্রজী এখনও আসেন নি, প্রদীপ জ্বলছে। আমি কমণ্ডলু হতে জল খেয়ে প্রদীপের আলোতে বসলাম ডায়েরী লিখতে। ঘন্টা খানিক পরে রাত্রি প্রায় ১০ টায় মতীন্দ্রজী এসে ঘরে ঢুকলেন। এসেই তিনি বললেন — আজ মোহান্তজীর গদীতে প্রায় সাত হাজার টাকা প্রণামী পড়েছে। আজ ১৯ শে কার্তিক শুক্রবার, জগদ্ধাত্রী, পূজা ত! কাল দেখবেন, আরও বেশী প্রণামী পড়বে। আমি কোন উত্তর না দেওয়ায় তিনি নীরবে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। আমি বসে বসে ডায়েরী লিখে চললাম। নিচে নাগাদের ছাউনীর কাছে ঢং করে একটা ঘন্টার শব্দ হল। তার মানে এখন রাত্রি ১টা। লেখা শেষ করে একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নিচে নাগাদের সাত নম্বর ছাউনীর কাছ হতে হোমের সুগন্ধ ভেসে আসছে বলে মনে হল। কান পাততে শুনতে পেলাম মৃদু যন্ত্রধ্বনি। কৌতূহল বশে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম ধীর পদক্ষেপে। আশ্রম বাড়ীর নিচের তলার বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম, দীর্ঘাঙ্গী মহারাজের ছাউনীর ভিতরেই হোমাগ্নির আভায স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মন্ত্র আরও স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হচ্ছে —

ওঁ আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধূরন্ধরে।
ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

হে জগদ্ধাত্রী, তুমি আধার ও আধেয় স্বরূপিণী, তুমি সর্বভারবাহিনী, ধারণ শক্তিরূপিণী! তুমি সর্বকর্মবিধাত্রী, সনাতনী, শাশ্বতধামরূপিণী এবং চির অবিচলিত স্বভাবা — তোমাকে প্রণাম।

ওঁ পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণি।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাতিরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

হে জগদ্ধাত্রী; তুমি পরমাণু স্বরূপিণী এবং তুমিই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি অণুরাশিতে মিলিতা দ্ব্যণুকাদিস্বরূপা। তুমি সূক্ষ্ম হয়েও অতি সূক্ষ্মরূপিণী, তোমাকে প্রণাম।

মন্ত্রোচ্চারণ করেই শুনতে পেলাম; তিনি জগদ্ধাত্রী মহাবীজ উচ্চারণ করে 'স্বাহা যোগে আহুতি দিলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ; অধীর আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি বেশ কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন —

ওঁ অগম্য-ধ্যান-ধামস্থে মহাযোগীযে হৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে নর্মদায়ে নমোঽস্তুতে॥

অর্থাৎ মা নর্মদে! তুমি অগম্যলোকাধিষ্ঠিত চৈতন্য জ্যোতির্ময়ধাম নিবাসী মহাযোগীশ্বর মহাদেবের হৃদয়পুর নিহিত অসীম ও অতুলনীয় ভাবরাশির মধ্যে অধিষ্ঠিতা, অতর্ক অচিন্ত্য ভাবস্বরূপিণী! তোমাকে প্রণাম করি।

মহাত্মার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাঁর কান্নার করুণ সুরে আমার বুকের মধ্যটাও কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি আর দাঁড়ালাম না। পা টিপে টিপে দোতলায় উঠে এসে দোতলার শেষ প্রান্তে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। মতীন্দ্রজীর টর্চটি নিয়ে টিপে দেখলাম, রাত্রি তখন আড়াইটা। দীর্ঘাঙ্গী মহারাজের গভীর অর্থবহ ভাবোদ্দীপক নর্মদা মন্ত্রটি স্মরণ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকালবেলায় প্রায় আটটায়। মতীন্দ্রজীর বিছানা গুটানো আছে দেখলাম, তিনি উঠে বাইরে চলে গেছেন। বিছানা গুটিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম মোহান্তজী আমার কাছেই আসছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — বাবা তোমার শরীর ঠিক আছে ত! আমি 'হাঁ' বলতেই তিনি বললেন — দুদিন আগে জ্বর হয়েছিল ত! তাই ভাবনা। নাগারা দলে দলে নর্মদাতে স্নান করে এসেছেন। এখন যে যার নিত্যকার্যে ব্যাপৃত। মতীন্দ্রজী এখনও স্নান করেন নি। তুমি তার সঙ্গে গিয়ে স্নান তর্পণাদি সেরে এস।

আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে মতীন্দ্রজীর সঙ্গে নর্মদাতে গিয়ে স্নান তর্পণাদি করে এলাম। যাবার সময়েই লক্ষ্য করেছিলাম, দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ তাঁর ছাউনীর সামনে দাঁড়িয়ে যথারীতি সূর্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্নান করে ফিরে এসেও দেখি তিনি একই অবস্থায় দণ্ডায়মান। বেলা ১টার সময় খাওয়ার ঘন্টা পড়তেই আমি নাগাদের পংক্তিতে বসে খেয়ে নিলাম। খেয়ে উপরে উঠার সময় দেখলাম, দীর্ঘাঙ্গী মহারাজের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কেবল স্নানের পূর্বে বা পরে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন, সেই অবস্থা হতে তাঁর দৃষ্টিপথের সামান্য দিক পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র! সূর্য ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছেন পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে, তিনিও পূর্বাস্য হতে পশ্চিমাস্য হয়েছেন মাত্র! কঠোর সাধনা সন্দেহ নাই। সারা দুপুর ধরে ডায়েরীর পাতা ভরছি। বেলা প্রায় সাড়ে চারটার সময় নিচে নেমে গেলাম। অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটেছে। দীর্ঘাঙ্গী মহারাজের কাছ হতে প্রায় ২৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে সকলেই অতি সন্তর্পণে তাঁকে প্রণাম করে যাচ্ছেন। এমনিতেই তাঁর ছাউনীর চারপাশে মোটা মোটা কাছির ঘের দেওয়া আছে, ত্রিশূল হাতে কয়েকজন নাগা পাহারা দিচ্ছেন। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা ছাউনীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। ছাউনীর পর্দা ফেলে দেওয়া হল। মূল আশ্রমবাড়ীর উপরে নীচে অসম্ভব লোকের ভীড় জমল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করছেন। সেই উদ্দাম চিৎকারে ঘর থেকে বেরোতেই পারলাম না, সান্ধ্য ক্রিয়াতেও মন বসছে না। হর নর্মদে ধ্বনির সঙ্গে যে দুটি লাইনের অপরূপ সুর রঞ্জনা মনের মধ্যে গেঁথে গেছল, তা এখনও আমার মনে আছে—

১। রেবা তেরী মহিমা অতি ভারী, সকল পুরাণ ন গাহি।
তেরে জলকে কঁকর পত্থর, শংকর রূপ হো জাই।।

২। যম সে দূতন জায় পুকারে, পাপী খোজ খোজ হম হারে।
থে ইয়ে সব রেবাকে দ্বারে, বন্দ্ কিয়া যমদ্বার।।
নর্মদে হৈ তেরে আধার।।

রাত্রি প্রায় দশটায় কীর্তনের আসর ভাঙল। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে সবাই চলে গেলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা নাগাদ্ মতীন্দ্রজী শুতে এলেন। ঘরে ঢুকেই বলতে শুরু করলেন — আজ প্রণামী পড়েছে ১৪ হাজার টাকা। প্রণামী গুণতেই দেরী হয়ে গেল। গুরুজী সারা গুজরাটে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ এবার সঙ্গে আছেন। আগামী পাঁচ সাতদিনের মধ্যে আরও ভক্তদের ভীড় বাড়বে।

আমাকে কোন উত্তর না দিতে দেখে তিনি চুপ করে গেলেন। ঘুমিয়ে পড়লাম।

খুব সকালেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখলাম, মতীন্দ্রজীও জেগেছেন। আমি তাঁকে বললাম, আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে ভূতেশ্বর মন্দিরে যেতে। মোহান্তজীর ঘরের দরজা দেখছি এখনও বন্ধ। আপনি দয়া করে তাঁকে জানাবেন যে আমি মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বেই ফিরে আসব। তিনি পাশ ফিরে শুয়ে বললেন — 'লক্ষ্মণভারতীজীকে বলে যান।' আমি কমণ্ডলু হাতে কম্বল গায়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিচে নেমে আসি লক্ষ্মণভারতীজীকে দেখতে পেলাম না। আমি সোজা রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম। এখনও সূর্যোদয় হয় নি। আমি আধঘন্টা হাঁটার পরেই সূর্যোদয় হল। শহরে লোক চলাচল সুরু হয়েছে। শীতের সকাল বলে এখনও জড়তা ভাল করে কাটে নি। আমি একজন রিক্সাওয়ালাকে দেখতে পেয়ে ভূতেশ্বর মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। মনে হয়, সে আমার ভাঙা ভাঙা হিন্দী মোটেই বুঝল না। সোজা রাস্তায় আরও কতকটা পথ হেঁটে গিয়ে আরও একজন রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাণপণে 'ভূতেশ্বর, ভূতেশ্বরজী ,ভূতেশ্বর মহাদেবজী কিধার বা' জিজ্ঞাসা করেও যখন সঠিক উত্তর পেলাম না, সেই সময় একজন ছাত্রকে দেখলাম বই হাতে এগিয়ে আসতে। প্রায় পনের যোল বৎসরের কিশোর। সে আমার কথা বুঝল। আমাকে বুঝিয়ে বলল — সোজা রাস্তায় হেঁটে যেতে আপনাকে প্রায় সাত আট মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে। আমি মহল্লার পাশ দিয়ে একটা গলি রাস্তা দিয়ে কতকটা এগিয়ে দিচ্ছি , সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে লোককে কেবলই জিজ্ঞাসা করবেন — 'সেঁধবা কিধার বা?' সেঁধবা এই শহরতলীর বিখ্যাত শ্মশান। এই স্থান সবাই চেনে। সেঁধবা হতে কিছু দূরেই ভূতেশ্বরজীর মন্দির।

ছেলেটির কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, যে রাত্রিতে আমাদের ভৃগুকচ্ছের ৪৬ তম তীর্থ ভূতেশ্বর পরিক্রমা শেষ করি, সেদিন সেঁধবার মহাশ্মশানে মহারুদ্রস্থানে প্রণাম করে ভূতেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছেছিলাম। আমার মন খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ছেলেটি প্রায় মাইল খানিক পথ আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। আমি তাঁকে অজস্র আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণে হাঁটতে লাগলাম। বেলা প্রায় পৌনে নটায় আমি পৌঁছে গেলাম ভূতেশ্বরজীর মন্দিরে। দেখলাম মন্দিরের সেই জটাজূট পুরোহিতজী সেইমাত্র কৌপীনবস্ত অবস্থায় নর্মদায় ডুব দিয়ে এলেন। তার গা দিয়ে এখনও জল ঝরছে। আমাকে দেখেই বললেন — ক্যা কাঠিয়া বাবা! আপ্ ফিন ক্যায়সে আ গয়ে? আমি মহাদেবকে প্রণাম করে উঠেই ছলোছলো চোখে তাঁকে বললাম — আমি দিন পাঁচেক আগে গত মঙ্গলবার রাত্রে যেদিন এখানে ভূতেশ্বরজীকে প্রণাম করে ফিরে যাই, সেইদিন রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখি আমার একজন পরম শ্রদ্ধার পাত্র, পরমপ্রিয় একজন আপনজন যেন নর্মদায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গেলেন। সেই দৃশ্য দেখার পর থেকে মন আমার অহরহ কাঁদছে। তাই এই শাম্ভবী পীঠে এলাম যদি ভূতেশ্বরজীর দয়ায় মনে একটু শান্তি পাই।

— ঠিক হ্যায়, কোঈ বাত নেহি। পহেলে ত আপ নর্মদাজীমেঁ নাহাকর আইয়ে। আকর ভস্ম স্নান ইয়া আগ্নেয় স্নান কর লিজিয়ে। তব বাৎ চিৎ হোগা।

এই বলে তিনি কৌপীন বদলে নিয়ে ভস্ম স্নান অর্থাৎ গায়ে ছাই মাখতে বসলেন। আমি কম্বল সেখানে ফেলে রেখে কমণ্ডলু ও গামছা হাতে নিয়ে স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সংক্ষেপে সেরে যখন মন্দিরে ফিরে এলাম, তখন তাঁর আগ্নেয় স্নান শেষ হয়েছে। তিনি আমাকে জানালেন — পূর্বেই এখানে শুনে গেছ যে, নিত্য হবনই এখানে পূজার প্রধান অঙ্গ। আমি হোম করতে বসছি। তোমার কাছে এই ভূর্জপত্রটি রাখ। ভস্ম স্নান সেরে তুমি ভূতেশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গের অঙ্গগুণ্ঠন বা উদ্ধূলন ( ভস্ম মাখিয়ে গাত্র মার্জনা) করাবে তারপর সেই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি শিখার আভাতে এই ভূর্জপত্রটি দু হাতে ধরে, পাঠ উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। মহাদেবের দয়া হলে তোমার মনোবেদনা দূরীভূত হওয়ার কোন কারণ তদ্দণ্ডেই ঘটে যেতে পারে। তিনি মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে স্থায়ী যজ্ঞকুণ্ডে হোমের আয়োজন করতে লাগলেন। আমি ভস্ম স্নান অর্থাৎ ছাই ঘষতে ঘষতে ভূর্জপত্রটি সূর্যরশ্মির দিকে ধরে দু'তিনবার উল্টে পাল্টে দেখে নিলাম। সাধারণ ভূর্জপত্র, কোথাও কিছু লেখা নাই। আমি গর্ভগৃহের এককোণে পবিত্রভাবে সুরক্ষিত এক অঞ্জলি ছাই নিয়ে মনে মনে শিবস্তোত্র পাঠ করে লিঙ্গগাত্রে ছাই মাখাতে লাগলাম। মহাদেবের ভস্ম স্নান হয়ে গেলে বসে বসে জপ করতে লাগলাম। হোম যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন হোমশিখার সামনে দু হাতে ভূর্জপত্রটি মেলে ধরলাম। তাতে দেবনাগরী অক্ষরে জ্বল্‌জ্বল্ করে লেখা ফুটে উঠল — আত্যন্তিকম্। এই অত্যদ্ভূত দৃশ্য দেখে আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল : আমার মনে হল, মহাত্মা সোমানন্দজী চব্বিশ অবতারেই থাকুন, কিংবা সীতামায়ীর জঙ্গলেই থাকুন, তিনি নিশ্চয়ই কুশলে আছেন। মনে খুবই স্বস্তি পেলাম।

হবনের শেষে মহাত্মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — ক্যা কুছ্ দেখা। আমি তাঁকে দুটি পৃথক পৃথক শব্দের কথা বলতেই তিনি হেসে বললেন — ইসকী মতলব এহি হ্যায়, যিন্‌কো লিয়ে আপ্‌কো এ্যাতনা মর্মবেদনা হ্যায়, উন্‌কো দৈহিক ঔর আত্যন্তিক দোনো তরফ বরাবর আচ্ছাই হ্যায়।

ভূতেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করে খুশী মনে বেরিয়ে এলাম গর্ভগৃহ থেকে। তিনিও আমার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন। মন্দিরে পূজার সম্ভার নিয়ে তখন অনেক পূজার্থী উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করতেই বললেন — শিবমস্তু। শাম্ভবী সবসে বড়া সাধন হৈ। কৌশিস্ করেঙ্গে, তো পূর্ণকাম হো জাবেগী।

আমি ফিরতে লাগলাম ভারোচের দিকে। বেলা তখন বোধহয় এগারটা বেজে গেছে। সেই কিশোর বালক প্রদর্শিত পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। মানসিক প্রশান্তির জন্য চলার গতি অনেক বেড়ে গেছে। পথে দু তিনজনকে জিজ্ঞাসা করে আমি যখন মূল আশ্রমবাড়ীর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি তখন বেলা বারটা বেজে গেছে। দূর থেকেই দেখতে পেলাম আশ্রমের বাইরে বেরিয়ে এসে মোহান্তজী দু তিনজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কাছে এসে পৌঁছতেই তিনি বললেন — আর কিছুক্ষণ দেরী হলেই আমার এই দুজন নাগা শিষ্যকে তোমার খোঁজে ভূতেশ্বরের স্থানে পাঠিয়ে দিতাম। এখানে চল, হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসবে চল। একটু পরেই খাবার ঘন্টা পড়ে যাবে।

তাঁর সঙ্গে উপরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে বসতে না বসতেই খাওয়ার ঘন্টি পড়ে গেল। নিচে নেমে লঙ্গরখানার ছাউনীতে গিয়ে প্রথম দলের সঙ্গেই খেতে বসলাম। দীর্ঘাঙ্গী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মোহান্তজীও এসে খেতে বসলেন। ভোজনান্তে দোতলার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম — কি ভাই মতীন্দ্রজী! আজ দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ ত্রাটকে মগ্ন হন নি?

— হয়েছিলেন বৈ কি ! পরশু জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল বলে তিনি উদয়াস্ত ত্রাটকে ছিলেন। বিশেষ পর্বদিন ছাড়া অন্যান্য দিনে তাঁর ত্রাটকের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আজ বোধহয়, উনি যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু গুহ্যতত্ত্ব বলবেন বলে শুনেছি। আজও কাফি লোকের ভীড় হবে।

কথা বলতে বলতে দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিলাম। শীতকালের বেলা ছোট। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যা হতেই আরতি শেষ করা হল। দলে দলে, কাতারে কাতারে লোক এসেছেন, দীর্ঘাঙ্গীজীর ভাষণ শুনতে। মোহান্তজী নর্মদাস্তোত্র পাঠ করার পরেই সামনের সারিতে উপবিষ্ট একদল পণ্ডিতের মুখপাত্র হিসাবে একজন পণ্ডিতজী প্রশ্ন করলেন — শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কি রকম কৃত্যের অনুষ্ঠান করতে করতে দেহরক্ষা করতে হয়, সজ্ঞানে দেহরক্ষারই বা কৌশল কি, পূর্বকালে কিভাবে বৈদিক ঋষিরা দেহরক্ষা করতেন সে সম্বন্ধে কিছু সংকেত আমাদের দিবেন কি ?

প্রশ্ন শুনে দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ মৃদু হেসে বলতে লাগলেন — সজ্ঞানে দেহ রক্ষার বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই। সারাজীবন ধরে যাঁরা অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে থাকেন, মহাদেবের কৃপা হলে তাঁদের পক্ষেই সজ্ঞানে দেহরক্ষা করা সম্ভব হয়, নতুবা নয়। বিভিন্ন যোনি ও জীবন ভ্রমণ করতে করতে যে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে শিবকৃপা বা গুরুকৃপা লাভ হয়, সেই পারে, কর্ম শেষ হলে এই খেলাঘর ভেঙে যেতে। দেহরক্ষার প্রকার ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে গুরুর উপর। গুরুগতপ্রাণ ভক্ত যেহেতু সদৈব গুরুপ্রেমে মশগুল থাকেন, তাই তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয় কাল ও নিয়তির কারাগার ভেঙে যেতে। আমার কথাটি আপনারা ভাল করে লক্ষ্য করবেন, আমি বলছি গুরুগতপ্রাণতার কথা, কেবল গুরুর প্রতি অনুগত হলেই 'কেল্লাফতে' হবে না। পূর্বযুগেই কি, এ যুগেই বা কি, যে কোন পরমার্থবিদ্ তিনি যোগী হন কিংবা গৃহস্থাশ্রমেই থাকুন, তিনি যখন বাহ্য ও আভ্যন্তরীক অথবা অন্যান্য অরিষ্ট বা মৃত্যুলক্ষণ দেখে তাঁর মৃত্যুকাল আসন্ন হয়েছে আভাস পান, তখন তিনি তাঁর চিরাভ্যস্ত জীবনধারার অনুসারী নির্ভয় সুপ্রসন্নমনা, জিতেন্দ্রিয়, স্বধর্মনিরত, ক্ষমাবান এবং সর্বভূতেহিতে রত থেকে, বিধিপূর্বক নিজ সংস্কারানুযায়ী পুত্র বা শিষ্যকে স্বকীয় বিদ্যা ও মন্ত্র প্রদানপূর্বক, বিদ্বৎজন পরিবেষ্টিত কোন পুণ্যতীর্থে বা শুচিপ্রদেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। সেখানে ভূমির উপর কুশ বা কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করে, তার উপর আসন বন্ধনপূর্বক উত্তর বা পূর্বস্য হয়ে একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট হয়ে গুরুদত্ত সিদ্ধ মন্ত্রপ্রভাবে কিংবা নিত্যসিদ্ধ রেবামন্ত্র, শিব বা রামমন্ত্রে শরীরকে নিরুদ্ধ করবেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই হল সারকথা, শেষ কথা। তিনি বলেছিলেন —

নবদ্বারাণি সংযম্য গার্গ্যস্মিন্ ব্রহ্মণঃ পুরে।
উন্নিদ্রহৃদয়াম্ভোজে প্রাণায়ামৈঃ প্রবোধিতে॥
ব্যোম্নি তস্মিন্ প্রভারূপে নিরূপে সর্বকারণে।
মনোবৃত্তিং সুসংযম্য পরমাত্মনি পণ্ডিতঃ॥
মুর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণং ভ্রুবোর্মধ্যে তদানঘে।
কারণে পরমানন্দে আস্থিতো যোগধারণং॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরণ্ সুসমাহিতাঃ।
শরীরং সন্ত্যজেদ্ বিদ্বান যোগেনৈবাত্মদর্শনং॥
তদেব সংস্মরেদবিদ্বান্ ত্যজেত্ত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবেত্যসৌ ভাবামিতি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ॥
ত্বঞ্চেব যোগমাস্থায় ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি।
জ্ঞানেনৈব সহেতেন নিত্যকর্মাণিকুর্বতঃ।
নিবৃত্তফল সঙ্গস্য মুক্তি গার্গি করেস্থিতা॥

হে গার্গী, সমাধি অভ্যাসের জন্য প্রথমতঃ এই ব্রহ্মপুর শরীরস্থ নবদ্বার রুদ্ধ করবে। পরে অন্তঃ প্রাণয়াম দ্বারা হৃৎপদ্ম বিকশিত করবে। ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে যে শূন্যস্থান — ছিদ্র আছে, তদভ্যন্তরে নিরাকার সর্বকারণস্বরূপ পরমাত্মার জ্যোতিঃ বিরাজিত। তাতে মনোবৃত্তির সুসংযম করে, ঐ প্রাণজ্যোতিঃকে ঊর্ধ্বে মূর্ধ্বাপ্রদেশে উঠিয়ে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে তাকে ধারণ করবে। হে অনঘে, এইভাবে বিদ্বান ব্যক্তি পরমানন্দস্বরূপ সর্বকারণভূত ব্রহ্মজ্যোতিতে নিমগ্ন হয়ে একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের ধারণা করতে করতে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ঐভাবে সমাধিস্থ অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করার নিয়ম। ব্রহ্মবিদ্গণ বলে থাকেন যে, যিনি যে উপায় অবলম্বন করে আত্মসাক্ষাৎকার অভ্যাস করেন, শরীর ত্যাগকালে তাঁর সেই ভাবকেই আশ্রয় করা উচিত এবং যে ভাবাশ্রয়ে দেহত্যাগ ঘটে থাকে, পুনরায় সাধক সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অতএব হে গার্গী, তুমিও স্বকর্মনিরতা ও শান্তা হয়ে, ঐরূপ যোগাভ্যাসে নিজ দেহমধ্যে প্রণবাকারে জ্যোতির্ময় প্রাণত্মাকে ধ্যান পূর্বক আত্মদেহ ত্যাগ কর। যিনি ফলাভিলাষ শূন্য হয়ে উক্ত পদ্ধতিতে সজ্ঞানে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, মুক্তি তাঁর করতলস্থিত।

এই পর্যন্ত বলে দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ দু'এক মিনিট চুপ করে বসে রইলে। পরে পুনরায় প্রশ্নকর্তা পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — "গুরুকৃপায় প্রাণাত্মার দিব্য জ্যোতিতে হৃৎপদ্ম উদ্ভাসিত না হলে সজ্ঞান মৃত্যু কিংবা তদনুকুল সমাধি অভ্যাস করা যায় না। শ্রুতি বলেন, 'ভগবদ্দর্শন বাক্য মনের অগোচর।' বাক্য মনের অগোচর ঐ পরমতত্ত্ব ভগবদ্দর্শন — সম্পূর্ণতঃ তৎকৃপাসাধ্য অর্থাৎ তা তাঁর শ্রীঅঙ্গের দিব্যজ্যোতিঃ প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। এই জ্যোতিঃ পদার্থ, প্রতি জীবের পঞ্চশুর্ষি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। ঐ পঞ্চছিদ্র পথে সঞ্চারিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়বীয়াখ্য জীবনীশক্তির প্রবাহ ধরেই সাধকের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। একেই বলে সজ্ঞানে মৃত্যুলাভের জন্য ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যেই শেষ সমাধির অভ্যাস। ঐ পদ্ধতিটি দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করে রাখতে পারলে, মৃত্যুর পূর্বে সমূহ ইন্দ্রিয়

বিকল্প ও বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেলেও ঐ চিরাভ্যস্ত জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্যোতিঃতে ঐ জ্যোতিরাভ্যন্তরে গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম উদ্ভাসিত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী সাধককে অন্তিমে ভগবদ্দর্শনের দুর্লভ সুযোগ প্রদান করে তাকে।

সমাধিশ্চ পরোযোগো বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপা প্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ॥

অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরীণ বহু ভাগ্যবলে মৃত্যুকালীন সমাধি নামক সজ্ঞান মৃত্যুযোগ বা পরযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুর কৃপা এবং সদাপ্রসন্নতাই এই যোগের মূলকথা, সারকথা।''

পণ্ডিতজীদের প্রশ্নের জবাব দিয়েই সামনে উপবিষ্ট ভক্তদের দিকে তাকাতে তাকাতে দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ সহসা আমার উপর দৃষ্টি ফেললেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন — আপ্ কুছ্ পুছেঙ্গে বাঙালী বাবা? আমি বললাম — গত যোলই আষাঢ় মোহান্তজীর সঙ্গে এই ভৃগুকচ্ছের ৪৬ তম তীর্থ ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির পরিক্রমা করে এসেছিলাম। মন্দিরের জটাধারী পুরেহিতজী আমাদেরকে জানিয়েছিলনে, ভূতেশ্বরের সিদ্ধস্থান নাকি শাম্ভবী পীঠ। আজ সকালেও আমি সেখান হতে ফিরে এসেছি। ফিরবার সময় তিনি আবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, 'শাম্ভবী সবসে বড়া সাধন হৈ। কৌশিস্ করেঙ্গে তো পূর্ণকাম হো জাবেগী' আপনি সেই শাম্ভবী সাধনা সম্বন্ধেই কিছু বলুন।

আমার কথা শুনে মোহান্তজীর সঙ্গে দুতিন সেকেন্ড তিনি যেন কিছু ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে নিলেন। তাঁর সম্মতি ও সমর্থন পেয়ে দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ বলতে লাগলেন — শম্ভু শব্দের উত্তর ঞ প্রত্যয় করে উপাসনা অর্থে শাম্ভব শব্দটি নিস্পন্ন হয়। আবার শাম্ভব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে শাম্ভবী শব্দের উৎপত্তি। এক কথায়, শম্ভু বা শিব সম্বন্ধীয় সাধনা, শিবসাধনা, অর্থাৎ শিবত্ব অর্জনের তপস্যার পদ্ধতিকেই ভূতেশ্বর মহাদেবের মহাজাগ্রত স্থানকে কেন্দ্র করে শাম্ভবী পীঠ জেগে উঠেছে। নর্মদাতট বলে তপস্যার অগ্নি এখানে চিরপ্রদীপ্ত। শাম্ভবী বিদ্যার ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে গুরুমুখে শুনেছি —

ব্যাঘ্রচর্মধরো দেবোহ্যণিমাদি বিভূষিতঃ।
লোকানাম্ ইষ্টদাতা চ লোকানাং ভয়নাশনঃ॥
লোকানাং মুক্তিজনকো লোকানাং মুক্তিদায়কঃ।
সদানন্দ করো দেবশ্চার্ধনারীশ্বরো বিভুঃ॥

অর্থাৎ শাম্ভবী বিদ্যার এই সদাশিব অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বিভূষিত এবং ব্যাঘ্রচর্ম পরিধায়ী। তিনি সততই অর্ধনারীশ্বর, শক্তির সঙ্গে নিত্যযুক্ত, সকল লোকের ইষ্টদাতা, ভয়নাশন এবং মুক্তির জনক। তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা। ধ্যান, পূজা, জপ শিবগতপ্রাণতা মানুষের অশেষ কল্যাণ করলেও ইহজীবনেই সেই পরমতত্ত্বানুভূতি আস্বাদন করতে হলে, জন্মমল, কর্মমল, আণবমলের করাল গ্রাস ছিন্নভিন্ন করে অভয় ও অমৃতপদে চিরস্থিতি লাভের জন্য গুরু পরম্পরা কিছু গুহ্যতম ক্রিয়াকৌশল গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় অভ্যাস করতে হয়। এই যে দুর্লভ উপাসনা পদ্ধতি, তারই নাম শাম্ভবী বিদ্যা। যাঁরা শাম্ভবী বিদ্যার সংকেত জেনেছে, তাঁদের মতে ঐ অভ্যাসের গুরুপরম্পরা প্রণালী হল —

নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষণয়েৎ।
সা ভবেৎ শাম্ভবী মুদ্রা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

খেচরী মুদ্রা আয়ত্তাধীন হলে তবেই শাম্ভবীতে অধিকার জন্মে। যখন দেখবে জিহ্বা অবলীলাক্রমে ভ্রূমধ্যস্থান স্পর্শ করতে পারছে, তখন যোগাসনে বসে জিহ্বাকে তালু মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বদিকে কপালকুহরে প্রবেশ করাবে এবং দৃষ্টি স্থির রাখবে। 'নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য', নিজ ভ্রূদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থান, পলকশূন্য স্থির দৃষ্টিতে নিরক্ষণ করে একাগ্রসনে আত্মাকে অর্থাৎ ঐরকম দৃষ্টিসম্ভূত জ্যোতিঃ অবলোকন করবে। এরই নাম শাম্ভবী মুদ্রা। শৈবাগম তন্ত্রাদিতেও এই কার্যকর সাধনার ক্রম গোপন আছে।

এই শাম্ভবী সাধনার বিশেষত্ব এই যে, উভয় চক্ষুর মণিদ্বয় একপাশে এনে ঊর্ধ্বনেত্রে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবিন্দুকে লক্ষ্য করতে হয়। প্রথমতঃ একপাশে অর্থাৎ বাম চক্ষুতারা ঐ চক্ষুর ডানপাশে এবং দক্ষিণ চক্ষুতারা ঐ চক্ষুর বামপাশে এনে ভ্রূমধ্যস্থলে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে হয়। কিছুদিন ধরে নিয়মিত অবিচলিত নিষ্ঠায় অভ্যাস করতে করতে ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস স্থির হয়। এইভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের একতানতা হলেই ভ্রূমধ্যে একটা জ্যোতির প্রকাশ ঘটে। সাধন জগতের, সাধন জগৎই বা বলি কেন অন্তর্জগতের এমনই বৈচিত্র্য যে, উক্ত জ্যোতির মধ্যে সংকল্পিত বহু রূপ স্বতঃই উদ্ভাসিত হতে থাকে। ক্রমে পূর্ব পূর্ব জন্মের উপাসিত ও অর্জিত তত্ত্বে নিত্যস্থির চিদ্‌জ্যোতিঃ বা চৈতন্য সত্ত্বায় মন বুদ্ধি ডুবে গিয়ে সব একাকার হয়ে যায়; তখন শুধু জ্যোতিঃ, শুধু আনন্দ ছাড়া আর কিছু থাকে না। ক্রিয়াবান্‌ অনুভবী ঋষিরা আত্মসংবেদ্য রস আস্বাদন করে গেছেন —

> শাম্ভবী মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
> বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্টা মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ॥
> খ মধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
> আত্মানং খ-ময়ং দৃষ্টা ন কিঞ্চিৎ অপি বাধ্যতে।
> সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ॥

প্রথমে উল্লিখিত শাম্ভবী মুদ্রা অবলম্বন করে আত্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করতে হবে। পরে ঐ বিন্দু অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে আপনার মনকে নিয়োজিত করবে অর্থাৎ তখন মনে ঐ জ্যোতিঃ ছাড়া অন্য কোন ভাবনা আসতে দিবে না। তারপর শিরোস্থিত ঐ উদ্ভাসিত বা স্বতঃ প্রকটিত ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে জীবাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে শূন্যস্থান — আকাশ ভাবনা করবে। এইভাবে জীবাত্মাকে ব্রহ্মজ্যোতির্ময় দেখে যোগী অবিরোধময় অর্থাৎ মুক্ত ও সদানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হন। মূলে কিন্তু শিবকৃপা। নিষ্ঠা এবং ক্রিয়া তৎপরতা থাকলে শিব নিজেই কৃপা করেন। জীব পূর্ণকাম হয়। তাই এই বিদ্যার নামও শাম্ভবী বিদ্যা। শিবত্ব অর্জনের জন্য এই বিদ্যা বা সাধনা শ্রেষ্ঠ সহায়, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অলমিতি।

ভাষণ শেষ করেই দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ ধীরে ধীরে উঠে গেলেন পিছনের দরজা দিয়ে। তাঁর সঙ্গী একজন সেবক তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেলেন ছাউনীতে। তাঁর চলে যাওয়ার পরে আধঘন্টা ধরে নর্মদা কীর্তন হল। সভা যখন শেষ হল, তখন রাত্রি ১০ টা বেজে গেছে।

আমি নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে শাম্ভবী বিদ্যা, শাম্ভবী পীঠ প্রভৃতি নানা বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখতে পেলাম মতীন্দ্রজী আমার পাশে শুয়ে আছেন। গভীর ঘুমে অচৈতন্য। হয়ত অনেক রাত্রে শুতে এসেছেন। নীচে ছাউনীতে ছাউনীতে কেউ স্তব পাঠ করছেন, কেউ বা নর্মদাস্তোত্র পাঠ করছেন, শিববন্দনাও

শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ খুব জোরে তিনবার মতিশঙ্খ বেজে উঠল। বোধহয় কোন নাগা মতিশঙ্খ বাজিয়ে নিত্য পূজা শেষ করলেন। আমি বসে বসে ভাবছি, গত ১৬ই কার্তিক ভৃগুকচ্ছের তীর্থ পরিক্রমা শেষ হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে প্রায় সাত দিন কেটে যাবার উপক্রম। আমার সামনে এখনও দুস্তর পথ পড়ে আছে। হরিধাম অতিক্রম করে অমরকন্টক পর্যন্ত দক্ষিণতট ধরে যেতে পারলে তবে আমার ব্রতশেষ হবে। কাজেই আজই আমাকে মোহান্তজীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করতে হবে। বিদায়ের কথা ভাবতেই বুকটা 'গুরগুর' করে উঠল। স্নেহময় মানুষটা আমাকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছেন। দুর্গম অরণ্য পথে এমন দরদী বন্ধু আর কাউকে পাব বলে মনে হয় না। সামনের বিছানায় দৃষ্টি পড়তেই মতীন্দ্রজীকে দেখে চোখ দুটো আর্দ্র হয়ে উঠল। একই জেলায় বাড়ী, আমার গ্রাম হতে মাত্র আট মাইল দূরেই মতীন্দ্রজীর স্বগ্রাম। কেউ কাউকে চিনতাম না। মা নর্মদা হাজার হাজার মাইল দূরে এনে সংযোগ ঘটালেন। এখন ছাড়ার পালা আসছে। এঁরা ত কঠোর সন্ন্যাসের পথ নিয়েছেন, এঁদের মনে বিচ্ছেদ বিরহের স্নেহ ভালবাসার কোন স্থান আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি কি করব? উদ্‌গত অশ্রু কোনমতে চেপে আমি প্রাতঃকৃত্য করতে গেলাম।

প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখি মতীন্দ্রজী জেগে উঠেছেন। তিনি আমাকে বললেন — একটু অপেক্ষা করুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো বৃষখাতে স্নান করতে। উভয়ে একসঙ্গে গিয়ে স্নান তর্পণ সেরে আশ্রমের দিকে ফিরব, এমন সময় দেখি, নর্মদার বাঁধের উপর হাঁটু গেড়ে বসে একজন অর্ধোন্মাদ সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক অনর্গল সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলে চেলেছেন —

'Hail Holy light!—offspring of Heaven first born!
Or of the Eternal co-eternal beam,
May I express thee unblamed? Since God is light,
And never but in Unapproached light
Dwelt from eternity; dwelt then in thee,
Bright effluence of Bright Essence increate!
Or hearst though rather, — Pure ethereal stream,
Whose fountain who shall tell?&c.,&c.'

সম্ভ্রান্ত লোকটির আবেগ-কম্পিত উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে মনে হল তিনি যেন মহাকবি মিল্‌টনের প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবিতাটি কেবল আবৃত্তি করছেন না, তিনি মন্ত্রপাঠ করছেন! কী সুন্দর জীবন্ত ঋষিবাক্য! আবৃত্তি মুখে তিনি বলেছেন — হে সুপবিত্র জ্যোতিঃ, তোমাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছি। পরমধাম হতে তুমিই সর্বপ্রথম প্রসূত হয়েছ। অথবা তোমাকে যদি সেই নিত্যসত্যের সমকালীন নিত্যজ্যোতিঃ বলে ব্যাখ্যা করি, তাহলে কি আমার অপরাধ হবে? ঈশ্বরও ত জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তিনি ত অনাদিকাল হতেই অনুপগম্য জ্যোতির্মণ্ডলেই বিরাজিত! অতএব হে অকৃত্রিম স্বতঃসিদ্ধ সমুজ্জ্বল শুদ্ধ সত্ত্বের স্বতোৎসারিত সমোজ্জ্বল জ্যোতিঃস্রোত! (অবশ্য বলতেই হবে তোমার অভ্যন্তরেই তাঁর অবস্থান!) — হে দিব্য জ্যোতিঃ প্রবাহ, তোমার মূল প্রস্রবন কোথায় কিরকম, তা কেই বা বলতে পারবে? হঠাৎ একটা কোলাহল উঠতেই ঐ ইংরাজী মন্ত্রের অনুধ্যানে ছেদ পড়ল। দেখলাম, ধূলা উড়িয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী এসে থামল, গাড়ী থেকে চার পাঁচজন লোক দৌড়ে এসে সেই আবৃত্তি

বা প্রার্থনারত ভদ্রলোককে জাপটে ধরে টেনে ঘোড়ার গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুলল। সেই অর্ধোন্মাদ নামে কথিত সম্ভ্রান্ত মানুষটি একান্ত অসহায় ভাবে নর্মদার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন — Hallo! Mother Reba again I shall see to Thee! অর্থাৎ মা রেবা! আবার তোমার সঙ্গে একদিন দেখাশুনা বা বোঝাপড়া হবে! লোকেরা ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

সমবেত জনতার কাছেই শুনলাম, ভদ্রলোক ভারোচের বিখ্যাত বাচোয়াৎ বাড়ীর সন্তান। অক্সফোর্ডেই লেখাপড়া করেছেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পরেই তাঁর এইরকম অবস্থা। আগে নর্মদার তটেই ঘুরে বেড়াতেন। ভাবোন্মাদ বা অর্ধোন্মাদ অবস্থা হওয়ার পর তাঁকে ঘরেই আবদ্ধ করে রাখা হয়। বাড়ীর লোকজন সবসময় তাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই রাখেন। বাচোয়াৎদের অর্থের অভাব নাই , তাই যথোচিতভাবে অনেক সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু কোন স্থায়ী সুফল ফলে নি। ইত্যাদি।

বেলা প্রায় এগারটার সময় আমি ও মতীন্দ্রজী আশ্রমে ফিরে এলাম। লক্ষ্মণভারতীজীর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল, তিনি হাসলেন মাত্র। তাঁর বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নাই। তিনি লঙ্গরখানা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন। এতগুলি লোকের ভিক্ষার বন্দোবস্ত তাঁকেই করতে হচ্ছে। দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম যথারীতি দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ তাঁর ছাউনীর সামনে দাঁড়িয়ে ত্রাটক সাধনায় মস্ত্ আছেন। ঘরে ঢুকে ভিজা গামছা রোদে দিয়ে বসলাম। মতীন্দ্রজী বললেন — আগামী ২৭ শে কার্তিক হতে ৩০ শে কার্তিক অর্থাৎ শনিবার হতে মঙ্গলবার কার্তিক পূজার দিন পর্যন্ত এখানে বিশ্বকল্যান যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে। তখন দেখবেন এখানে কিরকম ভীড় হয়! এই বলেই তিনি নিচে গেলেন কাজকর্ম দেখাশুনা করতে। আমি ধীরে ধীরে মোহান্তজীর ঘরে গিয়ে উঁকি মারলাম, দেখলাম বহুলোক তাঁর কাছে বসে আছেন। সরে এলাম সেখান থেকে, বুঝলাম এখন বিদায় প্রার্থনা করা সঙ্গত হবে না। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একা তাঁকে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আদর করে কাছে ডাকতেই আমি নিচের দিকে মুখ করে তাঁকে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম — অনেকদিন হয়ে গেল। এবার প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দিন। হরিধাম অতিক্রম করে এখনও আমাকে রেবাতীর্থ দক্ষিণতট পরিক্রমা করতে হবে।......

আমার কথা শুনেই তিনি প্রায় মিনিট খানিক আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। তাঁর ডানহাতে আমার হাতদুটি ধরে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলতে লাগলেন — আমি তোমার কথা শুনে কিছুই স্থির করতে পারছি না, আমি যেন জড়ের মত হয়ে পড়েছি, বৎস! মামেবং জড়ী করোষি। এইবলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। একটুখানি নিজেকে সামলে নিয়ে রোরুদ্যকণ্ঠে বললেন — জানি তোমাকে চিরকাল ধরে রাখা যাবে না, তবুও আরও দুটো দিন থাক। আমাকে একটু সামলাতে দাও। বলেই বুকে টেনে নিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেও কেঁদে ফেললাম। কোনমতে সামলে প্রণাম করে দ্রুত পালিয়ে গেলাম নিজের ঘরে।

ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। এখনই মতীন্দ্রজী এসে পড়বেন, তাই উঠে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে ফেললাম। চুপ করে শুয়ে আছি এমন সময় মতীন্দ্রজীর পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম

তিনি ঘরে আসছেন। পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। তিনি দু' একবার ডেকে চুপ করে গেলেন, আমি কোন সাড়া দিলাম না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি 'এবার আবার একা হয়ে পড়ব। মা নর্মদার যা ইচ্ছা তাই ঘটুক।' উঠে বসলাম।

বেলা প্রায় চারটার সময় মতীন্দ্রজী উঠে আমাকে বললেন — আজ সন্ধ্যা হতে নর্মদা কীর্তনের আসর বসবে। এ জিনিষ আপনি কখনও দেখেন নি। বাংলাদেশে যেমন হরিবাসর বসে, হরিবোল, হরিবোল, শব্দে কীর্তন হয়, সেইরকম এখানে আজ হর নর্মদে হর নর্মদে ধ্বনি তুলে প্রায় রাতভোর কীর্তন হবে। সন্ধ্যা ৭টা হতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত হবে চৈতন্যলীলার মত নর্মদালীলাকে কেন্দ্র করে যাত্রাগান। নাগাদের সাধনভজন তপজপে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, সেইজন্য এই আশ্রমবাড়ীর পিছনে বিরাট শামিয়ানা টাঙিয়ে লোকজনদের বসার ব্যবস্থা হচ্ছে। লক্ষ্মণভারতীজী সব দেখাশুনা করছেন। আমাদের বাংলাদেশে কোথাও যাত্রা হলে যেমন শুরুতেই আসরে একটা বড় ঘড়ি রেখে 'টং' করে একটা শব্দ করা হয়, তেমনি এখানেও দেখবেন সেই রকম ঘড়ি বাজিয়ে পালার সূচনা করা হবে। আজকের পালায় যিনি মার্কণ্ডেয় মুনি সাজবেন, তিনি শুধু বড় অভিনেতাই নন, মা নর্মদার অনন্য ভক্তও বটে। সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি সেজে তিনি যখন তাঁর বিশাল জটাভার নিয়ে আসরে নেমে পাঠ করবেন, সেই সময় তাঁকে দেখে আপনার বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। কল্পান্তে একবার মার্কণ্ডেয়জী এক এক কুমারী-কন্যাকে দেখে তাঁর চরণযুগল ধরে তাঁর পরিচয় জানার জন্য অশেষ প্রার্থনা করতে থাকেন। মার্কণ্ডেয় মুনির সেই আকুলি-বিকুলি ঐ অভিনেতা এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেন যে, তা দেখলে আপনি না কেঁদে থাকতে পারবেন না। দেখবেন, আসরের সবাই কেঁদে ভাসাবেন। যে কুমারী-কন্যাটি নর্মদা সাজবেন, তাঁর পবিত্র অঙ্গসজ্জা, সেই কৃষ্ণাজিন পরিহিতা, ত্রিশূলধারিণী কচি কোমল ভৈরবীরূপের সাত্ত্বিক ছটা দেখলে চমকে উঠবেন। মনে হবে স্বয়ং অমৃতা নর্মদাই যেন চোখের সামনে এসে আবির্ভূতা হয়েছেন........ । আচ্ছা, আমি এখন চলি, আপনার সুবিধামত যাবেন সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ।

এই বলেই মতীন্দ্রজী দ্রুত নেমে গেলেন নিচে। তিনি এখন যে আনন্দ মার্গে বিচরণ করছেন, এ সময় তাঁকে আমার এখানে হতে চলে যাবার কথা বলতে ইচ্ছা হল না। আমি নিজেও নিচে নেমে নাগাদের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। দীর্ঘাঙ্গী মহারাজের ছাউনীতে পর্দা ফেলা আছে। দেখতে পাচ্ছি, স্ত্রী পুরুষ বালক মিলিয়ে শত শত লোক যাত্রার আসরে গিয়ে জমায়েৎ হচ্ছেন। চারদিক কলরবে ভরে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমি উপরে গিয়ে সন্ধ্যা করতে বসলাম। সন্ধ্যা শেষ করে আসরের এক কোণে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনতে লাগলাম। নাগারাও ছাউনী হতে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রার রস উপভোগ করছেন। আসরে চারটি ডে-লাইট ও চারটি হ্যারিকেন জ্বলছে, চারদিক আলোতে ঝলমল করছে। অভিনয় নৈপুণ্যে পালা এমন জমে উঠেছে যে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন। মহর্ষি ভৃগু যখন নর্মদাতটে সুদীর্ঘকাল তপস্যা করে অস্থিচর্মসার হয়ে কোনমতে ধুঁকছেন, তখন মা নর্মদা মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তুলিতে দুধ ডুবিয়ে ক্রন্দনরতা অবস্থায় মহর্ষিকে মাতৃস্নেহে যত্ন করছেন, সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমার চোখেও জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি ধীরে ধীরে আসর থেকে ফিরে এসে ভক্তি ও আবেগে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম। ভক্তি রসাশ্রিতে ঐ পালাভিনয় শুধু আমার চোখকে নয়, মনকেও দ্রবীভূত করেছে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম মতীন্দ্রজী তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। আমি কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে বৃষখাতে চলে গেলাম স্নান করতে। গিয়ে দেখি, লক্ষ্মণভারতীজী স্নান করে উঠে আসছেন। সুযোগ পেয়ে তাঁকে আমার যাওয়ার কথা বললাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন — করীব সাল ভর এক সাথমেঁ থা। ঔর কভি ভেট হোগা নেহি, এহি চিন্তামেঁ হমারা দিল দুখাতা হৈ। খ্যার, আপকো জানেই ত হোগা। জলে-হরি পরিক্রমাকী শপথমেঁ বহোৎ বহোৎ কঠিনাই হ্যায়। মা নর্মদা আপ্‌কো ভালা করেঁ। আজ ত কার্তিক মাহিনাকো চব্বিশ তারিখ হৈ। আপ্‌কো বারেমেঁ মোহান্তজী মুঝে বোলা হৈ। উন্‌কা বিচারমেঁ পরশু আপ্‌কা জানা আচ্ছাই হোগা। আজ কাল দো রোজ আভিতক ত হৈ। ফিন্ ভেট হোগা।

ব্যস্ত মানুষ, স্নান করে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি বৃষখাতে নেমে স্নান তর্পণ সেরে উঠেছি, এমন সময় দেখলাম মতীন্দ্রজী দৌড়াতে দৌড়াতে আসছেন। কাছে এসেই তাঁর প্রথম কথা — হ্যাঁ ভাই , তুমি নাকি দু'একদিনের মধ্যেই চলে যেতে চাও? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই তিনি ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লেন। নিজের কপাল চাপড়ে আপন মনে মনে বলতে লাগলেন — 'জানি আমার কপালে এত সুখ সইবে কেন? মা বাবাকে হারিয়ে সেই কতকাল আগে এখানে এসে পৌঁছেছি। কোনদিন যে কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাব, তা কখনও আশা করি নি। মণ্ডলেশ্বর হতে আসার পথে ধর্মপুরীতে তোমাকে পাবার পর হতে কেবলই মনে হত, তুমি স্বগ্রামবাসী, স্বজন। তোমার সঙ্গে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার গ্রাম, সেই বাদাড় মুকশুদপুর, বাজারচণ্ডী, অকড়া, কালিয়াড়া, জনার্দনপুর প্রভৃতি গ্রামগুলিও আমার মনের মধ্যে আবার এসে ভীড় করেছিল। কিন্তু হায়, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।'

সামনের দিকে হতাশভাবে হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন — ঐ নর্মদাই আমার একমাত্র নিয়তি। জন্মেছিলাম, সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা বাংলা মায়ের কোলে। মরব এখানে দুর্জয় পাহাড়-পর্বতের রুক্ষ্ম কঙ্করময় দেশে।

তাঁর চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে করে জল পড়ছে। নিজের আবেগে কথাগুলি বলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নর্মদার জলে। স্নান করে 'রেবা রেবা মাগো'! বলতে বলতে উঠে এসে হাঁটতে লাগলেন আশ্রমবাড়ীর দিকে। দুজনে একসঙ্গেই হাঁটতে লাগলাম কিন্তু কারও মুখে কোন কথা নাই, মনে হচ্ছে দুজনেই বুকে বিদায়ের রাগিনী বাজছে। আশ্রমে এসেই তিনি ভিজা কৌপীনাদি রোদে মেলে দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

যথানিয়মে কার্তিক মাসের ২৪ তারিখটি কেটে গেল। ২৫ শে কার্তিক স্নান তর্পণাদি সেরে নিচের যেসব ঘরে লক্ষ্মণভারতীজীর সঙ্গীরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। হরিধাম হতে এঁরা মাঝখানে কয়েকদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও উত্তরতটের শূলপাণি ঝাড়ির সমগ্র পথেই এঁরা সঙ্গী ছিলেন। একসঙ্গে অনেক দুঃসহ দুঃখ ভাগ করে ভোগ করেছি। সেই দুই পণ্ডিতজীসহ সকল নাগাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছি, এমন সময় রতনভারতীজী জানালেন — মোহান্তজী আপনার খোঁজ করছেন। আমি দোতলায় গিয়ে দেখি, মোহান্তজী চুপ করে বসে আছেন। তাঁর মুখটা থমথমে। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করেই তিনি আমার হাতে একটি নূতন কম্বল ও সোয়েটার এগিয়ে দিয়ে বললেন — তোমার সোয়েটারটা ছিঁড়ে গেছে। প্রচণ্ড শীত আসছে। সোয়েটারটা জবরদস্ত না হলে

দক্ষিণতটে শীতে বড় কষ্ট পাবে। এ দুটো আমার উপহার বলেই মনে কর। আমি বললাম — সোয়েটারটা আপনার আশীর্বাদী হিসাবে নিচ্ছি কিন্তু কম্বল আমার আছে। দুটো কম্বল নিয়ে আমি কি করব? আপনি ত জানেন দূরপথে একটা শোলাকেই ভারী লাগে। ছলো ছলো চোখে বললেন — তোমার কম্বলটা আমার কাছে আন। কম্বলটা ঘর থেকে এনে দিতেই তিনি ধর্মপুরীতে কম্বলের চারপ্রান্তে, ভীলদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার আশঙ্কায় যেসব শঙ্খস্ফটিক, মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রদত্ত একমুখী রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি দৈববস্তু নিজেই সযত্নে গুপ্তভাবে সেলাই করে দিয়েছিলেন, সেইসব সেলাইমুখ পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন — খেয়ে এসে আমি পূর্বের মতই সযত্নে তোমার এই জিনিযগুলি নূতন কম্বলটির বিভিন্ন প্রান্তভাগে কৌশলে রেখে দিব। কম্বলটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা না পর্যন্ত কারও সাধ্য নাই এগুলির সন্ধান পাবে। তোমার কম্বলটা আমার কাছে রেখে দিব। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কথাগুলি বলেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি দৌড়ে পালালাম নিজের ঘরে। একটু পরেই খাবার ঘন্টা পড়ল। আমি চোখে মুখে জল দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেলাম লঙ্গরখানায়। ইচ্ছা করেই আজ আমি একটু দেরী করে শেষ দলে খেতে বসলাম। বসলাম, লক্ষ্মণভারতীজী, রতনভারতীজী, গণেশভারতী এবং পণ্ডিত কবিরাজ প্রভৃতির সঙ্গে। লক্ষ্য করলাম প্রথম সারিতে বসে মোহান্তজী, দীর্ঘাঙ্গী মহারাজ, মতীন্দ্রজী প্রভৃতি প্রায় ১৫০ জন নাগা খেয়ে গেলেন। খাবার পরেই দেখলাম মতীন্দ্রজী তর্‌তর্‌ করে উপরে উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ নেমে এসে আমাকে খুঁজতে লাগলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম লক্ষ্মণভারতীজীর কাছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন — আপনি কোথায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিলেন? খাবার সময় দেখতে পেলাম না। আমাকে কোন জবাব দিতে হল না, লক্ষ্মণভারতীজীই বললেন — উসমে ক্যা? আজ বাঙালী বাবা, হামলোগোঁকা সাথ ভিক্ষা লেঙ্গে। কালসে ত ঔর জিন্দেগী ভর মোকা মিলেঙ্গে নেহি! শেষের কথাগুলো বলার সময় বৃদ্ধের ঠোঁটগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল। যাইহোক, তাঁদের সঙ্গে ভিক্ষা প্রাপ্তির পর উপরে উঠে গিয়ে দেখি মোহান্তজী তাঁর ঘরে বসে নূতন কম্বলটি প্রান্তে প্রান্তে একমনে আমার দৈববস্তুগুলি ভরে ভরে সেলাই করে চলেছেন কম্বলের রোয়াঁ টেনে টেনে রোয়াঁরই আস্তরণ বিছিয়ে। আমি ঘরে গিয়ে বসে রইলাম। বেলা প্রায় চারটার সময় মোহান্তজী আমার ঘরে ঢুকে কম্বল ও সোয়েটারটি দিলেন। মতীন্দ্রজী ও রতনভারতীজীকে কাছে বসিয়ে বললেন — সকালে উঠে বাঙালী বাবার সঙ্গে তোমরা কতটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসবে। রাস্তা সংক্ষিপ্ত হলেও তোমরা বৈদ্যনাথ ঘোড়েশ্বর তবরার পথ ধরবে না। তোমরা ভারভূতির পথে হাঁটবে। ভারভূতিতে পৌঁছে গেলে বাঙালী বাবা নিজেই পথ চিনে যেতে পারবেন। ঐ রাস্তাতেই আমরা এসেছি। ঐ পথ দূর হলেও সহজ পথ, চেনা পথ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ভক্তদের ভীড় জমছে। তিনি উঠে গিয়ে নিজের ঘর থেকে আবার ফিরে এলেন। আমার ঝোলাটা টেনে নিয়ে তাতে সমুদ্র-পূজা ও আরতির জন্য কয়েক ডেলা কর্পূর, একটা কর্পূরদানী, পথে খাবার জন্য কয়েকটা লাড্ডু ও ফল ভরে দিলেন। কোন কথাই শুনলেন না। তিনি আরতি করতে চলে গেলেন। আমি ঘরে বসে সব ঘুছিয়ে রেখে সন্ধ্যা করতে বসলাম। রাত্রি ১০টার সময় মতীন্দ্রজী শুতে এসে আপন মনে তাঁর গ্রামের কথা, মা-বাবার কথা, বলতে লাগলেন এবং আমাকে মাঝে

মাঝে চিঠি দিবার জন্য অনুরোধ করলেন। উভয়ে কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। বিছানার উপর বসেই বাবাকে স্মরণ করলাম, স্মরণ করলাম মা নর্মদাকে। প্রণামাদি সেরে প্রাতঃকৃত্য সারলাম। গাঁঠরী, ঝোলা বেঁধে নিয়ে বসেছি, মোহান্তজী এসে পৌঁছলেন। তাঁর সাড়া পেয়ে মতীন্দ্রজী উঠে পড়লেন। মোহান্তজী উপদেশছলে আমাকে বললেন — পথিমধ্যে কোন মন্দিরের কাছাকাছি ছাড়া থাকবে না। মা নর্মদাকে সতত স্মরণপথে রাখবে তা বলাই বাহুল্য। পরিক্রমাবাসী হিসাবে কিছু পাথেয় সঙ্গে রাখ, তাতে কোন দোষ হবে না, তিনি টাকা দিতে চাইতেই আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম — পূষণ গিরিজীর নৌকার চিঠি সঙ্গে আছে যখন, তখন আশা করছি সমুদ্র পার হতে কোন টাকা লাগবে না। আমি যাঁর সঙ্গে পরিক্রমা উঠিয়েছিলাম, অমরকন্টকের সেই মহাত্মা শংকরনাথজী অর্থাদি কাছে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। আপনার পায়ে পড়ি আমাকে সেই শপথ রাখতে দিন। আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ মন্ত্রপাঠ করলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে মতীন্দ্রজী এবং রতনভারতীজী প্রস্তুত হয়ে এসে গেছেন। তাঁরা জোর করে আমার গাঁঠরী, ঝোলা, কমণ্ডলু প্রভৃতি তুলে নিলেন। 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে নিচে নামলাম। আমাদের ধ্বনি শুনে প্রত্যেক ছাউনীর ভিতর হতে নাগারা সমস্বরে হর নর্মদে ধ্বনি দিলেন। আশ্রমের ফাটকে এসে পৌঁছেছি , তখন দেখলাম লক্ষ্মণভারতীজী কোথা হতে দৌড়ে দৌড়ে কাছে এলেন। 'বাঙালি বাবা যা রাহা হ্যায়, ঔর জিন্দেগীভর ভেট নেহি হোগা' বলতে বলতেই মোহান্তাজী কেঁদে ফেললেন। সকলের চোখেই জল। তাঁদের পিছনে পিছনে আমি হাঁটতে লাগলাম বৃষখাতের দিকে। নর্মদাকে দর্শন ও প্রণাম করে আবার মোহান্তজীকে এবং লক্ষ্মণভারতীজীকে প্রণাম করে বললাম — অনেকটা এগিয়ে এসেছেন, আর না। এবার ফিরে যান আশ্রমে। আপনাদের প্রাণভরা আশীর্বাদে আমার সমূহ মঙ্গল হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। লক্ষ্মণভারতীজী মোহান্তজীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি আর তাঁর মুখের দিকে তাকাতে সাহস করলাম না। বেশ কতকটা এগিয়ে গিয়ে দেখি, মোহান্তজী ও লক্ষ্মণভারতজী তখনও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে সদ্যোত্থিত সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সূর্যবন্দনা পাঠ করতে লাগলাম।

এক নাগাড়ে সকাল ৯টা পর্যন্ত হেঁটে আমি সঙ্গী জনকে বললাম — এবার আপনারা ফিরে যান। এবারে আমি সোজা নর্মদার বাঁধ ধরে হেঁটে যেতে পারব। কিন্তু মতীন্দ্রজী কিছুতেই আমার কথা শুনলেন না। বললেন — ভারভূতেশ্বর মন্দির পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিবার নির্দেশ আছে। এই সুযোগে আমাদের ভরভূতিকে প্রণাম করার সুযোগটা নষ্ট করে দিতে চান কেন? আমরা ভারোচের সীমা অতিক্রম করে দশকন্যা তীর্থ, টিম্বিমহল্লা, বরুয়া গ্রামের ঋণমোচনেশ্বর তীর্থ, প্রভৃতি অতিক্রম করে এসেছি। বেলা ১১টা নাগাদ দেখবেন আমরা ভরভূতেশ্বরে পৌঁছে যাব। নর্মদাকে প্রণাম করে চলুন আবার হাঁটা যাক্। সত্য সত্যই বেলা ১১টায় আমরা পৌঁছে গেলাম সেই মহাতীর্থে। যাবার সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে যে গাছতলায় সেই 'ভক্ষণসুর' সাধুর দর্শন পেয়েছিলাম—সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে রতনভারতীজী

বললেন — ইয়াদ্ হ্যায় কি নেহি, ইধরই ভক্ষণসুরজীনে এ্যাতনা কেলা ঔর নড়াইল পায়ে থে! 'মেরে অখন্‌কে দৌতারে' উহ্ গানা ভি গাতে থে! আমার অবুঝ মন, কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। যেন তিনি ঐখানেই ধারে কাছে কোথাও বসে আছেন। আজ দেখছি, ঘাটে ও মন্দিরে অজস্র ভক্তের সমাবেশ। আমরা ঘাটে নেমে মোহান্তজী কর্তৃক পূর্বপ্রদর্শিত পন্থায় 'ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করতে করতে নর্মদার তলদেশ হতে মৃত্তিকা তুলে ঘাটের উপর ফেলে 'ত্বং নর্মদে পুণ্যজলে' ইত্যাদি স্নান মন্ত্র পাঠ করে স্নান করলাম। তর্পণাদি সেরে ভারভূতেশ্বরজীকে দর্শন ও প্রণাম করলাম। সেদিনকার মত আজও পুরোহিতের কাছ হতে প্রচুর প্রসাদ পাওয়া গেল। আমরা মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে একটা গাছতলায় বসে তিনজনে পেটভরে প্রসাদ খেলাম। নর্মদাতে হাত মুখ ধুয়ে এসে আমি দুজনকেই জড়িয়ে ধরে বললাম, এবারে আপনারা ফিরে যান ভাই; নতুবা আশ্রমে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ছেটিছেলের মত মতীন্দ্রজী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। অনেকক্ষণ ধরে আমরা তিনজনেই কাঁদলাম। কারও মুখে কোন কথা বেরোচ্ছে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই আমি গাঁঠরী বোঝা ইত্যাদি কাঁধে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে দিলাম পিছন ফিরে। দেখি, তাঁরা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। অমি কোনমতে গাঁঠরী, কমন্ডলু সামলে হাত তুলে বিদায় জানালাম। ২-৩ মিনিট পরে আবার পিছন ফিরে দেখতে পেলাম তাঁরা যাইহোক ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন। বেলা বোধহয় দুটো বেজেছে। আমার ভিতরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, শ্লথপদে দু'এক মিনিট হেঁটে বসে পড়লাম। গায়ে যেন কোন শক্তি নাই। আমি বসে বসে মা নর্মদার শ্রীচরণে প্রার্থনা করতে লাগলাম — মা আমাকে শক্তি দাও। তুমি না কৃপা করলে আমি কি করে তোমার কূলে কূলে হেঁটে তোমাকে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করতে পারব।

মিনিট পাঁচেক পরে গাঁঠরী ঘাড়ে তুলে হাঁটতে আরম্ভ করলাম, নর্মদার বাঁধে বাঁধে। নর্মদার দিকে তাকিয়ে বললাম—মাগো, এই বিশাল বিশ্বে এখন আমি সম্পূর্ণ একা, তুমি সহায় হও মা। পথে যেসব পথিক আসা যাওয়া করছেন তাঁরা অধিকাংশই ভারভূতেশ্বর মন্দির হতে ফিরছেন। দেবদর্শনের গভীর পরিতৃপ্তি তাদের, মুখে চোখে ফুটে রয়েছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম,'অমলেশ্বরজী' ঔর কিত্‌না দূর বা —'ঔর পাঁচ মিল।' অনুমান করলাম, অমলেশ্বরই আজ থাকতে হবে। মনে পড়ল অমলেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্তির চারিদিকে স্তূপীকৃত তাজা আমলকী সাজানো আছে। আমলকীর বনের মধ্যেই মন্দির। সদ্য সদ্য একটি আমলকী ছিঁড়ে সেখানে মহাদেবকে অর্ঘ্য দিতে হয়। ঘন্টা দেড়েক হেঁটেই আমি নর্মদাতীরস্থ আমলকী বন দেখতে পেলাম। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম মহল্লার নাম অমলেশ্বরই বটে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে অনুমান করলাম বেলা বোধহয় ৩ টা বা সাড়ে ৩ টা। এখনও অনেক রোদ। এত বেলা থাকতে থাকতে এখানে রাত কাটাতে ইচ্ছা হল না। মন্দিরের সামনে মহাদেবকে প্রণাম করে আমলকী বন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে মাইলখানেক দূরে সমনী গ্রামে এসে পৌঁছলাম। মনে পড়ল এটি খেচরী পীঠ। এখানে শুণ্ডীশ্বর মহাদেব বিরাজমান। মন্দিরের মধ্যে পূর্বপরিচিত পুরোহিতজী বসে আছেন। আমি ভগবান শুণ্ডীশ্বরকে প্রণাম করে তাঁকে ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের অবস্থান কতদূরে জিজ্ঞাসা করলাম। আর মাইলখানিক হাঁটলেই সেখানে পৌঁছতে পারব জানতে পেরেই আমি দ্রুতপদে

হাঁটতে লাগলাম। ডিণ্ডীশ্বর মন্দিরে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা। মহাদেবের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন — ক্যা আপ্ দলছুট হো? আমি জানালাম — দলছুট নই, আমার সঙ্গীরা ভারোচে থেকে গেছেন, সেখান থেকে তাঁরা নৌকাতে করে মণ্ডলেশ্বরে যাবেন। আমি হরিধামে পৌঁছে দক্ষিণতটে যাব পরিক্রমা করতে।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগে চলুন মণ্ডপ গৃহে গিয়ে আপনার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করি। পরে আরতি করব।

পরিচিত মণ্ডপ গৃহ, ভারোচ যাওয়ার পথে মোহান্তজীদের সঙ্গে গতবারেও এখানে রাত্রিবাস করেছিলাম। আমাকে মণ্ডপ গৃহে শোওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে একটি মোমবাতি জ্বেলে রেখে তিনি মন্দিরে গেলেন, আরতির আয়োজন করতে। আমি গাঁঠরী, ঝোলা ফেলে রেখে নর্মদার ঘাটে গেলাম টর্চটা ঝোলা থেকে বের করে নিয়ে; হাতে কমণ্ডলু। আজ ২৬শে কার্তিক শুক্রবার। দুদিন আগে ছিল পূর্ণিমা। একটু পরেই জ্যোৎস্না উঠবে। আমি নর্মদাতে নেমে হাত-মুখ ধুয়ে কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে এলাম। গতবারে ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গভীর রাত্রে যে অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিলাম, সে কথা মনে পড়তেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। মনে কিঞ্চিৎ ভয়ও জন্মাল। এবার আমি সম্পূর্ণ একা। মন্দিরে গিয়ে অগ্নিবর্ণ ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করলাম। আরতি সুরু হয়ে গেছে। ওঁ পবনমন্দ সুগন্ধ শীতল হেমমন্দির শোভিতং....শ্রীবেদব্রহ্মা করত অস্তুতি ডিণ্ডীশ্বর বিশ্বম্ভরং — সেই একই মন্ত্রে পুরোহিতজী আরতি করে চলেছেন নেচে নেচে। শিঙ্গা, ডম্বরু এবং ঢোলক ভক্তরা বাজাচ্ছে। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত। পূর্বের মতই শিবলিঙ্গ গনগনে আগুনের রূপ ধারণ করলেন। আরতির শেষে গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ ডিণ্ডীশ্বরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। পুরোহিতজী একটি জ্বলন্ত ঘৃতপ্রদীপ হাতে নিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপে এসে বসলেন। দু'এক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন — একা একা আপনার ভয় করবে না ত?

— আজ্ঞে না। আমি একা একাই ত পরিক্রমা করছি। মা নর্মদা অবশ্য আমাকে একাকীত্ব অনুভব করতে দেন নি। মাঝে মাঝেই তাঁর দয়ায় অনেক দরদী সাথী জুটে গেছেন।

— বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। মায়ী ত এ্যায়সাই আপনা পরিক্রমাবাসী সন্তানকো দেখভাল করবাই করবেগা। হম অভি যা রহা হৈ। কোঈ ডর নেহি। ফিন্ সুবে ভেট হোগা। আপ্ বিস্তারা বিছা লিজিয়ে।

তিনি চলে গেলেন। আমি আসন বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মোহান্তজীর স্নেহের দান সেই নূতন কম্বলটি গায়ে চাপালাম। রাত্রি এখন বড় জোর ৮ টা। নূতন কম্বল গায়ে কুটকুট করছে, ব্যবহার করতে করতে পরে হয়ত মোলায়েম হবে। কিঞ্চিৎ অস্বস্তি হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল মন্দিরে কেউ যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন — ব্যোমপঞ্চকম্। আকাশ। পরাকাশ। মহাকাশ। সূর্যাকাশ। পরমাকাশ। বাহ্য অভ্যন্তরময় আকাশ। বাহ্য অভ্যন্তরে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় পরাকাশ। বাহ্য অভ্যন্তরে অপরিমিত জ্যোতির ন্যায় তত্ত্বমহাকাশ। বাহ্য অভ্যন্তরে সূর্যের ন্যায় সূর্যাকাশ। অনির্বচনীয়জ্যোতি সর্বব্যাপক নিরতিশয় আনন্দলক্ষণ পরমাকাশ।

তস্মাচ্ছুক্রতেজোময়ং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্। তদ্ব্রহ্ম মনঃ-সহকারে-চক্ষুষান্তর্দৃষ্ট্যা বেদং ভবতি, বেদ্যং ভবতি।

আমি হতচকিত হয়ে গায়ের কম্বল ফেলে দিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসেছি। শেষোক্ত মন্ত্রটি আর একবার কাটা কাটা স্বরে উচ্চারণ করে সেই অদ্ভুত গম্ভীর কণ্ঠস্বর নীরব হল। গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে। চোখ বন্ধ কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে আছি, আরও কিছু শুনবার জন্য। ভয়ে চোখ খুলতে পারছি না, চোখ দুটো কেউ আঁঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে। ঐ ভাবেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ মনে হল, বিস্তৃত আকাশপট যেন আমার মাথার উপরেই , পূর্ণচন্দ্র আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত ! দৃশ্যপট ধীরে ধীরে বদলে গেল। আমি দেখছি — (১) প্রকাণ্ড অগ্নি যেন সবদিকে শিখা বিস্তার করে জ্বলছে। (২) ধীরে ধীরে সেই সর্বব্যাপ্ত অগ্নিশিখা সঙ্কুচিত হয়ে এক ছোট অগ্নিশিখার রূপ নিল। আকারে ছোট হলেও তেজ প্রচণ্ড; আপাদমস্তক দেহে তাপবোধ হচ্ছে। (৩) সেই অগ্নি রূপান্তরিত হল নিশ্চল একটি স্ফটিক প্রদীপে, বড়ই সুস্নিগ্ধ। (৪) পূর্ণচন্দ্র বিকশিত সেই আকাশ কোথায় গেল, এ যে দেখছি নীলমেঘের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ স্ফূরণ হচ্ছে। (৫) ক্রমে ক্রমে উড়ীধানের শুঁয়ার মত অতি সূক্ষ্ম এক হলুদবর্ণের জ্যোতিঃ প্রকাশ পেল।

বহু বহুক্ষণ পরে আমি জেগে উঠলাম, পুরোহিতজীর কণ্ঠস্বরে — ব্রহ্মচারীজী! অভি সুবা সাত বাজ গিয়া। সূর্যোদয় হো রহা হৈ। জাড়া বহোৎ হ্যা, সোয়েটার চড়াইয়ে। আমাকে ডাক দিয়েই তিনি চলে গেলেন। ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে ডিণ্ডীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম। সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে ধীরে ধীরে গাঁঠরী ঝোলা প্রভৃতি গুছিয়ে নিয়ে কমন্ডলু ও লাঠি হাতে মণ্ডপ গৃহ হতে বেরিয়ে এলাম। নর্মদার ঘাটে এসে দেখি পুরোহিতজী দাঁতন করছেন। নর্মদা স্পর্শ করে তাঁকে বললাম — দণ্ডবৎ। অভি হম্ চল পড়ে। তিনি কিছু উত্তর দিবার আগেই আমি সোজা নর্মদার তট ধরে হাঁটতে লাগলাম। মাইল খানিক হেঁটে যাবার পর একটি অর্ধভগ্ন প্রাচীন মন্দির দেখে চেনা চেনা মনে হল। কিছুলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরা বললেন — বাবা অঙ্গরেশ্বর মহাদেওজী কা মন্দর হৈ। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরাই জানালেন যে আর দেড় মাইলটাক হাঁটলেই মুনিড মহল্লা। আমার ধীরে ধীরে মনে পড়ল সেই মনোরম তপোবনসদৃশ মুন্যালয় তীর্থের কথা। ভারোচে যাবার সময় যেখানে জীবনে সর্বপ্রথম ইঙ্গুদী বৃক্ষ এবং মনোহর দুটি শুকপাখী দেখেছিলাম। আমি অঙ্গরেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম মুনাড গ্রামের দিকে।

ডিণ্ডীশ্বরের মন্দিরে গতরাত্রিতে বাস করার পর শরীরটা বিশেষ ভাল নাই। হাঁটতে হবে তাই হাঁটছি, শরীরের গ্রন্থিগুলো যেন শিথিল, কমণ্ডলু ও লাঠি আলতোভাবে ধরে নিয়ে চলেছি। হাতের আঙুলগুলো জোরে মুঠো করতে পারছি না। নর্মদা তো সামনেই বয়ে চলেছেন, কমণ্ডলুতে জল বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি ? যেমন ভাবনা তেমন কাজ। গাঁঠরী নিচে নামিয়ে কমণ্ডলুর জলে ভাল করে মুখচোখ ধুলাম। একটুখানি রোদে বসে খালি কমণ্ডলু ও লাঠি ধরে, লাঠির উপর ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় ঘন্টাখানিক লাগল মুনাড গ্রামে পৌঁছতে। মুনাড গ্রামে নয়নানন্দকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মন অনেকখানি

সতেজ ও উৎফুল্ল হল। মনে পড়ল মোহান্তজীর কথা। তিনি গতবারে এই তপোবনসদৃশ গ্রামখানির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন — একসময় সমস্ত মুনিরা একত্রিত হয়ে নর্মদাতটের এইখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যার চিন্ময় প্রভাব নাকি এখনও এখানে বর্তমান। চিন্ময় প্রভাব বুঝি না, কিন্তু প্রকৃতির প্রভাব যে দেহমন স্নায়ু শিরার উপর স্নিগ্ধ প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে ধীরে ধীরে মুনীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌঁছিলাম। ঘাটে নেমে স্নান তর্পণাদি সেরে পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে মুনীশ্বর মহাদেবের মাথায় জল ঢাললাম। বড়ই তৃপ্তি পেলাম এখানে। এখন আর শরীরে কোন জড়তা নাই। পুরোহিত জানালেন — সকাল ৯টা বেজেছে।

এবার আমি বেশ দ্রুতভাবে হাঁটতে পারছি। বেলা ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত হেঁটে আমি একে একে মেগাবের খাঁড়িতে সেই বিখ্যাত গণিতা তীর্থ, কাসবা গ্রামের কন্থেশ্বর, কুজাগ্রামের তিনটি মহাদেব মন্দির, কপালেশ্বর, বৈঁগনী গ্রামের বৈজনাথজী, এরন্ডী তীর্থ পেরিয়ে তিন মাইল দূরে কোল্যাদ মহল্লাতে কপিলেশ্বর মন্দিরে এসে পৌঁছিলাম। ভারোচ যাবার সময় এই বর্ধিষ্ণু গ্রামের অতিথিশালাতেই আমরা রাত্রিবাস করে ছিলাম। উঁকি মেরে দেখলাম, নির্জন অতিথিশালায় কেউ নাই। ফাঁকা ঘর পড়ে আছে। সে সময় এখানে দুজন মাদ্রাজী দন্ডী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁদের একজন আমাদের কাছে শিবের অষ্টমূর্তির ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছিলেন। অতিথিশালার প্রাঙ্গনে বসে মোহান্তজী প্রদত্ত সেই প্রসাদ ঝোলা থেকে বের করে খেতে বসলাম। খুব ক্ষুদা পেয়েছিল, সমূহ লাড্ডু ও ফলটল সবই খেয়ে ফেললাম। আমার খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় দেখলাম হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে একদল সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। কথা বলে জানতে পারলান তাঁরা ভারোচ যাবেন। তাঁদের সংকল্প তাঁরা এখানেই রাত্রিবাস করবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় জানালাম আমার গন্তব্যপথ হরিধাম। তাঁদের ঠিক উলটো পথ। সন্ন্যাসীরা সদাশয় এবং সদালাপী। বললেন — আজ হরিধামে পৌঁছান কোনমতেই সম্ভব হবে না। পথে কোথাও থাকতেই হবে। হরিধামে আগে পড়বে ভয়ঙ্কর ভূতনাথের জঙ্গল। অবেলায় সেই জঙ্গলে প্রবেশ করা আপনার একার পক্ষে কোনমতেই উচিত হবে না। আপনি এখান থেকে তিন মাইল দূরে মুবাগ্রাম পেরিয়ে, আমলেঠা মহল্লার ভিতর দিয়ে দেজ মহল্লায় চলে যান। সেখানে দধীচি মুনির আশ্রমে রাত্রিবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কাল সকালে দিনের আলোতে ভূতনাথের জঙ্গলে তখন প্রবেশ করবেন। দধীচি আশ্রমের সাধুরা বড়ই সজ্জন। আপনার একার পক্ষে সেখানে থাকার কোন সমস্যাই হবে না। আমি তাঁদের 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে কপিলেশ্বরকে প্রণাম করে হাঁটতে সুরু করে দিলাম। সন্ন্যাসীদের একজনের হাতঘড়িতে দেখে নিয়েছি বেলা ২ টা ২০ মিনিট বেজেছে।

মুবাগ্রাম আমলেঠা পেরিয়ে যখন দহেজ বা দেজগ্রামে পৌঁছিলাম, তখন সূর্য পাটে বসেছেন। আমি লোককে জিজ্ঞাসা করে সোজা পৌঁছে গেলাম দুধনাথজী শিবের মন্দিরে। সেখানে প্রণাম করে পাশেই ভগবতীর মন্দিরে প্রাণাম করতে গিয়ে দধীচি আশ্রমের সেই সাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, যিনি এই মন্দিরে থেকেই মোহান্তজী এবং আমাদেরকে ডেকে নিয়ে গেছলেন ভিক্ষার জন্য। তিনি আমাকে দেখেই চিনলেন। তিনি আমার সঙ্গীদের কথা জিজ্ঞাসা করতেই

আমি সংক্ষেপে তাঁকে সব জানালাম। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আমাকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের একটি কুটীরেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁদের অনুষ্ঠিত দধীচি মুনির আরতি দেখলাম। আরতির পর মিনিট দশেক তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কুটীরে ঢুকে সন্ধ্যা করতে বসলাম। সান্ধ্যক্রিয়া সেরেই শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল। সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে। বেলা তখন ৮টা বেজেছে। চমৎকার মিষ্টি রোদে হাঁটতে ভালই লাগছে। দূরে দূরে জনবসতিপূর্ণ শস্যশ্যামল গ্রাম দেখতে দেখতে মনের আনন্দে হেঁটে চলেছি; আনন্দের কারণ আজ হরিধামে পৌঁছে যাব। আজ না নৌকা পেলেও কাল নিশ্চয়ই নৌকা পেয়ে যাব। মহাত্মা পূষণ গিরিজীর ছাড়পত্র অর্থাৎ নৌকার চিঠি ত কাছেই আছে, ভাবনা কি। প্রায় পৌনে একঘন্টা হাঁটার পর সামনে জঙ্গল দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বুকটা ধক্ করে উঠল। ভূতনাথের জঙ্গল। যেখানে জনশ্রুতি রুদ্রপিশাচের বাস। রুদ্রপিশাচ থাকুন না থাকুন, সকলের মুখে শুনে আসছি এটি ভয়ঙ্কর স্থান! গতবারে মোহান্তজীর সঙ্গে নিজেই ত দেখে গেছি, ভূতনাথের মন্দিরে পৌঁছতে কত ঘুরপাক খেতে হয়েছে। সোজা জঙ্গল অতিক্রম করে যাওয়ার উপায় নাই। নিরাপদে সমুদ্র পেরোতে হলে প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীকে ভূতনাথের মন্দিরে প্রণাম ঠুকে যেতেই হবে। তা নাহলে নাকি সমুদ্রে নৌকাডুবি হয়ে যায়! আমি ঝোলা গাঁঠরী পথের উপর রেখে বাবা এবং মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। জঙ্গলে ত কোন জন্তু জানোয়ারের ভয় নাই, ভয় কেবল বনের গোলকধাঁধাকে। যা হবার হবে। হর নর্মদে বলতে বলতে ঢুকে পড়লাম বনের ভিতর। আমার এটা খুব ভাল করেই মনে আছে যে, একটা অশ্বত্থ ও পর পর তিনটা শিমূল গাছ অতিক্রম করে সেবারে একটা বড় বেলগাছ এবং আমলকী গাছের আড়ালে কালচে রং এর প্রাচীন মন্দিরটি চোখে পড়েছিল। আমি বনের মধ্যে বেল ও শিমূল গাছের চূড়া লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। নানারকম লতাপাতা ঠেলে ঠেলে হাঁটতে লাগলাম। কোথাও কোন পথের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছি না। মিনিট পনের হাঁটার পর একটা শিমূল গাছের চূড়া দেখতে পেয়ে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে লাগলাম। কাছাকাছি এসে দেখি প্রায় ১০ ফুট ব্যাসযুক্ত গুঁড়িওয়ালা শিমূল গাছ। তার পিছনে অসংখ্য বনপাদপ, নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে শাখা বাহু ছড়িয়ে কি একটা গাছ, বনের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। শোভা দেখার মন এখন নাই। নিরাশ হলাম! কারণ ভূতনাথের মন্দিরের কাছে এতবড় গাছ ছিল না। তাছাড়া সেখানে আছে পরপর তিনটি শিমূল গাছ। বেলগাছ ও আমলকী গাছও ত এখানে ধারে কাছে দেখছি না। সে পথ ছেড়ে জঙ্গলের অন্য পথ ধরলাম। শিশিরসিক্ত নিস্তব্ধ বনস্থলীতে কতরকমের বন্য বিহঙ্গের অদ্ভুত সব কূজন শুনতে পাচ্ছি। একটা পথের চিহ্ন দেখতে পেয়ে আশায় বুক দুলে উঠল। এই পথ নিশ্চয়ই ভূতনাথের মন্দিরে পৌঁচেছে। সেই পথের নিশানা ধরে হাঁটতে লাগলাম। হায় ভগবান, এ যে পৌঁছে গেলাম এমন এক জায়গায় যেখানে অনেকখানি অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে। পাথরের পাশ দিয়ে হেঁটে মিনিট দশেক পরে পৌঁছলাম বনের এমন একপ্রান্তে যেখানে বন ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, সেখানে এখনও কুয়াশা জড়িয়ে আছে গাছপালায়; মনে হচ্ছে ঢালুতে নিচে কেউ বুঝি আগুন দিয়েছে, তার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে

উঠে আসছে জঙ্গলের ভিতর। এইভাবে এদিকে ওদিকে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে হতাশ হয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়লাম গাঁঠরীর উপর। বড় বড় গাছপালার ফাঁক দিয়ে তির্যক ভাবে রোদ এসে পড়েছে গায়ে। আমি হতাশ মনে মা নর্মদার ষড়ক্ষরী মূলবীজ জপ করতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেক পরে বনের ভিতর কোথাও থেকে কানে একটা গান ভেসে এল। কান পাততেই ধীরে ধীরে বুঝতেও পারলাম সেই গানের ভাষা —

মেরে আখন কে দৌতারে,
পিতাপুত্রী অভিরাম মনোহর
কৈলাস-কন্টক মেঁ বাঢ়ে।

আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। এ যে ভারোচের সেই 'কঙ্কালসার ভক্ষণসুর' সাধুর কণ্ঠস্বর! আনন্দে মনে নেচে উঠল। গানের সুর লক্ষ্য করে গাছপালা মাড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম।

শুক শারদ নারদ বলিহারী
মহিমা বর্ণত হারে
মেরে আখন কে দৌতারে।

গানের ভাষা ও সুর ক্রমশঃ স্পষ্টতর ও নিকটতর হচ্ছে—

মেরে আখন কে দৌতারে
রেবা শিবম্, শিবম্ রেবা
ইয়ে দৌ, রূপ উজারে।

একটা লতার ঝোপ অতিক্রম করতেই সেই পরপর তিনটি শিমূল গাছ, বেল ও আমলকী গাছের আড়ালে ভূতনাথের মন্দির চোখে পড়ল। দরজার চৌকাঠে বসে আছেন গায়ক। কিন্তু ইনি ত ভারভূতি বা ভারোচের সেই 'ভক্ষণসুর' সাধু নন, ইনি যে আমার প্রিয় পরম যোগিরাজাধিরাজ প্রলয়দাসজী! আমার হাত থেকে গাঁঠরী, ঝোলা, লাঠি ইত্যাদি খসে পড়ল। মাথা ঘুরে গেল, আমি ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লাম। মিনিটখানিক তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমার বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটছে না; ভাবছি, ইনিই কি তিনি অর্থাৎ যাঁর একসঙ্গে প্রায় ৮০টা কলা এবং ৮টা নারকেল খাওয়া দেখে রতনভারতীজী যাঁকে 'ভক্ষণসুর সাধু' বলে অভিহিত করেছিলেন? তাকাবার সময় উভয়েরই চোখ দুটির অদ্ভুত ধরণের মিজিমিজি ভঙ্গিমা ছাড়া আর কিছু দৈহিক সাদৃশ ত চোখে পড়ছে না। 'আমার কাছে উঠে এসে ভূতনাথকে প্রণাম কর। ভৃগুকচ্ছ ত পরিক্রমা করে এলে তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি, তবে কিছু অসন্তোষেরও কারণ ঘটেছে। মুল শ্রীপতি তীর্থে এবং ভূতেশ্বরের শাম্ভবী পীঠে বিশেষতঃ ফেরার সময় ভারভূতেশ্বরের মহাদেবকে মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাস্তবরাজ শুনিয়ে আসা উচিত ছিল। যাইহোক, এখন মধ্যাহ্নক্ষণ আসন্ন। মধ্যাহ্নক্ষণ ধরে তোমাকে ভূতনাথের পূজা করতে হবে। মন্দিরের মধ্যে ফুল, বেলপাতা, চন্দন সবই আছে। তুমি পূজা করতে বসে যাও। আমি মহাদেবের জন্য কিছু ভোগ সংগ্রহ করে আনছি।' এই বলে তিনি লাঠি হাতে নিয়ে কোথাও যাবার উপক্রম করতেই আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। 'শিবং ভুয়াৎ' বলে তিনি লাঠি ঠুকে ঠুকে মন্দিরের পিছন দিকে চলে গেলেন। আমি দু'তিন মিনিট হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম। তারপর মন্দিরে ঢুকে পাশাপাশি অবস্থিত ভূতনাথ নামে

অভিহিত তিনটি শিবলিঙ্গকে আমি আমার মত করে পূজা করতে আরম্ভ করলাম। শিব তিনটিতে জল ঢেলে মার্জনা করছি, এমন সময় দেখলাম ১২ টি বার রকমের পাখী নানারকম শব্দ যথা —কেউ কিচিরমিচির, কেউ টুংটুং, কেউ টিয়ার মত বুলি, কেউ ট্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করতে করতে মন্দিরের চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি সেই পক্ষীকুলের কলতানের মধ্যে পূজা করতে লাগলাম ভূতনাথের। পূজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় মুখ তুলে দেখি, 'ঠুক্ ঠুক্' লাঠির শব্দ করতে করতে মহাত্মা ফিরে এসেছেন। একটি শালপাতায় মোড়া এক ডেলা ছানা ও তিনটি কলা ভূতনাথের সম্মুখে রেখে ভোগ নিবেদনের ইঙ্গিত জানালেন। আর একটি শালপাতায় মোড়া পৃথক এক ডেলা ছানা নিয়ে তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পাখীদের মধ্যে বিলোতে লাগলেন। পাখীরা তাঁর হাতের উপর কাঁধের উপর বসে ঠুকরে ঠুকরে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল। আমার ভোগ নিবেদনও শেষ হল, পাখীরাও তাঁর হাতে ছানা খেয়ে উড়ে গেল বনে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, তিনি ভোগ নিয়ে আসার পূর্বে মন্দিরের মধ্যে ঢুকেও কয়েকটা পাখী যত্রতত্র নেচে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু তিনি এসে পৌঁছানো মাত্রই সকলে তাঁকেই ঘিরে ছিল। তাঁর হাতের ছানা শেষ হয়ে গেলেও শিবলিঙ্গের সামনে ছানা শালপাতাতে থাকলেও কোন পাখী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে সেদিকে দৃক্‌পাতও করল না।

পূজা ও প্রণাম করে দরজার বাইরে এসে তাঁর পায়ে ফুল চাপিয়ে সাষ্টাঙ্গে ভক্তি নিবেদন করলাম। তখন থেকে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে, ভারোচে ইনি দেখা দিয়েছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু খুবই অশোভন হবে বলে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলাম না। ভাবলাম, একই গান উভয়ের মুখে শুনেছি বলে যে উভয়েই একই ব্যক্তি হবেন, এমন কোন কথা নাই। একই গানের ভাষা দুজন কেন দুশ জনেরও জানা থাকতে পারে।

— লেও শৈলেন্দ্রনারায়ণজী! ভূতনাথজী কা পরসাদী পা লিজিয়ে।

আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। তিনি কিছু গ্রহণ করবেন কিনা বলতে যাবো, এমন সময় তিনি নিজেই বলে উঠলেন — লেওজী, ইধর বৈঠকে পা লিজিয়ে, করীব এক বাজ গিয়া হোঙ্গে। আপ্‌তো জানতে হো, হম্ কুছ্ লেতে নেহি।

সশব্দে একটা উদ্‌গার তুলে বললেন — কয়রোজ পহেলে ভারভূতিমেঁ ভারভূতেশ্বরজী মুঝে জবরদস্তিসে বহোৎ কেলা ঔর নড়াইল খিলায়ে থা। আভি শ' সাল ইসীমেঁ বীত্ জায়েঙ্গে।

আমার সংশয় মোচন হল, আমি ভূতনাথের প্রসাদ খেয়ে নিলাম। হাত মুখ ধুয়ে তাঁর কাছে বসতেই তিনি বললেন — তুমহারা ঝোলাসে ডায়েরী ঔর কলম লেও, উপদেশ ব্যাপৃত দেশিক শাক্তবেদান্তী ঔর শৈবাগমী প্রাচীন গুরুসম্প্রদায়মেঁ এক দুর্লভতম মন্ত্র পরম্পরাসে প্রচলিত হে। হম বলতে হেঁ , আপ্ লিখ লিজিয়ে।

তিনি ধীরে ধীরে সেই মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন, আমি লিখে নিতে লাগলাম। ওঁ যদ্‌ব্রহ্ম শুদ্ধং নিরহং নিরীহং স্বান্তর্বিলীনাত্মসমস্তশক্তি হতে আরম্ভ করে বেদত্রয়ী কর্মময়ী বিল্লাজশক্তিং গুরুং দ্বাদশমানতাঃ স্মঃ পর্যন্ত চব্বিশ লাইন মন্ত্র তিনি বার বার উচ্চারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে বানান বলে দিয়ে অতি যত্ন সহকারে লিখিয়ে দিলেন। আমি শুদ্ধভাবে লিখতে পেরেছি কিনা, তা জানার জন্য তিনি সেই মন্ত্রমালা বার বার দুবার পড়ে শোনাতে বললেন।

— লেওজী, আভি সাড়ে তিন বাজে হোঙ্গে। আভি জঙ্গলসে নিকলেঙ্গে। আমি ভূতনাথকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় মিনিট দশেক হেঁটে জঙ্গলের বাইরে এসে কলপ্রবাহিনী নর্মদার দর্শন পেলাম। দূর খাঁড়িতে সমুদ্রে মিলিত হওয়ার জন্য নর্মদা ছুটে চলেছেন প্রবল উচ্ছ্বাসে। আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট সারি সারি গাছের তলায় তলায় হেঁটে সমুদ্রের নিকটবর্তী একটা খাঁড়ির কাছে এলাম, তটের উপরে একটি পড়ো বাড়ী এবং মিষ্টি নিমপাতার গাছটি দেখেই চিনতে পারলাম যে আমরা লুণ্ঠেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁচেছি। সমুদ্রের জল লুটিয়ে লুটিয়ে এসে অদূরে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

—আপ্ একরাত্রি ইয়ে লছমনিয়া লোটেশ্বরমেঁ বাস করকে গিয়া। আজ ভি হম্‌লোগ ইধরই ঠারেঙ্গে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সেই পড়ো ঘরে ঢুকে দেখলাম, তিনখানা ঘরই পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করছে। গতবারে এইসব ঘর পোড়াকাঠ এবং ছাই-এ ভর্তি ছিল। ইতিমধ্যে কেউ হয়ত পরিষ্কার করে রেখে গেছেন। একটি ঘরে ঢুকে তাঁর জন্য আমার নূতন কম্বলটি পেতে দিলাম। পাশের ঘরে ঢুকে নিজের জন্য আসন বিছালাম। তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন। কারণ কিছু বুঝলাম না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — হমারা লিয়ে কোঈ বিস্তারা কম্বলাদিকে জেরুরৎ নেহি জী। উহ্ কামরা সে কম্বল উঠা লিজিয়ে, হম্ আপকা পাশমেঁই বৈঠতা হুঁ। এইবলে তিনি মেঝের উপরেই বসে পড়লেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাঁর ঝোলা থেকে চারটি মাঝারি সাইজের মোমবাতি বের করে আমাকে দিয়ে বললেন — একঠো জ্বাল লো। ইয়ে রাত্রি আপকো নিদকে লিয়ে নেহি। পর পর বাতি জ্বালকে উহ্ মন্ত্রমালা মুখস্থ করেঁ। মনন ভি করেঁ। যো ভূতনাথ মহাদেও ঔর ভূতনাথকী জঙ্গল দেখকে আয়া উসকী বারেমেঁ ঔর থোড়া প্রকাশ ডালতে হৈ , ধ্যান দেকর শুনিয়ে।

এই বলে তিনি যেসব কথা শোনালেন তার সংক্ষিপ্তসার এই যে, স্মরণাতীতকাল পূর্বে ঐ ভূতনাথের স্থানে একজন শৈব মহাযোগীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে প্রকট হন। শিবলিঙ্গ আবির্ভাবের কালে আকাশ মণ্ডল ভেদ করে তাঁর কাছে একটি একাক্ষরী দিব্যমন্ত্র প্রকট হয়। আনন্দে অভিভূত হয়ে সেই মহাযোগী প্রচণ্ড উল্লাসে নৃত্য করতে করতে প্রাণপণে চিৎকার করে ঐ বীজ দুবার উচ্চারণ করেন এবং অপার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, সেখানে পূর্বোক্ত শিবলিঙ্গের পাশে আর দুটি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয়ে গেল। জাপ্য মূলবীজকে এইভাবে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করায় সেখানে তৎক্ষণাৎ নন্দী, ভৃঙ্গী, বীরভদ্র, ঘণ্টাকর্ণ বহুতর রুদ্রপিশাচদের আবির্ভাব ঘটে। এই নিয়মবিরুদ্ধ কাজের জন্য চিরতরে তাঁর জিহ্বা স্তব্ধ হয়। তিনি অতঃপর যতকাল জীবিত ছিলেন ততদিন সংকেতে বা লিখে লিখে সমাগত ভক্তদের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করতেন। সেই মহাযোগীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁর সামনে কেউ এসে পৌঁছালেই সেই ভক্তের মনে এবং জিহ্বায় আপনা হতেই মহাদেবের একাক্ষরী মহাবীজ স্ফূরিত হত। কালক্রমে তাঁকে কেন্দ্র করেই একটি বিরাট আখড়া গড়ে উঠে। সেই আখড়ার নাম হয় ভূতনাথ আখড়া। তামাম্ হিন্দুস্থানে সাধারণের পরিচিত সন্ন্যাসীদের সাতটি আখড়া আছে। যথা — নির্বানী বা মহানির্বানী, নিরঞ্জনী, জুনা, অটল, আহ্বনী, আনন্দ ও বড় আখড়া। রুখড়, সুখড়, এবং অগন নামক

আখড়া এই ভূতনাথ আখড়ারই অন্তর্গত। সারা ভারতবর্ষে শংকরপন্থী দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরকে বাদ দিলে প্রত্যেক সন্ন্যাসীই এইসব কোন না কোন আখড়ার লোক। বলতে ভুলে গেছি, যাঁর তপস্যা প্রভাবে ঐ ভূতনাথ মহাদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁকে লোকে ভূতনাথ বাবা বলেই ডাকতেন। তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যরা যে কারিগরী কৌশলে লক্ষ্ণৌ-এর ভুলভুলাইয়া নির্মিত হয়েছে, সেই কৌশলের ব্যবহারিক প্রয়োগে ভূতনাথ মন্দিরের চারদিকে সারি সারি গাছ লাগিয়েছিলেন। সেইসব গাছপালা ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ এর ভুলভুলাইয়াতে প্রবেশ করে সাধারণ যাত্রী যেমন বিভ্রান্ত হয়, সঠিক পথ সহজে খুঁজে পায় না, তেমনি ভূতনাথের জঙ্গলে প্রবেশ করে পথ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। রুদ্রপিশাচ বা ভূতপ্রেতাদির গল্প সম্পূর্ণ কুসংস্কার প্রসূত। অজ্ঞরা কিছুতেই বোঝে না যে, যেখানে ভূত আছে সেখানে ত ভূতনাথও আছেন! কাজেই ভয় কিছু নাই।

ভূতনাথ প্রসঙ্গ শেষ করেই তিনি মন্ত্রমালার শব্দার্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। প্রায় ঘন্টাখানিক ধরে বিশদভাবে মর্মার্থ বলার পর তিনি উঠে পড়লেন — 'আপ মুখস্থ করেঁ, হম্ দুসরা কামরামেঁ যা রাহা হুঁ। ঘাবড়াও মৎ! হম উধারহি ঠারেঙ্গে' — এই বলে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কমণ্ডলু ও ছোট্ট একটি ঝোলা ছাড়া তাঁর সঙ্গে কম্বলাদি কিছুই নাই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, মেঝেতে শুয়ে এই শীতের মধ্যে কিভাবে যে তিনি রাত কাটাবেন, তা আমার বোধগম্য হল না। কিন্তু ওঁকারেশ্বরে থাকা কালে তাঁর মধ্যে যেসব অলৌকিকত্ব দেখেছি, সেসব কথা স্মরণ করে ঐ সম্বন্ধে আমি আর কোন মাথা ঘামালাম না। আমি বসে বসে স্থির মনে তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রমালা মুখস্থ করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে করতে লাগলাম মন্ত্রার্থ অনুধ্যান। একটা মোমবাতির শিখা নিভু নিভু হতেই আর একটি মোমবাতি জ্বেলে দিলাম। প্রাণপ্রণে মুখস্থ করে চলেছি রাত্রি জেগে জেগে। দ্বিতীয় মোমবাতিও যখন শেষ হল, তখন তৃতীয়টাও জ্বেলে নিলাম। তৃতীয়টির শেষ পর্যায়ে মনে হল মন্ত্রগুল সব মুখস্থ হয়ে গেছে। আমি চোখ বন্ধ করে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম। আবৃত্তি করতে করতে দু তিন জায়গায় অল্প অল্প ঠেকে যেতে চোখ খুলে দেখি ঘর নিরন্ধ্র- অন্ধকারে ঢেকে গেছে, তার মানে তৃতীয় মোমবাতিটাও শেষ হয়েছে। চতুর্থ মোমবাতি জ্বেলে যেখানটাতে আটকে গেছল, তা আবার ভাল করে পড়ে নিলাম। ঘুমে আর চোখ খুলে রাখতে পারছি না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে মহাত্মার ডাকে আমার ঘুম ভাঙলঁ — সাত বাজ গিয়া। বিস্তারা ছোড়কে খাঁড়িমে যাকর নাহা লিজিয়ে। গোমুখাকার নন্দিকেশ্বর ইয়া লুণ্ঠেশ্বর মহাদেওকা পূজা করকে আইয়ে। পূজান্তে ইধর বৈঠকে মহর্ষি তণ্ডিকৃত স্তবরাজ পাঠ করিয়ে হম করীব বারা বাজে ইধর পধারেঙ্গে।

আমার তখনও বিছানা ভালভাবে গুটানো হয় নি। তিনি কথাগুলি বলে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি মিনিট পাঁচেক পরে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, সূর্যোদয় হচ্ছে। তবে কুয়াশা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। যেখানে সমুদ্র ও নর্মদার মিলন ঘটেছে, সেখানে গোমুখাকার স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিরাজমান, সেই লোটনেশ্বর বা লুণ্ঠেশ্বরের দিকে তাকিয়েও জলের উপর কুয়াশার আস্তরণের জন্য তাঁকে চোখে দেখতে পেলাম না। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্নান করতে গেলাম খাঁড়িতে। স্নান তর্পণাদি সেরে গোমুখাকার স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করলাম।

মোহান্তজীর সঙ্গে ৯ই কার্তিক প্রথম যখন এখানে আসি তখন তিনি জানিয়েছিলেন যে, এই গোমুখাকার শিবলিঙ্গের মধ্যে নর্মদা প্রবিষ্টা আছেন। সেই জল পান করলে সোমপানের ফল হয়। সেবারে শিবলিঙ্গের খোরে (গর্তে) আঙুল ডুবিয়ে জলপান করেছিলাম। এবারেও সেইভাবে একবিন্দু জলপান করে ফিরে এলাম সেই পড়ো বাড়ীতে, যাত্রীশালায়। আলখাল্লাদি গায়ে চাপিয়ে মহর্ষি তণ্ডিকৃত সেই স্তবরাজ ঝোলা থেকে বের করে পাঠ করতে লাগলাম। পাঠ যখন শেষ হল, তখন দেখলাম, লাঠি ঠুকে ঠুকে মহাত্মা প্রলয়দাসজী এসে পৌঁছলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটি আমার সামনে রেখে দিয়েই বললেন — 'ইয়ে আপকো লিয়ে পরসাদী হৈ।' কিভাবে তিনি এই পরসাদী কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, এইসব প্রশ্ন এই রহস্যময় মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা জেনেই তাঁকে 'পরসাদী' প্রসঙ্গে কিছু না বলে তাঁকে কেবল জিজ্ঞাসা করলাম — আর ত প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে গেলেই রামতীর্থ, জমদগ্নি তীর্থ তথা লোহরচ্যা গ্রাম পেরিয়ে মূল হরিধামে পৌঁছে যাব। আমি কি খাওয়া দাওয়ার পরেই সেখানে চলে যাব নৌকা পাই কিনা দেখতে ? আজই কি আমি রেবা-সমুদ্র সংগম অতিক্রম করে দক্ষিণতটে পৌঁছাতে পারব?

— নেহি জী। আভি গ্যারহ্ বাজ গয়া। দক্ষিণতটমেঁ পাড়ি দেনে কি লিয়ে এ্যাতনা উতলা কেঁও ? আজ ২৯ শে কার্তিক, সোমবার। সোমবার শিবের বার; সমুদ্র লঙ্ঘন করতে নাই। আমি সকালেই হরিধাম ঘুরে এসেছি। আজ চারদিন হল, ওপার থেকে কোন নৌকা আসে নি। পারাপারের জন্য ওপার থেকেই নৌকা সাধারণতঃ এসে থাকে। শতাধিক সন্ন্যাসী দক্ষিণতটে যাবার জন্য বালির চড়ায় ধর্না দিয়ে পড়ে আছেন। আসা করা যাচ্ছে, কাল নৌকা এসে পৌঁছাবে। কাল ৩০ শে কার্তিক, সংক্রান্তি। এই বিষুপদী সংক্রান্তিতে সর্বত্র কার্তিক পূজার অনুষ্ঠান হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার ও বিশ্বাস এই যে, কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক ঠাকুরের পূজা করলে অপুত্রকদের ও বন্ধ্যা নারীদের পুত্রলাভ হয়। সিদ্ধযোগীরা এই দৃষ্টিতে কার্তিককে দেখেন না। সিনোরে বিদুরজীর তপস্যা ক্ষেত্রে মহাত্মা পূষণ গিরীজীর কাছে শুনে এসেছ যে, কার্তিক হলেন ভগবান সনৎকুমার। তিনি খাঁটি কথাই তোমাকে শুনিয়েছেন। আমার কাছেও নিশ্চিত ভাবে জেনে যাও যে, ভগবান সনৎকুমার হলেন মূর্তিমান ব্রহ্মবিদ্যা। তাঁরই কৃপায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বয়ং নারদও দেবর্ষিত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন। নরের ধর্ম নার। সেই ধর্ম যিনি দান করেন, ভগবৎ মহিমা প্রচারের দ্বারা নরত্ব তথা দেবত্ব ফুটিয়ে তোলেন, তিনি নারদ। সামবেদীর ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে আম্নাত হয়েছে — মৃদিতকষায়ায় তস্মৈ ভগবান সনৎকুমারঃ তমসঃ পারম্ দর্শয়তি অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষ হতে বিমুক্ত সেই নারদকে ভগবান সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার অর্থাৎ পরব্রহ্ম দর্শন করিয়েছিলেন। তং স্কন্দং ইতি আচক্ষতে, তং স্কন্দং ইতি আচক্ষতে — জ্ঞানীগণ তাঁকে স্কন্দ নামে অভিহিত করেন। স্কন্দ কার্তিকেরই অপর নাম। আগামীকাল কার্তিক পূজার শুভদিন। জগৎসৃষ্টির পর কোন এককালে ভগবান সনৎকুমার এই পরম শুভদিনেই এই মর পৃথিবীতে পরব্রহ্ম বিদ্যার জ্যোতির ঢল নামিয়েছিলেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিদ্যা প্রকট করেছিলেন। তাই আগামীকালই তোমাকে হরিধামে সমুদ্র অতিক্রমের শুভদিন হিসাবে নির্দিষ্ট করেছি। কাল যদি মা নর্মদা ও মহাদেবের কৃপায় তুমি নৌকায়

চাপতে পার, তাহলে সমুদ্রের তলদেশে এক অত্যদ্ভুত দিব্যদৃশ্য তোমার চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তোমার উপর তোমার পিতার আশীর্বাদ সহস্রধারে ঝরে পড়ছে। তাই সেই শুভক্ষণের প্রাক্কালে তুমি এসে পৌঁচেছ। কি পদ্ধতিতে তা ঘটবে, তার তুক্‌টুকু বলবার জন্য এবং তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিবার জন্য তোমাকে ভৃগুকচ্ছ হতে চোখে চোখে রেখে আসছি।

মহাভারতে তুমি পড়েছ — কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন অনিবার্য, যুদ্ধ হলেই লোকক্ষয় হবে, শোকও পেতে হবে, এই দুশ্চিন্তায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কাতর হয়ে মহামতি বিদুরের কাছে গিয়ে সকাতরে প্রার্থনা করেন যে, আসন্ন আত্মীয় স্বজন বিয়োগজনিত দুর্বার শোক আমি কিভাবে দমন করব? জ্ঞান ছাড়া ত শোকজয়ের আর কোন উপায় নাই। আমি তোমার কাছে জ্ঞানোপদেশ প্রার্থনা করি। বিদুর তাঁকে বললেন — মহারাজ! মৃত্যু বলে কোন বস্তু নাই। মৃত্যুশোক কেবল মোহের ফল মাত্র। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কথা শুনে বিস্মৃত হয়ে বলে উঠলেন — মৃত্যু নাই এ তোমার কেমন কথা? প্রতিদিনই ত কতলোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এ বাস্তব অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর সকল লোককেই ভোগ করতে হচ্ছে, তবুও তুমি বলছ, মৃত্যু বলে কোন বস্তু নাই! তোমার কথার মর্ম আমাকে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দাও। তাঁর আকুলিবিকুলি দেখে বিদুর উত্তর দিয়েছিলেন — এই অপূর্ব গুহ্যতত্ত্ব আমি ভগবান সনৎকুমারের দয়ায় বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি আমার বোধে এই তত্ত্ব ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ঐ তত্ত্বের বক্তা হতে পারব না। এ বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। তবে ঐ গুহ্যতত্ত্ব বুঝবার জন্য যদি আপনার তীব্র বাসনা হয়ে থাকে, তাহলে আমি এইটুকু করতে পারি যে আমি আমার জ্ঞানগুরু মূর্ত ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ ভগবান সনৎকুমারকে ধ্যানযোগে আবাহন করতে পারি, তিনি আবির্ভূত হলে সশ্রদ্ধ চিত্তে আপনি তাঁর কাছে এই তত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে বুঝে নিন। এইবলে বিদুর ধ্যান সমাহিত চিত্তে ভগবান সনৎকুমারকে আবাহন করলেন। ভগবানের আবির্ভাব ঘটলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। ভগবান সনৎকুমার তখন তাঁকে যে ব্রহ্মবিদ্যা সাহায্যে মৃত্যুশোক নিবারণ করা যায়, সেই সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই সারগর্ভ উপদেশ-মালা 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্ম-শাস্ত্রম্' নামে অভিহিত। ভগবান সনৎকুমারেরই অপর নাম সনৎসুজাত।

ধৃতরাষ্ট্র ও ভগবান সনৎকুমারের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে যে সব প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল —

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সনৎসুজাত ! যদি মাং পরার্থাং ব্রাহ্মীং বাচং বদসি হি বিশ্বরূপাং।
পরাং হি কাম্যেন সুদুর্লভাং কথাং প্রব্রূহি মে বাক্যমিদং কুমার।।

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র বললেন — হে সনৎসুজাত, আপনি যে ব্রাহ্মী কথা বললেন, তা পরার্থ ও বিশ্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানে বিশ্বের সকল রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয় বলে ব্রাহ্মীকথাকে বিশ্বরূপ বলা হয়। ব্রহ্মকে জানলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না, এইজন্য ব্রাহ্মীকথা পরার্থও বটে। যে কথা বুঝলে সংসারমুক্ত হওয়া যায়, সে কথায় সংসারী ব্যক্তি পরাঙ্মুখ থাকে বলে তাদের কাছে ব্রাহ্মীকথার অর্থোপলব্ধি অত্যন্ত দুলভ। সেই দুর্লভ কথা আরও প্রকৃষ্টরূপে আমাকে বলুন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সনৎসুজাত উবাচ

আদ্যাং বিদ্যাং বদসি হি সত্যরূপাং যা প্রাপ্যতে ব্রহ্মচর্যেন সদ্ভিঃ।
যাং প্রাপ্যৈনং মর্তলোকং ত্যজন্তি যা বৈ বিদ্যা গুরুবৃদ্ধেষু নিত্যা॥

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রকে ভগবান সনৎসুজাত উত্তর দিলেন — যে বিদ্যা গুরুবৃদ্ধে নিত্য, যে বিদ্যা প্রাপ্ত হলে লোক এই সংসার অতিক্রম করে, সত্যানুসন্ধানীরা যে বিদ্যা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা লাভ করে থাকেন, সেই সত্যরূপা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যার কথাই কি তুমি জানতে চাইছ?

উদ্ধৃতি সহকারে ধৃতরাষ্ট্র এবং ভগবন সনৎকুমারের এই দুটি উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিয়ে মহাত্মা প্রলয়দাসজী এইবার আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন — 'যা বৈ বিদ্যা গুরুবৃদ্ধেষু নিত্যা', এই বাক্যটির উপর ভাল করে ধ্যান দাও। 'গুরুবৃদ্ধ' শব্দে এখানে বৃদ্ধ গুরু বুঝতে হবে। যদিও কর্মধারয় সমাসে বৃদ্ধ-শব্দ গুরুশব্দের পূর্বে বসা উচিত, তথাপি কতকগুলি শব্দে এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যেমন কড়ার-জৈমিনি এবং জৈমিন-কড়ার উভয়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কড়ার অর্থ্যাৎ কটাশেবর্ণ। তাই এখানে বৃদ্ধগুরু বা গুরুবৃদ্ধ উভয়ই ব্যাকরণ সিদ্ধ হয়েছে। অবিদ্যার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির জন্য মানুষের মধ্যে অনেক সময় সত্যাত্মক জ্ঞান প্রতিরুদ্ধ থাকে কিন্তু গুরুবৃদ্ধে প্রতিবন্ধকের অভাববশতঃ সর্বদাই ঐ জ্ঞান ভাসমান, প্রোজ্বল। গুরু শব্দের অর্থ তুমি জান। 'গু' শব্দে অন্ধকার এবং 'রু' শব্দে তৎনিরোধক, সুতরাং যিনি অন্ধকার তথা অজ্ঞান দূর করেন, তিনিই গুরু। অতএব মানুষেতে গুরুকল্পনা কর্তব্য নয় কারণ পরমেশ্বর মহাদেবই একমাত্র গুরু। বৈদিক ঋষিরা যজ্ঞকালে ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা প্রভৃতিকে বরণ করবার পূর্বে অগ্নিকে বরণ করতেন, তারপর দেবতাদের প্রতিনিধিস্বরূপ ঐ ঐ মানুষকে অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বরণ করতেন। স্বয়ং মহাদেবের মুখ নিঃসৃত স্পষ্টোক্তি — মন্ত্রদাতা আপন হৃদয়ে গুরুর যে রূপ ধ্যান করেন, গুরুর সেইরূপ ধ্যানই তিনি শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, মানুষ মানুষের গুরু কিভাবে হয়? একথায় কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়, কারণ আমি যদি জড়ধী হই, তাহলে কোন শিক্ষকই আমাকে পণ্ডিত করতে পারেন না। সুতরাং যিনি পরমেষ্ঠিগুরু, তিনি স্বয়ং কৃপা করে জ্ঞানের অবরোধজনক আবরণ উদ্ঘাটন না করে দিলে জীবনের আর উপায়ান্তর নাই। একমাত্র পরমেষ্ঠিগুরু বা দিব্যগুরুই পারেন, জড়ধীকে দিব্যজ্ঞানী করে তুলতে, অমৃতের আস্বাদন দিয়ে পরমবোধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ ভেদে তিন প্রকারের গুরুমণ্ডলী থাকলেও তাঁরা সবাই দিব্য পরমেষ্ঠিগুরুর কিরণছটা। এ যেন এক বিরাট আলোকস্তম্ভ হতে সরাসরি ১২ টি দিব্যরশ্মি এসে পড়েছে বারটি কেন্দ্রে। যেহেতু পূর্ণের কোন অংশ হয় না, সকলেই পূর্ণ, সেইরকম ঐ বারটি কেন্দ্রকে ১২ জন দিব্যগুরু বলে ধরা হয়। শৈবাগম ও শাক্ত্যাগমের পূর্ণগুরুরা মনুষ্য ভাষায় প্রকাশযোগ্য করে ঐ রকম বারটি পূর্ণ দিব্যজ্ঞানের কেন্দ্রকে বারটি নামে চিহ্নিত করে গেছেন। ভগবান সনৎকুমার 'গুরুবৃদ্ধ' শব্দে ঐ বারজন দিব্যগুরুকে বুঝিয়ে গেছেন। তাঁর মতে ঐ বারজন দিব্যগুরুর মধ্যেই 'যা বৈ বিদ্যা গুরুবৃদ্ধেষু নিত্যা' অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদেরই করতলগত। তাঁদের কৃপা ছাড়া অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য কিছুতেই কারও দৃষ্টিতে কোনকালে দীপ্যমান হয় উঠে না।

তোমাকে যে মন্ত্রমালা মুখস্থ করতে বলেছি সেগুলি ঐ পরমেষ্ঠিগুরু, দিব্যগুরু বা গুরুবৃদ্ধেরই প্রণাম মন্ত্র। শৈবাগম ও শাক্তাগমের প্রাচীন গুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে

গুরুপরম্পরাক্রমে ঐ মন্ত্রমালা প্রাপ্ত হওয়া গেছে।

এই পর্যন্ত বলে চোখ বন্ধ করে তিনি প্রায় দু' মিনিট কাল বসে রইলেন। তারপর চমকে উঠে বললেন — প্রায় দুটো বাজতে যায়। তুমি এবারে খেয়ে নাও। খাবার পর বিশ্রাম করতে থাক। আমি দুদণ্ড পরে ফিরে আসব। বলামাত্রই তিনি ঘর থেকে বেরিয়েই হাঁটতে লাগলেন রামতীর্থের দিকে।

আমি খেতে বসলাম। হাঁড়ির মুখ খুলে দেখি তাতে পরমান্ন আছে। তখনও ঈষদুষ্ণ। আমি খাবার পর নিজের আসনের উপর শুয়ে পড়লাম। আমার ঘুম ধরে গেছল। লাঠির ঠুক্‌ঠুক শব্দে জেগে দেখি, তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজতে যায়। সূর্য পাটে বসেছেন। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে। তিনি এসেই মেঝেতে চুপ করে বসে রইলেন।

আমার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা! বাইরে বেরিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে সন্ধ্যা করতে বসব কিনা বুঝতে পারছি না। তিনি পূর্ববৎ ধ্যান নিমীলিত লোচনে বসে রইছেন। অত্যন্ত মৃদু ভাবে তাঁর দেবশরীর দুলছে। তিনি স্থিরভাবে বসে থাকলে তাঁর শরীর স্বাভাবিক ভাবেই দোল খায়, ওঁকারেশ্বরে থাকাকালে এ আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি। বসতে বসতে সারা ঘরটা সুঘ্রাণে ভরে গেল। এই সুগন্ধি উৎস যে তাঁরই দেহ এ আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম। কতক্ষণ আর একইভাবে বসে থাকা যায়! শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, যাক্ গে, সন্ধ্যা করতেই বসি। আমি বাইরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে সান্ধ্যক্রিয়ায় বসবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় তিনি কলকণ্ঠে বলে উঠলেন — মন্ত্রমালা তোমার কেমন মুখস্থ হয়েছে; উদাত্ত কণ্ঠে শোনাও দেখি। ঐ দিব্যমন্ত্র পাঠ করলে আর কোন পৃথক সান্ধ্যক্রিয়া করার প্রয়োজন হয় না। দিব্যগুরুর প্রণাম মন্ত্রে তপজপ যোগ ক্রিয়ার সমস্ত কিছু সূক্ষ্মভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। যে কোন সিদ্ধ বেদমন্ত্রোচ্চারণের সমান শক্তি ঐ মন্ত্রমালায় নিহিত আছে। এ কথাটি তুমি ভাবভাবে বুকে গেঁথে নাও যে, ঐ মন্ত্র পাঠ করলে মা নর্মদা, ভবানীশক্তি, হরি, হর, বিষ্ণু, আদি সমস্ত দেবশক্তি ও দিব্যশক্তিকে আরাধনা করা হয়, তুষ্ট করা হয়। মৃত্যুকালে ঐ মন্ত্ররাজি কারও চিত্তপটে উদিত হলে সেই সুকৃতিবান সাধকের ব্রাহ্মী অবস্থা লাভ হয়। নাও, আমাকে ঐ দিব্য মন্ত্রমালা মুখস্থ শোনাতে থাক।

তাঁর আদেশে আমি তাঁকে দুবার মন্ত্রগুলি মুখস্থ শোনালাম।

— অভি মন্ত্রার্থ শুনাইয়ে জী।

প্রতি দুলাইন করে মন্ত্র শুনিয়ে তার অর্থ শোনাতে লাগলাম মহাপুরুষকে। মন্ত্রার্থগুলি প্রথমবার শেষ পর্যন্ত শোনার পর তিনি স্বগতোক্তি করলেন — গুরুতত্ত্ব প্রদর্শনায় দেশিকগুরুসম্প্রদায়দৃষ্টিমাশ্রিত্য শ্লোকা এতে ব্যাখ্যায়ন্তে। সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিতিরোধানানুগ্রহ কর্তারো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বর সদাশিবাঃ পঞ্চাধিকারিণ উচ্যন্তে। তেষাং সমষ্টিরূপঃ পরশিবাপরপর্যায় আদিনাথ এক ইতি শিবরূপাঃ ষড়্‌গুরবঃ তথা বৃত্তিভেদেন ব্রহ্মাদীনাং পঞ্চপুরুষাণং পঞ্চশক্তয়স্তাসাং সমষ্টিরূপিণী আদিশক্তিরেকেতি শক্তিরূপাঃ ষড়্‌গুরুব ইত্বেবং দ্বাদশগুরুবঃ প্রসিদ্ধাঃ। পুনরপি ব্যাখ্যাং কুরু।

আমি পুনরায় প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা শোনালাম। খুশী হয়ে বললেন — কাল সকালে এখান থেকে যাত্রা করার সময় ভগবান সনৎকুমারকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত জানিয়ে হরিধামে

যাবে। আগামীকালের কার্তিক মাসের বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিটি ভগবান সনৎকুমারেরই দিন। হরিধামে পৌঁছেই যে মন্ত্র গত ৯ই কার্তিক তোমার সাথী মোহান্তজী তোমাকে উচ্চারণ করিয়ে সমুদ্র স্নান করিয়েছিলেন, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেই তুমি সমুদ্র স্নান করবে। গতবারে তুমি সমুদ্রে শ্রীফল উৎসর্গ করে গেছ, কাজেই এবারে তা না করলেও চলবে। তবে স্নান তর্পণাদির পর অতি অবশ্যই কর্পূর জ্বেলে সমুদ্রের আরতি করবে। আমি আজ দেখে এসেছি, প্রায় সন্ধ্যার মুখে চারটি নৌকা এসে পৌঁচেছে। সকাল ৮টা নাগাদ ছেড়ে যাবে। প্রায় ১৫০ জন সাধু ধর্না দিয়ে সেখানে পড়ে আছেন। মা নর্মদার দয়া ভিক্ষা করে নৌকাতে গিয়ে সওয়ার হবে। নৌকায় বসেও তুমি মা নর্মদা, মহাদেব, ভগবান সনৎকুমার এবং মহর্ষি ভৃগুদেবের চরণে প্রণিপাত জানাবে। তোমাকে মোহান্তজী ঠিকই বলেছিলেন, এই হরিধাম হতে ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটাই ছিল মহর্ষি ভৃগুর তপোক্ষেত্র। ভৃগুক্ষেত্ররূপে পরিচিত হওয়ার পূর্বে এখানে থেকে মূল শ্রীপতি ক্ষেত্র পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ছিল মূল বৈষ্ণবীশক্তি লক্ষ্মীদেবীর শ্রীক্ষেত্র। সেইজন্য শিবভূমি নর্মদার এই পুণ্যস্থলীকে হরধাম বলা স্বাভাবিক হলেও হরিধামই বলা হয়। হর ও হরিতে কোন তফাৎ নাই। নৌকায় বসে মা নর্মদার মূল ষড়ক্ষরী বীজ জপ করতে করতে যাবে। নৌকার অন্যান্য যাত্রীরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এবং ভয়াল উচ্ছ্বাস দেখে দেখবে, কেউ হর নর্মদে ধ্বনি, কেউ বা নর্মদা বন্দনা, কেউ বা উচ্চৈঃস্বরে শিবস্তোত্র পাঠ করতে থাকবেন ভয়ে এবং উত্তেজনায়। তুমি কিন্তু প্রবল কলরবের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্যও নর্মদার বীজ মনে এবং জিহ্বাতে জপ করতে ছেড়ো না। পনের ষোল মাইল ঐখানে সমুদ্রের বিস্তার; জোয়ার ভাঁটার মারপ্যাঁচ থাকলে ১০। ১২ ঘন্টা সময়ও লেগে যায় নিরাপদে দক্ষিণতটে পৌঁছতে। মা নর্মদার কৃপা হলে আট ঘন্টার মধ্যেও কোন কোন নৌকা পৌঁছে যায়। যার যেমন কর্ম। জোয়ার এসে পড়লে মাঝিরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি তাতে পরিক্রমার নিয়ম মানে নি এমন কোন পতিত সাধু মূর্তি নৌকাতে থাকে, তাহলে সহসা জোয়ারের ধাক্কায় সে নৌকা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে। ক্রুরকর্মা ব্যক্তির পক্ষে হরিধাম অতিক্রম করা দুষ্কর। এইজন্যই পাথর গিরি মহারাজ মা নর্মদার প্রত্যাদেশ পেয়ে পরিক্রমাবাসীদের যথোচিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর উত্তরসাধক পুষণ গিরিজী এখনও সে দায়িত্ব সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।

তিনি আরও বলতে লাগলেন — মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে এমন একটা বিচিত্র স্থান জলের মধ্যে দেখতে পাবে যেখানে নর্মদার জল স্পষ্টতঃ শ্বেতাভ এবং সমুদ্রের জল নীলাভ; পাশাপাশি দুই বর্ণের পার্থক্য দুটি ধারা গায়ে গায়ে মিশামিশি করে বয়ে চলেছে। নর্মদা যে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এটি তার অকাট্য প্রমাণ। ঐ মিলিত ধারা দর্শন মাত্রই তুমি ঐ মন্ত্রমালা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে থাকবে। নিজের মাতৃভাষাতেই প্রকাশ্যে মন্ত্রার্থও বলতে থাকবে। তুমি নিশ্চিত থাক, তোমার সহযাত্রীদের মধ্যে একজনও বাঙালী থাকবেন না। সংস্কৃতবোদ্ধা যদি কেউ থাকেন তিনি শুনুন, তাতে কোন ক্ষতি নাই। দিব্যমন্ত্রের হিল্লোল ও ব্যঞ্জনা জাগিয়ে তুলবে আকাশে বাতাসে। মন্ত্রপাঠের শেষে ষড়ক্ষরী বীজ জপ করতে করতে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ দেখবে — নৌকা থেমে যাবে। তুমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে সমুদ্রের তলার দিকে। বিনামেঘে যদি আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে তাহলে সে সময় মা নর্মদার ইচ্ছা হলে মহর্ষি ভৃগুর চিরজাগ্রত তৃতীয় নেত্র উদ্ভাসিত হয়ে যেতে পারে মুহূর্তের জন্য।

এই কটি কথা বলেই তিনি পূর্ববৎ চোখ বন্ধ করে দুলতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। সাধারণ লোক হলে আমি হয়ত ভেবেই বসতাম, দুলতে দুলতে হয়ত তিনি ঘুমিয়েই পড়েছেন। কিন্তু না, তিনি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন —

কথন থা সো কহ্ দিয়া অব কুছ কহা ন জায়।
এক রহা দুজা গয়া দরিয়া লহর সমায়॥

অর্থাৎ যা বলার ছিল বলে দিয়েছি। এখন আর কিছু বলা যাবে না। দুই গিয়ে এক হয়েছে। লহরী প্রবেশ করেছে সমুদ্রে।

উনমুনিমেঁ মন লাগিয়া গগনহি পঁহুচা চায়।
চাঁদ-বিহুনা চাঁদনা 'রেবা রেবা গায়॥

আমার মন পৌঁছে যেতে চাচ্ছে শূন্যে। সেখানে চাঁদ নাই। কিন্তু চাঁদনি রয়েছে। চারদিকে 'রেবা রেবা' রব উঠেছে।

— তুমি এখন শুয়ে পড়। ভোরে আমি জাগিয়ে দিব। পাশের কামরায় আমি থাকছি। কোন ভয় নাই। এই বলে তিনি টলতে টলতে চলে গেলেন।

তিনি চলে যেতেই আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। তাঁর নির্দেশ মত যাতে সব কাজ করতে পারি, এজন্য তাঁর উপদেশের খুঁটিনাটিও মনে মনে ভাল করে সাজিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল হল, চারদিক কুয়াশায় ঢেকে আছে। ভোরের পাখীরা কলস্বরে ডেকে চলেছে কিন্তু ঠাণ্ডার প্রকোপে কেউ নীড় ছেড়ে উড়ে বেড়ালেও কুয়াশার জন্য আমার দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়। আমি মহাত্মার পূর্ব নির্দেশমত ভগবান সনৎকুমার, মা নর্মদা, মহাদেব এবং মহর্ষি ভৃগুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছি, এমন সময় পাশের ঘর থেকে তাঁর সাড়া পেলাম — মহাদেবকে ঐখানে বসে প্রণাম জানালে চলবে না, তুমি প্রাতঃকৃত্য সেরে খাঁড়ির কাছে হেঁটে গিয়ে গোমুখাকৃতি স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে প্রণাম করে এস। হরিধামে পৌঁছে তখন একেবারে সমুদ্রে স্নান করবে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গাঁঠরী ইত্যাদি বেঁধে নিয়ে সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ধীরে ধীরে খাঁড়ির কাছে পৌঁছে গোমুখাকৃতি স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে প্রণাম করে ফিরে এলাম মহাত্মার কাছে। ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন — হ্যাঁ, এবার তুমি সোজা চলে যাও হরিধামের রেবা সমুদ্রসৈকতে। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ, পথ তোমার মঙ্গলময় হোক। এই বলেই তিনি পিছন ফিরলেন, লাঠি ঠুকে ঠুকে হেঁটে যেতে লাগলেন যাত্রীশালার পিছনদিকে। আমি কয়েক পাপড়ি এগিয়ে গিয়ে আর্তস্বরে চীৎকার করে বলে উঠলাম — 'আবার আপনার দর্শন পাব ত ? আজ আমি একান্তভাবে একা হয়ে গেলাম। দক্ষিণতট পরিক্রমার সময়ও আপনার কৃপাদৃষ্টি যেন আমার উপর থাকে।' আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। কিন্তু ইনি ত মোহান্ত-নগেন্দ্রভারতীজীর মত স্নেহময় সাধু নন, নিতান্তই কুলীশ কঠোর। তাঁর দেবদেহ ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যেতে লাগল। তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে; কান পেতে শুনলাম তিনি তান ধরেছেন —

মুঝে কঁহা ঢুঁড়েগা বাচ্ছা, মৈঁ তো তেরে পাশমেঁ।
না মৈঁ ওঁকার, না মৈঁ ভারোচ, না কোঈ রেবাতটমেঁ
না তো কোঈ ক্রিয়াকর্মমেঁ নহি যোগবৈরাগমেঁ।
খোজী হোয় ত তুরন্ত মিলুঙ্গা, পলভরকী তালাসমেঁ।
প্রলয়দাস ত সদা নিবসতি সব শ্বাঁসোকী শ্বাঁসোমেঁ।।

— ওরে বাচ্চা, তুই আমাকে কোথায় খুঁজে বেড়াবি? আমি ত তোর পাশেই আছি, পাশেই থাকব। আমি ওঁকারেশ্বরেও নাই, ভারোচেও নাই, রেবাতটের কোথাও নাই। কোন ক্রিয়াকর্ম বা যোগবৈরাগ্য অবলম্বন করেও আমাকে পাওয়া যাবে না। যদি সন্ধানী হোস্ তাহলে শীঘ্রই পেয়ে যেতে পারবি, এক পলকের খোঁজাতেই। প্রলয়দাস যে সকলের শ্বাসের শ্বাসে, প্রাণের প্রাণে বাস করে থাকেন।

তিনি ধীরে ধীরে অদৃশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ঘরে ঢুকে কাঁধে তুলে নিলাম, গাঁঠরী এবং ঝোলা। হাতে লাঠি এবং কমণ্ডলু নিয়ে হেঁটে চললাম হরিধামের পথে। কুয়াশায় পথ ঢেকে আছে। রামতীর্থ, জমদগ্নি তীর্থ অতিক্রম করার পর কিছুদূর হাঁটার পর লোহরচ্যা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। তখনও সূর্যোদয় হয়নি তবে পূর্বাকাশ ক্রমে লাল হয়ে উঠেছে। সূর্যকে স্মরণ করে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রপাঠ করতে করতে এগিয়ে চললাম —

ওঁ চিত্রং দেবানামুদ্‌গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ!
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।

(১ম। ১১৫ সূ। ১)

এই মন্ত্রের দেবতা সূর্য। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি দৃষ্ট মন্ত্র এটি। এই মন্ত্রে ঋষি ভগবান সূর্যনারায়ণের উদ্দেশ্যে বলেছেন — যিনি বিচিত্র তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, এবং মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ, সেই সূর্যনারায়ণ উদিত হয়েছেন, দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ তাঁর উর্জস্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে ; সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলেরই আত্মাস্বরূপ।

আমি এই মন্ত্র বারবার গাইতে গাইতে বালিয়াড়ি পেরিয়ে রেবাসংগমে গিয়ে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, সত্যসত্যই চারটি বড় বড় নৌকা কিনার থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে নোঙ্গর করা আছে। মাঝি মাল্লারা উনুন ধরিয়ে খাবার তৈরী করছে। একে সমুদ্রের গর্জনে কানে তালা লাগার জোগাড় ; তার উপর সাধুদের চীৎকার, নৌকায় উঠার জন্য তাঁদের আকুল আবেদন, নানা কণ্ঠে হর নর্মদে ধ্বনি, এক কথায় চারদিক হৈ হৈ কোলাহল! কল্‌কল্ হু হু শব্দে মাঝে মাঝে শোঁ শোঁ আওয়াজ, ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ এর আছড়ে পড়া, সব মিলিয়ে মনে হল আমি যেন শান্ত প্রকৃতির কোল হতে একটা তাণ্ডব নৃত্যের আসরে এসে পৌঁছে গেছি।

নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নাই। আমি বালির উপর ঝোলা গাঁঠরী আলখাল্লা আদি ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি নর্মদা ও সমুদ্রকে প্রণাম করে হর নর্মদে বলতে বলতে নেমে পড়লাম সমুদ্রে। মোহান্তজী সমুদ্র স্নানের যে মন্ত্র শিখিয়েছিলেন, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যুক্তকরে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বললাম —

ওঁ অনশ্চ তেজো হি অপস্য দেহো রেতো হি বিষ্ণোঽমৃতস্য নাভিঃ।
এতদ্ ব্রুবন্ পাণ্ডবং শ্রৌতবাকম্ ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাং॥

সমুদ্রে ডুব দিয়ে তর্পণ করে উঠে আসব, এমন সময় এক বিরাট উত্তাল ঢেউকে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে আসতে দেখলাম। আমার পিছনে সাধুরা তখন 'গেল গেল' রব তুলেছেন। কোনমতে আমি জলে লাফ দিতে দিতে ছুটে এসে উঠলাম বালুতটের উপর। গর্জনশীল ঢেউ ছলাৎ করে এসে আছড়ে পড়ল এসে তটকে প্লাবিত করে। দুজন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে আমার ঝোলা গাঁঠরী তুলে নিয়ে সরে গেছলেন বলে রক্ষা , নতুবা সব ভেসে যেত জলে, ভিজে ত যেতেই। আমি এখানে আসার সময় জমদগ্নি তীর্থের পাশের ঝোপ থেকে কিছু বুনো ফুল তুলে এনেছিলাম পূজার উদ্দেশ্যে, সেগুলি ঝোলার মধ্যেই ছিল। আমি ঝোলার ভিতর হতে সেগুলি আনতে গিয়ে যে সাধুরা সেগুলিকে সরিয়ে এনে সমুদ্রজল হতে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার গিয়ে জলে নামলাম। সমুদ্রের জলে এক একটি ফুল নিক্ষেপ করে পূজা করতে থাকলাম —

ওঁ নমো ভগবতে সনৎকুমার। ওঁ মহর্ষি ভৃগবে নমঃ। ওঁ নমো শিবায়। ওঁ রেবায়ৈ নমঃ। নমঃ সমুদ্রায়।

তিন সপ্তাহ আগে মোহান্তজীর সঙ্গে এখানে প্রথম যখন আসি, তখন তিনি জানিয়েছিলেন যে, এই সমুদ্র ও রেবার জলমূর্তি আসলে মহাদেবের অষ্টমূর্তির এক মহান মূর্তি — অপমূর্তি বা ভবমূর্তি। একথা মনে পড়তেই আবার একটি ফুল সমুদ্রে তর্পণ করে পূজা করতে লাগলাম — ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ। পূজার শেষে কর্পূরদানীতে কর্পূর জ্বেলে সমুদ্রের আরতি করলাম।

আরতি শেষে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি, দূরে আবার একটা উত্তাল ঢেউ পুঞ্জীভূত সাদা ফেনার পাহাড় নাচাতে নাচাতে 'রোষে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে, অট্টরোলে অট্টহাসে উন্মাদ গর্জনে' ছুটে আসছে। এক মিনিট পরেই প্রচণ্ড ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল তটের উপর। বাতাসেরও কী দাপট!

সাধুরা বোধহয় ভয় পেয়েছেন। তাঁরা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে হর নর্মদে ধ্বনির সঙ্গে শিবস্তোত্র পাঠ করতে করতে পরিত্রাহী চীৎকার করতে লাগলেন। সমুদ্রের ঐ তাণ্ডব দৃশ্য দেখে আমারও মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, বাঙালী ঋষি প্রণীত একটি বাংলা মন্ত্র —

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র কোলে
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ-সমুদ্র-সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে
নিখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ম শ্বেত রুদ্রহাসি জড়প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ।
মরিতে ছুটিছে কোথা; ছিঁড়েছে বন্ধন॥ (' সিন্ধুতরঙ্গ ', মানসী)

ক্রান্তদর্শী কবি ছাড়া উত্তাল সমুদ্রের এমন নিখুঁত বর্ণনা আর কেই বা দিতে পারতেন? বাবা বলতেন — 'বাংলার মটিতে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই প্রত্যেক বাঙালী সন্তান রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিশোধ্য ঋষিঋণে জড়িত।' একথা মনে পড়া মাত্র আমি আবার সমুদ্রের জলে কিছুটা নেমে সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি পবিত্র জল অর্পণ করে এলাম। এখন দেখছি, হাওয়ার দাপট কিছুটা কমে এসেছে। আমার ঝোলা গাঁঠরীর উপর বালির আস্তরণ পড়েছে। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। বালি ঝেড়ে আলখাল্লা ও সোয়েটার গায়ে চাপালাম। একজন ঘড়িধারী সাধুর কাছে সকাল ৭টা বেজে ১০ মিনিট হয়েছে শুনেই কিছুদূরে হোগলার নীচে উপবিষ্ট অফিসার ও পুলিশের কাছে ছুটলাম। তাঁদের কাছে পূজনীয় পূষণ গিরিজী প্রদত্ত নৌকার চিঠিটি পেশ করতেই অফিসার চিঠিটি খুলে পড়েই আপদমস্তক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে নিলেন। চিঠিটি আর একজনের হাত দিয়ে মন্তব্য করলেন — গুরুজীনে ইস্পিসাল চিঠ্‌টি লিখেঁ হৈ। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গুরুজীকা সাথ কব কাঁহা ভেট হুয়া থা?

করীব ঢাই মাহিনা পহেলে সিনোরমেঁ উনকী ছাউনীমেঁ ভেট্ হুয়া থা।

তিনি আর কোন প্রশ্ন না করে একটা লাল খেরায় বাঁধানো জাব্দা খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাতে নাম ধাম, কোথা হতে কোন উদ্দেশ্যে আসছি, কোথায় যাবো, সম্প্রদায় ও গুরুর নাম সব লিখে দিয়ে দস্তখৎ করে দিতে বললেন। আমি যথাজ্ঞান সব লিখে সই করে দিলাম। সই করে দিবার পর দুজনে মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এলেন — আভি বায়ু অনুকূল হৈ, নৌকা ছোড় দিয়া যায়। এই বলে একজন অফিসার আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলে সমুদ্র কিনারে পৌঁছে মাঝি-মাল্লাদের উদ্দেশ্যে একটা সাদা পতাকা শূন্যে তুলে নাড়তে লাগলেন। বুঝলাম, এই হল নৌকা ছেড়ে দিবার ইঙ্গিত। মাঝিরা পাল তুলে নৌকা আনতে লাগলেন সমুদ্রের কিনারে। সাধুদের মধ্যে বিষম সোরগোল পড়ে গেল। তাঁরা হুড়োহুড়ি করে ছুটে আসছেন নৌকাতে আগেভাগে উঠবার জন্য। তাঁদের পক্ষে এই হুড়োহুড়ি ও চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। কারণ আমি আগেই শুনেছি তাঁরা এই প্রচণ্ড শীতে দুর্দম বালুর ঝাপ্টার মধ্যে চার পাঁচদিন ধরে মুক্ত আকাশের তলে ধর্না দিয়ে পড়ে আছেন।

নৌকাওয়ালারা এক একটি কাঠের পাটাতন নৌকা হতে কিনারাতে ঠেকিয়ে দিবা মাত্রই সকলে হুড়োহুড়ি করে নৌকাতে উঠে বসতে লাগলেন। অফিসার একজন নৌকাওয়ালাকে ডেকে আমাকে নৌকার এককোণে বসিয়ে নিতে বললেন। আমি একে একে বাবা, ভগবান সনৎকুমার, মা নর্মদা, মহাদেব এবং মহর্ষি ভৃগুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে জানাতে ঝোলা, গাঁঠরী, কমণ্ডলু ও লাঠি সহ নৌকাতে গিয়ে উঠে বসলাম।

চারটি নৌকার চারটি পাটাতনের মুখে দাঁড়িয়ে ২ জন অফিসার এবং ৪ জন পুলিশ গুনে গুনে তুলতে লাগলেন সাধুদেরকে। এক এক নৌকায় ৩০ জনের বেশী কাউকে বসতে দিলেন না। 'ত্রিশ সে অধিক এক ভী আদমী নহীঁ বৈঠায়েঙ্গে', বলতে বলতে অফিসার ও পুলিশরা বাকী সন্ন্যাসীদেরকে জোর করে নামিয়ে দিলেন। অফিসার ও পুলিশ নৌকা হতে নেমে যেতেই মাল্লারা চট্‌পট্ কাঠের পাটাতনগুলো নৌকার উপর তুলে নিল। যাঁরা উঠতে পারলেন না, তাঁরা কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন মাঝিদেরকে। কেউ কেউ কাঁদতে লাগলেন,

কেউ বা আবার তাদেরকে অভিশম্পাতের ভয় দেখাতে লাগলেন। মাঝিরা বলল — 'হমেঁ কঠোর সাজা হো জায়েগী, হম ত্রিশ সে অধিক এক ভী বৈঠায়েঙ্গী নেহি। এক ভী দুর্ঘটনা হো জাবেগা, সরকার হমলোক কো পাকড়ায়গা। হাজত বাস করনে পড়েগা, হমেঁ ফাঁসী হো জায়েগী।' নোঙ্গর উঠিয়ে নৌকা খুলে দিল মাঝিরা। বায়ু অনুকূল। তরতর করে নৌকা চলতে লাগল সমুদ্রের বুকে। মাঝে মাঝে ঢেউ এসে ঠোক্কর খাচ্ছে নৌকার গায়ে। সমুদ্রের জল ঠিকরে এবং ছিটিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে। উপরে নিচে উঠা নামা করতে করতে ঢেউ যখনই ছুটে আসছে তখন চারটা নৌকাই দোল খাচ্ছে। আমরা কেবলই দোল খাচ্ছি। কখনও মনে হচ্ছে আমরা ঘন কুয়াশা ভেদ করে চলেছি , কখনও বা ফেনিল জলোচ্ছাস অত্যুজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছে। আমি একমনে মা নর্মদার ষড়ক্ষরী বীজ বসে জপ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু জপে কি মন বসতে চায়? সমুদ্রের যুগপৎ ভীমকান্ত ভয়াল এবং নয়নবিমোহন শ্যামকান্ত মধুর রূপ চোখ ও মনকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে। কোনমতে লুণ্ঠেশ্বর মন্দিরের ঋষিবাক্য স্মরণ করে জিহ্বাতে আঁকড়ে রেখেছি ষড়ক্ষরী মহাবীজের বর্ণাত্মক রূপকে। হঠাৎ সকল সন্ন্যাসীকে সামনের দিকে তাকিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করতে দেখে দূরের দিকে তাকিয়ে দেখি, এক আকশস্পর্শী উত্তাল ঢেউ প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে দূর থেকে। এ ঢেউ নৌকার উপর আছড়ে পড়লে নৌকা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। তখন সন্ন্যাসীরা প্রাণভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন, সেই ফোঁপানি ক্রমে উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিণত হল। কারও মুখ দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে হর নর্মদে ধ্বনিও নির্গত হচ্ছে না। কেউ ভয়ে কাঁপছেন, কেউ বা চোখ বন্ধ করে কেঁদে চলেছেন। যে ভীষণ মূর্তিতে মাইলের পর মাইল জুড়ে সেই সমুদ্র তরঙ্গ ছুটে আসছে, মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং বাসুকি নাগ বিষম আক্রোশে তার সহস্র ফণা তুলে আমাদেরকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। আমাদের নৌকা হতে প্রায় আধমাইল বা তারও বেশী দূরে সেই ভয়ঙ্কর ঢেউ ভীষণ গর্জন করতে আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল। সেই তরঙ্গাভিঘাতে আমাদের নৌকা ভীষণ জোরে অনেকক্ষণ ধরে উপরে নিচে দোল খেতে লাগল। মাঝিরা অনেক কষ্টে হাল চেপে ধরে কোনমতে টাল সামলাল। আমার মনে পড়ল কথার রাজা রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতরঙ্গে'র বর্ণনা —

ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে চূর্ণ হয়ে যায় টুটে
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল —
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি আছাড়ি আঙ্গুল।

খণ্ড প্রলয়ের পর ধরিত্রী যেন শান্ত হল। সমুদ্রের আর সেই 'সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার' চোখে পড়ছে না। শান্ত ও নিস্তব্ধ সমুদ্রে আবার নৌকা ভেসে চলল। প্রায় আধঘন্টা পরে আবার যাত্রীরা কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আনন্দে সমস্বরে গান ধরলেন —

রেবা মেরী নাইয়া উস্ পার লগা দেনা।
অব তক তো নিভয়া হৈ, আগে ভী নিভা লেনা॥

একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলে উঠলেন — পানি কা তরফ্ দেখিয়ে। উস্ তরফ্ মৈয়াকী সফেদ ধারা ঔর ডাহিনা তরফ্ সমুন্দর কা নীলাভ পরবাহ (প্রবাহ)। সমুন্দর কা সাথ মাতাজীকো

মিলন কী এহি অকাট্য প্রমাণ হৈ। বৃদ্ধের কথায় বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মস্তিষ্কে শিহরণ খেলে গেল। সমুদ্র গর্জন এবং সাধুদের কীর্তন কোলাহল মধ্যেই আমি নতজানু হয়ে যুক্তকরে মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রদত্ত দিব্য মন্ত্রমালা উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করতে করতে মন্ত্রার্থ উচ্চৈঃস্বরে স্মরণ করতে লাগলাম —

ওঁ যদ্ ব্রহ্ম শুদ্ধং নিরহং নিরীহং স্বান্তর্বিলীনাত্মসমস্তশক্তি।
সচ্চিৎসুখং চৈকম্ অনন্তপারং তং তু আদিনাথং গুরুমানতা স্মঃ।। ১

— যিনি শুদ্ধ, নিরহঙ্কার, আপ্তকাম এবং যাঁর অভ্যন্তরে সমস্ত শক্তি বিলীন হয়ে আছে, সেই অনন্ত অপার সচ্চিদানন্দ আদিনাথ নামক পরমাত্মা আমাদের প্রথম দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ যাস্তদ্বিলীনামিতশক্তয়ঃ স্যুস্তৎরূপিণী ব্রহ্মণ আদ্যভিন্না।
নিদ্রান্ত আদ্যেব নরস্য বৃত্তির্নতাঃ স্ম স্তাং শক্তিগুরুং দ্বিতীয়ম্।। ২

— পরব্রহ্ম হতে অভিন্না আদ্যাশক্তি — যিনি বিলীন হয়ে আদিনাথ নামক পরব্রহ্মে সুপ্তোত্থিত পুরুষের বৃত্তিবৎ অবস্থান করেন, তিনি আমাদের দ্বিতীয় দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ ত্বয়া বিশিষ্টস্তু স আদিনাথো নিরাকৃতির্নির্গুণ উচ্যতেহসৌ।
বৃত্ত্যন্যগোহনুগ্রবাং স্তৃতীয়ং সদাশিবং তং গুরুমানতাঃ স্মঃ।। ৩

— সেই শক্তিবিশিষ্ট আদিনাথ নির্গুণ ও নীরূপ হলেও নিবৃত্তিক যোগীর প্রজ্ঞায় অনুগ্রহবশতঃ আরূঢ় হন বলে তাঁর নাম সদাশিব। সেই সদাশিব আমাদের তৃতীয় দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ তদুত্থিতা যা স্বত এব বৃত্তিঃ শ্রুত্যা স নৈকো রমতে দ্বিতীড্যা।
তাং শুদ্ধবিদ্যাং চ সদাশিবীয়াং শক্তিং চতুর্থং গুরুমানতাঃ স্মঃ।। ৪

— সদাশিব দ্বিতীয় ব্যতীত একক প্রকাশিত হতে পারেন না বলে যে শক্তিরূপ বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই শক্তিই আমাদের চতুর্থ দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রনাম করি।

ওঁ তদ্বানরূপঃ সগুণঃ স জাতস্তু অপাদপাণিঃ শ্রুতিবাক্প্রসিদ্ধঃ।
তিরোহিতং তিষ্ঠতি বিশ্বমস্মিন্ তমীশ্বরং পঞ্চমমানতাঃ স্মঃ।। ৫

— সেই শক্তিযুক্ত আকারবিরহিত কিন্তু জ্ঞানাদি বহুগুণবিশিষ্ট সদাশিব যখন অনুগ্রহ নিগ্রহ-সমর্থ ঈশ্বররূপ ধারণ করেন এবং তাঁর যে ঈশ্বররূপকে শ্রুতি চরণহীন হলেও বেগগামী, নয়নহীন হলেও দৃষ্টিমান্ ও কর্ণহীন হলেও শ্রবণশীল বলে বর্ণনা করেছেন, সেই ঈশ্বর আমাদের পঞ্চম দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ শ্রুতিবর্ণিতা যা তদ্বৃত্তিরস্মান্ মহদাদিগর্ভম্।
ধত্তেহন্তরে তাং বয়মীশ্বরস্য শক্তিং তু ষষ্ঠং গুরুমানতাঃ স্মঃ।। ৬

— লীলার জন্য দ্বৈতভাব গ্রহণ করেছেন বলে শ্রুতি যাঁকে ইচ্ছাময় বলেন এবং তাঁর যে ইচ্ছাশক্তিরূপ বৃত্তি মহাদাদির নিধান বলে অভিহিত , তাঁর সেই বহুভবন শক্তি আমাদের ষষ্ঠ দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ তদ্যুগগুণাঢ্যাকৃতিমান্ স যা ত রুদ্রেতি বেদোক্তবচঃপ্রসিদ্ধঃ।
লয়ীকৃতং তিষ্ঠতি বিশ্বমস্মিংস্তং সপ্তমং রুদ্রগুরুং নতাঃ স্মঃ।। ৭

— মহাদাদিনিধানশক্তিযুক্ত যে ঈশ্বর গুণবহুল হয়ে আপনাতে সমস্ত বিশ্ববেগ ধারণ করে থাকেন এবং যজুর্বেদ রুদ্রাধ্যায়ে যাঁকে রুদ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি আমাদের সপ্তম দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ অহং বহু স্যামিতি যা তদুত্থা বৃত্তির্জনিত্রী মহাদাদিকানাম্।
পৃথক পৃথক্ কৃত্য চ রুদ্রশক্তিং তমষ্টমং স্বীয়গুরুং নতাঃ স্মঃ।। ৮

— এক থেকে বহু হবার অভিপ্রায়ে ধৃতবেগ রুদ্র হতে বৃত্তিরূপা যে শক্তি অন্তর্নিহিত তত্ত্বসমূহকে পৃথক করার জন্য মহাদাদির জনিত্রী হন, তিনি আমাদের অষ্টম দিব্যগুরু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ ব্যাপ্নোতি তদ্যুক স মহন্মুখেষু তত্ত্বেষু তেজস্তু অখিলম্ স্বকীয়ম্।
নিধায় তৎস্থং পরিপাতি বিশ্বং বিষ্ণুগুরুং তং নবমং নতাঃ নতাঃ স্ম।। ৯

— সংসৃষ্ট ও বিবিক্ত হওয়ায় বৃত্তি অবলম্বন করে মহাদাদি তত্ত্বে যাঁর স্বকীয় সমগ্র তেজ পালনের জন্য নিহিত থাকে, তিনি আমাদের নবম দিব্যগুরু বিষ্ণু। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ওঁ পুষ্ণাম্যহং বিশ্বমিদং স্বকীয়ং মদীয়শক্ত্যেতি মদীয়বৃত্তিঃ।
পুষ্ণাতি তত্ত্বান্তরগং তু বিশ্বং তাং বিষ্ণুশক্তিং দশমং নতাঃ স্মঃ।। ১০

— আমি স্বতঃই বিশ্বপোষণকৃৎ — এইরূপ বৃত্তিগত যে বৈষ্ণবী শক্তি তত্ত্বান্তরে পরিণত বিশ্বের পোষণ করেন, তিনি আমাদের দশম দিব্যগুরু বিষ্ণুশক্তি। তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

ওঁ তত্ত্বান্তরস্থং জগদিত্থমন্তঃ পশ্যন্ স্ববৃত্ত্যা স বিরাড্ বভূব।
সমষ্টিজীবোঽখিলসৃড বিধাতা গুরুং তমেকাদশমানতাঃ স্মঃ।। ১১

— তত্ত্বান্তরে জগৎ পরিণত হবে বলে আপন বৃত্তির দ্বারা যিনি হিরণ্যগর্ভাখ্য বিরাট হয়েছিলেন এবং যাঁর সেই মূর্তি হতে অখিল চরাচর বিবিক্ত হয়েছে, তিনি আমাদের একাদশ দিব্যগুরু। তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

ওঁ যজ্ঞাদিকং চাত্মভবাঃ সুখাপ্ত্যৈ কুর্বন্তু জীবা ইতি যাস্যবৃত্তিঃ।
বেদত্রয়ী কর্মময়ী কিলাজশক্তিং গুরুং দ্বাদশমানতাঃ স্মঃ।। ১২

— আপন শরীরবস্তুভূত জীব চিরসুখের জন্য যজ্ঞাদিসাধিত উপাসনা করবে, এইরকম তাঁর যে বৃত্তি বেদত্রয়ী কর্মময়ী সাবিত্রী নামে প্রসিদ্ধা, তিনি আমাদের দ্বাদশ দিব্যগুরু। তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

দিব্যগুরুদের স্নিগ্ধ প্রণাম মন্ত্রপাঠ শেষ হল। চোখ খুলে দেখি এতক্ষণ আমি মন্ত্রপাঠে মগ্ন থাকলেও নৌকা তরতর করে অনুকূল বাতাসে ভর করে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। আমি কমণ্ডলু হাতে কিছুটা লোনা জলই পিপাসার চোটে খেয়ে ফেললাম। চুপ করে বসে আবার মা নর্মদার ষড়ক্ষরী বীজ জপে মন দিলাম। নৌকা দ্রুত বেগে বয়ে চলেছে স্রোতের টানে। সহসা নৌকা থেমে গেল। 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' রব উঠল। মাঝিরা কোন উত্তর দিল না, তারা শক্ত হাতে হাল ধরে বসে রইল। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চঞ্চল যাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বলতে

লাগলেন — ঘাবড়াতে হো কেঁও? ভগবান্ জো ভী করেঙ্গে, আচ্ছা হি করেঙ্গে। বায়ু জহাঁ ভী প্রতিকুল হো জাতী হৈ, নৌকা বালে বহী লঙ্গর ডালকর বীচ সমুদ্রমেঁ খাড়া হো জাতে হৈঁ ; জব তক অনুকূল বায়ু নহীঁ আতী তব তক বীচমেঁ হী খড়ে রহতে হৈঁ। কভী-কভী তো দো-দো তিন-তিন দিনোঁ তক নৌকায়েঁ সমুদ্রকে বীচমেঁ খড়ী রহনী পড়তী হৈ।

বৃদ্ধের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর এক সাধু মন্তব্য করতে লাগলেন — ইস্ অর্থমেঁ তো হমলোগ ভাগ্যশালী হি সিদ্ধ হুয়ে। কেঁও যাত্রা কে পহলে তো দো ঘন্টাকে লিয়ে জরুর প্রতিকূল থা, লেকিন উসকা বাদ সাড়ে চার পাঁচঘন্টা অব তো বায়ু অনুকূল বনী রহে। এই সাধুর কথাকে যথার্থ বলেই মনে হল। কারণ অনেকক্ষণ ধরে বায়ুর প্রতিকূলতা দেখছি না, নৌকা নিরাপদেই এতক্ষণ এসেছে। তাছাড়া মাঝি মাল্লারা এখানে নোঙ্গরও ফেলে নি! হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মত মুহূর্তের জন্য আলোর ঝলসানি দেখতে পেলাম। আমার টনক নড়ল, মনে পড়ে গেল মহাত্মা প্রলয়দাসজীর কথা — 'মন্ত্র পাঠের শেষে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ দেখবে নৌকা থেমে যাবে। তুমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে সমুদ্রের তলার দিকে....।' ঋষিবাক্য স্মরণে আসা মাত্রই আমি জলের তলার দিকে তাকালাম। কিন্তু আমি এ কী দেখলাম? সমুদ্রের মধ্যে দেখছি যেন কারও দীপ্তচক্ষু জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। চোখের সম্মুখস্থিত স্বচ্ছাবরণী যা সুশ্রুতের ভাষায় শ্বেতমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডলের পশ্চাৎস্থিত তারকামণ্ডল বা কৃষ্ণমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যস্থিত কণীনিকা, মণি বা দীপ্তোপলও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ঢলে পড়লাম পার্শ্বোবিষ্ট এক সাধুর গায়ে। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখছি নৌকা তখনও স্থির। আমি সমুদ্রের নিচের দিকে আর তাকাতে সাহস করলাম না। আমাদের নৌকায় সমুদ্রের তলদেশ হতে কতকগুলি শিবলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে এসে পড়ছে। প্রত্যেকেই দুটি তিনটি করে নানা বর্ণের শিবলিঙ্গ সাগ্রহে এবং শ্রদ্ধাভরে কুড়িয়ে নিলেন। আমার কোলে এসে যেটি পড়েছিল, সেটি হাতে নিয়ে দেখি সেটি দেখতে অবিকল একটি চোখের মত। কৃষ্ণবর্ণের চক্ষুর অবয়ব যেমন দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠোদর পরিমিত হয়ে থাকে, এই শিলার দৈর্ঘ্য প্রস্থও সেইরকম। তাতে শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল এবং দীপ্তোপল বা চোখের মণিও অঙ্কিত আছে। আমি শিলাটি বুকে চেপে ধরে বলতে লাগলাম — মহর্ষি ভৃগবে নমঃ। সনৎকুমারায় নমঃ। নমঃ রেবায়ৈ। নমঃ শিবায়।

নৌকাতে শিবলিঙ্গগুলি ছিটকে আসার পরেই নৌকা পুনরায় স্বাভাবিক ভাবে বয়ে চলেছে। সদ্যপ্রাপ্ত শিলাটি কি তাহলে ভৃগুর তৃতীয় নেত্রের প্রতীক ? হবে! সমুদ্রের উপর বসে তখন সেই কথাই আমার মনে এল। নৌকা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণতটের দিকে। দক্ষিণতটের জঙ্গল, সারি সারি বৃক্ষরাজী সবই দৃষ্টির সামনে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠছে। মা নর্মদাকে মনে মনে প্রণাম করে চলেছি আর বলছি — মা তোমার উত্তরতটকে চিরকাল মনে রাখব, উত্তরতটে তুমি অনেক দেখালে, অনেক শেখালে, অনেক চেনালে। তোমার এই অহেতুক করুণা ভুলবার নয়। আজ একে একে মনে পড়ছে তোমার কৃপাধন্য সন্তানদেরকে — সেই প্রেমমূর্তি সুমেরদাসজী, যোগী শংকরনাথ, নামপ্রেমী দিওয়ানাজী,

মহাত্মা শোভানন্দ, ওঁকারের ঋষি প্রলয়দাসজী, ২৪ অবতারের অবধূত শিরোমণি সোমানন্দজী, ধাবড়ী কুণ্ডের মহাত্মা একলিঙ্গস্বামী, নির্মৎসর কাব্যরসিক সন্বিদানন্দজী, কোটেশ্বরের যোগিরাজ করপাত্রীজী, গোটামানুষ পরিপূর্ণমানুষ সেই মহৎহৃদয় নগেন্দ্রভারতীজী সকলের উদ্দেশ্যেই ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করছি মা। তুমি তাঁদের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান কর। তোমার রাতুল চরণে অকিঞ্চনের এই প্রার্থনা। মোহান্ত নগেন্দ্রভারতীজীর কথা স্মৃতিপটে উদয় হতেই বুকটা হু হু করে উঠল। আমি যুক্তকরে প্রণাম করতে করতেই ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

আমাকে কাঁদতে দেখে সেই ঘড়িধারী সাধু আমাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন — ঔর কোঈ ডর নেহি। ঔর দশ পন্দর মিনিট কা বাদ চার বাজেকা অন্দর নৌকা ভীড়েগা তটমেঁ। খতরনাক খতম হো গয়ী।

মা নর্মদাকী জয় হো। জয় শিবশংকর। সাধুরা উচ্ছ্বাসিত হয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে লাগলেন। মাঝিরা অতি সাবধানে নৌকাকে ভিড়িয়ে দিল কিনারায়। কাঠের পাটাতন কিনারাতে ঠেকিয়ে দিতেই সকলে একে একে নেমে পড়তে লাগলেন। দক্ষিণতটের মাটি স্পর্শ করতেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম বাবাকে। ঝোলা, গাঁঠরী নামিয়ে রেখেই লুটিয়ে লুটিয়ে প্রণাম করলাম মা নর্মদাকে, মহাদেবকে এবং ঋষি প্রলয়দাসজীকে। ওঁ সর্বেভ্যঃ সাধুভ্যোঃ নমঃ, সর্বেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ নমঃ, গুরুভ্যঃ নমঃ, দিব্যগুরুভ্যঃ নমঃ।

প্রণাম করে উঠে বসে তাকিয়ে রইলাম অথৈ অকূল সমুদ্রের দিকে, দু বৎসরের অধিককাল উত্তরতটের কূলে কূলে, শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে, দুর্গম অরণ্যপথে নানান্ বিপদ-আপদের মধ্যে ঘুরে ফিরেও উত্তরতটকে বড় আপন করে নিয়েছিলাম। উত্তরতটে আমি যে অনেক পেয়েছি। ভাবছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আর কাকে প্রণাম করতে বাকী থাকল? এই ভাবনা উদয় হওয়া মাত্রই মনে পড়ল প্রাচীন হিন্দী কবি নিশ্চলদাসীজীর একটি বিখ্যাত উক্তি। আমারই মত তাঁরও একদিন মনে জেগেছিল — 'কাকু করু প্রণাম?' আর কাকে প্রণাম করি? তাঁর মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল — 'বিশ্ব ভরণ-পোষণ করে তারই নাম ভারত। শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে নিজেকে ধন্য বোধ করেছিলেন। বড় খাঁটি কথাই বলে গেছেন কবি নিশ্চলানন্দ। ভারতবর্ষ বিশ্বকে ভরণ-পোষণ করছে, তার অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর তাবৎলোকের মুখে অন্ন জুগিয়ে, রাজকীয় বৈভব, ঐশ্বর্যের বিলাস, আড়ম্বর ও সমারোহের উৎস হয়ে ভারত সকলকে ধন্য করছে, ভারত পৃথিবীর লোককে ভরণ-পোষণ করছে জ্ঞানে, ত্যাগের ঐশ্বর্যে, অমৃতত্বের বাণীতে। বেদ উপনিষদের অমৃতস্যন্দী দুন্দুভি একদিন বেজে উঠেছিল এই ভারতের মাটিতেই। এখনও ভারতের মাটিতে বসেই আধুনিক কালের ঋষিরা সেই পুরাণী প্রজ্ঞার আলোকে দিয়ে চলেছেন সত্যের সন্ধান।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও মহাকাব্যে আমরা রোম্যান্টিক ভারতের যে পরিচয় পাই, তাতে দেখি, সেই শ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে দশার্ণ গ্রাম, প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঐশ্বর্যের ভারতবর্ষকেও দেখেছি — যেথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী স্ব-মহিমচ্ছায়া। প্রতাপান্বিত নরপতির যুদ্ধাশ্বের হ্রেষাধ্বনিও শোনা গেছে। শোনা গেছে দৃপ্ত হস্তের অস্ত্রের ঝনঝনা। কিন্তু সেই ছবি মহীয়সী বিশ্বম্ভরা ভারতমাতার প্রকৃত রূপ নয়, প্রকৃতিও নয়,

যথার্থ প্রকাশও নয়। প্রকৃত ভারতের রূপ রয়েছে, ঐ রাজসিক সমারোহ এবং ঐহিক বৈভবের নেপথ্যে। প্রকৃত ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়তার সন্ধান পাই সেখানে, যেখানে বলদর্পী এবং ঐশ্বর্যগর্বী রাজন্যবর্গ রাজ্যের ভাঙাগড়া খেলায় প্রমত্ত হয়ে ওঠেন নি বরং ত্যাগ বৈরাগ্যের মহামন্ত্র বুকে নিয়ে হেলায় মুকুট, দণ্ড ও সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, চীরধারণ করে সন্ন্যাসীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজপ্রাসাদের বাইরে শিলাসোপানে, স্বরূপসন্ধানের প্রেরণায়। কবিগুরুর ভাষায় — 'ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছেন।' এই মৌনী ও যোগী ভারতবর্ষের সেই মহানরূপ দেখে এলাম নর্মদার উত্তরতটে। নর্মদা তপোভূমি, নর্মদা শিবভূমি। তপস্যার জ্যোতিঃস্বরূপিনী সেই নর্মদা স্মরণাতীতকাল হতে বয়ে চলেছেন, এই ভারতেরই বুকে। গবেষণারত বৈজ্ঞানিক যেমন নিজের গবেষণাগারে বসে নিজের উপলব্ধ সত্য যে কত সত্য এবং প্রত্যক্ষ, তার বাস্তব স্বাদ দিয়ে চলেছেন। মা নর্মদে আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করছি — পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তবুও সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার বারবার মনে পড়ছে ঋষি পিতার শেষ কথা। নর্মদা পরিক্রমাতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি আমাকে বলেছিলেন — নর্মদার তটে ঘুরে বেড়ালেই বুঝতে পারবি, ভারতের মন যেন এক চির তীর্থযাত্রী সত্যসন্ধানী। সহস্র সহস্র পরিক্রমাবাসী পথ চলার ধর্মকেই জীবনে সারসত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং বলা বাহুল্য, সেই পথেই নর্মদার দয়ায় তাঁরা কৃতকৃত্য হয়েছেন। শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়ালেই শেষ পর্যন্ত সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব কি ? — এ প্রশ্ন যেন মনে কখনও না উঁকি মারে। পথে পথে অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে কিনা তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু নর্মদার তটে তটে তপস্যার মন নিয়ে বেড়ালে নর্মদা যে তোর বুকের পাত্র ভরে তুলবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। নিশ্চিত না হলে কোন বাপ কি প্রাণ প্রিয় পুত্রকে দুর্গম অরণ্যপথে বাঘ ভালুকের মুখে ঠেলে দিতে পারে? চলার পথে পন্থা ও লক্ষ্যের মধ্যে কোন হিসাব মেলাতে যাবি না। পন্থা ও লক্ষ্যের মধ্যে সত্যকার কোন প্রভেদ নাই। পন্থা ও লক্ষ্যেরই মতন মহৎ এবং পথিক হয়ে থাকাটাই লক্ষ্যলাভ।

যাওয়া সে যে তোমার পথের যাওয়া
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া। (চরৈবতি)

কাজেই আমি দক্ষিণতটেও হেঁটে বেড়াব। পরিক্রমা ও প্রাপ্তি যেখানে সমার্থক, সেখানে পথে চলাটাই ধর্ম। হর নর্মদে॥

## ॥ উত্তরতট পরিক্রমা সমাপ্ত॥